বড়দিন সংখ্যা
২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
Christmas 2025

সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
গৌরবময় পথ চলার ৮৫ বছর

বড়দিন: নব আশা ও আনন্দের উৎসব

It is with great sadness we announce that **Mrs.Yvonne D'Silva**, beloved wife and mother, passed away on July 12, 2025. She was born on October 29, 1941 in Noakhali, Bangladesh. She was joined in marriage to **Derek D'Silva on September 18, 1974.** They had 3 children. She spent most of her life in Noakhali and some of it in the United States. She was preceded in death by her parents and three siblings.

Mrs. D'Silva was a revered administrator, teacher and leader in her community. She dedicated her life to service to the church and community. She taught at Brother Andre's High School for almost 45 years. Over time she also served as an assistant headmistress and retired as headmistress. Her absolute love was teaching. She taught generations of family members. She always referred to her students as her kids and their adoration and respect has always been constant. She was and is still known as **"Boro Didi".**

She attended Holycross college in Dhaka and went on to receive her degree in Education from Mymensingh Teacher's Training College. Her entire academic career was spent at Brother Andre's High School. She was an active member of Our Lady of Lourdes Catholic church. She was a woman of strong faith and always recited her rosary. She was kind and generous to everyone.

She was in many ways a woman before her time. She courageously pushed against limits that were arbitrarily set for women and went on to live a life of her choosing. She inspired her own children as well as countless others. Her strength, kindness and courage in the face of adversity was exemplary.

We are broken hearted but also incredibly fortunate to have had her as a wife and a mother. She was loved fiercely and will be missed dearly.

-The grieving D'Silva Family

সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সূচীপত্র

প্রবন্ধ

- বড়দিন ও জুবিলী: মুক্তি ও নবজীবনের আহ্বান - *ফাদার প্রলয় আগষ্টিন ডি'ক্রুজ* ♦৮
- খ্রিস্ট জন্ম জয়ন্তী: আশাবাদী হওয়ার আহ্বান - *সিস্টার বিনু পালমা এলএইচসি* ♦১০
- কেনোটিক তত্ত্বে খ্রিস্টের দেহধারণের রহস্য - *ফাদার শিপন পিটার রিবেরু* ♦১১
- "বড়দিন" হলো ভালোবাসার উৎসব - *ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসি* ♦১৩
- চল বেথলেহেমে যাই - *জনি জেমস্ মুরমু সিএসসি* ♦১৪
- "...আমি এক মহা আনন্দের সংবাদ.....(লুক ২:১০-১১) - *সিস্টার মেরী আলো পালমা আরএনডিএম* ♦১৫
- প্রতিবছর প্রভু যিশুখ্রিস্ট গোশালায় জন্মায় না রে, জন্ম নেয় প্রতিটি মানুষের অন্তরে - *স্বপন বৈরাগী* ♦১৬
- আনন্দের সুখবর ও নববর্ষ - *ব্রাদার সিলভেস্টার মৃধা সিএসসি* ♦১৭
- "জাগো জেরুশালেম জাগো, ছড়াও তোমার দীপ্তি" - *প্রাণেশ ডেভিড পেরেরা* ♦ ১৮
- সেই তারাটি - *পাষ্টর কিশোর তালুকদার* ♦২০
- ভালোবাসার জন্মদিন: আত্মশুদ্ধির দীর্ঘ যাত্রায় বড়দিন - *অর্নেট ব্লেইজ পেরেরা* ♦২১
- দু'হাজার বছর পূর্বে খ্রিস্টের দেহধারণ ও দ্বিতীয় আগমনের গভীর বার্তা - *যোগেন জুলিয়ান বেসরা* ♦২২
- নতুন অনুভবে ভক্তি আর প্রেমে জারিত হোক বড়দিন উৎসব - *সুনীল পেরেরা* ♦২৪
- বড়দিন: বিনম্র সেবক হওয়ার আহ্বান - *ডানিয়েল লর্ড রোজারিও* ♦২৬
- বড়দিন এসেছে ভালোবাসার এবং ঐশ-শান্তির নববারতা নিয়ে - *খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন* ♦২৮
- পাহাড়ি ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের বড়দিন উদ্‌যাপন - *জ্যাষ্টিন গোমেজ* ♦৩১

খোলা জানালা

- বাংলাদেশে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ইতিহাস ও ভূমিকা - প্রদীপ পিটার গমেজ ♦৩৩
- পরিবেশ ও প্রকৃতি ধ্বংসে ধরিত্রী মাতার চোখে জল- হে মানুষ তুমি কেন দেখছো না - *বিভুদান বৈরাগী* ♦৩৫
- বই পড়ার গুরুত্ব - *আলেক রোজারিও* ♦৩৯
- খ্রিস্টীয় লোকাচার ও প্রসঙ্গকথা - *ফাদার সুরেশ পিউরীফিকেশন* ♦৪১
- প্রান্তের আলো : বড়দিন ও বাংলাদেশের সংখ্যালঘু রাজনীতি - *অপু প্লাসিড* ♦৪৪
- পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ব্যবহার্য বৈচিত্র্যময় বস্তু, সাহিত্য ও সংস্কৃতি - *রিপন ত্রিপুরা* ♦৪৬
- বড়দিন: যত্নের সংস্কৃতি বিকাশে আশা জাগায় - *ড. ফাদার লিটন হিউবার্ট গমেজ সিএসসি* ♦৫১
- নতুন গির্জা নির্মাণ ও পুরাতন গির্জা সংস্কার বিষয়ক নীতিমালা - *ফাদার ইউজিন জে. আনজুস সিএসসি* ♦৫৩
- ইতিবাচক চিন্তা সাফল্যের সোপান - *চয়ন হিউবার্ট রিবেরু* ♦৫৮

সাহিত্যমঞ্জুরী

- বঙ্গে খ্রীষ্টের জন্ম উৎসব: নাতাল থেকে খ্রীষ্টমাস এবং বড়দিন - *ড. ফাদার তপন ডি' রোজারিও* ♦৬০
- রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষক ও খ্রিস্টীয় সঙ্গীতসাধক শ্রী বিজয় কুমার সিংহ - *প্রদীপ পেরেজ এসজে* ♦৬৫

আলোকিত ব্যক্তিত্ব

- ডা. নেভেল ডি'রোজারিও-কে যেমনটা দেখেছি, যতটুকু জেনেছি - *ড. আলো ডি'রোজারিও* ♦৬৯

যুবতরঙ্গ

- আত্মবিশ্বাসে আলোকিত জীবন - *দোলন যোসেফ গমেজ* ♦৭১
- বৃদ্ধি-উন্মুখ মানসিকতা জীবনে নিয়ে আসবে সুখ ও শান্তি - *উইলিয়াম জেরিয়েল* ♦৭২
- শিক্ষাক্ষেত্রে বুলিং এর প্রভাব ও করণীয় - *খ্রিষ্টফার কস্তা* ♦৭৩
- জেনারেশন - *সাম্য টলেন্টিনু* ♦৭৪

মহিলাঙ্গণ

- মাতৃত্ব - *মালা রিবেরু* ♦৭৬
- নারীর সততা ও নারীর ক্ষমতা - *মিনু গরেট্টী কোড়াইয়া* ♦৭৮

ভ্রমণ কাহিনী

- মন্ট্রিয়ল সৌন্দর্য - *জেমস্ গমেজ (আদি)* ♦৭৯
- আশার তীর্থযাত্রা-২০২৫ খ্রিস্টাব্দ : তীর্থস্থানে অনন্য অভিজ্ঞতা - *ফাদার যোহন মিন্টু রায়* ♦৮০
- আশার তীর্থযাত্রী: জুবিলী বর্ষে ঘুরে এলাম পুণ্য তীর্থস্থান - *ফাদার নরেন জে. বৈদ্য* ♦৮৪

গল্প

- দুই হৃদয়ের আলো - *রবীন ভাবুক* ♦৮৬
- জেলখানার মত - *মিল্টন রোজারিও* ♦৮৯
- সাদাকালো টেলিভিশন - *সাগর কোড়াইয়া* ♦৯২
- ভালোবাসা কখনো পরাজিত হয় না - *প্রদীপ মার্সেল রোজারিও* ♦৯৩
- আমার এ মন পাখরতো নয়! - *ডেভিড স্বপন রোজারিও* ♦৯৪
- ফিরে পাওয়া সেই হারিয়ে যাওয়া..... - *নব কস্তা* ♦৯৭
- দীর্ঘশ্বাস - *সুমন কোড়াইয়া* ♦৯৯
- আত্মোপলব্ধি - *ফাল্গুনী ডি' কস্তা* ♦১০০
- ফাটল - *খোকন কোড়ায়া* ♦১০১
- আগমন - *জেসিকা লরেটো ডি' রোজারিও* ♦১০২
- ফিরে আসা - *ষ্টিফেন কোড়াইয়া* ♦১০৩
- এক গিটার বাদকের বড়দিন উদ্‌যাপন - *রবিন সি. গমেজ* ♦১০৬
- সুতোয় বাঁধা ঘুড়ি - *রাখি রিটা রোজারিও* ♦১০৮

স্বাস্থ্য কথা

- শীতের আমেজ ও স্বাস্থ্যঝুঁকি - *গ্রন্থনায়: জেভিয়ার রোজারিও* ♦১০৯

কলাম

- প্রেরিতগণের শ্রদ্ধামন্ত্র ও প্রসঙ্গ কথা - *ফাদার দিলীপ এস. কস্তা* ♦১১২

ছোটদের আসর

- ত্যাগ, দান ও আলোর উপহার - *জাসিন্তা আরেং* ♦১১৪
- বড়দিন: শিশু যিশুর জন্মদিন - *প্লাবন স্কট গ্রেগরী* ♦১১৫

বিশ্বমণ্ডলীর সংবাদ

- ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ: ভাটিকানের এক সন্ধিক্ষণ খ্রিস্ট জন্ম জয়ন্তী, পোপ ফ্রান্সিসের অধ্যায়ের সমাপ্তি ও পোপ লিও'র নতুন যাত্রা - *ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু* ♦১১৬

পানজোরাতে মহান সাধু আন্তনীর তীর্থোৎসবে সকলকে আমন্ত্রণ

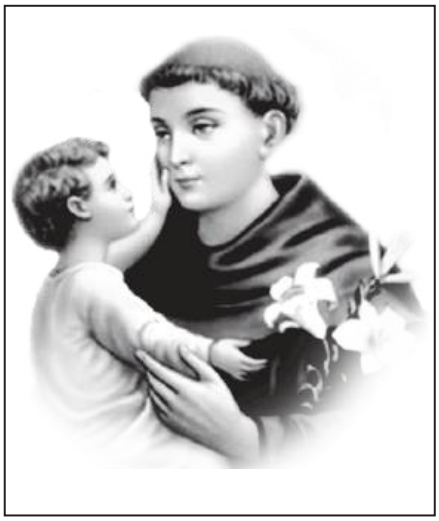

অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী **৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬** খ্রিস্টবর্ষ রোজ শুক্রবার, নাগরীর পানজোরাতে পাদুয়ার **সাধু আন্তনীর তীর্থোৎসব** মহাসমারোহে পালন করা হবে। এই তীর্থোৎসবে পর্বকর্তাদের জন্য শুভেচ্ছা দান ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা এবং খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য ২০০/- টাকা মাত্র। এছাড়াও যারা তীর্থভূমি উন্নয়নে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করতে চান, অনুদান দিতে চান ও মানত পূরণ করতে চান তাদেরকে সরাসরি নাগরী ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিতের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ঐতিহ্যবাহী পানজোরার অলৌকিক কর্মসাধক মহান সাধু আন্তনীর এই মহা তীর্থোৎসবে যোগদান ক'রে তাঁর মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও দয়া-আশীর্বাদ লাভ করতে আপনারা সকলেই আমন্ত্রিত।

বি.দ্র.

১। পর্বকর্তাদের শুভেচ্ছাদান সরাসরি নাগরী ধর্মপল্লীতে অথবা স্থানীয় পাল-পুরোহিতের মধ্য দিয়ে দিতে পারবেন।

২। আগাম যোগাযোগের ভিত্তিতে ১০০/- টাকা রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে পর্বদিনে দুপুরের প্যাকেট লাঞ্চ সংগ্রহ করার সুবিধা রয়েছে। তবে অবশ্যই ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টবর্ষ এর মধ্যে স্থানীয় পাল-পুরোহিতের মাধ্যমে জানাতে হবে।

৩। পর্বকর্তাদের জন্য শুভেচ্ছা দান ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা মাত্র। খ্রিস্টযাগের জন্য উদ্দেশ্য দান ২০০/- টাকা।

নভেনা খ্রিস্টযাগ:
২৮ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টবর্ষ
সকাল ০৬:৩০ মিনিট এবং
বিকাল ০৪:০০

পর্বীয় খ্রিস্টযাগ:
০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টবর্ষ, শুক্রবার
১ম খ্রিস্টযাগ- সকাল ৭:০০
২য় খ্রিস্টযাগ- সকাল ১০:০০

যোগাযোগের ঠিকানা -
ফাদার খোকন ভিনসেন্ট গমেজ
পাল-পুরোহিত, নাগরী ধর্মপল্লী
মোবাইল: ০১৭১২১৫৩৮৩৯

ধন্যবাদান্তে,
পাল-পুরোহিত, সহকারী পাল-পুরোহিত
পালকীয় পরিষদ ও খ্রিস্টভক্তগণ
নাগরী ধর্মপল্লী

বি.দ্র. এছাড়াও তীর্থভূমির পরিবেশ আরও প্রার্থনাপূর্ণ, আধ্যাত্মিকপূর্ণ করার জন্য অনেক কাজ করা প্রয়োজন। এসব চলমান উন্নয়ন কাজে আপনিও শরিক হয়ে সাধু আন্তনীর বিশেষ অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ লাভ করুন।

বর্ষ : ৮৫ : বড়দিন সংখ্যা
ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
নব কস্তা
জেভিয়ার রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ও অন্যান্য ছবি

ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

অস্থির বিশ্বে শান্তির বার্তা নিয়ে ‘বড়দিন’ হোক প্রতি ঘরে

বিভিন্ন ঘটনা-দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে বেশ দ্রুততই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ চলে গেলো। বছরের শেষের দিকে অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বর, জাতির গৌরবগাঁথা স্মরণে বিজয় দিবস এবং ২৫ ডিসেম্বর, প্রভু যিশু খ্রিস্টের জন্ম উৎসব তথা বড়দিন আমাদেরকে আনন্দিত ও আশাবাদী হবার উপলক্ষ্য দান করে। আমাদের প্রত্যাশা নতুন বছর অর্থাৎ ২০২৬ খ্রিস্টবর্ষ আমাদের জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে নবায়ন ঘটানোর সাথে সাথে শুদ্ধি ও সমৃদ্ধি আনবে।

যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন ‘বড়দিন’ শুধুমাত্র খ্রিস্টানদের একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, বরং মানব ইতিহাসে এক গভীর আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মোড় পরিবর্তনের স্মারক। স্বর্গ ও মর্তের মিলন ঘটে যিশুর জন্মের মধ্য দিয়ে। যিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে যে মিলন-বন্ধনের সূচনা হয়, তা মানবজাতির জন্য আশা, মুক্তি ও শান্তির নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। পবিত্র বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী, স্বর্গীয় দূতগণ ও বেথলেহেমের মাঠে রাখালেরা একযোগে আনন্দ উদ্‌যাপন করেছিল, কারণ সেই রাতে জন্ম নিয়েছিলেন সেই শিশু–যিনি “শান্তির রাজা”, “অনন্য মন্ত্রণাদাতা” এবং “ইম্মানুয়েল”–অর্থাৎ “আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর”।

যিশুর জন্ম অনন্য ও বিস্ময়কর। কুমারী মারীয়ার গর্ভে, ঈশ্বরের শক্তিতে তাঁর আগমন মানব যুক্তি ও ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করে। বেথলেহেমের গোয়ালঘরে যিশুর জন্ম ঘোষণা করে যে ঈশ্বর ক্ষমতাবানদের প্রাসাদে নয়, বরং দীন-দুঃখী, অবহেলিত ও প্রান্তিক মানুষের মাঝে বাস করতে ভালোবাসেন। তাই যিশুর জন্মে বিশেষভাবে আশার আলো জ্বলে ওঠে দরিদ্র, নিপীড়িত ও হতাশ মানুষের হৃদয়ে। তাই যিশুর জন্মদিন, বড়দিন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়–ঈশ্বর দূরে নন, তিনি মানুষের দুঃখ-কষ্টে একাত্ম হয়েছেন।

আজকের বিশ্ব অস্থিরতা, সহিংসতা, যুদ্ধ, বৈষম্য ও নৈতিক সংকটে জর্জরিত। ক্ষমতার লড়াই, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় আমাদের প্রতিদিনের বাস্তবতা। এই প্রেক্ষাপটে বড়দিনের বাণী আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। যিশুর জন্ম আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়–শান্তি শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে নয়, বরং বিনয়, ত্যাগ ও ভালোবাসার মধ্য দিয়ে আসে। বড়দিনের মূল আহ্বান হলো–মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব, বিভাজনের দেয়াল ভেঙে পুনর্মিলন, এবং ঘৃণার পরিবর্তে ভালোবাসার চর্চা। আজকের বৈশ্বিক বাস্তবতায়, যেখানে মানুষ মানুষকে শত্রু ভাবতে শিখছে, সেখানে বেথলেহেমের সেই শিশুর জন্ম আমাদের নতুন করে মানবিক হতে শেখায়।

বহু ধর্ম ও সংস্কৃতির দেশ; বাংলাদেশের অন্যতম একটি সম্পদ ও ঐতিহ্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। তবে বর্তমান সময়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক বিভাজন, অর্থনৈতিক চাপ এবং নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ অনেক মানুষের জীবনকে অনিশ্চিত করে তুলেছে। এমন বাস্তবতায় বড়দিন আমাদের কী বার্তা দেয়? বড়দিন আমাদের শেখায়–অন্যায়ের বিরুদ্ধে নীরব থাকা নয়, বরং শান্তিপূর্ণ ও নৈতিক অবস্থান গ্রহণ করা। যিশু অন্যায়কে সমর্থন করেননি, কিন্তু প্রতিশোধের পথও বেছে নেননি। তিনি সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন ভালোবাসার শক্তি নিয়ে। বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতায় এই শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজে সহনশীলতা, সংলাপ ও পারস্পরিক সম্মান ফিরিয়ে আনার জন্য বড়দিন আমাদের নতুন করে অনুপ্রাণিত করে। তবে বর্তমানের অস্থির সময়ে বাংলাদেশের খ্রিস্টানরা কতটা আনন্দে ও নির্ভাবনায় বড়দিন উদ্‌যাপন করতে পারবে!

বড়দিনের সময়ে রাষ্ট্র, সমাজ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর দায়িত্ব হলো–ক্ষুদ্র ধর্মীয় সম্প্রদায় যেন ভয়মুক্ত পরিবেশে তাদের বিশ্বাস ও সংস্কৃতি পালন করতে পারে সেদিকে নজর দেয়া। বড়দিন কেবল খ্রিস্টানদের উৎসব নয়; এটি মানবতার উৎসব। অন্যের আনন্দে শরিক হওয়াই এই দিনের প্রকৃত শিক্ষা। বড়দিনের প্রকৃত শিক্ষা: বিনয়, সহমর্মিতা, ক্ষমা-পুনর্মিলন ও আশা আমাদের আটপৌড়ে জীবনে অনুশীলন করলে তা আমাদের জীবনে আলো, আনন্দ ও শান্তি নিয়ে আসতে পারে।

বেথলেহেমের সেই নীরব রাতে জন্ম নেওয়া শিশুটি আজও আমাদের ডাকছে–ভয় নয়, ভালোবাসা বেছে নিতে; ঘৃণা নয়, ক্ষমা করতে; বিভাজন নয়, ঐক্য গড়তে। বাংলাদেশের এই অস্থির সময়ে বড়দিন আমাদের নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শেখায়–একটি ন্যায়ভিত্তিক, শান্তিপূর্ণ ও মানবিক সমাজের। তাই এ বছর বড়দিনে আমাদের প্রার্থনা হোক–আমাদের হৃদয় যেন বেথলেহেমের গোয়ালঘরের মতোই সরল ও গ্রহণযোগ্য হয়, যেখানে শান্তির রাজা বাস করতে পারবেন। জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে মহান বিজয় দিবস, পুণ্যময় বড়দিন ও সম্ভাবনাময় নব বর্ষের শুভেচ্ছা জানাই। †

রাখালেরা যা কিছু শুনল ও দেখল, তার জন্যে পরমেশ্বরের বন্দনা করতে করতে, তাঁর জয়গান গাইতে গাইতে তখন ফিরে গেল। তাদের যেমনটি বলা হয়েছিল, সব-কিছু ঠিক সেই ভাবেই ঘটেছিল। *(লুক ২:২০ পদ)*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

বড়দিনের শুভেচ্ছা

যিশুখ্রিস্টের শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে সকলকে জানাই বড়দিনের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের সকল বিশপ, পুরোহিত, ব্রাদার, সিস্টার, বিশপীয় সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের চেয়ারম্যান বিশপ জেমস রমেন বৈরাগীসহ সকল সদস্য-সদস্যা, 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সকল পাঠক, শুভাকাঙ্ক্ষী, লেখক-লেখিকা, উপকারী বন্ধু-বান্ধব ও বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি রইল কৃতাঞ্জলি। বাণীদীপ্তি, রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা বিভাগ, জ্যোতি কমিউনিকেশন, প্রতিবেশী প্রকাশনী, জেরী প্রিন্টিং প্রেস-এর সকল সম্মানিত ক্রেতা, গ্রাহক ও শ্রোতাদের প্রতি রইল আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা। সকলের দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য এবং সফল আরেকটি বছর কামনা করছি। খ্রিস্টবর্ষ ২০২৬ সকলের জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল সুখ ও আনন্দ।

ছুটির নোটিশ

শুভ বড়দিন উপলক্ষে খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের সকল বিভাগ ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৫ থেকে ২ জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। প্রতিবেশীর পরবর্তী সাধারণ সংখ্যা প্রকাশ করা হবে আগামী ১১ জানুয়ারি, রবিবার ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ।

পরিচালক
খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র

বিশেষ ঘোষণা

২০২৬ খ্রিস্টাব্দেও সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা নির্ধারিত ৪০০ টাকাই থাকবে। -বিজ্ঞাপন বিভাগ, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

রেডিও ও টিভি চ্যানেলে বড়দিনের অনুষ্ঠানমালা

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের সরাসরি প্রযোজনা এবং সহযোগিতায় রেডিও ও টিভি চ্যানেলে বড়দিন উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এসব অনুষ্ঠানগুলো দেখা ও শোনার জন্য সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

বিটিভি'র অনুষ্ঠান

অনুষ্ঠান : **"আলোয় ভরা ভালোবাসা"**
মূলভাবনা : **ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু**
রচনা : **সুনীল পেরেরা**
সম্প্রচারের সময় : রাত ১০টার সংবাদের পর (ব্যতিক্রম হলে প্রতিবেশী'র ফেইসবুক পেইজে ও স্থানীয় পুরোহিতের মাধ্যমে পরিবর্তিত সম্প্রচার সময় জানিয়ে দেয়া হবে)।
সহযোগিতা : বাণীদীপ্তি
তারিখ : ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

বাংলাদেশ বেতার, সিলেট

অনুষ্ঠান : **"বড়দিন : মিলনের দিন"**
গ্রন্থণা ও প্রযোজনা : **ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু**
উপস্থাপনা : **ইভা মারাক, ঈশিতা গমেজ ও সুনীল পেরেরা**
সার্বিক সহযোগিতা : **বাণীদীপ্তি স্টুডিও**

বড়দিনসহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান দেখুন ও শুনুন

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর ফেইসবুক পেইজ
সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর ইউটিউব চ্যানেল
বাণীদীপ্তি মিডিয়া ইউটিউব চ্যানেল

রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা সার্ভিসের বিশেষ অনুষ্ঠান

অনুষ্ঠান : **"বিভিন্ন কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে বড়দিন"**
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা : **ফাদার নিখিল গমেজ**
সম্প্রচারের সময় : সকাল ৮:০০ মিনিট
তারিখ : ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

www.veritasbangla.org
www.facebook.com/veritasbangla1

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন

ইমেইল : wklypratibeshi@gmail.com
ওয়েবসাইট : https://weekly.pratibeshi.org/

ব্যবহার করুন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো

ফেইসবুক : www.facebook.com/weeklypratibeshi
ইউটিউব:https://www.youtube.comBanideeptiMedia

পরিশোধ করুন গ্রাহক চাঁদা বিকাশে

বিকাশ নম্বর : ০১৭৯৮৫১৩০৪২

বড়দিন উপলক্ষে বাণী

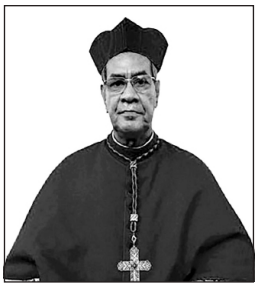

জাতীয় নির্বাচনে বড়দিনের বার্তা

আজ ২৫ ডিসেম্বর, প্রভু যিশুর জন্মদিন, আমাদের বড়দিন। এ বড়দিন হচ্ছে মিলনের বড়দিন: ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মিলন এবং মানুষে-মানুষের মিলন; তাই বড়দিনে উপলব্ধি করি মিলনের আনন্দ! মিলনময় আনন্দের শুভেচ্ছা জানাই সদিচ্ছাপূর্ণ সকল অনুগৃহীত ভক্তদের প্রতি।

বিগত চারটি সপ্তাহ ধরে, আমরা খ্রিস্টবিশ্বাসীরা, অনেক প্রত্যাশা, প্রতীক্ষা ও প্রস্তুতি নিয়ে প্রভু যিশুর আগমনের বার্তা শুনতে চেষ্টা করেছি। এই সময়ে আমার একটা প্রশ্ন ছিল: "প্রভু যিশু এবছর কোথায় ও কীভাবে আগমন করবেন?"

বড়দিন উৎসবকালের সমাপ্তিতে যখন গোটা দেশ জাতীয় নির্বাচনের অপেক্ষা করছে ও প্রস্তুতি নিচ্ছে, অনেক বাসনা ও প্রত্যাশা নিয়ে নির্বাচনের পথ চলছে, যখন বিভিন্ন ব্যক্তি ও দল, মুক্তি ও স্বাধীনতা, মানব মর্যাদা ও অধিকার, এবং ন্যায়, উন্নয়ন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নানা নির্বাচনী ইশতেহার প্রদান করছেন, তখন মানবত্রাতা যিশুর কাছ থেকে আমরা এই বাণী শুনতে পাচ্ছি: "প্রভুর আত্মিক প্রেরণা আমার ওপর অধিষ্ঠিত, তিনি আমাকে করেছেন অভিষিক্ত। তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন দীনদরিদ্রের কাছে মঙ্গলবার্তা প্রচার, বন্দীর কাছে মুক্তি আর অন্ধের কাছে নবদৃষ্টি-লাভের কথা ঘোষণা করতে, পদদলিত মানুষকে মুক্ত করে দিতে এবং প্রভুর অনুগ্রহদানের বর্ষকাল ঘোষণা করতে" *(লুক ৪:১৮-১৯)*।

আমরা বাইবেলে এও শুনছি : "আমি এক মহা আনন্দের সংবাদ তোমাদের জানাতে এসেছি; এই আনন্দ সমস্ত জাতির জন্য সঞ্চিত হয়ে আছে" *(লুক ২:১০)*। আরও শুনছি স্বর্গীয় দূতবৃন্দের মুখে : "ইহলোকে নামুক শান্তি তাঁর অনুগৃহীত মানবের অন্তরে। *(লুক ২:১৪)*।"

মানুষের সকল প্রত্যাশার মধ্যে যে কথাটা আরও গভীর সত্য সেটা হল: মানবাধিকার, উন্নয়ন, ন্যায় বা শান্তি কেবলমাত্র কথা বা বার্তা নয়, কেবলমাত্র মানুষের প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনাও নয়। সকল কথা ও বার্তার পেছনে আছেন স্বয়ং ঈশ্বর যিনি মানুষ হয়ে আমাদের জীবনে আগমন করতে চান। আমাদের সকল অযোগ্যতা ও রাশিরাশি পাপ-অপরাধ থাকা সত্ত্বেও, ঈশ্বর আমাদেরকে ভালবেসে, দীনদরিদ্র মানুষকে নির্বাচন করে রেখেছেন, যেন তাদের মাঝে তিনি জন্ম গ্রহণ করতে পারেন, তাদের সাথে একাত্ম হতে পারেন এবং "মানুষের-মাঝে-ঈশ্বর" হিসেবে তিনি বাস করতে পারেন।

যখনই মানুষ আপন জীবনে, ঈশ্বর বলে তাঁকে গ্রহণ করবেন, তখনই তারা মানুষের কাছে "ইশতেহার", মানুষের জন্য "গণমঙ্গল" অথবা "মঙ্গলবার্তা" হয়ে আসবেন। তখনই হবে তাঁর আগমন, মানুষ লাভ করবে মর্যাদা ও অধিকার, আসবে জনকল্যাণ ও উন্নয়ন, প্রতিষ্ঠিত হবে ন্যায় ও শান্তি, ভালবাসা ও মিলন, সফলতা ও অর্জন, স্বাধীনতা ও তার সংরক্ষণ।

বড়দিন উৎসবে ও জাতীয় নির্বাচণ-ক্ষণে দেশবাসী সকল মানুষের মধ্যে পরম করুণাময় প্রভুর আগমন হোক ––এই প্রতীক্ষায় আমরা থাকি অনেক প্রত্যাশা ও প্রার্থনা নিয়ে।

বড়দিনের এই আনন্দোৎসবে সকল দেশবাসীর কাছে, খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। বড়দিন সবার মধ্যে ও জাতীর জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল আনন্দ, শান্তি এবং করুণাময় ঈশ্বরের অশেষ আশীর্বাদ। শুভ বড়দিন!

. . . . . .

At the end of the Christmas Season this year we will have our long-awaited National Election in Bangladesh for which so many promises are made, so extensive manifestoes are propagated by individuals and different political parties. It is good to keep in mind that God of love has already elected us as his chosen people and brought to us the Good News of Emmanuel, God-with-us. Let us surrender to God's manifestoes of love and mercy, justice and peace, human dignity and rights, and freedom and protection. My greetings of joy, peace and harmony to all during the Christmas and during everyday of the New Year.

Cardinal Patrick D'Rozario, csc
Archbishop Emeritus of Dhaka.
Moreau House, Plot-B, House 28, Road 3,
Banashree, Rampura, Dhaka 1219. Bangladesh

বড়দিন উপলক্ষে বাণী

বিশপদের ষোড়শ সিনডের চূড়ান্ত দলিল প্রকাশিত হয়েছে। এই সিনডাল যাত্রাতে (২০২১-২০২৪) মণ্ডলী নিজে পবিত্র আত্মার আলোকে আলোকিত হয়ে আহূত হয়েছে তাদের যাপিত খ্রিস্টীয় জীবন পরীক্ষা-নিরিক্ষা করে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে নবায়নের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে; যাতে মাণ্ডলিক মিলন ও একতাকে আরও গভীর করা যায় এবং অংশগ্রহণকে ব্যাপক ও শক্তিশালী করে যিশু প্রদত্ত মিশন কাজকে আরও শক্তিশালী করা যায়। এই দলিল গুরুত্ব আরোপ করে যে, মণ্ডলী হলো বিশ্বাসী জনগণ, একটি মিলন-বন্ধন যা গঠিত হয় সত্যিকারের ভ্রাতৃত্বপূর্ণ প্রেমের মধ্য দিয়ে, এটা একটা আমলাতান্ত্রিক সংগঠন নয়। আমাদের মধ্যে রয়েছে বিশ্বাস ও ভালবাসার একটা বন্ধন। মণ্ডলী হলো ঈশ্বরের একটি পরিবার, অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ গৃহ, যেখানে সবার স্থান রয়েছে। আমাদের এই মিলন বন্ধন শক্তিশালী হয় খ্রিস্টযাগ ও খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করে এবং প্রভুর বাণী শ্রবণ ও পালনের মধ্য দিয়ে।

মঙ্গলসমাচারে বর্ণিত সাধু পিতর ও তাঁর সঙ্গীদের তিবেরীয় সাগরে মাছ ধরার ঘটনাকে পটভূমি হিসাবে ব্যবহার করে এই দলিল আমাদেরকে একটা ইঙ্গিত প্রদান করে যে, জাল একে অপরের সাথে একটা বন্ধনে আবদ্ধ। যা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমাদের মিশন কাজকে সার্থক করার জন্য বন্ধন, একাত্মতা, সাহায্য ও সহযোগিতা প্রয়োজন। মঙ্গলবাণী ও খ্রিস্টাদর্শ প্রচারের জন্য প্রয়োজন একাত্মতা, বোঝাপড়া, সহযোগিতা এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। এই সিনড্ আমাদের সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে যেন আমরা পবিত্র আত্মার প্রতি উন্মুক্ত হই, তাঁর কথা শুনি এবং নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক নবায়নের মধ্য দিয়ে মন পরিবর্তন করি। আমাদের যাত্রা হোক "আমি" থেকে "আমরা" হওয়াতে। এই মনপরিবর্তনের পদ্ধতিতে রয়েছে সুশাসন, দায়বদ্ধতা এবং স্বচ্ছতা।

সবার কল্যাণের জন্য মাণ্ডলিক অবধারণ (সিদ্ধান্ত) প্রক্রিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত কতকগুলো নিয়ম-নীতির উপর দাঁড়িয়ে আছে: অন্যের কথা শুনা, প্রার্থনা, সংলাপ, বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়নের উপর। পুনরুত্থিত খ্রিস্ট শিষ্যদের ফুঁ দিয়ে যখন পবিত্র আত্মাকে প্রদান করেছিলেন তখনই নতুন সৃষ্টির সূচনা হয়েছে - মিশনারী মণ্ডলীর জন্ম হয়েছে। সিনডাল শিক্ষাকে বাস্তবায়ন করার জন্য এসো আমরা সক্রিয়ভাবে মাণ্ডলিক জীবনে ও মিশন কাজে অংশগ্রহণ করি, অন্যকে অংশগ্রহণ করতে সুযোগ করে দেই, বিশেষ করে নারী এবং যুবাদের - মিলন-একাত্মতা, অন্যের যত্ন, ভ্রাতৃত্ব ও দরদ-ভালবাসা চর্চা করি বিশেষ করে দরিদ্রদের প্রতি।

আমরা এ বছর যিশু খ্রিস্টের ২০২৫ বছরের জন্ম-জুবিলীবর্ষ পালন করেছি। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি পোপ ফ্রান্সিসের ঐতিহাসিক অবদানের কথা। তিনি সমগ্র মণ্ডলীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন যাতে আমরা এ জগতে আশার তীর্থ যাত্রী হয়ে উঠি। আমরা সবাই এ জগতে তীর্থযাত্রী। আশা আমাদের পথ দেখায়, এগিয়ে যাওয়ার সাহস যোগায়, আশা মানুষকে সঞ্জিবিত রেখে স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখে। আশা আমাদের জীবনকে রূপান্তরিত ও সক্ষম করে, যাতে আমরা হতাশা নিরাশার অন্ধকারের মধ্যে ঈশ্বরের ভালবাসার দ্যুতি ছড়াতে পারি।

আসুন আমরা হয়ে উঠি আশার জীবন্ত সাক্ষ্য ও বাতিঘর। প্রভু যিশুর জন্মতিথি আমাদের প্রত্যেকের জীবনে বয়ে আনুক গভীর আনন্দ, মিলন, সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব ও শান্তি।

সবাইকে বড়দিনের উষ্ণ শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং নববর্ষ উপলক্ষে রইলো অনেক অনেক শুভ কামনা।

+ বিজয় ডি'ক্রুজ, ওএমআই

আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ ওএমআই
আর্চবিশপ, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ
সভাপতি, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী

বড়দিন উপলক্ষে বাণী

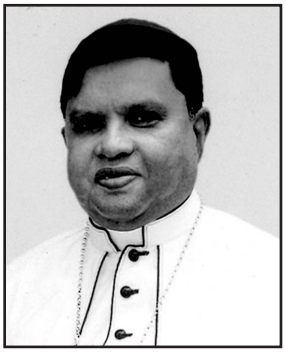

এই জুবিলী বর্ষের শেষে আমরা প্রতি বছরের মত প্রভু যিশু খ্রিস্টের জন্ম উৎসব 'শুভ বড়দিন' পালন করছি। এই বছরে বিশেষ ভাবে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, যিশুর জন্ম হল আশার তীর্থযাত্রার জন্য ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ আমন্ত্রণ। বেথলেহেমে জন্ম নেওয়া শিশু যিশুতে আশা দেহ ধারণ করেন, তার এই দেহধারণের মাধ্যমে মানুষ তার আশার যাত্রার দিক নির্দেশনা খুঁজে পায়, তাঁর ভালবাসায় মানব হৃদয় শক্তি লাভ করে। তাঁর জন্ম হল মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার চিহ্ন।

বড়দিন আমাদের সহজ সরল হৃদয় রাখালদের মত যিশুকে আশা নিয়ে খুঁজতে আহ্বান জানায়, এমনকি অন্ধকারের মধ্যেও যেন আশা হত না হয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের জন্য ত্যাগ ও তপস্যার মাধ্যমে সামনের দিকে এগিয়ে যাই। যিশু এই জগতে এসেছিলেন পাপময়তার অন্ধকার দূর করে, বিশেষভাবে যারা হতাশা নিরাশার মধ্যে জীবন যাপন করছে, অন্যায় অবিচারের স্বীকার হয়ে জীবনের পথ হারিয়ে ফেলছে তাদের জীবনে আশার আলো জ্বালাতে। বর্তমান বিশ্বে যে অন্ধকারময় অবস্থা বিরাজ করছে সেখানে যিশু তাঁর জন্মের মাধ্যমে আহ্বান করছেন যেন আমরা আশার দূত হয়ে আলো জ্বালাতে পারি। তার জন্ম আমাদের আশার পুর্ননবীকরণ করতে, শান্তি, করুণা ও আনন্দের তীর্থযাত্রী হতে আহ্বান করছে।

এই বড়দিন সবার জীবনের ক্ষত নিরাময় করুক, লক্ষ্যকে শক্তিশালী করুক এবং বয়ে আনুক অনাবিল শান্তি, আশায় ভরে তুলুক আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। বিশ্বাসের সাথে আমাদের আশার তীর্থযাত্রা চালিয়ে যাই এবং আনন্দে উদ্‌যাপন করি প্রভু যিশুর জন্ম উৎসব বড়দিন।

এই জুবিলী বর্ষে আপনাদের সবার প্রতি জানাই শুভ বড়দিন ও আনন্দময় নতুন বর্ষের শুভেচ্ছা। প্রার্থনা করি নতুন বর্ষ আপনাদের সবার জীবনে বয়ে আনুক সফলতা, আনন্দ ও শান্তি এবং আশার তীর্থযাত্রী হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যান।

খ্রিস্টেতে বিনীত,

+ জেমস্ রমেন বৈরাগী
খুলনা ধর্মপ্রদেশ।
সভাপতি, বিশপীয় সামাজিক যোগাযোগ কমিশন, সিবিসিবি

প্রবন্ধ

বড়দিন ও জুবিলী: মুক্তি ও নবজীবনের আহ্বান

ফাদার প্রলয় আগষ্টিন ডি'ক্রুজ

'চির নতুন এসেছে আবার
উঠেছে বেজে শঙ্খধ্বনি
মন প্রাণ তাই নিবেদন করি
বরণ করি তাঁর চরণ খানি।'

জুবিলীর মধ্য দিয়েই পুরাতন আবার নতুন করে আসে। কেননা পুরাতন না হলে জুবিলী হয় না, আর যখন জুবিলী হয় তখন পুরাতনটাই নতুন হয়ে ওঠে। আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্টের জন্মদিনকেই আমরা বড়দিন নামে আখ্যায়িত করে থাকি। বড়দিন অর্থাৎ আজ থেকে দুই হাজার পঁচিশ বছর আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে প্রতিবছর একই সময়ে স্মরণ করি, জন্ম দিবস উদ্‌যাপন করি; এই দিনটিই আমাদের জন্য বড়দিন। কেন এই দিন এত গুরুত্ববহ? কেন এই দিন এত ঘটা করে পালনের ব্যাপার? কারণ এই দিনেই ঈশ্বর নিজে মানুষের মাঝে অবতীর্ণ হয়েছিলেন শিশু যিশুর অন্তরালে। ঈশ্বর মানুষ হয়েছেন এটাই হলো বড়দিনের মূল কথা। তিনি এসেছেন মানবজাতির মাঝে বিরাজমান সকল অন্ধকারের কালোমেঘ ঘুচিয়ে মুক্তির আলো জ্বালাতে। ভোরের রক্তিম সূর্যের ন্যায় অন্ধকার ভেদ করে নতুন আলোকিত দিনের শুভ সূচনা করতে। পাপ ও হতাশার শৃঙ্খলা ভেঙ্গে মানব হৃদয়ে আশার দ্বার উন্মুক্ত করে দিতে।

খ্রিস্ট জন্ম মানব জাতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যে ঘটনা ঘটার মধ্য দিয়ে পুরো বিশ্বের ইতিহাস একটি নতুন মোড় নিয়েছে; প্রবেশ করেছে একটি নতুন অধ্যায়ে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে প্রভু যিশু খ্রিস্টের জন্ম একটি ধর্মের প্রবর্তকের জন্মদিন তথা খ্রিস্টভক্তদের জন্য একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান বটে, বড়দিন উদ্‌যাপন বটে। কিন্তু যিশু খ্রিস্ট শুধুমাত্র একটি ধর্মের ব্যক্তিত্বে সীমাবদ্ধ নন, তিনি একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, যিনি একটি নতুন ইতিহাসের জন্ম দিয়েছেন। এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এই জন্মের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনে শুরু হয়েছে নতুন দিক দর্শন। এসেছে নতুন ঐতিহ্য-ঐশ্বর্য, এসেছে ভাবনার নতুন আঙ্গিনা, জেগেছে নতুন চেতনা। তিনি মানুষকে দিয়েছেন নতুন আশা, নতুন দিশা, নতুন প্রত্যাশা। তাঁকে আবর্তন করেই বিশ্ব ইতিহাস আবর্তিত।

বড়দিন ও জুবিলী দু'টো আলাদা বিষয়, কিন্তু এই দু'টোকে একেবারেই আলাদা করে দেখার সুযোগ নেই; বিশেষত যখন আমরা দুই হাজার পঁচিশ খ্রিস্টাব্দের এই সময় পুণ্য জুবিলী বর্ষ উদ্‌যাপন করছি যা কিনা খ্রিস্টের জন্মেরই জয়ন্তী। 'চির নতুন', যিশু হলেন সেই চির নতুন আর জুবিলী হলো পুরাতন নতুন যা চির নতুনও বলা যাবে। তিনিই চির নতুন ও চির পুরাতন। জুবিলী পালনের ইতিহাসে যাচ্ছি না, তবে জুবিলী পালনের রেওয়াজ ও ভিত্তি আসলে সেই পুরাতনকে নতুন করে সামনে আনার ঘটনাই আসল কথা। ফিরে যাওয়া সেই গোড়ায়, সেই মূলে যেখান থেকে এর উৎপত্তি বা শুরু হয়েছে। দীর্ঘ দিন বা বহু বর্ষ পরে সেই পুরাতনকে নতুনভাবে দেখা, স্মরণ করা এবং এর সঙ্গে জড়িতদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটা

সুযোগ নেওয়া। জুবিলীর একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মূল্যায়ন। আরম্ভের পর থেকে এই যে সুদীর্ঘ যাত্রা পথ, এই যে সময় পেরিয়ে গেল (শত বছর বা হাজার বছর) এই মধ্যখানের সময়টায় কী করা হয়েছে, তা আর একটু তলিয়ে দেখা। চিন্তা করে উদ্ধার করা যে, যে সকল উদ্দেশ্য, লক্ষ্য নিয়ে এর শুরু হয়েছিল বর্তমানে এর অবস্থান কেমন। আমরা যথার্থ পথে চলছি কিনা। আমরা আমাদের উদ্দেশ্য লক্ষ্যে স্থির আছি, যেভাবে যাচ্ছি ঠিক আছে বা এর উন্নয়নে আমাদের আরো কোন পদক্ষেপ নিব বা নেওয়ার সুযোগ আছে। জুবিলী আমাদের জন্য সেই সুযোগ তৈরি করে দেয়, যেখানে আমরা প্রয়োজনীয় মেরামত করতে পারি। পুরাতনকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করে প্রয়োজনে আবার যুগ উপযোগী করে নতুনভাবে কিছু করার উদ্যোগ নিতে পারি। মূল বিষয় বা আসলটাকে ভিত্তি করে আধুনিকায়ন বা হালনাগাদ করাও বলা চলে। জুবিলী উদ্‌যাপনে আমরা পিছনে ফিরে তাকাই, কিন্তু আমরা পিছিয়ে যাই না। আমরা আরো সম্মুখে যাই। আমাদের গতি বাড়াই আমরা লক্ষ্য অতিক্রম করে আরো এগিয়ে যেতে চাই নতুন লক্ষ্য পূরণে, স্পর্শ করতে চাই আরো একটি নতুন অধ্যায়। তাই জুবিলী পুরাতনকে নতুন করে তোলে এবং নতুন করে চলার অনুপ্রেরণা দেয়।

জুবিলী একটি উৎসব, বড়দিন একটি উৎসব। দু'টোই উৎসব, আবার কোনটাই শুধু উৎসবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, উৎসব ছাড়া পালন করাও মানায় না। আনন্দঘন পরিবেশে উদ্‌যাপন করা, প্রচার প্রচারণা করা, ঘোষণা করা জুবিলীর একটি বিশেষ দিকও বটে। কারণ বাইবেলে জুবিলী পালনের নির্দেশনায় আছে শিঙ্গা বাজিয়ে, উঁচু স্থান থেকে এই আনন্দের ঘোষণা করা ও সকলকে নিয়ে উৎসব, আমোদ প্রমোদ করা। আর আমরা বর্তমান বাস্তবতায় তাই করি। আনন্দ আয়োজনের কোন কমতি রাখি না। সাজ-সজ্জা, খাওয়া দাওয়া, বাদ্য বাজনা, নাচ-গান সব কিছুই জুবিলী উৎসবের অঙ্গ হয়ে ওঠে। আমাদের পক্ষে যা করা সম্ভব, আমরা তার সব কিছু করার মধ্য দিয়ে বড়দিন ও জুবিলী উদ্‌যাপন করে থাকি। বড়দিন উৎসবের সঙ্গে আমরা জুবিলীকে টানছি কারণ এইবারের বড়দিন হলো, বড়দিনের জুবিলী এবং জুবিলী পালন করার যে অর্থ প্রাচীনকাল থেকে বলা হচ্ছে এবং আমরা বহুকাল ধরে বহন করছি, যা আমরা জেনে আসছি, বড়দিনের (যিশু খ্রিস্টের জন্ম) উদ্দেশ্যও ঠিক তাই। মুক্ত ও মুক্তি।

জুবিলী ও বড়দিন দু'টোই বাইবেলে উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মে লেবীয় পুস্তকের ২৫ অধ্যায়ে আমরা জুবিলীর বিষয় উল্লেখ পাই যেখানে জুবিলী পালনের সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া জুবিলী পালন করা এটা তৎকালীন সমাজের একটি বিশেষ রীতিতে পরিণত হয়েছিল। মানুষ জুবিলী পালনের অপেক্ষায় থাকতো। সময়ের পূর্ণতায় তারা জুবিলী পালন করে আসছিল। মূলত তখন প্রতি সাত বছর অন্তর অন্তর জুবিলী পালন করার রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। এই বছর তারা বিশ্রামের বছর হিসাবে এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে কৃতজ্ঞতার বছর হিসাবেই পালন করতো। তারা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে কৃতজ্ঞতা ভরে স্বীকার করতো যা কিছু আছে সবই ঈশ্বরের দেওয়া দান, তাই তারা ধন্যবাদের ডালি নিবেদন করার আয়োজন করতো এবং এটা একান্ত আবশ্যক মনে করেই করতো। তাই জুবিলী যেমন মানুষের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহের বছর হিসাবে পালন করা হয়, ঠিক একইভাবে বড়দিনও ঈশ্বরের অনুগ্রহের একটি ধারাবাহিকতা। ঈশ্বর

যে ভালোবাসা থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, বড়দিন বা যিশুর জন্ম সেই ভালোবাসার পূর্ণতা প্রকাশ। পবিত্র বাইবেল থেকে আমরা জুবিলী বর্ষের অর্থ পাই জুবিলী মানে হলো ক্ষমা এবং পুনঃস্থাপনের বছর। ঐতিহ্যগতভাবেই দেখা যায় যে, সেই সময় জুবিলী উপলক্ষে দাসেরা মুক্তি পেত, ঋণগ্রস্থদের ঋণ ক্ষমা করে দেওয়া হতো, ইজারাকৃত জমি তার মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া হতো। এমন কি তারা চাষের জমির প্রতিও কৃতজ্ঞ ছিল। যে জমি তাদের ফসল দিত, সেই সকল চাষের জমিকেও জুবিলী বর্ষে বিশ্রাম দেওয়া হতো। সেই বছর সে-সকল জমিতে লাঙ্গল চালানো হতো না। পুরো বছরই জমি পতিত থাকতো বিশ্রামের চিহ্ন হিসাবে। এই সব তারা করতো ঈশ্বরের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা নিবেদনের চিহ্ন হিসাবে। তারা মনে করতো সারা বছর ঈশ্বর তাদের প্রতি দয়া ও ন্যায় প্রকাশ করে আসছে, তাদেরও ঈশ্বরের এই দয়ার প্রতিদানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং অন্য মানুষের প্রতি সদয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই তাদের সামর্থ্য অনুসারে তারা পরস্পরের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতো। বর্তমান সময়ে আমরা যখন জুবিলী বর্ষ উদ্‌যাপন করি তখন আমাদের প্রতিও একই আমন্ত্রণ আমরা যেন নিজেকে, আমাদের পরিবারকে, আমাদের সমাজকে এবং প্রকৃতিকে ঈশ্বরের অনুগ্রহে নবায়ন করি। জুবিলীর একটা প্রকাশ উৎসবে আমদে। কিন্তু জুবিলীর আধ্যাত্মিকতা ও আহ্বান হলো মূলত কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ, প্রশংসা এবং পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন সাধন করা।

বাইবেলে (পুরাতন নিয়মে) জুবিলী পালন আমাদের জন্য যে শুভ সংবাদ বয়ে আনে ও শিক্ষা দেয় তা হলো মুক্তি ও মুক্ত করার। বড়দিন আমাদের জন্য সেই মুক্তির পূর্ণরূপ প্রকাশ করে। যিশু নিজেই সেই কথা উচ্চারণ করেন *(লুক ৪:১৬-২১)*। যিশু খ্রিস্টের জন্মের মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারি, আমরা বুঝতে পারি যে, মুক্তি কোনো দূরের স্বপ্ন নয়, বরং মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করা সম্ভব, এটি খুবই বাস্তব। মুক্তির কাজ এই মুহূর্তে এবং এখানেই শুরু হয়েছে আর স্বয়ং যিশুই মুক্তির পূর্ণতা। যিশু তাঁর মুক্তিদায়ী কাজ এই পৃথিবীতে নিজের হাতে করেছেন এবং তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে তা সম্পন্ন করেছেন। তিনি মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে সেই একই কাজ চলমান রেখেছেন যেন কেউ মুক্তির আনন্দ থেকে বঞ্চিত না হয়। মণ্ডলীর সভ্য হিসাবে ভালোবাসা, ক্ষমা, পুনর্মিলন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সেই মুক্তির কাজ আমাদের চর্চা করে যেতে হবে। তিনি আমাদের তাঁর শিষ্য করেছেন, আহ্বান করেছেন যেন আমরা বড়দিন উৎসব উদ্‌যাপন করি, জুবিলী উৎসব করি আর তাঁর মধ্য দিয়ে এই উৎসবের নিগূঢ় রহস্য উন্মোচন করি।

জুবিলী বর্ষ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ঈশ্বর আমাদের কখনো বঞ্চিত করেন না। তিনি তাঁর উদার হৃদয়ে আমাদের আকর্ষণ করেন। এমন কি আমরা তাঁর অনুগ্রহ অস্বীকার করলেও তিনি আমাদের আবার নতুন করে সুযোগ দেন। জুবিলীতে সেই কারণেই জীবন মূল্যায়ন করা ও ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নতুন করে শুরু করার সুযোগ গ্রহণ করার এই সুযোগটা কাজে লাগানো খুবই দরকার। বড়দিন ও জুবিলী আমাদের জন্য মুক্তি ও নবজীবনের দ্বার উন্মুক্ত করে। প্রত্যেক জন মানুষের প্রতি এই সময়ের আহ্বান হলো এতে সাড়া দেয়া, জীবন নবায়নের এই সুবর্ণ সময়টা ব্যবহার করা। নবজীবন বা জীবন নবায়ন মানে হলো জীবন পুনঃমূল্যায়ন করে নতুনভাবে শুরু করা। জীবনের প্রতি যত্নশীল হওয়া এবং সচেতন হওয়া। ঈশ্বরের অনুগ্রহ উপলব্ধির মধ্যে নিয়ে আসা। যিশু যেমন নিকোদেমকে বলেছিলেন নতুন করে জন্ম নিতে হবে *(যোহন ৩:১৬)*। ঐশ করুণা ও মানব মুক্তির এই রহস্যময় সত্য বুঝতে হলে নবজীবনে পদার্পণ করা দরকার। আধুনিক এই যন্ত্র নির্ভর ও প্রযুক্তির যুগে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি উন্মোলিত করতে না পারলে যুক্তি তর্কে মুক্তির রহস্য অনুধান করা সম্ভব হবে না। তাই আত্মিক শক্তি দিয়েই জীবন পর্যালোচনা করতে হবে।

বড়দিন ও জুবিলী দু'টো আনন্দঘন উৎসব একত্রে আমাদের বিশ্বাসের যাত্রাকে গভীরতর করে। বিশ্বাসের পথে জীবন যাপন করলেই কেবল এর গভীরতা অনুভূতি উপলব্ধি করা যায়। এগুলো আমাদের শেখায় ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদেরকে পরিবর্তন করতে অবিরত অনুপ্রাণিত করে যাচ্ছে। জুবিলীর তাৎপর্য বুঝতে না পারলে, হৃদয়াঙ্গম করতে না পারলে, আমরা উৎসব আনন্দ ব্যতীত আর কোন কিছুই এখান থেকে পাব না। যেভাবে নিকোদেম বুঝতে পারেনি নতুন জন্মের রহস্য। যিশুর জন্ম অর্থাৎ বড়দিন আমাদের নতুন করে তাঁর সাথে জন্ম নিতে আহ্বান করেন যেন আমরা নতুন জীবন পেতে পারি, যেন আমরা নতুন মানুষ হয়ে উঠতে পারি। যিশু আমাদের জন্য মানুষ হয়েছেন তিনি আমাদের দেখিয়েছেন মানুষ হয়েও পরিত্রাণ লাভ করা সম্ভব। তার জন্য প্রয়োজন তার মত নতুন মানুষ হয়ে ওঠা বা নবজন্ম নেওয়া। আমাদের সকলের প্রতি সেই আহ্বান, যেন আমরা এই নবজন্মের মাধ্যমে নিজের জীবন এবং সমাজে, একে অন্যের কাছে শান্তি ও ন্যায় এবং ভালোবাসার সাক্ষী হয়ে উঠতে পারি। বড়দিন ও জুবিলীর প্রকৃত তাৎপর্য তুলে ধরি।

তোমার আগমনে

রবার্ট অরবিন্দ চিরান

মাস কেটে বছর, বছর কেটে দিন
অপেক্ষার প্রহর পেরিয়ে-
কত যুগ আসে আর চলেও যায়,
রাখে না কেউ মনে-
আনন্দ আর দুঃখ নিয়ে
থাকে না কেউ আর বসে॥

জীবনের প্রতিটি বসন্তে ফুল আসে
দিনের শেষে যায় যে তাও ঝরে।
ছড়িয়ে দিয়ে যায় তার কিছু স্মৃতি,
আশা-ভালোবাসা বাতাসে,
মনে হবে- এইতো ধরেছি,
চেয়েছি আমি যারে
মিথ্যে কুহক আশে॥

তুমিও এসো হে প্রভু
তোমার মুক্তিবার্তা নিয়ে-
প্রতি বছর হা-ভাতে প্রতিটি ঘরে,
হৃদয় দোয়ার খুলে, চেতনার নতুন জয়গানে;
তুমি এসো এবার পাপী-তাপীর মন-মন্দিরে
বাজিয়ে সপ্তবীণা, মাতিয়ে ধরণী-
করে অন্ধকার অবসান
হবো পবিত্র আজি তোমার আবাহনে॥

খ্রিস্টের হও

স্বপন ডেভিড কস্তা

যদি খ্রিস্টের হও
যদি বাড়াও হাত
তবেই মুছে যাবে
পাপ কালিমার ছাপ।

হাসি মুখ তুলে
অভিমান ভুলে
জানাই বড়দিনের শুভেচ্ছা
আলিঙ্গন করে।

বড়দিনের আনন্দে
কীর্তনের তালে তালে
গানের সুরে মিলালে সুর
হবে পুরোনো যত
দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর।

মনের জানালা খুলে
যিশুর আলো আসতে দাও
হৃদয়ে ভালোবাসার
শতক ফুল ফুটুক
ছুটুক পাল তুলে,
অনন্ত শান্তির পথে-
যদি খ্রিস্টের হও।

খ্রিস্ট জন্ম জয়ন্তী: আশাবাদী হওয়ার আহ্বান

সিস্টার বিনু পালমা এলএইচসি

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষকে খ্রিস্ট জুবিলী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। অর্থাৎ যিশু খ্রিস্টের জন্মের ২০২৫ বছর পূর্তি উৎসব। ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে পোপ ৮ম বনিফাস-এর সময় প্রথম এই খ্রিস্ট জয়ন্তী পালন করা হয়েছিল আর ১৪৭৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতি ২৫ বছর অন্তর অন্তর এই জুবিলী পালিত হয়ে আসছে। জুবিলী বছর হলো পুণ্যবর্ষ। জুবিলী হলো আনন্দের উৎসব, অনুতাপ মনপরিবর্তন, ক্ষমা দেওয়া ও নেওয়ার সময়, ঋণ পরিশোধের বছর, পিছনে ফিরে তাকানোর উৎসব, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানোর উৎসব। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের জুবিলী বছরের মূলভাব "আশার তীর্থযাত্রী"। বর্তমান পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আজ যখন হিংসা, বিদ্বেষ, স্বার্থপরতা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, সন্ত্রাসী কার্যক্রম মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক মন্দা, হতাশা-নিরাশা, চুরি-ডাকাতি, ধর্ষণ, পরিবার-সমাজে অনৈতিকতা, মাদকাসক্ততা, বিচ্ছেদ, অশান্তি, অভাব-অনটন নিত্য নৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে তার মাঝে আশার আলো ও খ্রিস্ট বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা জগতের মানুষকে আশার আলো দেখাতে পারি। যেভাবে ঈশ্বর শূন্যতা থেকে জগত সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার থেকে আলো ফুটিয়েছেন। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন, "আমরা সবাই আশার তীর্থযাত্রী।" প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে আশার বাসনা আছে, ভাল কিছু হবে, আসবে সুদিন। আশা একটি ঐশতাত্ত্বিক গুণ, যার দ্বারা আমরা আমাদের সুখ হিসাবে ঐশরাজ্য ও শাশ্বত জীবনের বাসনা করি, খ্রিস্টের প্রতিশ্রুতির উপর আস্থা রাখি। এটি মানুষকে নিরাশা থেকে মুক্তি দেয়। অনন্ত সুখের প্রত্যাশায় হৃদয় উন্মুক্ত করে, স্বার্থপরতার হাত থেকে রক্ষা করে এবং আমাদের জীবনকে ভালোবাসার দিকে চালিত করে। বিশ্বাস থেকেই আশা জন্ম নেয়। আশা মানুষকে পথ দেখায়, সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহস যোগায়, লক্ষ্যে পৌঁছতে সহায়তা করে এবং আশা আমাদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দান করে। আশা জীবনের চ্যালেঞ্জগুলোকে সুযোগ হিসেবে রূপান্তরিত করে। রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের পালকীয় সম্মিলনীতে বিশপ জের্ভাস রোজারিও তার স্বাগত বক্তব্যে বলেছেন, "শুধু আশা করলেই হবে না, আশার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে অর্থাৎ যা আশা করি তা পাওয়ার জন্য ধ্যান-প্রার্থনা-সাধনা-অনুশীলন করতে হবে, কাজ করতে হবে, পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকার করতে হবে। অন্ধকারকে দোষারূপ না করে আশার প্রদীপ প্রজ্বলন করতে হবে। নিজে আশাবাদী মানুষ হয়ে অন্যদের জীবনে আশার আলো জ্বালাতে পারি।" ঠিক ৪টি প্রদীপের গল্পের মত: শান্তি, বিশ্বাস, ভালোবাসা ও আশা নামে ৪টি প্রদীপ। নীরবে ৪ টি প্রদীপ জ্বলছে, তাদের পরস্পরের মধ্যে কথা হচ্ছে। প্রথম প্রদীপটি বললো, "আমি হলাম শান্তি" কিন্তু বর্তমানে পৃথিবীতে অশান্তিতে পূর্ণ কেউ আমাকে গ্রহণ করে না। প্রদীপটি তখন ধীরে ধীরে নিভে গেল। দ্বিতীয় প্রদীপটি বললো, "আমি হলাম বিশ্বাস" কিন্তু আমি আর মানুষের অন্তরে থাকতে পারছিনা কেননা আমার গ্রহণীয়তা কমে গেছে। মৃদু বাতাস এসে প্রদীপটি নিভিয়ে দিল। হঠাৎ তৃতীয় প্রদীপটি বলে উঠলো, "আমি হলাম ভালোবাসা" কিন্তু দিন দিন মানুষ আমাকে অবজ্ঞা করছে, আমাকে আর কেউ বুঝতে চাইছে না। তখন হঠাৎ করেই প্রদীপটি নিভে গেল। কিছুক্ষণ পরে ছোট একটি শিশু সেখানে প্রবেশ করে ৩টি নেভানো প্রদীপকে প্রশ্ন করলো, "তোমরা জ্বলছো না কেন? তোমাদের কি শেষ পর্যন্ত জ্বলার কথা নয়?" প্রশ্নটি বলেই শিশুটি কাঁদতে লাগলো। চতুর্থ প্রদীপটি তখন বলে উঠলো, "তোমরা ভয় পেয়ো না, আমি হলাম আশা, যেহেতু আমি এখনো জ্বলছি, তাই আমি অন্যদেরও জ্বালাতে পারবো।" শিশুটি উজ্জ্বল দৃষ্টিতে আশার প্রদীপটিকে লক্ষ্য করছিল, আশার প্রদীপ সবাইকে আলো জ্বালিয়ে দিল।

আমরা যে যিশু খ্রিস্টের জন্মের ২০২৫ বছর পূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন করছি তাতে জুবিলীর অর্থ অনুসারে পুনরায় খ্রিস্টের দেহধারণ রহস্য ধ্যান করতে হবে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। খ্রিস্টের দেহধারণ সম্পর্কে লেখক লামবের্ট নবেন লিখেছেন:

"ঈশ্বরের কথা- আমি তোমাদের বলি, কেন মানুষ হয়ে আমি জন্মগ্রহণ করেছি।

ঈশ্বর বলেন, আমি উলঙ্গ হয়ে জন্ম নিলাম, তুমি যেন তোমার নিজের অহংকার তুলে ফেলতে শিখ।

আমি গরীব হয়ে জন্ম নিলাম, তুমি যেন আমাকেই তোমার একমাত্র সম্পদ বলে গণ্য করতে শিখ।

আমি একটা গোশালায় জন্ম নিলাম, তুমি যেন প্রত্যেক পরিবেশ পবিত্র করতে শিখ।

আমি দুর্বল হয়ে জন্ম নিলাম, তুমি যেন আমাকে ভয় না কর।

আমি প্রেমের কারণে জন্ম নিলাম, তুমি যেন আমার প্রেমকে কখনও সন্দেহ না কর।

আমি রাত্রে জন্ম নিলাম, তুমি যেন বিশ্বাস করতে পার যে, আমি সবকিছুই আলোকিত করতে পারি।

আমি মানব ব্যক্তিরূপে জন্ম নিলাম, তুমি যেন নিজের সত্তাকে নিয়ে লজ্জাবোধ না কর।

আমি মানুষ হয়ে জন্ম নিলাম, তুমি যেন ঈশ্বরের মত হতে পার।

আমি আমার জন্মদিন থেকে অত্যাচারিত হয়েছিলাম, তুমি যেন জীবনের সমস্যা গ্রহণ করতে শিখ।

আমি অতি সাধারণভাবে জন্ম নিলাম, তুমি যেন জটিল মানুষ না হও।

আমি তোমার জীবনের মধ্যেই জন্ম নিলাম, আমি যেন সকল মানুষকে পিতার ঘরে নিয়ে যেতে পারি।"

লেখক লামবের্ট নবেন তার উক্ত লেখনীতে খ্রিস্টের দেহধারণ রহস্যের গভীর তাৎপর্য তুলে ধরেছেন যা আমাদের আহ্বান জানায় খ্রিস্টের জীবন ধ্যানে আশাবাদী মানুষ হতে। জগতের দৃষ্টিতে যা ছিল আশাহীন নগন্য-অর্থহীন-ঘৃণিত-তুচ্ছ-অপমানজনক তাকে তিনি তার জীবন দিয়ে গৌরবময়-অর্থপূর্ণ করে তুলেছেন। যে গোশালা দুর্গন্ধময় পরিবেশ, সেখানে যিশু জন্মগ্রহণ করে পবিত্র করে তুলে আহ্বান জানান প্রত্যেক পরিবেশকে পবিত্র করে তুলতে। যিশু রাত্রে জন্মগ্রহণ করে যেভাবে সবকিছুই আলোকিত করেছেন তেমনি আমাদের আহ্বান জানায় অন্ধকারকে দোষারূপ না করে যে কোন হতাশা-নিরাশাময় অবস্থায় আশার প্রদীপ প্রজ্বলন করতে। যার কাছে সবকিছু করার ক্ষমতা আছে তিনি ঈশ্বরপুত্র ঈশ্বরের মতই বলার সাথে সাথে যাদু-মন্ত্রের মত সবকিছু হয়ে যায় অথচ গরীব হয়ে জন্ম নিয়ে আহ্বান জানান আমরা যেন তাঁকেই একমাত্র সম্পদ বলে গণ্য করি। জগতের কাছে যে ক্রুশ ছিল লজ্জাজনক-ঘৃণিত সেই ক্রুশে যিশু প্রাণত্যাগ তরে মহিমান্বিত-গৌরবান্বিত করে তুলে আহ্বান জানিয়েছেন, জীবনের দুঃখ-কষ্ট-চ্যালেঞ্জ-অপমানে ভীত না হয়ে পুনরুত্থানের আশা-আনন্দে যিশুতে ভরসা রাখতে। এই জুবিলীবর্ষ আমাদের আহ্বান জানায় আশায় নবায়িত হয়ে আশার দৃশ্যমান চিহ্ন হতে, রূপান্তরিত মানুষ হতে। আশার জননী মা-মারীয়ার মত ঈশ্বরে গভীর বিশ্বাস-আস্থা রাখতে যিনি যিশুর পরিত্রাণের যাত্রাসঙ্গী হয়ে পুত্রের যাতনাভোগ-মৃত্যু নিজের চোখে দেখেও ক্ষমাশীল হৃদয়ে সবকিছু বহন করেছেন। আমাদের আহ্বান জানায় আজকের জগতে খ্রিস্টের চোখ, মুখ, হাত-পা, হৃদয় হয়ে অন্যের কাছে অপর খ্রিস্ট হয়ে বিশ্বাস হস্তান্তর করতে এবং আমরা যেন হয়ে উঠি বাইবেল যা লোকে পড়বে ও খ্রিস্টের অনুসরণ করবে।

সহায়ক গ্রন্থ: *ফাদার স্ট্যানলী কস্তা, জুবিলী বর্ষ ২০২৫: "আশার তীর্থযাত্রী" সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, সংখ্যা ০২,২০২৫ খ্রিস্টাব্দ।*

কেনোটিক তত্ত্বে খ্রিস্টের দেহধারণের রহস্য

ফাদার শিপন পিটার রিবেরু

খ্রিস্টের দেহধারণ খ্রিস্টধর্মের একটি অন্যতম প্রধান নিগুঢ়-রহস্য। পবিত্র শাস্ত্র ও মণ্ডলীর ঐতিহ্যগত শিক্ষায় ঘোষণা করা হয় যে, যিশুখ্রিস্ট ত্রিত্ব ঈশ্বরের দ্বিতীয় ব্যক্তি কিন্তু তিনি মানুষ হয়েছেন। খ্রিস্টভক্তগণ বিষয়টিকে বিশ্বাসের দৃষ্টিতে মানবমুক্তি কল্পে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা হিসাবে গ্রহণ করে থাকেন। সাধু পল ফিলিপ্পীয়দের কাছে পত্রে এই ঘটনাকে 'কেনোটিক' তত্ত্বের মধ্য দিয়ে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে তিনি ত্রিত্বের দ্বিতীয় ব্যক্তির নিজেকে রিক্ত, শূন্য ও অবনমিত ক'রে মানব জাতির সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত হওয়ার সুমহান নির্দশন হিসাবে বর্ণনা করেছেন, "তিনি তো স্বরূপে ঈশ্বর হয়েও ঈশ্বরের সাথে তাঁর সমতুল্যকে আঁকড়ে থাকতে চাইলেন না, বরং নিজেকে তিনি রিক্ত করলেন, দাসের স্বরূপ গ্রহণ ক'রে তিনি মানুষের মতো হয়েই জন্ম নিলেন" *(ফিলি ২:৬-৭)*। অর্থাৎ তিনি আমাদেরই একজন হয়ে এই জগতে আসেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করেন *(দ্র. যোহন ১:১৪)*।

খ্রিস্টের দেহধারণ ও ভ্রান্তশিক্ষা: কিন্তু দেখা গেল যে, খ্রিস্টমণ্ডলীর শুরুতেই খ্রিস্টবিশ্বাসের এই মৌলিক বিশ্বাস ও তত্ত্ব নিয়ে নানা রকম ভ্রান্তশিক্ষার আর্বিভাব হয়। দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুতে 'ডোসেটিজম' নামক এই ধরনের একটি মিথ্যা শিক্ষার উদ্ভব হয়। এটি যিশুর দেহধারণ সম্পর্কে ভ্রান্ত শিক্ষা দিতে থাকে। তাদের মতে, যিশু কেবল মানবীয় স্বভাব নিয়ে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। মানুষরূপী তার বাহ্যিক অবয়ব প্রকৃত দেহ ও রক্ত দিয়ে গড়া নয়, বরং একটি মিথ্যা ছায়া। এক্ষেত্রে তার দুঃখকষ্ট/মৃত্যুও বাস্তব ছিল না; এমনকি তার ক্রুশবিদ্ধ ও শারীরিক পুনরুত্থানের মতো ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোকেও তারা অবাস্তব বা কাল্পনিক হিসাবে গণ্য করত। অন্য কথায় বলা যায় যে, এই মতবাদ জগতে যিশুর ঐতিহাসিক অস্তিত্ব ও মানবজাতির সাথে গভীর সম্পর্ককে পরোক্ষভাবে অস্বীকার করে।

কিছু চিন্তাবিদ খ্রিস্টবিশ্বাসীদের মধ্যে এই ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য ক'রে প্রেরিতশিষ্যগণই প্রথম এদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। প্রেরিতশিষ্য যোহন তার লেখনীর মধ্য দিয়ে এই মতবাদ সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করেছিলেন, "প্রিয়জনেরা, যে কোন আত্মিক প্রেরণাকেই বিশ্বাস করো না, বরং সেই সব আত্মিক প্রেরণা যাচাই করে দেখ, ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে কিনা। কারণ এখন অনেক নকল প্রবক্তা সংসারে দেখা দিয়েছে। যে আত্মিক প্রেরণা ঈশ্বরের কাছ থেকেই আসে, সেই প্রেরণাকে তোমরা এই ভাবে চিনতে পারবে: যিশুখ্রিস্ট যে মরদেহে পৃথিবীতে এসেছিলেন, সেই সত্যকে স্বীকৃতি জানায় যে আত্মিক প্রেরণা, তা ঈশ্বরের কাছ থেকেই এসেছে। কিন্তু যে সব আত্মিক প্রেরণা যিশুকে সেই স্বীকৃতি দেয় না, সেই সব প্রেরণা নিশ্চয় ঈশ্বরের কাছ থেকে আসেনি। তেমন প্রেরণা বরং সেই খ্রিস্টশত্রুরই আত্মিক প্রেরণা, যার বিষয়ে তোমরা শুনেছ যে, সে একদিন আসবেই। আর এখন সে তো এই সংসারে এসেই গেছে" *(১ যোহন ৪:১-৩)*। খ্রিস্টের দেহধারণের এই মৌলিক বিশ্বাসমন্ত্রটি সম্পর্কে প্রেরিতশিষ্য যোহন কোন ধরনের

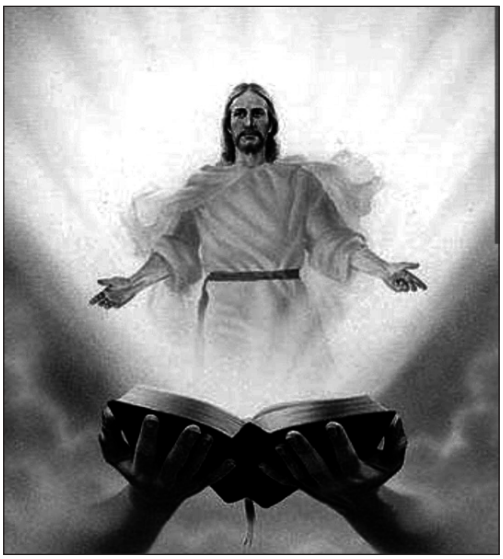

আপোস করেননি। তিনি সরাসরি তাদেরকে খ্রিস্টশত্রু অর্থাৎ খ্রিস্টমণ্ডলীর শত্রু হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। যিশুর একান্ত প্রিয়জন ও অতি কাছের এই শিষ্য মানব যিশুর সাথে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা- শোনা, দেখা, স্পর্শ প্রভৃতি ক্রিয়াপদগুলোর মাধ্যমেও জোরালোভাবে তুলে ধরেছেন *(১ যোহন ১:১-৩)*।

কেনোটিক তত্ত্ব ও খ্রিস্টের দেহধারণ: সাধু পল যিশুর দেহধারণের এই রহস্যটি উপরে উল্লেখিত ফিলিপ্পীয়দের কাছে পত্রে ২:৬-৭ পদে আরো গভীরভাবে তুলে ধরেন। তিনি এখানে একটি মূখ্য গ্রীক শব্দ ব্যবহার করেন, আর তা হচ্ছে 'কিনোসিস' (kenosis)। প্রাথমিকভাবে 'কিনোসিস' শব্দটির অর্থ হচ্ছে, শূন্য করা; রিক্ত হওয়া; কারো অধিকার বা সম্পদ থেকে বঞ্চিত হওয়া; একাকী হয়ে পড়া প্রভৃতি *(জেরে ১৪:২)*। সাধু পল ফিলি ২:৭ পদে এই শব্দটি মূলত যিশুর দেহধারণের জন্য ব্যবহার করেন, যা আবার খ্রিস্টের দেহধারণের 'কেনোটিক তত্ত্ব' নামেও পরিচিত। এখানে তিনি নিজেকে অস্বীকার করেছেন, ঈশ্বর হিসাবে তার যে মূল্য ও সুযোগ-সুবিধা তা থেকেও তিনি স্বেচ্ছায় নিজেকে বঞ্চিত করেছেন।

খ্রিস্ট 'নিজেকে রিক্ত করা'র ধারণাকে অনেকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা দিতেও চেষ্টা করেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে এইচ. গ্রোটিয়াস নামক এক চিন্তাবিদ দাবী করেন যে, দেহধারণের সময় খ্রিস্ট নিজের জন্য আরোপিত উপাধিসমূহ, যেমন- ঈশ্বরত্ব, সর্বজ্ঞতা, সর্বব্যাপিতা, সর্বশক্তিমান প্রভৃতি তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে বা তুলে নেয়া হয়েছিল, কিন্তু পবিত্রতা, প্রেম ও ধার্মিকতার মতো প্রয়োজনীয় গুণাবলীগুলো রেখে দেয়া ছিল। আসলে এই ধরনের শিক্ষা সাধু পলের লেখা ফিলি ২:৭ পদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এটি খ্রিস্টের দেহধারণ রহস্যটিকে ভুলভাবে উপস্থাপনের সামিল।

'কিনোসিস' শব্দটি ফিলি ২:৭ পদে যদিও স্বেচ্ছায় খ্রিস্টের ঐশরিক বিশেষ অধিকারকে ত্যাগ করাকে ইঙ্গিত করে, কিন্তু দু'টি ক্রিয়াপদ 'ধারণ' (taking) ও 'হওয়া' (being born) দ্বারা পরিষ্কার করা হয় যে, শূন্যতা বা রিক্ততা খ্রিস্টের ঈশ্বরত্বকে বিয়োগ দেয়ার মধ্য দিয়ে নয় বরং মানব স্বভাবের সংযুক্তির মধ্য দিয়ে ঘটেছে। সুতরাং, এখানে কিছুই বাদ দেওয়া হয়নি বরং নিজের সঙ্গে এমন একটি বিষয় যোগ করা হয়েছে যা আগে তাঁর মধ্যে ছিল না, যেমন, 'দাসের স্বরূপ, মানুষের সাদৃশ্য' প্রভৃতি। এদিক থেকে যেতে পারে যে, দেহধারণকৃত খ্রিস্টের ঈশ্বরের থেকে কম নয় বরং অতিরিক্ত উপাধি তাঁর মধ্যে সন্নিবেশ ঘটেছে- যা তাকে অত্যন্ত উচ্চতর আসনে উন্নীত করেছে। তার গভীর নম্রতা ও আত্মসমর্পণের জন্য ঈশ্বর তাকে সবকিছুর উপরে স্থান দিলেন *(দ্র. ফিলি ২:৮-১১)*।

কেনোটিক তত্ত্ব সম্পর্কে অরিজেনের ধারণা: আদিমণ্ডলীর পিতৃগণের মধ্যে অন্যতম ঐশতত্ত্ববিদ অরিজেন এই 'কেনোটিক' তত্ত্ব সম্পর্কে বলেন যে, খ্রিস্টের 'রিক্ত করা' অর্থ এই নয় যে, তাঁর প্রকৃত ঐশরিক গৌরবের

ক্ষতি এবং ক্ষমতার সীমাবদ্ধতাকে নির্দেশ করে, বরং বাক্যের (logos) ঐশরিক প্রকৃতি অক্ষত ও অপরিবর্তিত রয়েছে। 'রিক্ত/শূন্য' করার মানে হচ্ছে মানবীয় অবস্থার সাথে শ্রদ্ধাভরে একাত্ম হওয়া ও একজন 'দাসের রূপ' ধারণ করা। তিনি 'কেনোসিস' বা শূন্যতা/রিক্ত করা'কে ঈশ্বরপুত্র যিশুর মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও অনুকম্পার একটি সুদৃঢ় কর্ম হিসাবে উপস্থাপন করেন। এটি ঈশ্বরের ঐশরিক প্রকৃতির অপরিহার্য অপরিবর্তনীয়তা এবং তাঁর পরিপূর্ণতার সাথে আপোস না করেই একটি পতিত, বৈচিত্র্যময় সৃষ্টির সাথে যোগাযোগ করতে এবং শেষে তা রক্ষা করতে সক্ষম হয়।

কেনোটিক তত্ত্ব বা দেহধারণ সম্পর্কে কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা (সিসিসি): কাথলিক খ্রিস্টমণ্ডলীর শিক্ষাও এই বিষয়ে অবস্থান খুবই স্পষ্ট। যিশুখ্রিস্টের দু'টি স্বভাব বা স্বরূপ: একটি ঐশরিক এবং অন্যটি হচ্ছে মানবিক। এই দু'টি স্বভাব আলাদা বা বিচ্ছিন্ন দু'টি অবস্থা নয়, বরং এই দুটি স্বরূপ ঈশ্বরপুত্রের ঈশ্বরীয় ব্যক্তিত্বে যুক্ত হয়ে আছে *(দ্র. সিসিসি, ৪৮১)*। সুতরাং, এই ঐশব্যক্তি যিশুখ্রিস্ট যখন পিতার পরিকল্পনা অনুসারে মানবমুক্তির জন্য দেহগ্রহণ করেন, তখন তিনি ঐশ স্বরূপ পরিত্যাগ না করেই মানবস্বরূপ বা স্বভাব গ্রহণ করেন *(দ্র. সিসিসি, ৪৭৯)*। ঈশ্বরপুত্র আবার মানবীয় আত্মাও গ্রহণ করেছিলেন এবং মানবীয় জ্ঞানে ভূষিত হয়েছিলেন। এজন্য পবিত্র শাস্ত্র বলে যে, ঈশ্বর পুত্র যখন মানুষ হলেন, তখন তিনি 'প্রজ্ঞায় ও বয়সে, এবং ঈশ্বরের ও মানুষের অনুগ্রহে বেড়ে উঠতে লাগলেন' *(লুক ২:৫২)*। এমনকি তিনি নিজের জন্য অনুসন্ধান ও শিক্ষা লাভ করেছেন *(দ্র. মার্ক ৮:২৭)*। তিনি যে সত্যিকার অর্থে স্বেচ্ছায় নিজেকে রিক্ত করলেন, দাসের স্বরূপ ধারণ করলেন *(দ্র. ফিলি ২:৭)*- তা এই সত্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ *(দ্র. সিসিসি, ৪৭১)*।

খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জীবনে কেনোটিক তত্ত্বে প্রভাব: ফিলিপ্পীয়দের কাছে পত্রে সাধু পল ফিলিপ্পীয় মণ্ডলীর একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। প্রেরিতশিষ্যদের সময় থেকেই খ্রিস্টমণ্ডলীতে, বিশেষভাবে ফিলিপ্পীয় মণ্ডলীতে কিছু বিভক্তি দেখা দেয়। এগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল 'ইহুদীপন্থী খ্রিস্টান'- যারা খ্রিস্টীয় জীবন-যাত্রায় ইহুদী বিধান ও ঐতিহ্য যোগ করতে সোচ্চার ছিলেন; এবং অন্যদিকে ছিলেন 'উদারপন্থী খ্রিস্টান'- যারা যিশুখ্রিস্টের শিক্ষাকেই বেশী প্রাধান্য দিয়ে থাকতেন। এমতাবস্থায়, সাধু পল তাদের নিজের মধ্যে ঐক্য ও মিলনের আহ্বান জানায়। ব্যক্তিস্বার্থ ও দলাদলির উর্ধ্বে উঠে একে অন্যের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধাশীল হওয়া আহ্বান জানান। খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসাবে একমন, একপ্রাণ, একপ্রেম, একচিত্ত হওয়ার দাবী করেন *(দ্র. ফিলি ২:১-৪)*। তার এই আহ্বানকে আরো শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যেই তিনি যিশুখ্রিস্টের মানুষ হওয়া ও তার নম্রতা-আনুগত্য 'কেনোটিক' নামক গীতিকার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেন *(দ্র. ফিলি ২:৬-১১)*। কেনোটিক তত্ত্বের মধ্য দিয়ে পলের শিক্ষা শুধুমাত্র তৎকালীন ফিলিপ্পীয় সমাজের জন্যই প্রযোজ্য নয়, বরং আজও খ্রিস্টসমাজ ও খ্রিস্টভক্তের জন্য তা সমভাবে কার্যকরী।

১. কেনোটিক তত্ত্বের প্রধান দিক হল যিশুখ্রিস্ট যিনি ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান, এবং সমস্ত স্থান-কাল-পাত্রের উর্ধ্বে, তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে রিক্ত করলেন, নম্র হলেন এবং মানব স্বভাব গ্রহণ করলেন। এখানে তাঁর অপরিসীম নম্রতা, আত্মত্যাগ ও উন্মুক্ততার বিরল দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই তিনটি গুণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের মানুষ নম্রতার পরিবর্তে অহংবোধ, উগ্রতা, আত্মত্যাগের পরিবর্তে আত্মস্বার্থ, এবং উন্মুক্ততার পরিবর্তে ব্যক্তি ও সমাজে বিরাট দেয়াল তৈরি হচ্ছে, নিজেদের আবদ্ধ করে রাখা হচ্ছে। সুতরাং, কেনোটিক তত্ত্বে অন্তর্নিহিত খ্রিস্টের দেহধারণ শুধুমাত্র একটি উৎসব নয় বরং নতুন মানুষ হওয়ার আহ্বান ধ্বনিত হচ্ছে।

২. কেনেসিস শিক্ষা দেয় যে, যিশু একজন প্রেরণকর্মী ছিলেন- যিনি পিতার মুক্তি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে এই জগতে এসেছিলেন। এটি করতে তাকে সর্বোচ্চ মূল্য দিতে হয়েছে, অর্থাৎ নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হয়েছে। এক্ষেত্রেও তিনি প্রতিটি খ্রিস্টভক্তের সামনে উদাহরণস্বরূপ। কেননা যিশুখ্রিস্টে দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে প্রতিটি খ্রিস্টভক্ত প্রেরণকর্মী হয়ে উঠে ও খ্রিস্ট দেহের অংশ হয়। খ্রিস্টের আদর্শ গ্রহণ করে সবাইকে সত্যিকার প্রেরণকর্মী হওয়ার আহ্বান এখানে রয়েছে।

৩. কেনোটিক তত্ত্ব নেতৃত্ব ও সমাজ গঠনের পথ দেখায়। খ্রিস্ট একজন শক্তিশালী নেতা ছিলেন। তিনি জগতের মুক্তিযজ্ঞের জন্য সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। কিন্তু এটা নিয়ে কখনো বড়াই করেননি বা অহংকারী হননি, বরং তিনি নম্র হয়েছেন, ন্যায্যতার পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং যিনি সবকিছুর উৎস সেই স্বর্গীয় পিতার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে কাজ করেছেন। সমাজে যারা বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব দিচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রেও খ্রিস্টের এই আদর্শ খুবই অর্থবহ ও সময়োপযোগী বলে মনে করি।

৪. ব্যক্তিগত উৎকর্ষতা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যও এই তত্ত্ব বিশেষভাবে প্রয়োগযোগ্য। ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা, আত্মসমর্পণ, নিজেকে অস্বীকার করার সুন্দর গুণগুলো ব্যক্তি জীবনকে আরো সুন্দর ও অর্থবহ করে তুলতে পারে।

৫. কেনোটিক তত্ত্বে একটি ডায়াগ্রাম রয়েছে- সেটি হচ্ছে, খ্রিস্ট নিজেকে অবনমিত করেছে (descent), তাই ঈশ্বর তাকে উচ্চে তুলে ধরেন (ascent)। বড়দিন উৎসব সত্যিকারে অর্থে আমাদের এই শিক্ষাই প্রদান করে থাকে। যে কেউ নিজেকে নম্র করে ঈশ্বর তাকে পুরস্কৃত করেন।

৬. সর্বোপরি, এটি মানুষকে সংলাপের দিকেও ধাবিত করে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, বিভিন্ন পর্যায়ে আন্তঃমাণ্ডলিক, ও আন্তঃসামাজিক সংলাপও খ্রিস্টের দেহধারণ উৎসাহিত করে। কেননা, খ্রিস্ট নিজেকে নমিত ক'রে এই জগতে আসার উদ্দেশ্য ছিল মানুষের সাথে সংলাপ করা।

পরিশেষে বলা যায় যে, কেনোটিক তত্ত্ব খ্রিস্টের দেহধারণ রহস্যের প্রকৃত রূপ প্রকাশ করে। ঈশ্বরপুত্র যিশু খ্রিস্ট মানুষ হয়েছেন তাঁর ঈশ্বরত্ব নিয়েই, সেটি বাদ দিয়ে নয়। তাই খ্রিস্টমণ্ডলীর এই মৌলিক ও অভ্রান্ত শিক্ষায় প্রতিটি খ্রিস্টভক্তের বিশ্বাস ও আনুগত্য থাকা একান্ত আবশ্যক। একই সাথে, এই কেনোটিক তত্ত্বে যিশু খ্রিস্টের অন্যান্য ও পরমোত্তম কিছু বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী প্রকাশ পেয়েছে- যা প্রতিটি খ্রিস্ট অনুসারীর জীবনে ধারণ ও পালনের দাবী রাখে।

(১৩ নং পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

সহৃদয়তা, মহানুভবতা ও বিশ্বস্ততায় অভাব, যার কারণে যিশুর জন্ম প্রতিবছর হলেও মানব জীবনে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। এর ফলে আমাদের জীবনে পবিত্র আত্মার কাজ বেশি উপলব্ধি করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে বললেই চলে। "এত ভালোবাসা তুমি দিলে ওগো প্রভু..., ভুলি প্রভু" *(গীতাবলী ৩৩৭)*-এ যেন আমাদের প্রার্থনা। আমরা মনে প্রাণে গেয়ে উঠি," ভালোবাসা যেখানে, প্রভু যিশু সেখানে, পরস্পরকে ভালোবাসো বিশ্বসৃষ্টি যিশুর প্রেম, যিশু প্রেম, দেবতা। প্রেম বিলাতে এলেন ধরায়, হলেন মুক্তিদাতা" *(গীতাবলী-৩৩৯)*। আমরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস গড়ে তুলি যে, আমাদের ভালোবাসার যিশু ধরায় নেমে আসবেন ও বাস করবেন মানবের অন্তরে। যিশুর ভালোবাসার পৃথিবী ও প্রত্যেকেই হয়ে উঠবো ভালোবাসার মানুষ। বড়দিনে সকলকে ভালোবাসার শুভেচ্ছা জানাই।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

গ্রামবাংলা পত্রিকা ১৭ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান, সুশীল রায়, এম.এম.সি. জলপাইগুড়ি।

“বড়দিন” হলো ভালোবাসার উৎসব

ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসি

‘বড়দিন’ হলো মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসার বড় প্রমাণ ও উৎসব। যিশুর জন্ম মানব জাতির জন্য একটি “শুভ সংবাদ” বা “শুভ বার্তা” যা আমরা ২৫ ডিসেম্বর উৎসবমূখর পরিবেশের মধ্যদিয়ে পালন করে থাকি। সারা বিশ্বব্যাপী বড়দিন যে ভাবে আনন্দময় পরিবেশে পালন করা হয়ে থাকে, সেখানে ভালোবাসার ছাপ ছাড়া অন্যকিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ খ্রিস্ট ঈশ্বরের এক মহান ও অনন্য উপহার মানবজাতির জন্য। আমাদের প্রতি ঈশ্বরের এই ভালোবাসা উপলব্ধি করাই হলো বড়দিন। আর ভালোবাসা উদ্‌যাপন তো সবচেয়ে বড় উৎসবই বটে। তাইতো আমরা গান করে থাকি, “মহানন্দ আজি বিশ্ব আসরে, জগৎ ত্রাতা জন্মিলেন দায়ুদ নগরে” *(গীতাবলী ৬৮৬)*। “দেখ, এক কন্যা গর্ভবতী হইয়া এক পুত্র প্রসব করিবে ও তাঁহার নাম, ইম্মানুয়েল রাখিবে” *(যিশাইয়া ৭:১৪)*। ঈশ্বর স্বর্গ থেকে নেমে এসে আমাদের সাথে মিশে আছেন বা বসবাস করছেন। এটা মানব জাতির জন্য ঈশ্বরের বড় ভালোবাসা বা উপহার। এই শ্রেষ্ঠ উপহার ২৫ ডিসেম্বর আমরা উৎসব মুখর পরিবেশে গ্রহণ করে থাকি ভালোবাসা দিয়ে। বড়দিনে যে সকল কাজকর্ম, অনুষ্ঠান, খাওয়া-দাওয়া সবকিছুর পিছনে রয়েছে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ।

‘বড়দিন’ হল ঈশ্বরের ভালোবাসার দান। ঈশ্বর মানুষকে ভালোবেসে নিজপুত্রকে মুক্তিদাতা রূপে এ জগতে প্রেরণ করেন। তাই খ্রিস্ট হলো মানব জাতির জন্য ঈশ্বরের ভালোবাসার দান। খ্রিস্ট স্বর্গ ছেড়ে এ পৃথিবীতে নেমে এলেন নিজের জীবন উৎসর্গ করতে কারণ তিনি মানুষদের বা বিশ্বাসীদের জীবন রক্ষাকর্তা। “যিশুর জীবন দান” এর পিছনে রয়েছে মানুষের প্রতি তাঁর অসীম প্রেম বা ভালোবাসা। আত্মদান বা আত্মত্যাগ- এর উর্ধ্বে হলো ভালোবাসা এবং একমাত্র ভালোবাসা থাকলে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া যায়। যিশু ঠিক তাই করেছেন। তিনি জগতকে এতই ভালোবেসেছেন যে, নিজেকে মানব সেবার তরে দান করেছেন। এটাই মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসার চূড়ান্ত প্রমাণ। আজকের উৎসব হল “যিশুর জন্মদিন” বা বড়দিন, অর্থাৎ ঈশ্বর তাঁর হৃদয়ের ভালোবাসা নিজ পুত্র ‘খ্রিস্টকে’ মানবরূপে ও মানুষের মাঝে বসবাস করার জন্য প্রেরণ করেছেন। তাই খ্রিস্ট হলেন মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসার শ্রেষ্ঠ দান। যিশুর ভালোবাসা হলো ঈশ্বর প্রদত্ত এক বিশেষ ধরণের প্রেম যা যিশু নিজেই দেখিয়েছেন এবং তার বিশ্বাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। যা ঈশ্বরের প্রতি ও সকল মানুষের প্রতি গভীর স্নেহ ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এই ভালোবাসা বা প্রেম কেবল মানবিক অনুভূতি নয় বরং এটি অন্যকে সেবা করার মাধ্যমে তাদের প্রয়োজনে পাশে দাঁড়ানোর এবং একে অপরকে ভালোবাসার মাধ্যমে প্রকাশ করা। তাই বলা যায় যে, ‘বড়দিন’ হলো যিশুর ভালোবাসারই প্রকাশ। ‘বড়দিন’ উৎসবের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো ঈশ্বরের প্রেম ও করুণা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া এবং মানুষকে পাপ থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য যিশু খ্রিস্টের পৃথিবীতে আগমনের ভালোবাসা ও আনন্দ উদ্‌যাপন করা। এই দিনে যিশু আমাদের মানবতা, ক্ষমা এবং ভালোবাসার পথ দেখানোর জন্য এসেছেন, যা ঈশ্বরের ভালোবাসারই এই মহান বার্তা।

“বড়দিনের” তাৎপর্য হলো ঈশ্বরের ভালোবাসার প্রকাশ যিশুর জন্ম বা বড়দিনের মধ্যদিয়ে। যিশু পৃথিবীতে এসেছেন মানুষকে ঈশ্বরের ভালোবাসার পথ দেখাতে এবং ক্ষমার বার্তা দিতে। ঈশ্বর মানুষকে ভালোবাসেন বলেই, মানুষের মৃত্যু নয় বরং পরিত্রাণ বা মুক্তি চান। তাই তিনি যিশুকে প্রেরণ করেছেন। ঈশ্বরের এই মহা ভালোবাসার কথা স্মরণ করি আমরা ২৫ ডিসেম্বর যা বড়দিনের উৎসবের মধ্যদিয়ে যিশুর ভালোবাসা প্রকাশ করেছে শান্তি স্থাপন করে ও আশার শর্ত দিয়ে। বড়দিন কেবল মাত্র একটি উৎসব নয়, বরং শান্তি, আশা, আনন্দ ও ভালোবাসার নতুন বার্তা নিয়ে আসা। বড়দিন, মানুষের মধ্যে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা ও সেবার মানসিকতা জাগিয়ে তোলে। তাই আমরা বড়দিনে বিভিন্ন আয়োজনের মধ্য দিয়ে, সেবা করার পাশাপাশি বিভিন্ন কিছু করার মাধ্যমে অন্তরের ভালোবাসা আদান প্রদান করে থাকি। আমরা অনুপ্রাণিত হই অন্যদের ভালোবাসতে ও গ্রহণ করে নিতে। এইদিনে মানুষ যিশুর ভালোবাসায় নিজেদের জীবনকে নবীকরণ করার এবং তাঁর সীমাকে হৃদয়ে ধারণ করার সুযোগ পায়। বড়দিন বা যিশুর জীবন ও শিক্ষা মানুষকে তাঁর দেখানো পথে চলতে এবং প্রেম ও সেবায় আত্মনিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করে। যিশু বার বার ভালোবাসার কথা বলেছেন ও শিক্ষা দিয়েছেন, আমরা যেন সেবায় ও ভালোবাসায় বলীকৃত হই। আমরা যেন জীবন দিয়ে অন্যদের ভালোবাসি। যিশুর আদেশ পরস্পরকে ভালোবাসার *(মার্ক ১২:৩৪, মার্ক ২২:৩৯-৪০)*। ঈশ্বর যেমন ভালোবাসা প্রকাশ স্বরূপ যিশুকে এ পৃথিবীকে প্রেরণ করেন। তেমনি যিশুও তাঁর ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন সেবা দানের মধ্যদিয়ে। “তোমরা বরং ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পরস্পরের সেবা কর! কারণ সমগ্র ঐশ বিধানের সারকথা এই একটি আদেশের মধ্যেই ব্যক্ত: তোমার প্রতিবেশিকে তুমি নিজের মতোই ভালোবাস” *(গালাতীয় ৫:১৪)*।

মর্তে যিশুর আগমন, যিশুর জীবন ও শিক্ষা স্মরণ করিয়ে দেয় ঈশ্বরের সাথে মানুষের মিলন বন্ধন। পিতা ঈশ্বরের সাথে তাঁর আপন সন্তানদের মাঝে, অর্থাৎ মানুষের সাথে এক মিলন বন্ধন স্থাপন করেছেন। যিশুকে মর্তে পাঠিয়ে। যিশু হলেন পিতার কাছে যাওয়ার পথ বা মধ্যস্থতাকারী। যিশু হলেন মুক্তির উপায় বা পিতার ভালোবাসা বা মুক্তি লাভের মাধ্যম। তিনি নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়েছেন, তা কিভাবে সম্ভব। তাই বড়দিনের প্রকৃত অর্থ হলো মানুষের জন্য ঈশ্বরের ভালোবাসা যিশুর আগমন। ঈশ্বর মানুষকে ভালোবাসেন তারই ফল হলো, গোয়াল ঘরে দীন বেশে নিজ পুত্রের জন্ম, ক্রুশের উপর পুত্রের মৃত্যু ইত্যাদি। এ সবকিছুই আমাদের জন্য ঈশ্বরের শিল্প, আমরা যেন ঈশ্বরের শিক্ষার পথে চলি, তাঁর পুত্র যিশুকে ভালোবাসি ও তার বাণীশিক্ষা অনুসরণ করে পরস্পরকে ভালোবাসি। কারণ ভালোবাসা ছাড়া কোন কিছু অর্জন করা অসম্ভব। ভালোবাসা ছাড়া বড়দিন পালন অর্থহীন। ভালোবাসা ছাড়া যিশুকে অন্তরে ধারণ করতে পারব না, ভালোবাসা ছাড়া নিজেরাও বেঁচে থাকবো না। তাই “ভালোবাসার” পৃথিবী গড়ে তুলতে হবে। আমাদের ভালোবাসার মানুষ হতে হবে এবং অন্যদেরও ভালোবাসার মানুষ হতে সাহায্য করতে হবে, তাহলেই যিশু আমাদের মাঝে জন্মগ্রহণ করবেন প্রতিদিন ও প্রতি মনে। আমরা গানে বলি, “মানুষের কল্যাণে আসিয়াছ এ ভবে, মুছিতে পাপের বন্ধন। মধুময় বাণী তব বিশ্বের ঘরে ঘরে জাগায়েছে প্রেমের স্পন্দন *(গীতাবলী ৬৯৮১)*।” পরিশেষে বলতে চাই যে, বর্তমান পৃথিবীতে সবকিছু থাকার পরেও ভালোবাসার অভাব। যার ফল অশান্তির ভয়াবহতা বা কুফল দিনদিন বেড়েই চলছে। প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে দেখা যাচ্ছে ভালোবাসার আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা,

(বাকি অংশ ১২ নং পৃষ্ঠায় পড়ুন...)

চল বেথলেহেমে যাই

জনি জেমস্ মুরমু সিএসসি

ইতিহাসের পাতায় বেথলেহেম একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। কারণ ঈশ্বর তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে দাউদ নগরী এই বেথলেহেমেই মর্তের মানব হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এজন্যই বড়দিন বা যিশুর জন্মদিনের মহান তাৎপর্য উদ্‌ঘাটন করার জন্য বেথলেহেমে যাওয়া বাঞ্চনীয়। ঠিক যেমনটি মারীয়া-যোসেফ সেখানে গিয়েছিলেন। "যোসেফ ছিলেন দাউদের বংশ ও গোত্রেরই মানুষ। তাই তিনি গালিলেয়ার নাজারেথ শহর থেকে গেলেন যুদেয়ার সেই দাউদ-নগরীতে, যার নাম বেথলেহেম" *(লুক ২:৪)*। কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগে, দাউদ নগরী বেথলেহেম নগরে এত স্থান থাকতে কেন যিশুকে গোয়াল ঘরেই জন্ম নিতে হয়েছিল? সন্তান সম্ভবা মারীয়ার জন্য যোসেফের ভাল কোনো স্থান খুঁজে না পাওয়া এটি কি কাকতালীয় বিষয়? "তিনি প্রসব করলেন একটি পুত্রকে-তাঁর প্রথমজাত সন্তানটিকে। শিশুটিকে তিনি কাপড়ে জড়িয়ে একটি যাবপাত্রে শুইয়ে রাখলেন, কারণ পান্থশালায় তাঁদের থাকার জায়গা জোটেনি" *(লুক ২:৭)*। এরমানে তারা নিশ্চয় পান্থশালায় থাকতে চেয়েছিলেন এরজন্য তাদের কাছে হয়তো অর্থও ছিল। কিন্তু সে সময়ে লোকগণনা করার দরুন সেস্থানে অনেক মানুষের সমাগম ঘটেছিল বিধায় তারা থাকতে চেয়েও পান্থশালায় স্থান পাননি। শেষে গোয়ালঘরেই তাদের থাকতে হল। গরুর আবর্জনা, ঘাস-লতা-পাতার দুর্গন্ধে আবদ্ধ এই স্থানটি যিশুখ্রিস্টের জন্মের ফলে হয়ে উঠল ঈশ্বর পুত্রের রাজকীয় আবাসস্থল। ঈশ্বর পুত্রের সিংহাসন হয়ে উঠল যাবপাত্র, যেটায় কিনা গরুকে খাবার খেতে দেওয়া হয়। এভাবেই যিশুখ্রিস্টের উপস্থিতিতে যা অপবিত্র, অশুচি, অন্ধকার সবকিছু পবিত্র, শুচি ও আলোয় ভরে উঠল।

মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে খাদ্য হল সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু এটি যতই গুরুত্বপূর্ণ বা অপরিহার্য বিষয়ই হোক না কেন পৃথিবীর কোনো খাবারই মানুষকে পরিতৃপ্ত করতে পারেনা। পবিত্র বাইবেলের শুরুতেই আমরা দেখতে পাই যে, এই দৈহিক খাবার গ্রহণের সাথে মানব জাতির সর্বপ্রথম পাপ জড়িত রয়েছে। "নারী দেখল, গাছটির ফল খেতে ভাল, চোখেও আকর্ষণীয়, এবং জ্ঞানদায়ী গাছ বিধায় আনাকাঙ্ক্ষিত; তাই সে তার কয়েকটি ফল পেড়ে নিজে খেল ও তার সঙ্গে উপস্থিত তার স্বামীকেও দিল; সেও খেল" *(আদিপুস্তক ৩:৬)*। বর্তমান সময়ে মানুষ অত্যধিক ভোগ ও বস্তুগত বিষয়াবলী হস্তগতকরণের মধ্যে জীবনের অর্থ খুঁজে চলেছে। পৃথিবীতে আজ যেখানে অনেক মানুষ দু'বেলা খাবার সংস্থানের জন্য সারাদিন খেটে মরছে, সেখানে অনেক মানুষ রয়েছে যারা অধিক ভোগের নেশায় মাতাল হয়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছে। ঈশ্বর জানেন আমরা মানুষ কতকিছুর জন্য ক্ষুধার্ত। তাই তো তিনি নিজ পুত্র যিশুর মাধ্যমে আমাদের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা নিবারণ করে থাকেন। এই মানবপুত্র আমাদের কাছ থেকে খাদ্য নেন না বরং নিজেকে দেবার মাধ্যমে খাদ্য দেন। বেথলেহেমে গিয়ে আমরা আবিষ্কার করতে পারি যে, তিনি কারো জীবন নিয়ে নেননা বরং জীবন দেন। কারণ তিনি হলেন জীবনদাতা। যিশু নিজের দেহ আমাদের জন্য বিলিয়ে দেন এবং বলেন- "নাও, খাও, এ আমার দেহ" *(মথি ২৬:২৬)*। মানব শিশুর আকারে গোয়ালঘরে জন্মগ্রহণের মাধ্যমে শিশু যিশু এই বার্তা বহন করেন যে, তিনি নিস্ব, দরিদ্রদের ভালোবাসেন এবং তিনি ছোট-বড়, ধনী-গরীব সকলের ত্রাণকর্তা। এভাবে নিজেকে অন্যের সাথে সহভাগিতা করার মাধ্যমে তিনি নতুন ধরণের জীবনাদর্শ আমাদের সামনে তুলে ধরেন। গোয়ালঘরের যাবপাত্রের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের এই উপলব্ধি আসে যে, কোনো বস্তুগত জাগতিক বিষয় কখনো জীবনময় খাদ্য হতে পারেনা। কারণ তাহলে যিশু খ্রিস্ট কখনোই এত দীন বেশে জন্মগ্রহণ করতেন না।

বেথলেহেমের গোশালঘরে শিশু যিশুর জন্ম আমাদের কাছে শিক্ষা বহন করে, ঈশ্বরপুত্র যদি এরকম একটা স্থানে জন্মগ্রহণ করতে পারেন তাহলে তিনি কি আমার বা আপনার মত অন্ধকার পাপময় হৃদয়ে জন্মগ্রহণ ও সেখানে বাস করতে পারবেন না? একবার, হ্যাঁ শুধু যদি একবার ভালোভাবে আমাদের হৃদয়ে শিশু যিশুকে স্থান দিতে পারি, আমাদের হৃদয় যদি তাঁর আবাসগৃহ হয়ে উঠতে পারে তাহলে মন্দ কোনো কিছুই আমাদেরকে আসক্ত করতে পারবেনা। মাতা মণ্ডলী তাই আমাদের ত্রাণকর্তার জন্মদিনের পূর্বে আগমনকালীন সময়ে পাপস্বীকার, নবাহ প্রার্থনা, প্রস্তুতিমূলক বিভিন্ন পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করতে বিশেষভাবে আহ্বান জানায়। তবে বর্তমান বেথলেহেম নগরে না গিয়ে যেতে হবে আমাদের হৃদয় বেথলেহেম নগরে। গোশাল ঘরের মত গরুর আবর্জনা, লতা-পাতা কতকিছু দিয়েই না আমাদের হৃদয় ভরে গেছে। এখন আমাদের কাজ হল নিজেদের সময় সুযোগ মত স্থানটিকে যতটুকু সম্ভব পরিষ্কার রাখা। নতুন দামী রঙ্গিন জামা-কাপড় দিয়ে এ স্থানটিকে সাজানো যায় না। পুরাতন জামা-কাপড় পরেও আমাদের বড়দিন অর্থপূর্ণ হতে পারে যদি আমরা আমাদের হৃদয় মন্দির শিশু যিশুর জন্য প্রস্তুত রাখতে পারি।

বেথলেহেম হলো রাজা দায়ুদের নগর। এখানে শৈশবে তিনি রাখাল ছিলেন। এই রাখাল দায়ুদকেই ঈশ্বর রাজা অর্থাৎ একজন মহান ব্যক্তি হবার জন্য মনোনীত করেছিলেন। শিশু যিশুর জন্মে সারা পৃথিবীর মানবজাতির প্রতিনিধি হিসেবে রাখালদেরই মনোনীত করা হয়েছিল। বড়দিনের শুভরাত্রিতে এই রাখালগণই সর্বপ্রথম শিশু যিশুকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। সেই রাত্রিতে প্রভুর এক দূতের মহান বার্তা শুনে "এক আশ্চর্য ভীতিতে ভরে উঠল তাদের অন্তর" *(লুক ২:৯)*। কিন্তু স্বর্গদূত তাদের বললেন, "ভয় পেয়ো না" *(লুক ২:১০)*। এই কথাটি আমরা বাইবেলে অনেকবার দেখতে পাই। তবে এই বাক্য 'ভয় পেয়ো না' কথাটি কোনো সাধু-সাধ্বীদের ক্ষেত্রে বলা হয়নি। বলা হয়েছে মা মারীয়া, রাখালদের মত অতি সাধারণ মানুষদেরকে। রাখালদের কাছে যিশুর আত্মপ্রকাশ আমাদেরকে এটাও বলে যে, তিনি এ পৃথিবীর সকল অবহেলিত মানুষদের জন্য আশার আলো হয়ে জন্মেছেন। কাউকেই তিনি পরিত্যাগ করতে চান না। তিনিই হবেন আমাদের সেই মেষপালক যিনি সকল ভয় দূর করবেন এবং সবাইকে শর্তহীনভাবে ভালোবাসবেন। ঈশ্বর প্রতিনিয়ত আমাদের প্রত্যেকজনকে বলছেন, "ভয় পেয়ো না"। এদেন বাগানে প্রথম মানব

আদম-হবার পাপের ফলেই মানুষের মাঝে ভয় প্রবেশ করেছে। আদম উত্তরে বললো, "বাগানে তোমার সাড়া পেয়ে আমি ভয় পেলাম, কারণ আমি উলঙ্গ; তাই নিজেকে লুকিয়েছি" *(আদিপুস্তক ৩:১০)*। বেথলেহেম হলো ভয়কে জয় করার স্থান। মানুষ ঈশ্বরের আহ্বানে 'না' বললেও ঈশ্বর বারবার 'হ্যাঁ' কথাটি বলেন। আর ঈশ্বরের উপস্থিতিকে মানুষ যেন ভয় না পায় সেজন্যই তিনি শিশু হয়ে জন্ম নিলেন।

প্রভু যিশুর সাথে কিভাবে সাক্ষাত করতে হবে- এই শিক্ষাও বেথলেহেমের রাখালগণ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। সেই রাত্রিতে তারা কেউ ঘুমাননি বরং জেগে জেগে তাদের মেষপাল পাহারা দিচ্ছিলেন। যিশু নিজেও মঙ্গলসমাচারে অনেকবার বলেছেন "তোমরা জেগেই থাক" *(মথি ২৫:১৩; মার্ক ১৩:৩৫; লুক ২১:৩৬)*। কারণ যারা জেগে থাকবে অর্থাৎ সর্বদা প্রস্তুত থাকবে তারা সেই মশীহের দেখা পাবেই। ঠিক যেমনটি রাখালগণ সজাগ ও প্রস্তুত ছিলেন বলেই "প্রভুর মহিমা তখন তাদের ঘিরে উজ্জ্বল দীপ্তি ছড়াতে লাগল" *(লুক ২:৯)*। একই সাথে এই বার্তা পাবার পর তারা আর কোনো কিছু চিন্তা না করে প্রভু যিশুর জন্য ঝুঁকি নিয়ে নিজেদের মেষপাল যেভাবে ছিল ফেলে রেখে "তারা সেখানে ছুটে গেল" *(লুক ২:১৬)*। আবার শিশু যিশুকে দেখার পর নিজেদের মধ্যে চুপচাপ না থেকে তারা তা সবাইকে জানাতে লাগলেন। এখানে সজাগ থাকা, ছুটে যাওয়া, ঝুঁকি নেওয়া-এগুলো হলো ভালোবাসার কাজ। এই উত্তম মেষপালক যিনি তার মেষপালদেরকে জীবন দেবার জন্য মানবরূপে জন্মেছিলেন তিনিই পরবর্তীতে পিতরের মধ্য দিয়ে আমাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করেন "তুমি কি আমাকে ওদের চেয়ে বেশী ভালবাস ?" *(যোহন ২১:১৫)*। এই প্রশ্নের উত্তরেই মেষপালদের ভবিষ্যত নির্ভর করছিল। এই পুণ্যতিথিতেও যিশু জানতে চান 'আমি তাকে ভালবাসি কিনা' যদি তাকে ভালোবাসি তাহলে নিশ্চয় তাঁর জন্য হৃদয় গোশালা প্রস্তুত করব।

"চল এখন আমরা বেথলেহেমে যাই" *(লুক ২:১৫)*-এই কথাটির পরই রাখালগণ বেথলেহেমে ছুটে গেলেন। রাখালদের মত আমরাও বেথলেহেমে যাবার পথে আমাদের স্বার্থপরতা, প্রতিশোধপরায়নতা, জাগতিকতার মোহ ও ভোগবাদের ফলে বাধাগ্রস্থ হয়ে পড়ি। তাই যে বেথলেহেম নগরে শিশু যিশু জন্মেছেন ও আমাদের জন্য যাবপাত্রে শুয়ে অপেক্ষা করছেন তার নিকট আসুন আমরা শক্তি যাচ্না করি যেন স্বার্থপরতা, কামনা-বাসনা, ভোগ-বিলাস ত্যাগ করে সকলকে ভালোবাসার মাধ্যমে হৃদয় বেথলেহেমে তাকে স্থান করে দিতে পারি। তবেই আমরা বলতে পারব- "আপনি তো জানেন, আমি আপনাকে সত্যিই ভালবাসি" *(যোহন ২১:১৭)*।

"...আমি এক মহা আনন্দের সংবাদ তোমাদের জানাতে এসেছি; এই আনন্দ জাতির সমস্ত মানুষের জন্যেই সঞ্চিত হয়ে আছে" *(লুক ২:১০-১১)*

সিস্টার মেরী আলো পালমা আরএনডিএম

আমরা পবিত্র বাইবেল হতে জানতে পারি যে, মুক্তিদাতা যিশু খ্রিস্টের জন্মের মহা আনন্দের সংবাদ প্রভুর এক দূত সবার আগে রাখালদের জানিয়েছিলেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন 'রাখালদের'? কেন অন্য কোন মানুষ এই আনন্দের সুখবর জানতে পারেনি? উত্তর, আমরা পবিত্র বাইবেল হতেই পাই যে, রোম সম্রাট অগাস্টাস লোকগণনার হুকুম জারি করেন। তাই সকল মানুষ নাম লেখানোর জন্য নিজ নিজ শহরে গিয়েছিল। সেই কারণে সেই রাতে যুদেয়ার দাউদ-নগরীর বেথলেহেমে বহু মানুষ উপস্থিত ছিল।

যে রাতে আমাদের ত্রাণকর্তা প্রভু যিশু খ্রিস্ট এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁর জন্মের সেই সুখবর তাদের কারোর কাছে স্বর্গদূত জানায়'নি। কারণ লোকেরা লম্বা যাত্রা করে খুবই ক্লান্ত-শ্রান্ত ছিল। আর সেই কনকনে শীতের নিঝুম রাতে মানুষেরা ছিল গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সেই রাতে রাখালরাই জেগে ছিল।

'রাখালেরা' ছিল দরিদ্র এবং ইহুদী সমাজে উপেক্ষিত শ্রেণীর মানুষ। ঐ শীতের রাতে তাদের ব্যথার ব্যথী জন্মেছিলেন জীর্ণ একটি গোশালায়। পবিত্র বাইবেলে উল্লেখ আছে যে, ঐ অঞ্চলে একদল রাখাল রাতে তাদের নিজ নিজ পালের মেষগুলোকে পাহারা দিচ্ছিল। সামাজিক দিক থেকে রাখালেরা ছিল মানবাধিকার-বঞ্চিত ও অল্প আয়ের মানুষ। তারাই মুক্তিদাতা প্রভু যিশুর জন্ম সংবাদ সর্বপ্রথম জেনেছিল।

রাখালেরা যিশুর জন্মের সুখবর কীভাবে জেনেছিল? প্রভুর এক স্বর্গদূত তাদের কাছে আসেন এবং তাদের পাশে দাঁড়ানোর সাথে সাথে প্রভুর গৌরব তাদের চারিদিকে ঘিরে রাখেছিল। প্রথমে তারা খুব ভয় পেয়েছিল। তাই স্বর্গদূত রাখালদের বলেছিলেন, "ভয় পেয়ো না'! আমি এক মহা আনন্দের সংবাদ তোমাদের জানাতে এসেছি; এই আনন্দ জাতির সমস্ত মানুষের জন্যেই সঞ্চিত হয়ে আছে। আজ দাউদ-নগরীতে তোমাদের জন্য এক ত্রাণকর্তা জন্মেছেন-তিনি সেই খ্রিস্ট, স্বয়ং প্রভু। এই চিহ্নে তোমরা তাঁকে চিনতে পারবে: দেখতে পাবে কাপড়ে জড়ানো, জাবপাত্রে শোয়ানে এক শিশুকে" *(লুক: ২:১০-১২)*।

স্বর্গদূতেরা রাখালদের কাছ থেকে চলে যাবার পর, তারা কোন ইতস্তত না করে বেথলেহেমে যায় এবং দূতের কথামতো গোয়াল ঘরে মারীয়া, যোসেফ ও জাবপাত্রে শোয়ানো নবজাতক শিশুকে দেখতে পায়। তারা তাঁকে (শিশুকে) প্রণাম করে অবনত শিরে এবং উপহার দেয় তাদের পালের শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট ভেড়া।

শিশুটির বিষয়ে স্বর্গদূত রাখালদের যা কিছু বলেছিলেন, তা সত্য জেনে এবং নিজ চোখে তা দেখে ও বুঝে রাখালেরা 'ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন ও তাঁর প্রশংসা' করতে করতে মুক্তিদাতা যিশু খ্রিস্টের জন্মের শুভ সংবাদ সবার কাছে পৌঁছে দিতে লাগল। যদিও মানুষ তাদের (রাখালদের) কথা শুনে অবাক হয়েছিল; প্রথমে বিশ্বাস করতে চায়নি। পরে কিন্তু তারাও (মানুষ) নিজেরা গিয়ে শিশুটিকে দেখল, এবং তা সত্য জেনে তারাও ঈশ্বরের বন্দনা গান গাইতে গাইতে ফিরে গেল।

রাখালেরা ছিল অন্তরে দীন আর বিনয়ী কোমল প্রাণের মানুষ। অন্তরে পবিত্র বলেই তারা পরমেশ্বরকে দেখতে পেয়েছিল *(মথি ৫:৩)*। তাদের ধন-সম্পদ ও প্রতিপত্তির মোহে পড়ার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম ছিল। এক কথায় তাদের ধন-সম্পদের প্রতি লোভ খুব কমই ছিল। অনেকটা নিরুপায় ও অসহায় বলেই, তারা একান্ত বিশ্বাস ও আস্থার সঙ্গে ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করে চলা তাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। তাদের যা ছিল, তা নিয়েই তারা (রাখালেরা) আনন্দে ও সুখে থাকত। কারণ তাদের প্রত্যাশা ছিল কম। তারা শিশুদের মতো অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকতো। ঈশ্বরকে জনগণের কাছে তারা উপস্থাপন করে আনন্দোৎসবের মাঝে, কারণ তারা জানে, '...পরমেশ্বর প্রভু রয়েছেন প্রত্যেক মানুষের অন্তঃস্থলে, ত্রাণকর্তাই সেই বীর! তিনি সকলকে নিয়ে আনন্দে মেতে উঠবেন, তাঁর ভালোবাসা দ্বারা সকলকে নবীভূত করবেন, তোমাদের (মানুষদের) জন্য আনন্দ চিৎকারে ফেটে পড়বেন।' তা হলো...পরিত্রাণের আনন্দ!'

রাখালেরা প্রবক্তা জেফানিয়ার কথাগুলো বারংবার উচ্চারণ করে বেশ রোমাঞ্চিত হয়েছিল, "তোমার ঈশ্বর স্বয়ং প্রভু, মহাযোদ্ধা যিনি, রক্ষাকর্তা যিনি, তিনি তো এখন তোমার মাঝখানেই রয়েছেন। তোমাকে নিয়ে তিনি গভীর আনন্দে আন্দিতই হবেন; তাঁর ভালোবাসার শক্তিতে তোমাকে নতুন করে গড়ে তুলবেন তিনি। তোমার জন্যে পুলকে

মেতে উঠে আনন্দধ্বনি জাগাবেন তিনি" *(জেফানিয়া ৩:১৭)*।

সেই একই আনন্দ, আমরাও প্রতিদিনই অভিজ্ঞতা করি। সেই একই আনন্দ আমরাও উপলব্ধি করি আমাদের প্রতিদিনের জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্য দিয়ে। আমাদেরও পরম পিতা পরম স্নেহে ও ভালোবেসে আমন্ত্রণ করে বলেন, "বৎস আমার, তোমার সঙ্গতি যতখানি, সেই মতো নিয়েই সুখেই থাক তুমি; ... বর্তমান সুখ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করো না; সঙ্গত ভাবেই যা-কিছু পেতে চাও তুমি, তা হাতছাড়া হতে দিয়ো না!" *(বেন-সিরা ১৪:১১, ১৪)*। আমরাও তো প্রতিদিন, প্রতিক্ষণে প্রবক্তা ইসাইয়ার মতো 'প্রতীক্ষিত মসীহকে (যিশু খ্রিস্টকে) মহোল্লাসে অভিনন্দন জানিয়ে বলতে পারি: "হে ঈশ্বর, তুমি ...আমাদের অসীম আনন্দ, কত গভীর করেছ আমাদের উল্লাস" *(ইসাইয়া ৯:৩)*।

প্রবক্তা ইসাইয়ার মুখ দিয়ে প্রভু আজ আমাদের নতুন করে বলছেন, "সানন্দে চিৎকার কর, জাগাও হর্ষধ্বনি," জগতের যত মানুষ, '...ফেটে পড় আনন্দ-চিৎকারে' কারণ তোমাদের মধ্যেই রয়েছেন ঈশ্বর, তিনি সেই মুক্তিদাতা। তিনি 'তো এখন তাঁর আপন জাতিকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, তাঁর এই দুঃখপীড়িত মানুষদের প্রতি দেখাচ্ছেন দয়া" *(ইসা ৪৯:১৩)*।

আমরা যারা যিশুকে লাভ করার জন্য আধ্যাত্মিকভাবে প্রস্তুতি নিয়ে প্রতীক্ষায় রয়েছি, আমাদের উদ্দেশে প্রবক্তা জাখারিয়া বলছেন, "ওগো সিয়োন কন্যা, আনন্দে মেতে ওঠ তুমি; ওগো... কন্যা, জয়ধ্বনি তোল! ওই দেখ, তোমার কাছে আসছেন তোমার রাজা; ধর্মময় তিনি! আহা কত নম্র তিনি! বসে আছেন, দেখ, একটি গাধারই পিঠে, বাচ্চা গাধারই পিঠে, ...*(জাখা ৯:৯)*।

আমরা ধনীই হই বা দরিদ্রই হই, যা-ই হই না কেন, যিশু চান আমরা যেন ধন-সম্পদের মোহ থেকে মুক্ত হয়ে, আমাদের যা আছে, তার সদ্ব্যবহার করি, আমাদের পার্থিব কোন কিছুর ওপর নয়, শুধুমাত্র ঈশ্বরের ওপর আস্থা রেখে চলি, তাহলেই আমরা আমাদের মুক্তিদাতা যিশুকে দেখতে পাবে *(মথি ৫:৩)*। বর্তমান পরিবেশ পরিস্থিতিতে আমাদের অন্তরে দীন অর্থাৎ সম্পূর্ণ নির্লোভ নিরাসক্ত অন্তর থাকাটাই বড় একটি চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি। তাই নিরাশ না হয়ে, যা-ই হোক আমাদেরও চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

প্রবক্তা জাখারিয়ার মতো আমরাও যিশুকে আমাদের অন্তরে নিয়ে গভীর আনন্দে আনন্দিত হতে পারব। রাখালদের মতো আমরাও আমাদের যা আছে, তা নিয়ে সুখেই থাকতে পারব। আমাদের দয়ার ও সাহায্যের হাত গরীর দুঃখী ভাই-বোনদের জন্য বাড়িয়ে দিতে পারব। আনন্দ মনে, তাদের সাহায্য সহযোগিতা করতে পারব। আমাদের চেষ্টা ও ভাল মনের জন্য যিশু তাঁর ভালোবাসার শক্তিতে আমাদের নতুন করে গড়ে তুলবেন, 'আমাদের জন্যে পুলকে মেতে উঠে আনন্দধ্বনি করবেন তিনি' *(জেফা ৩:১৭)*। প্রবক্তা আবারও আহ্বান করে বলছেন, "...সেই সুখ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করো না; সঙ্গত ভাবেই যা-কিছু পেতে চাও তুমি, তা হাত ছাড়া হতে দিয়ো না " *(বেন-সিরা ১৪:১৪)*।

বর্তমান সময়ে হতাশা নিরাশার সময়ে রাখালদের মতো আমরাও স্বর্গদূতের বাণী শুনতে পারব 'তোমরা... ভয় পেয়ো না! আমি এক মহা আনন্দের সংবাদ তোমাদের জানাতে এসেছি; এই আনন্দ জাতির সমস্ত মানুষের জন্যেই সঞ্চিত হয়ে আছে" *(লুক ২:১০-১১)*। যিশুর জন্মের আনন্দ সংবাদ শুনে রাখালেরা যেমন আনন্দ করেছিল, সাধু পলের কারারক্ষী যেমন, "ঈশ্বর বিশ্বাসী হতে পেরেছে বলে সে ও তার বাড়ির সকলে মিলে আনন্দ করতে...' পেরেছিল *(প্রেরিতশিষ্য ১৬:৩৪)*; তেমনিভাবে আমরা এই একই আনন্দের স্রোতধারায় নিজেদের ভাসিয়ে দিতে পারব। ৯

প্রতিবছর প্রভু যিশুখ্রিস্ট গোশালায় জন্মায় না রে, জন্ম নেয় প্রতিটি মানুষের অন্তরে

স্বপন বৈরাগী

মানব সভ্যতার ইতিহাসে কিছু জন্ম আছে যা কেবল একটি শিশুর জন্ম নয়, বরং মানবতার পুনর্জন্ম। প্রভু যিশুখ্রিস্টের জন্ম সেই রকমই এক অলৌকিক ও পবিত্র ঘটনা, যা আজও পৃথিবীর হৃদয়ে নাড়া দেয়। কিন্তু ভাবতে হবে–প্রতি বছর বড়দিনে আমরা যে উৎসব করি, আলো জ্বালাই, কেক কাটি ও সাজসজ্জায় মাতি, তা কি সত্যিই খ্রিস্টের জন্মের মহিমা বহন করে?

প্রভু যিশু জন্মেছিলেন গোশালায়–একটি সাধারণ, নোংরা, পশুবেষ্টিত স্থানে। সেই বিনম্র জন্মের মাধ্যমে তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন, ঈশ্বরের প্রেম বিলাসী প্রাসাদে নয়, দরিদ্রের কুঁড়ে ঘরে, পাপীর হৃদয়ে, ও নম্র আত্মায় স্থান পায়। সুতরাং, "প্রতি বছর প্রভু যিশু খ্রিস্ট গোশালায় জন্মায় না রে" এই কথাটি গভীর সত্য। কারণ সেই জন্ম পুনরাবৃত্তি নয়, বরং তার উদ্দেশ্য পূর্ণতা পায় তখনই, যখন মানুষের অন্তরে খ্রিস্টের ভালোবাসা ও সহানুভূতি জাগ্রত হয়।

আজকের সমাজে আমরা দেখছি উল্টো চিত্র। ধর্মীয় উৎসবগুলো এখন আর হৃদয়ের নয়, বরং আড়ম্বর ও প্রদর্শনের। গির্জায় প্রার্থনা কম, ফেসবুকে পোস্ট বেশি। মানুষ ধর্ম পালন করে মুখে, কিন্তু কর্মে হারায় মানবতা। বড়দিনে আলো জ্বলে রাস্তায়, কিন্তু অনেক হৃদয়ে অন্ধকার। কোথাও শিশু ঠান্ডায় কাঁপে, কোথাও বৃদ্ধা মা একা বসে থাকে, আবার কোথাও ক্ষুধার্ত কেউ তাকিয়ে থাকে উৎসবমুখর মানুষের দিকে। এ সমাজেই কি খ্রিস্টের জন্ম সম্ভব?

খ্রিস্ট বলেছেন, "তোমরা একে অপরকে ভালোবাসো, যেমন আমি তোমাদের ভালোবাসি।" এই বাণী শুধু গির্জার দেয়ালে নয়, আমাদের হৃদয়ে খোদাই হওয়া উচিত। যদি আমরা সত্যিই চাই যিশুর পুনর্জন্ম হোক, তবে তাকে খুঁজতে হবে দরিদ্রের মুখে, অসহায়ের চোখে, এবং পাপীর অনুতাপে। খ্রিস্ট জন্মান অন্তরের বিশুদ্ধতায়, ক্ষমার আলোয়, আর ত্যাগের আনন্দে।

ধর্মের মূল উদ্দেশ্য মানুষকে মানুষ বানানো, আত্মাকে জাগানো, আর সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আজ আমরা ধর্মকে ব্যবহার করছি পরিচয়, প্রতিযোগিতা, আর স্বার্থের যন্ত্র হিসেবে। যতদিন না আমাদের সমাজে সহমর্মিতা, ক্ষমা, ও সত্যনিষ্ঠা ফিরে আসে, ততদিন গোশালায় নয়, মানুষের অন্তরে যিশুর জন্ম অসম্পূর্ণই থেকে যাবে।

সুতরাং, বড়দিন মানে শুধু এক দিনের উৎসব নয়; এটি এক আহ্বান; অহংকার ত্যাগ করে প্রেম ও সেবার পথে ফিরে আসার। খ্রিস্টের জন্মের প্রকৃত তাৎপর্য এখানেই যে, তিনি আমাদের শেখান কিভাবে মানব হৃদয়েই ঈশ্বরের রাজ্য গড়ে ওঠে।

যদি প্রতিটি মানুষ নিজের অন্তরকে করে নেয় ভালোবাসার গোশালা, তবে পৃথিবীটাই পরিণত হবে এক নতুন বেথলেহেমে। ৯

আনন্দের সুখবর ও নববর্ষ

ব্রাদার সিলভেস্টার মৃধা সিএসসি

মেষপালক রাখালদের কাছে ঈশ্বরের প্রেরিত যে সুসংবাদটি মানবজাতির জন্যে বহন করে দূত এনেছিলেন, তা শুধুমাত্র জানানোর বিষয় নয়; এ সংবাদ একাধারে আনন্দের এবং সমস্ত জাতির মানুষের জন্যেও সঞ্চিত হয়ে আছে। দূতের মুখে উচ্চারিত সুসংবাদটি আরো বেশি আনন্দদায়ক মনে হয়েছে যখন দূতবাহিনী সমস্বরে পরমেশ্বরের বন্দনা করে বলে উঠলেন, "জয় উর্ধ্বলোকে, পরমেশ্বরের জয়!" ইহলোকে নামুক শান্তি তাঁর অনুগৃহীত মানবের অন্তরে" *(লুক ২:১০-২৪)*। নবজাত শিশুটির নাম কী হবে তা-ও সংবাদবাহক দূত দর্শনপ্রাপ্ত মারীয়াকে অকপটে বলে দিলেন। নবজাতকের নাম রাখবে যিশু। আরো চমকপ্রদ ঘোষণা হচ্ছে- তিনি মহান হয়ে উঠবেন, পরাৎপরের পুত্র বলে পরিচিত হবেন। প্রভু পরমেশ্বর তাঁকে দান করবেন তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসন। যাকোব বংশের ওপর তিনি চিরকাল রাজত্ব করবেন। অশেষ হবে তাঁর রাজত্ব" *(লুক ১:৩১-৩৩)*। ২৫ ডিসেম্বর মাতা-মণ্ডলী সমগ্র বিশ্বে প্রভু যিশুর জন্মোৎসব তথা শুভ বড়দিন উদ্‌যাপনের জন্য নির্ধারণ করেছে। মানবজাতির সকল আনন্দের শ্রেষ্ঠতম আনন্দমুখর দিনটি হচ্ছে খ্রিস্টীয় বড়দিন উৎসব। অপরদিকে নববর্ষ এ আনন্দের রেষ কাটতে না কাটতে সমাসীন হয়। ১ জানুয়ারি শুরু হয় নববর্ষ। নতুনত্ব ও নবাগত বর্ষে ব্যবসা বাণিজ্য, অফিস আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাব-নিকাশ ও ভর্তি কার্যক্রম নতুনভাবে শুরু করে। বর্ষপুঞ্জিতে বা ক্যালেন্ডারে বড় হরফে ছাপা হয় জানুয়ারি মাস বয়স্কদের মুখে শোনা যায়, জীবন হতে আর একটি বছর চলে গিয়ে নতুন অন্য একটি বছরে যাত্রা শুরু হল। আমরা প্রভু যিশুর আনন্দের সুখবর জন্মবার্ষিকী এবং নববর্ষের চেতনাকে সুস্বাগতম জানিয়ে আগামী দিনগুলোর শুভ সূচনা কামনা করি।

আনন্দের সুখবর: মানব মুক্তির ইতিহাসে মঙ্গলসমাচার লেখকগণ তাদের লেখনীতে চমৎকারভাবে যিশুর জন্মকাহিনী, আত্মজীবনী, কর্মতৎপরতা যিশুকে, যিশু কী করেছেন, কী বলেছেন, যিশু কী চেয়েছেন এর সবকিছুই নিখুঁতভাবে পবিত্র বাইবেলে তুলে ধরেছেন। আর এসব কিছুই আমাদের মানবজাতির জন্য পরম পাওয়াই নয়; সকল আনন্দের সুখবরও বটে। যে- কোন পরিবারে দীর্ঘ অপেক্ষার পর নবজাত একটি কাঙ্ক্ষিত শিশু সকলের কাছে আনন্দেরই সুখবর। কারণ এ শিশুকে ঘিরে পরিবারে রচিত হয় সুখ, শান্তি ও সহাবস্থান। দুঃখ এবং ভয়কে অবশ্যই আনন্দের জন্য পথ ছেড়ে দিতে হবে: আনন্দ কর, উল্লসিত হও, তার সঙ্গে মহোল্লাসে উল্লসিত হও, বলেন প্রবক্তা *(ইসাইয়া ৬৬:১০)*। মারীয়াকে স্বর্গদূত কী বলেছিলেন- "ভয় পেয়ো না, মারীয়া। তুমি পরমেশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করেছ" *(লুক ১:৩০)*। তদ্রুপ পাহারারত রাখালদের স্বর্গদূত অভয় দিয়ে বলেছিলেন, "ভয় পেয়ো না, আমি এক মহা আনন্দের সংবাদ তোমাদের জানাতে এসেছি; এই আনন্দ জাতির সমস্ত মানুষের জন্যেই সঞ্চিত হয়ে আছে" *(লুক ১:১০)*। যিশু তাঁর প্রেরণকর্মের সময়ে বলেছেন, "পিতা যেমন আমাকে ভালোবেসেছেন, আমিও তেমনি তোমাদের ভালোবেসেছি। তোমরা আমার ভালোবাসার আশ্রয়ে থেকো। যদি আমার সমস্ত আদেশ পালন কর, তবেই তোমরা আমার ভালোবাসার আশ্রয়ে থাকবে, আমিও যেমন আমার পিতার সমস্ত আদেশ পালন করেছি আর আছি তাঁর ভালোবাসার আশ্রয়ে। এসব কথা তোমাদের বললাম, যাতে আমার আনন্দ তোমাদের অন্তরে থাকতে পারে এবং তোমাদের আনন্দ যেন পরিপূর্ণ হতে পারে" *(যোহন ১৫:৯-১১)*। নিশ্চয়ই যিশুর এমন শাশ্বত বাণী আমাদের আনন্দিত করে এবং আনন্দের আহ্বানে সাড়া দিতে অনুপ্রাণিত করে তোলে। শিষ্যচরিত পত্রে শিষ্যদের আনন্দপূর্ণ ঘটনায় লক্ষ্য করি, তারা একসঙ্গে সমস্ত কিছু করতেন এবং নিয়মিত মন্দিরে যেত আর তারা আন্তরিক আনন্দ সরলতার সঙ্গে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করত। নিত্যই পরমেশ্বরের বন্দনা করত তারা; সকলেই তাদের ভালোবাসত" *(শিষ্যচরিত ২:৪৬-৪৭)*। আনন্দ সহভাগিতা ছিল প্রভু যিশুর শিষ্যদের একান্ত বৈশিষ্ট্য। রোমীয়দের কাছে সাধু পলের আরো চমকপ্রদ বাণী আমাদের উৎসাহিত করার খ্রিস্টবিশ্বাসী ভক্ত হিসেবে প্রভুতে আনন্দ লাভে। তিনি বলেছেন, তোমাদের খ্রিস্টবিশ্বাসের জীবনে সর্বাঙ্গীন আনন্দ ও শান্তি এনে আশাবিধায়ক পরমেশ্বর তোমাদের অন্তর ভরিয়ে তুলুন আর তাতে পবিত্র আত্মার প্রেরণায় তোমরা যেন আশায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠ *(রোমীয় ১৫:১৩)*। প্রভু যিশুর সঙ্গে থাকার আনন্দ অন্য রকম। স্বর্গদূতের ঘোষণায় মারীয়া এবং রাখালগণ আনন্দে পূর্ণ হয়ে প্রভুর প্রশংসা গানে মুখরিত হয়েছিলেন। তদ্রুপ ফিলিপীয়দের কাছে ধর্মপত্রে সাধু পল উল্লেখ করেছেন, আর সব সময়ে তোমাদের সকলের জন্যে যখনই আমি তাঁকে ডাকি, তখনই সেই প্রার্থনায় আমি একটা আনন্দ অনুভব করি *(ফিলিপীয় ১:৪)*। যোহনের প্রথম ধর্মপত্রে যোহন বলেছেন, আমরা নিজেরা যা দেখেছি আর যা শুনেছি, তা তোমাদেরও জানাচ্ছি। যাতে আমাদের সঙ্গে তোমরাও সেই মিলন-বন্ধনে মিলিত হতে পার, যে মিলন বন্ধনে পরম পিতার সঙ্গে আমরা নিজেরাই মিলিত হয়ে আছি। আমাদের সকলেরই আনন্দ যাতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, সেই জন্যেই এই সব কথা লিখলাম" *(১ যোহন ১:৩-৪)*। যিশুর জন্মবারতার ফলেই আজ আমরা পরিপূর্ণ এবং খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে মিলনেই খ্রিস্টমণ্ডলীর পরম আনন্দ।

খ্রিস্টবর্ষ: যিশু খ্রিস্টের জন্মলগ্ন হতে খ্রিস্টাব্দ শুরু হয়। ইংরেজী বর্ষ নামে সমগ্র বিশ্বে ব্যবসা-বাণিজ্যে হতে প্রায় সবক্ষেত্রে লেখার বেলায়ও ইংরেজী না লিখে অবশ্য খ্রিস্টাব্দ ব্যবহার করা হয়। যিশুর জন্মের পূর্বে ব্যবহার করা হত খ্রিস্ট পূর্বাব্দ। বাংলায়ও বঙ্গাব্দ আছে। প্রত্যেক ধর্মের বেলায় তাদের রীতি, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি অনুসারে সন, সাল, হিজরী বর্ষ ইত্যাদি প্রচলিত আছে। খ্রিস্টবর্ষের শুরুটাই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। যেমন- জানুয়ারি মাসে বছরের প্রথম মাসেই যিশু খ্রিস্টের জন্মের আট দিন পরে পরিচ্ছেদনের জন্যে খ্রিস্ট যিশুকে মন্দিরে নেয়া হল। সেখানে স্বর্গদূতের ঘোষণানুসারে 'যিশু' নামে অভিহিত করা হল। যিশুর এই শুদ্ধিকরণ অথবা নামকরণের উৎসবটি দু'টি কারণে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমত: প্রভুর কাছে উৎসর্গ, দ্বিতীয়: প্রভুর বিধান বা রীতি অনুসারে বলিদানস্বরূপ একজোড়া ঘুঘু কিংবা দু'টি পায়রার ছানা জেরুশালেম মন্দিরে উৎসর্গ করা। এখানে উল্লেখ্য, যিশুর নিবেদন পর্বের দিনটি ২/৩ জানুয়ারি মাসে, অর্থাৎ নববর্ষের প্রথম মাসেই নির্ধারিত। অতএব, খ্রিস্টবর্ষের পরিপূর্ণতা পেয়েছে যিশুর নিবেদন ও নামকরণ উৎসবের মধ্য দিয়ে।

প্রীতিসম্ভাষণ সূচক কথা: যে জাতি অন্ধকারে পথ চলত, তারা মহান এক আলো দেখতে পেল; যারা মৃত্যু ছায়ার দেশে বসে ছিল, তাদের উপর আলো জ্বলে উঠল। ভাববাদী ইসাইয়া এসব আশার বাণী শুনিয়েছেন যিশুর জন্মের ৭৪০ বছর পূর্বে। তিনি ঘোষণা করে হতাশা-নিরাশাগ্রস্ত মানুষের মনে আশার সঞ্চার করে আনন্দের সুখবর সকলকে জানিয়ে আরো বলেছেন, যে শিশুটি জন্ম নিয়েছেন আমাদের জন্য, তাঁর কাঁধে রয়েছে আধিপত্য ভার, তাঁর নাম রাখা হল 'আশ্চর্য মন্ত্রণাদাতা, শক্তিশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তিরাজ' *(ইসাইয়া ৯:১,৫)*। আসন্ন প্রভু যিশুর জন্মবার্ষিকী ও খ্রিস্টবর্ষের প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছাসহ সকল খ্রিস্টবিশ্বাসী ঐশজনগণ প্রভুর অসীম ভালোবাসা ও শান্তি নিয়ে সুখছন্দে জীবন অতিবাহিত করতে তাঁর দয়া, অনুগ্রহ এবং আশীর্বাদ কামনা করছি।

“জাগো জেরুশালেম জাগো, ছড়াও তোমার দীপ্তি”

প্রাণেশ ডেভিড পেরেরা

বাংলাদেশে বছরের সবচেয়ে ছোট দিনটির কাছাকাছি (২১ ডিসেম্বর অথবা ২২ ডিসেম্বর বাংলাদেশে সবচেয়ে ছোট দিন) আমরা ২৫ ডিসেম্বর ‘বড়দিন’ উদ্‌যাপন করে থাকি। সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা বা দিনের মাপকাঠিতে ২৫ ডিসেম্বর বছরের ছোট দিনের মধ্যে গণনা করা হলেও আমরা খ্রিস্টবিশ্বাসীরা ২৫ ডিসেম্বরকে ‘বড়দিন’ বলে আখ্যায়িত করে থাকি। কারণ যাকে কেন্দ্র করে এ মহোৎসব করে থাকি অর্থাৎ যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন বা জন্মতিথি সেই যিশুখ্রিস্ট অনেক বড় - অনেক মহান। যিশু খ্রিস্টের জন্মকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ বড়দিনকে কেন্দ্র করে যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় অতীতে অনেক গান রচিত হয়েছে, এখনও হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হয়তো হবে। বাংলাদেশের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। আমার এ লেখনীর মাধ্যমে ‘গীতাবলীর’ (খ্রীষ্টিয় গানের বই) একটি খুব সুন্দর ও চমৎকার গানের অনুধ্যান ও ব্যাখ্যা সহভাগিতা করতে চাচ্ছি যদিও ব্যাখ্যা শতভাগ সঠিক নাও হতে পারে। কারণ লেখক কোন দৃষ্টিকোণ থেকে এ গান রচনা করেছেন বা এর অন্তর্নিহিত অর্থ কি এর পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা একটু কঠিনই বটে। গানটির রচয়িতা কে তা আমার জানা নেই। তবে যিনিই এ গান রচনা করেছেন তাঁকে আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে গভীর শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই। আমার এ লেখনীতে এ গানের ব্যাখ্যায় ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে তাই আমি অগ্রীম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। গানের প্রথম পংক্তি **“জাগো জেরুশালেম জাগো ছড়াও তোমার দীপ্তি। স্বর্গ আজি ছড়ালো রশ্মি দেশ দেশান্তর করি/ উজ্জ্বল, আনিল সত্য মহানন্দ - জাগো জেরুশালেম এ যে প্রভুর আগমন।”** বাণীদিপ্তীর ক্যাসেট কিংবা বড়দিনের সময় খ্রিস্টযাগে বহুবার এ গান শুনেছি এবং ধ্যান করেছি বারংবার মনে হয়েছে বড়দিনের অন্তর্নিহিত অর্থ এ গানের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে - লুকিয়ে রয়েছে ইহুদি জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য, যিশুর আগমনের পূর্বে ইহুদিদের মানসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা যিশুর জন্ম, তিন পণ্ডিতের আগমন, তাদের উপহার, উপহারের অর্থ ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমার সুযোগ হয়েছিল বাংলাদেশের অন্যতম স্বনামধন্য ইংরেজী মাধ্যম স্কুল Saint Francis Xavier's Greenherald International School এ শিক্ষকতার এবং Cambridge O Level - G Religious Studies/ Bible knowledge পড়ানোর। সিলেবাস অনুসারে সাধু মথি ও সাধু লূকের পুরো দুইটা বই এবং প্রেরিতদের কার্যাবলী (The Acts of The Apostles) পড়িয়েছি এবং এর ব্যাখ্যাও দিয়েছি। মঙ্গলসমাচারগুলোর ব্যাখ্যার জন্য বিভিন্ন লেখকদের যেমন William Barkley, John Courtney Murray S.J.) বিশ্লেষণ বা টীকা - টিপ্পনী অনুসরণ করতে হয়েছে। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানকালে অনেক সময় আমি এ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি বিশেষ করে অখ্রিস্টান ছাত্র/ছাত্রীদের কাছ থেকে (অনেক অখ্রিস্টান ছাত্র/ছাত্রীও Bible knowledge নিয়ে Cambridge O Level পরীক্ষা দিয়েছে) যিশু কে? তাঁর জন্মস্থান কোথায়, তিনি কোন ধর্মের অনুসারী ছিলেন, তাঁর ধর্মগ্রন্থের নাম কি, ঈশ্বরকে তিনি বা তাঁর ধর্মের লোকেরা কি নামে ডাকতেন ইত্যাদি। এর উত্তরে আমাকে বলতে হয়েছে যিশু ছিলেন খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তক, তিনি ছিলেন মুক্তিদাতা, তিনি ছিলেন জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র, তিনি ছিলেন ইহুদী, তাঁর জন্মস্থান বেথলেহেমে যাকে ‘দায়ুদ নগরী’ (City of David) বলেও ডাকা হয়, তাঁর ধর্মের নাম ইহুদী ধর্ম (Judaism) তাঁর ধর্মগ্রন্থের নাম তানাখ (Tanakh) যা হিব্রু বাইবেল নামেও পরিচিত। যার প্রধান তিনটি অংশ রয়েছে ১। পঞ্চপুস্তক (Torah বা Pentateuch) ২। নেভিয়িম (Nevi'im) এবং কেতুভিম (Ketuvim) ঈশ্বরকে তাঁরা ইয়াওয়ে Yahweh বলে ডাকাতেন এবং তাঁরা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন। ইহুদীদের প্রথা অনুসারে ‘যিশু’ নামটি তাঁর জন্মের আটদিন পর রাখা হয়েছিল স্বর্গদূত গাব্রিয়েল এ নামটি দিয়েছিলেন যিশুর গর্ভাগণের আগে *(লুক ২:২১)* আর ঐদিনই যিশুর ত্বকচ্ছেদ করানো হয়। *(আদিপুস্তক ১৭:১২)* আর ‘খ্রিস্ট’ নামটির তাঁর জীবদশায় কর্মজীবনে যোগ হয়েছে। ‘খ্রিস্ট’ নামের মানে হলো অভিষিক্ত জন (The Anointed One) তিনি হলেন ঈশ্বরের অভিষিক্ত জন যাকে ঈশ্বর বিশেষ কাজের জন্য অভিষিক্ত করে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি হচ্ছেন মশীহ্ বা মুক্তিদাতা (Messiah or Liberator)

এবার আসা যাক মূল পর্বে। যিশুর জন্ম কিন্তু বেথলেহেমে (Bethlehem) (যা আমি আগে উল্লেখ করেছি) জেরুশালেমে নয় - আর জেরুশালেম থেকে ৬ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে বেথলেহেম- এ সমস্ত দেশ কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে (Middle East) অবস্থিত। প্রবক্তা মিখা (Micah) অনেক আগেই পুরাতন নিয়মে যিশুর জন্মস্থান নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন আর বেথলেহেমে যিশুর জন্ম যেন সেই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা পেল। তাছাড়া যিশুর জন্ম নিয়ে বিভিন্ন প্রবক্তাদের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যা আমি পরে উল্লেখ করব।

ইহুদীদের ইতিহাস ঘাটলে আমরা জানতে পারি (৪০০০) চার হাজার বছর পূর্বে মধ্যপ্রাচ্যে (Middle East) আব্রাহাম (যাকে বিশ্বাসীদের পিতা বলা হয়) এ ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বর্তমানে আমরা যাকে প্যালেষ্টাইন বলে থাকি সেখানে ইহুদীরা যুগ যুগ ধরে বসবাস করে আসছিল। ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে- প্রাচীন ইস্রায়েল এবং যুদেয়া বারংবার বিদেশী শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীরে অবস্থিত ইস্রায়েলীয় বা ইহুদীদের ভূখণ্ড ছিল তিনটি মহাদেশের মিলনস্থল - আর এ তিনটি মহাদেশ হলো - এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা। বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্য, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান, সামরিক সরঞ্জাম আনা-নেওয়া হতো ইস্রায়েলীয়দের এ ভূখণ্ডের উপর দিয়ে। তাই ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে ইস্রায়েলীয়দের এ ভূখণ্ড বিদেশীদের কাছে ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই খ্রিস্টজন্মের আগে ও পরে বহু বিদেশী শক্তি প্যালেষ্টাইন তথা জেরুশালেম দখল করে নেয়। বিদেশী শক্তিগুলির মধ্যে ছিল ১) মিশরীয় (Egyptian) ৯২৫ খ্রিস্টপূর্ব) ২। অ্যাসিরীয় (Asseyrian) ৮০০ খ্রিস্টপূর্ব ৩। ব্যাবিলনীয় (Babylonians) ৬০০ খ্রিস্টপূর্ব। এ সময় অর্থাৎ ৫৮৬ খ্রিস্টপূর্ব জেরুশালেম মন্দির ধ্বংস হয় যা রাজা দায়ুদের পুত্র রাজা সলোমন নির্মাণ করেছিলেন যা ৭০ খ্রিস্টাব্দে রোমীয় শাসক টিটুস ধ্বংস করে দেয়। এরপর জেরুশালেমে আর কোন মন্দির নির্মাণ করা হয়নি। যিশুর জীবনে মন্দিরকে ঘিরে যত ঘটনা- তা কিন্তু জেরুশালেমের দ্বিতীয় মন্দিরকে ঘিরে।

এরপর পর্যায়ক্রমে পারস্য (Persians) গ্রীক (Greek) এবং যিশুর জন্মের ৬৩ বছর আগে রোমানরা (Romans) ইস্রায়েল বা জেরুশালেম দখল করে নেয় - প্রতিষ্ঠা করে জেরুশালেমে ইহুদীদের উপর রোমীয় শাসন ব্যবস্থা। (রাজা হেরোদ, পিলাত এরা কিন্তু সবাই রোমীয় শাসক ছিলেন) যা ইহুদীরা অন্তর থেকে ঘৃণা করত। যুগ যুগ ধরে ইহুদী জাতি এভাবে বিদেশী শক্তি দ্বারা শাসিত এবং নির্যাতিত হয়েছে। এতে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এমতাবস্থায় ইহুদীরা গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছিলেন একজন মুক্তিদাতার (Messiah/ Liberator) যার আগমনের প্রতিশ্রুতি বিভিন্ন প্রবক্তাদের মাধ্যমে দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে যেরেমিয়া, মোশী, মিখা এবং প্রবক্তা ইসাইয়া। প্রবক্তা ইসাইয়ার গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে যিশুর আগমন এবং তাঁর কর্মজীবনের কথা বলা হয়েছে। প্রবক্তা ইসাইয়ার ৫৬-

৬৬ অধ্যায়ে যিশুর আগমন সম্বন্ধে এভাবে বলা হয়েছে, "একজন ঈশ্বর অভিষিক্ত ব্যক্তি আসবেন যিনি ইস্রায়েল জাতির মুক্তি ও পরিত্রাণ আনবেন।" অনেক ইহুদী আশা করেছিলেন তাদের প্রতিশ্রুত মুক্তিদাতা (অর্থাৎ যিশুখ্রিস্ট) আসবেন ঘোড়ার পিঠে চড়ে হাতে থাকবে ঢাল তলোয়ার, বল্লম - দূর করে দিবে যত বিদেশী শক্তিমান শাসকদের। তারা অবশ্য আশা করেছিলেন একজন শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতার।

অবশেষে তিনি আসলেন, ঠিকই আসলেন তবে কোন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে নয়- আসলেন একজন আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে - আধ্যাত্মিক রাজা হিসেবে। লূক লিখিত মঙ্গলসমাচার অনুসারে যিশুর জন্মের এ আনন্দ সংবাদটি স্বর্গীয় দূতবাহিনী সবার আগে পৌঁছে দিলেন ইহুদী জাতির দরিদ্র ও উপেক্ষিত রাখালদের কাছে। আর স্বর্গীয় দূতবাহিনীর প্রথম ও প্রধান বাণী ছিল, তোমাদের ত্রাণকর্তা জন্মেছেন - সেই খ্রিস্ট - স্বয়ং প্রভু। মুক্তিদাতা আসলেন- এ যেন এক মহা আনন্দ সংবাদ। নিরাকার ঈশ্বর সাকার হলেন - অসীম হয়ে সসীম মানুষের কাছে নেমে আসলেন। অধরার ঈশ্বর ধরার মধ্যে নেমে আসলেন। সাধু এনসেম বলেন, "ঈশ্বর মানুষ হলেন যাতে মানুষ দেবত্বে উত্তীর্ণ হতে পারে।" সত্যি তাই। এ যেন মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসার চরম বহিঃপ্রকাশ। রবি ঠাকুরের ভাষায়,

"তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর তুমি তাই এসেছো নীচে,

আমায় নইলে, ত্রিভূবনেশ্বর, তোমার প্রেম হত যে মিছে।"

গীতাবলীর গানে বলা হয়েছে, জেরুশালেমকে জাগতে, দীপ্তি ছড়াতে, কারণ- স্বর্গ থেকে আলোর রশ্মি নেমে এসেছে জন্ম নিয়েছে আলোর পুত্র অর্থাৎ যিশু আর ঈশ্বর নিজেই আলো আর আমরা যারা তাঁর সংস্পর্শে থাকি আমরাও আলোর সন্তান বা আলোর পুত্র হয়ে উঠি। যিশু সত্য- কারণ ঈশ্বর নিজেই সত্য এবং পৃথিবীতে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি এসেছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন, আমি পথ, সত্য এবং জীবন *(যোহন ১৪:৬)* এবার চোখ বন্ধ করে একটু কল্পনার রাজ্যে চলে যাই, পিলাতের সামনে দাঁড়িয়ে যিশু অভিযুক্ত তিনি, প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়া হলো, "তুমি কী রাজা?" উত্তর এলো, "আপনি নিজেইতো বললেন - তবে আমার রাজ্য ইহলোকে নয়। সত্যের পক্ষে সাক্ষী দিতে আমি এ পৃথিবীতে জন্মেছি।" পরবর্তী প্রশ্ন, "সত্য? সত্য আবার কী? সত্য কিন্তু কোন দার্শনিক ধারণা নয় - একজন ব্যক্তি পিতা ঈশ্বর কর্তৃক প্রকাশিত সত্যিকার একজন মানুষ - পিলাত তা বুঝে উঠতে পারেনি।

যিশুর জন্ম জেরুশালেমে না হলেও বৃহত্তর অর্থে জেরুশালেমকে বুঝানো হয়েছে। তখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বেথলেহেমকে চিনতো তার চেয়ে অনেক বেশি চিনতো জেরুশালেমকে - এখনও তাই। তাছাড়া যিশু জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিক কিন্তু জেরুশালেমকে ঘিরে। জন্মের আটদিনের মাথায় যিশুকে জেরুশালেম মন্দিরে উপস্থাপন, নামকরণ ও ত্বকছেদ, বারো বছর বয়সে মন্দিরে পণ্ডিতদের সঙ্গে তত্ত্বালোচনা, ৩০ বছর বয়সে জর্দান নদীতে সাধু যোহন কর্তৃক বাপ্তিস্ম লাভের পর মরুপ্রান্তরে ৪০ দিন উপবাসের পর শয়তান কর্তৃক তিনবার পরীক্ষিত - সবই কিন্তু জেরুশালেমকে ঘিরে। তাছাড়া ৩৩ বছর বয়সে যিশুর ক্রুশীয় মৃত্যু, গৌরবময় পুনরুত্থান এবং জৈতুন পর্বত থেকে স্বর্গারোহণ সবই কিন্তু জেরুশালেম থেকে।

এবার আসা যাক, পরবর্তী পংক্তিতে। যেখানে বলা হয়েছে, **"প্রবীণেরা আচ্ছন্ন আধারে, জাতিসমূহ গভীর নিশীতে বিরাজে - তবু তোমার তবে আসিবেন প্রভু, তোমার উপর মহিমা তাহার জ্বলিবে।"**

এখানে 'প্রবীণ' বলতে ইহুদী সমাজের বয়স্ক ধর্মীয় ও সম্মানীয় নেতাদের বুঝানো হয়েছে যারা, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে পরামর্শ ও নেতৃত্ব এমনকি বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। কোন কোন প্রবীণ নেতা ইহুদীদের সর্বোচ্চ আদালত যাকে স্যানহেড্রিন (Sanhedrin) বলা হয় - তারা এ স্যানহেড্রিন এর সদস্য ছিলেন। যিশু জন্মের আগে ইহুদী জাতির প্রবীণেরা এমনকি গোটা ইহুদী জাতি খুব হতাশার মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করছিল। "ঐ তিনি আসছেন, ঐ মুক্তিদাতা আসছেন' - একটি ধ্বনি যেন বারংবার প্রতিধ্বনিত হয়ে শূন্যে মিলে যাচ্ছিল। ঐ সময়কার সার্বিক পরিস্থিতির কারণে ইহুদী জাতি চরম হতাশার মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করছিল - 'তবু তোমার তরে আসিবেন প্রভু' গানের এ লাইনের সত্যতা অবশেষে পূর্ণ হলো - প্রভু কিন্তু ঠিকই আসলেন। হতাশা বা নিরাশা রূপ নিল আশায়।

গানের শেষ পংক্তিতে বলা হয়েছে "পূব হতে এলো জনতা, সাথে উপহার বহু, জন্মিল শিশু রাজা, যুগ-যুগের প্রতিক্ষীত মুক্তিদাতা - জাগো, জাগো হে জেরুশালেম।"

এখানে, পূর্ব হতে বলতে প্রাচ্য দেশ (Eastern Country) অর্থাৎ এশিয়া মহাদেশের কয়েকটি দেশকে বুঝানো হয়েছে বিশেষ করে পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোকে বুঝানো হয়েছে।

আর 'জনতা' বলতে তিন পণ্ডিতের কথা বলা হয়েছে। এ তিন পণ্ডিতদের জ্যোতিষী বা জ্যোতির্বিদ বলেও গণ্য করা হতো যারা গ্রহ নক্ষত্র গণনা করে আবিষ্কার করেছিলেন পৃথিবীতে কোন এক মহান নেতার আবির্ভাব ঘটবে। বাইবেলে মথি লিখিত মঙ্গলসমাচার ছাড়া অন্য কোন মঙ্গলসমাচারগুলোতে তিন পণ্ডিতের উল্লেখ নেই এবং তারা এশিয়ার কোন্ দেশ থেকে এসেছিলেন এবং তাদের নাম কি বাইবেলের কোথাও তা উল্লেখ নেই তবে বিভিন্ন তথ্য ঐতিহ্য এবং আধুনিক বিভিন্ন ঐশ্বতত্ত্ববিদগণের বিভিন্ন ব্যাখ্যায় জানা যায় একজন পারস্য বর্তমানে ইরান থেকে যার নাম মেলকিওর (Melchior) যিনি যিশুর জন্য স্বর্ণ উপহার হিসেবে এনেছিলেন - দেখতে লম্বা, সাদা দাড়িওয়ালা বয়স্ক। তিনি যে উপহার যিশুর জন্য এনেছিলেন অর্থাৎ স্বর্ণ এর একটি প্রতীকি অর্থ রয়েছে যার মানে দাড়ায় যিশু হচ্ছেন রাজা। স্বর্ণ রাজার মর্যাদার প্রতীক - যিশু রাজাধিরাজ (আধ্যাত্মিক রাজা) যে পিলাত যিশুর মৃত্যুর পর ক্রুশের উপর একটি ফলকনামাতে লিখেছিলেন: 'নাজারেথের যিশু- ইহুদীদের রাজা।' *(যোহন ১৯: ১৪-২০)* আসলে পিলাত যিশুকে তিরস্কার, অপমান করার জন্যই এ ফলকনামা বা দোষনামা লিখেছিলেন (যিশুর ক্রুশের উপরে যে INRI লেখাটা দেখতে পাই এটা পিলাতের নির্দেশে এভাবে (Latin) ল্যাটিন ভাষায় লেখা হয়েছিল Iesus Nazarenus Rey Iedaeorum সংক্ষেপে INRI পিলাত যিশুকে যেভাবেই অপমান করতে চেষ্টা করুক না কেন - যিশু কিন্তু সত্যিকার অর্থেই কোটি কোটি মানুষের আধ্যাত্মিক রাজা হিসেবে তাদের অন্তরে রাজত্ব করছেন।

এবার আসি দ্বিতীয় পণ্ডিতের প্রসঙ্গে। খ্রিস্টীয় ঐতিহ্য বা tradition থেকে জানা যায়, দ্বিতীয় পণ্ডিতের নাম ক্যাসপার (Casper) একজন তরুণ, যিনি ভারতবর্ষ থেকে এসেছিলেন যিশুর জন্য উপহার হিসেবে নিয়ে এসেছিলেন ধূপধুনো যা যিশুর যাজকীয় মর্যাদার প্রতীক - প্রার্থনা ও উপাসনায় এ ধূপ ব্যবহার করা হতো এখনও হয় যিশু হচ্ছেন মহাযাজক নিজের রক্ত উৎসর্গ করে, হয়ে উঠেছেন সত্যিকার বলিদান *(হিব্রু ৯: ১২-১৪)*।

তৃতীয় পণ্ডিতের নাম বালথাজার (Balthazar) মধ্যবয়সী একজন মানুষ কোন কোন প্রাচীন ঐতিহ্য বা তথ্য বলে, তিনি আরব দেশের ইয়ামেন থেকে এসেছিলেন তবে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পরে এ ধারণা পাল্টাতে শুরু করে - অনেকে মনে করেন তিনি আফ্রিকার ইথিওপিয়া থেকে এসেছিলেন সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন সুগন্ধি গন্ধনির্যাস। এ গন্ধনির্যাস যিশুর মৃত্যুর প্রতীক। ইহুদীদের প্রথা অনুযায়ী যেকোন মৃত ব্যক্তিকে কবর দেবার আগে শরীরে গন্ধনির্যাস মাখাতে হবে। ৩৩ বছর বয়সে যিশু যখন মারা যান তার বেলাতেও তাই ঘটেছিল। তিনজন মঙ্গলসমাচার লেখক তিন দৃষ্টিকোণ থেকে তা বর্ণনা করেছেন। মার্ক ও লুক বলেছেন, যিশুর মৃতদেহ পূর্ণাঙ্গভাবে সুগন্ধি বা নির্যাস মাখানো হয়নি

(বাকি অংশ ২০ নং পৃষ্ঠায় পড়ুন...)

সেই তারাটি

পাষ্টর কিশোর তালুকদার

ভৌগলিক দৃষ্টিকোন থেকে আমরা দু'টি বিশেষ তারা দেখতে পাই। একটি পূর্ব দিকে ভোরের আকাশে দেখা যায় এবং অপরটি পশ্চিম আকাশে সন্ধ্যায় দেখা যায়। এদের একটির নাম শুকতারা অন্যটি সন্ধ্যা তারা। যিশুখ্রিস্টের জন্মের সময়েও একটি বিশেষ তারা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সেটির কোন নাম এখনও পর্যন্ত জানা যায় নি। কিন্তু সেই বিশেষ তারা দেখে পূর্বদেশ থেকে কয়েক জন পণ্ডিত যেরুসালেমে এসেছিলেন। কারণ তারা গণনা করে দেখেছিলেন যে ইহুদিদের একজন রাজার জন্ম হয়েছে, তিনি খ্রিস্ট প্রভু। সেই তারা তাদের সঙ্গে সঙ্গে বেথলেহেম যাচ্ছিল।

একটু ঘুরে দেখা: *আমি এখানে একটি ব্যাপারে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, ভাই। আমাদের পিতৃপুরুষেরা একসময় সকলেই সেই মেঘের নিচে আশ্রয় পেয়েছিলেন, সকলেই লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে যেতে পেরেছিলেন; আর এই ভাবে তাঁরা সকলেই সেইদিন সেই মেঘ আর সাগরে অবগাহিত হয়ে মোশীর সঙ্গী যেন দীক্ষাস্নাতই হয়েছিলেন। তেমনি সকলেই খেয়েছিলেন একই অলৌকিক খাদ্য, সকলেই খেয়েছিলেন একই অলৌকিক পানীয়–তাঁরা তো সেই অলৌকিক শৈল থেকেই জল খেতেন, যেই শৈল ছিল তাঁদের পথের নিত্য সঙ্গী; আসলে স্বয়ং খ্রীষ্টই তো সেই শৈল। অথচ দেখ, পরমেশ্বর কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের অধিকাংশের ওপর অপ্রসন্নই হয়েছিলেন : তাদের মৃতদেহ তো শেষে মরুভূমির এখানে ওখানে পড়েই রইল। (১ করিন্থীয় ১০: ১-৫)*

ঈশ্বরের পরিচয়: *আমি যে আছি সেই আছি। সদাপ্রভু তাঁর ব্যক্তিগত নাম সম্পর্কে বলেন "পরমেশ্বর মোশীকে বললেন, আমি সেই আছি যিনি আছেন। তিনি বলে চললেন, তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের একথা বলবে: আমি আছি আমাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন। (যাত্রা ৩:১৪)* এই কথাগুলি থেকে হিব্রু 'ইয়াওয়ে' এসেছে। এটি এমন একটি হিব্রু শব্দ গুচ্ছ, যা দিয়ে কাজ করাকে বুঝায়। ঈশ্বর কার্যতঃ মোশিকে বলেছিলেন যে, 'আমি এমন এক ঈশ্বররুপে পরিচিত হতে চাই, যিনি সর্বদা বর্তমান ও সক্রিয়'। 'ইয়াওয়ে' নামের মধ্যে এই তাৎপর্য রয়েছে, তা হল ঈশ্বর দিনের পর দিন তাঁর লোকদের সঙ্গে জীবন্তরুপে উপস্থিত থাকার প্রতিজ্ঞা করেন। অর্থাৎ ঈশ্বর তাঁর প্রথম সন্তান ঈস্রায়েল জাতির সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন এবং তাদেরকে বলবান হস্ত দিয়ে পরাক্রমের সাথে বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে পরিচালনা করেছেন। ঈশ্বরের কোন পরিবর্তন নাই।

খ্রিস্টের পরিচয়: *"যীশু উত্তর দিলেন, আমি আপনাদের সত্যি সত্যিই বলছি, আব্রাহাম জন্মাবার আগে থেকেই আমি আছি! (যোহন ৮: ৫৮)* মোশির নিকটে ঈশ্বরের পরিচয় এবং ইহুদীদের নিকটে যিশুর পরিচয়, একই পরিচয়। অর্থাৎ ঈশ্বর এবং যিশু 'এক' যোহন ১৭ অধ্যায়। আবার যোহনের নিকটে যিশুর পরিচয়, *"আমিই আল্‌ফা, আমিই ওমেগা!"– এই কথা বলছেন স্বয়ং প্রভু পরমেশ্বর, যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সেই সর্বনিয়ন্তা যিনি! (প্রত্যাদেশ ১:৮)* *"ভয় পেয়ো না তুমি! আমিই প্রথম, আমিই শেষ! (১৭ পদ)। আমিই আল্‌ফা, আমিই ওমেগা; আমিই প্রথম, আমিই শেষ; আমিই আদি, আমিই অন্ত! (প্রত্যাদেশ ২২: ১৩)*

আল্‌ফা ও ওমেগা : গ্রীক্ বর্ণমালার প্রথম অক্ষর 'আল্‌ফা' এবং শেষ অক্ষর 'ওমেগা'। প্রকা ১;৮, ২১;৬, ২২;১৩ পদে বার বার বলা হয়েছে। "আমি আল্‌ফা এবং ওমেগা" এই কথার অর্থ হল, আমি প্রথম এবং শেষ"।

সেই তারাটি: *রাজা হেরোদের আমলে, যুদেয়ার বেথলেহেম নগরে যীশুর জন্ম হয়। পরে কোন এক সময় প্রাচ্যদেশ থেকে কয়েকজন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত জেরুসালেমে এলেন। এসে তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন: ইহুদিদের যে রাজা জন্মেছেন, তিনি কোথায়? কারণ আমরা তাঁরই তারাটি উদিত হতে দেখেছি এবং আমরা এসেছি তাঁর চরণে প্রণাম জানাতে। (মথি ২:১-২) রাজার কাছ থেকে এই কথা শোনার পর তাঁরা রওনা হলেন। আর সেই যে–তারাটি তাঁরা উদিত হতে দেখেছিলেন, তখন সেটি তাঁদের আগে আগে চলতে লাগল, যতক্ষণ না সেই স্থানটির ওপর এসে থামল, যেখানে শিশুটি ছিলেন। তারাটিকে দেখতে পেয়ে তাঁরা আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন। বাড়িতে ঢুকে তাঁরা শিশুটিকে তাঁর মা মারীয়ার কোলে দেখতে পেলেন। ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁরা তাঁকে প্রণাম করলেন এবং নিজেদের রত্ন পেটিকা খুলে তাঁকে উপহার দিলেন সোনা, ধূপধুনো ও গন্ধ নির্যাস। (মথি ২:৯-১১)*

উপহার: আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে উপহার দেওয়ার রীতিনীতির বেশ প্রচলন আছে। যেমন: বিবাহ বাড়িতে এবং জন্মদিনের অনুষ্ঠানে। তখন আমরা উপহার ছাড়া কিন্তু একদমই যেতে পারি না। তাহলে যিনি এই জগতের মুক্তিদাতা, পরিত্রাতা, তাঁর জন্মদিনে আমরা কিভাবে খালি হাতে যেতে পারি। প্রতি বছর ঘুরে ফিরে ২৫ ডিসেম্বর আমাদের কাছে ধরা দেয় ঠিকই কিন্তু আমরা হয়তো খালি হাতেই যিশুর জন্মদিন পালন করে যাচ্ছি। অথচ মথি ২৫: ৩১-৪৬ পদে যিশু খ্রিস্টের জন্য উপহার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। হয়তো এভাবে কখনও আমরা চিন্তা করে দেখিনি। একটু মনের গভিরে প্রবেশ করি এবং মনে মনে ভাবি, যিশুর জন্য কি কোন উপহারের কথা এখানে বলেছে? হ্যাঁ, খ্রিস্টেতে প্রিয় ভাই-বোন, এখানেই, কেবলমাত্র এখানেই যিশুর জন্য উপহারের বিষয় বলা হয়েছে। প্রতি বছর বড়দিনে আমরা কত টাকা-পয়সা খরচ করি, নতুন নতুন জামা-কাপড় ক্রয় করি, পোলাও-বিরিয়ানি খাই, প্রিয়জনকে কত উপহার দিই, কিন্তু যিশুর উপহার নিতে হয়তো ভুলেই গিয়েছি। না, প্রতি বছর একই ভুল, না, এবারে আর এতো বড় ভুল আর করব না।

পণ্ডিতেরা সেই সময়ে যিশুকে অনেক মূল্যবান উপহার দিয়েছিলেন। আজও আমরা যিশুকে তার চেয়ে আরও মূল্যবান উপহার দেওয়া চাই। আর তা হল, এই জগতে যারা অবহেলিত, নিপীড়িত, হতদরিদ্র, অন্নহীন, বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন এমন কাউকে খুঁজে বের করতে হবে এবং তার জন্য কিছু একটা উপহার ক্রয় করে বড়দিনের সময়ে দিতে হবে। তখন আমরা মনে প্রাণে বড়ই আনন্দ লাভ করতে পারব। ঠিক তখনই ঈশ্বরের আশীর্বাদ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকবে।

(১৯ নং পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

কারণ তখন বিশ্রামবার (Sabbath Day) শুরু হয়ে গিয়েছিল। ইহুদীদের প্রথা অনুযায়ী শুক্রবার সূর্যাস্ত থেকে শুরু করে শনিবার সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাদের বিশ্রামবার। এ সময় সকল প্রকার কাজ থেকে বিরত থাকতে হতো। যিশু যেহেতু শুক্রবার মারা গিয়েছিলেন এবং মৃতদেহ আনতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিলেন সেই কারণে তার শরীরে সুগন্ধি গন্ধনির্যাস সেইভাবে মাখানো হয়ে উঠেনি যার কারণে রবিবার খুব ভোরে কিছু মহিলা যিশুর কবরে ছুঁটে গিয়েছিল উদ্দেশ্য ছিল যিশুর মৃত শরীর দেখার জন্য নয় বিভিন্ন মশলা/সুগন্ধি মাখানো। যিশু পুনরুত্থান করেছেন তা মঙ্গলসমাচার রচিয়তা যোহন অবশ্য বলেছেন, "যিশুর দেহটি নিয়ে ইহুদীদের সমাধি- প্রথা অনুসারে ওই গন্ধদ্রব্য-মাখানো ক্ষোম-কাপড়ের ফালি দিয়ে দেহটি জড়িয়ে নিলেন" *(যোহন ১৯:৪০)*।

যিশুর জন্মদিন উপলক্ষে রচিত গান "জাগো জেরুশালেম জাগো ছড়াও তোমার দীপ্তি ....

শুধু যিশুর জন্মকাহিনীই অনুধ্যান করতে আমাদের শিক্ষা দেয়নি। আমাদের জানতে সাহায্য করেছে ইহুদী জাতির ইতিহাস ঐতিহ্য এমনকি যিশুকে দেয়া বিভিন্ন উপহারের অন্তর্নিহিত অর্থ। সেই সাথে আমাদেরকেও এ আহ্বান জানানো হচ্ছে জেরুশালেমের মতো আমরাও যেন জেগে উঠি, আমাদের জীবনাশে বা জীবনসাক্ষ্য দিয়ে নিজে দীপ্তমান হই এবং অন্যকে প্রদীপ্ত করি। তবেই আমাদের বড়দিন সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠবে। সবাইকে শুভ বড়দিনের শুভেচ্ছা।

ভালোবাসার জন্মদিন: আত্মশুদ্ধির দীর্ঘ যাত্রায় বড়দিন

অর্নেট ব্লেইজ পেরেরা

ডিসেম্বরের এই শেষ প্রান্তে এসে পৃথিবী যেন ক্লান্ত মায়েদের মতো নিঃশ্বাস ফেলে। কুয়াশার চাদর ধীরে ধীরে নেমে আসে শহরের ওপর, বাতির আলো ম্লান হয়ে নরম হয়ে ওঠে, আর বাতাসে মিশে যায় এক ধরনের অদ্ভুত প্রশান্তি-যা কেবল শীতের রাতই দিতে পারে। বছরের শেষদিকে এসে মানুষ যখন নিজের ভেতরের সমস্ত ভুলভ্রান্তি, ক্লান্তি, ব্যর্থতা আর অপূরণীয় স্বপ্নের হিসাব মিলাতে বসে, তখনই বড়দিন তার নীরব আলো নিয়ে এসে দাঁড়ায় মানুষের হৃদয়ের সামনে। যেন কেউ ফিসফিস করে বলে, "ফিরে তাকাও, যে আলো তুমি হারিয়েছ মনে করেছিলে, তা এখনো তোমার ভেতরেই আছে।"

সত্যিই তো, বড়দিনকে কখনোই কেবল বাইরের সাজসজ্জায় পাওয়া যায় না। কারণ বড়দিন শুধু কোনো উৎসব নয়-এটি এক চিরন্তন প্রত্যাবর্তন। প্রত্যাবর্তন মানুষের ভেতরকার শৈশবে, যেখানে সবকিছু ছিল নির্মল; প্রত্যাবর্তন সেই বিনম্রতায়, যেখানে মানুষ অন্য মানুষকে তার আসল রূপে গ্রহণ করত; প্রত্যাবর্তন সেই অর্পণে, যেখানে ভালোবাসা মানেই ছিল দান, ক্ষমা, সহানুভূতি। যিশুর জন্মগাঁথাও ঠিক তেমনই এক প্রত্যাবর্তনের কথা বলে। তিনি আসেননি কোনো রাজদরবারে, আসেননি কোনো যোদ্ধার বাহিনীর মাঝখানে; বরং আসেন একটি সাধারণ আস্তাবলে-যেন তিনি জন্মের মধ্যেই দেখিয়ে দিয়েছিলেন, মানুষের প্রকৃত আলো সাধারণতার মধ্যেই জন্মায়।

ইতিহাসের প্রতিটি যুগেই যখন অন্ধকার ঘনীভূত হয়েছে, তখনই মানুষ কোনো না কোনো আলো খুঁজেছে। আলো কখনো এসেছে কবির কলমে, কখনো বিপ্লবীর কণ্ঠে, কখনো নিরন্ন মানুষের চোখের চাহনিতে। আর কখনো এসেছে এক নবজাত শিশুর নিঃশ্বাসে, যে পুরো পৃথিবীকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিল। সেই শিশুটির জন্মদিনই আজ আমরা বড়দিন হিসেবে উদ্‌যাপন করি। কিন্তু সেই উদ্‌যাপন কি কেবল রঙিন আলো আর সাজসজ্জার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত? বড়দিনের অন্তরস্থ বার্তা আমাদের তা বলে না। বড়দিন হচ্ছে আত্মার দীর্ঘ যাত্রা, যেখানে মানুষ নিজের ভেতরের সমস্ত ধুলোবালি ঝেড়ে ফেলে হৃদয়কে নতুন করে তৈরি করে।

মানুষের মন বড় অদ্ভুত। বহির্জগতে যতই আলো থাকুক, ভেতরের গভীরে যদি অন্ধকার জমে থাকে, তবে জীবন কখনোই সার্থক হয় না। সারা বছর আমরা কত ছোটখাটো বিষয় নিয়ে রাগ করি, অভিমান করি, ভেঙে পড়ি, প্রতিশোধ চাই, নিজের মনকে কষ্ট দিই এত কিছু ঘটতে ঘটতে মন কখনো কখনো ভারী পাথরের মতো হয়ে যায়। বড়দিন তখন সেই পাথরটাকে নরম করে দিতে আসে। উৎসবের আনন্দ মানুষের ক্লান্ত মনকে স্পর্শ করে বলে "যা গেছে, তা ছেড়ে দাও; যা আসছে, তাকে আলিঙ্গন করতে শিখো।"

যিশুর জীবনে ক্ষমা ছিল সবচেয়ে আলোয় ভরা অধ্যায়। তিনি দেখিয়েছেন, ক্ষমা করা মানে কোনো ভুলকে প্রশ্রয় দেওয়া নয়; বরং নিজের ভিতরকার অন্ধকারকে ভেঙে ফেলা। মানুষের মন যখন কারো প্রতি রাগ করে, সেই রাগ কাকে পুড়িয়ে দেয়? অন্যকে নয় নিজেকেই। বড়দিন তাই আমাদের শেখায় ক্ষমা হলো সেই চাবি, যা নিজের হৃদয়ের কারাগার খুলে দেয়। আমরা ভুলে যাই যে ক্ষমা করা মানে নিজের ব্যথাকে মুক্ত করা। একটি শীতের রাত হয়তো এক মুহূর্তে বদলে দিতে পারে এক বছরের জমে থাকা অভিমান।

এই আত্মশুদ্ধির জায়গাটিই বড়দিনকে গভীরতর করে তোলে। মানুষ যতই আধুনিক হোক, মানবিকতার প্রয়োজনীয়তা সময়ের সাথে বদলায় না। আমরা প্রযুক্তিতে এগিয়েছি, কিন্তু আমরা কি মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কেও এগোতে পেরেছি? আমরা কি অন্যের মন বুঝতে শিখেছি? আমরা কি দরিদ্র, একা, অসহায়, অবহেলিত মানুষের দিকে তাকিয়েছি? বড়দিন আবার এসে এসব প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়। এটি বলে তোমার ভেতরের আলো যদি অন্যের জীবনে পৌঁছাতে না পারে, তাহলে সেই আলো কেবলই প্রদর্শন; কখনোই সত্যিকারের আলো নয়।

বড়দিনের সৌন্দর্য কেবল গানের সুরে নয়, কেবল মোমবাতির আলোয় নয়; এটি খুঁজে পাওয়া যায় মানুষের চোখে। উৎসবের রাতে যখন পরিবারের সবাই একত্র হয়, হাসি-আনন্দে ভরে ওঠে ঘর, তখন সেই হাসির মধ্যেই লুকিয়ে থাকে জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ-একতা। মানুষ যত দূরেই যাক, যত অর্জনই করুক, দিনের শেষে সে ফিরে আসে সেই কয়েকটি মানুষের কাছে, যারা তাকে নিঃশর্তভাবে ভালোবাসে। বড়দিন সেই ভালোবাসার বীজকে আরও সজীব করে দেয়।

আরও একটি বিষয় আছে কৃতজ্ঞতা। মানুষ সাধারণত যা পায়নি তা নিয়েই বেশি চিন্তা করে; যা পেয়েছে, তা ভুলে যায়। বড়দিন মনে করিয়ে দেয় মানুষের জীবনে যত দুঃখই থাকুক, আশীর্বাদও কম নেই। আমরা বেঁচে আছি, শ্বাস নিচ্ছি, আমাদের পরিবার আছে, বন্ধুরা আছে, আশা করার মতো ভবিষ্যৎ আছে এসবই তো ঈশ্বরের দেওয়া উপহার। বড়দিন সেই কৃতজ্ঞতাকে আরও স্পষ্ট করে তুলে ধরে, যেন উৎসবের আলো বলে "তুমি আশীর্বাদপুষ্ট।"

যিশুর জন্মের মুহূর্ত পৃথিবীর অস্থিরতার মধ্যেই ঘটেছিল। বিরোধ, শাসনের অত্যাচার, শঙ্কা, দারিদ্র্য-এসবের মাঝেই জন্ম নিয়েছিল শান্তির প্রতীক। আজও পৃথিবী অস্থিরতায় ভরা, মানুষের জীবন অনিশ্চয়তায় দুলছে, তবু বড়দিন মনে করিয়ে দেয়-আশার মৃত্যু কখনোই ঘটে না। ছোট্ট একটি আলোই যথেষ্ট পুরো অন্ধকারকে বদলে দিতে। ছোট্ট একটি হৃদয়ের দয়া হয়তো কারো পুরো পৃথিবী বদলে দিতে পারে। তাই বড়দিন এক নীরব শিক্ষা দেয়-অন্ধকার যতই থাকুক, আলো কখনো নিভে যায় না।

এবার আসা যাক, বড়দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুভূতিতে ভালোবাসা। ভালোবাসা এক খুব বড় শব্দ, কিন্তু সবচেয়ে ক্ষুদ্র কাজে তার সত্য প্রকাশ পায়। কারো হাত ধরে দাঁড়ানো, কারো পাশে নীরবে বসে থাকা, কারো কথা মন দিয়ে শোনা-এগুলোই বড়দিনের সত্যিকারের ভাষা। কারণ ভালোবাসা কখনোই উচ্চকণ্ঠ নয়; ভালোবাসা সবসময় নরম, বিনম্র, সংযত। বড়দিন সেই নরম ভালোবাসার উৎসব, যা মানুষের আত্মাকে শুদ্ধ করে দেয়, যেন নতুন বছরের পথে দাঁড়িয়ে মানুষ বলতে পারে "এবার ভালো হবো। এবার আলোয় ভরপুর হবো।"

সুতরাং, বড়দিন কেবল পুঞ্জিকার দিন নয়; এটি এক অন্তদর্শনের দরজা। প্রতিটি আলো, প্রতিটি সুর, প্রতিটি হাসির মধ্যে লুকিয়ে থাকে এক নীরব বার্তা-

"মানুষ হও, আরও বেশি মানুষ হও।

ভালোবাসো, আরও গভীরভাবে ভালোবাসো।

ক্ষমা করো, যেন তোমার হৃদয় নিষ্কলুষ হয়।

এবং আলো হয়ে ওঠো-অন্যের পথ আলোকিত করতে।"

শেষ পর্যন্ত বড়দিন আমাদের কাছে কেবল একটি সত্য রেখে যায়-

ভালোবাসাই পৃথিবীর প্রথম আলো, আর সেই আলোই মানুষের শেষ আশ্রয়।

দু'হাজার বছর পূর্বে খ্রিস্টের দেহধারণ ও দ্বিতীয় আগমনের গভীর বার্তা

যোগেন জুলিয়ান বেসরা

খ্রিস্টের দেহধারণ একটি সুসংবাদ: যিশু খ্রিস্ট দুই হাজার বছরেরও বেশি আগে এ পৃথিবীতে এসেছিলেন মানবদেহ ধারণের মধ্য দিয়ে। পিতা ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে পাপী মানুষকে মুক্তি দিতে পুত্র-ঈশ্বর মানুষের মাঝে জন্ম নিয়ে মানুষের মাঝে বাস করলেন তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত। যিশু খ্রিস্ট মানুষ হয়ে জন্ম নেয়ার মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের একজন হয়ে উঠেছেন, যাতে আমরা তাঁর সাথে থাকতে পারি ও তাঁর মত হতে পারি। তিনিই তো স্বর্গ থেকে নেমে আসা রুটি, যিনি ফিলিস্তিনের বেথলেহেম শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি কোন সাধারণ শিশু ছিলেন না, তিনি মানব জাতির জন্য এক অনন্য উপহার, এক অলৌকিক শিশু। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজাধিরাজ হয়েও এক ক্ষুদ্র গোশালায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এমন এক আশ্চর্যময় শিশু, যার নাম 'যিশু' রাখার জন্য আদেশ করা হয়েছিল; যে শিশু এই পৃথিবীতে রাজকীয়, যাজকীয় ও প্রাবক্তিক গুণের আধার হয়ে স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে এক স্থায়ী সেতুবন্ধন স্থাপন করবেন। তাঁর এই প্রদর্শিত পথেই যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর মানুষ 'আশার তীর্থযাত্রী' হয়ে স্বর্গের পানে অবিরাম যাত্রায় সামিল হবে। তিনিই একমাত্র ঈশ্বর-প্রেরিত মহামানব যিনি এই পৃথিবীর মানুষদের ঐশরিক ত্রাণকর্তা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সমস্ত পাপ থেকে তাদের রক্ষা করার উদ্দেশে নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছিলেন। তাইতো মারীয়ার কাছে দেবদূতের যিশুর জন্মের বার্তাটি প্রত্যেক প্রজন্মের মানুষের জন্য এক গভীর সুসংবাদ।

অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে, ঈশ্বর কেন মানুষ হয়েছিলেন। তিনি তো ইচ্ছা করলে সরাসরি মানুষকে রক্ষা করতে পারেন, অর্থাৎ যিশুকে এই পৃথিবীতে না পাঠিয়েও তো তিনি মানুষের পরিত্রাণের কাজ করতে পারতেন। হ্যাঁ, তিনি তা পারতেন বা পারেন, কারণ তিনি সর্বশক্তিমান, সকল সৃষ্টিই তাঁর পদতলে। কিন্তু তিনি তা করেন নি, কারণ তিনি একদিকে যেমন দয়াবান, তেমনি আবার ন্যায়বান। তাই যে অপরাধ করেছে, তার তো এমনি এমনি মুক্তি মিলবে না, তার জন্য অবশ্যই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তাইতো আমাদের মুক্তির জন্য বলিদানের প্রায়শ্চিত্ত দয়াবান ঈশ্বর নিজপুত্র যিশুর মাধ্যমে সাধন করেছেন। আর এর কারণ হিসাবে সাধু যোহন লিখেছেন- "ঈশ্বর জগতকে এত ভালোবাসলেন যে, তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করলেন, যেন যে কেউ তাঁর উপর বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়" *(যোহন ৩:১৬)*।

প্রভু যিশুর অলৌকিক জন্ম কাহিনীর মাধ্যমে এই পৃথিবীর অহংকারী রাজা-বাদশা বা তথাকথিত শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতাদেরকে এক বিরাট সতর্কতা মূলক বার্তা দেয়া হয়েছে। নিজস্ব শক্তির দম্ভে মানুষ যে নিজের সৃষ্টিকর্তাকেই অস্বীকার করে বসে- সেই দম্ভ চূর্ণ করে নিজের অস্তিত্বের বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। মানব সমাজের হাজার হাজার বছরের নিয়ম ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে পিতা ছাড়াই একজন কুমারীর গর্ভে যিশুর জন্ম সম্ভব করেছিলেন স্বয়ং পিতা ঈশ্বর। পুত্র ঈশ্বরকে এক কুমারীর গর্ভজাত করে প্রমাণ করলেন যে, ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ও মালিক। তাই মানুষের অহংকার করার মত কিছু নেই। বরং এই বিপথগামী অবাধ্য মানুষকে সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্যই ঈশ্বর নিজ পুত্র যিশুখ্রিস্টকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, যাতে তারা পাপের ক্ষমা পেয়ে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হতে পারে। তাই বর্তমানকালের ক্ষমতাশালী শাসক বা যেকোন অহংকারী মানুষকে যিশুর জন্মকাহিনী বার বার শোনানো যেতে পারে, যদি মন পরিবর্তন হয়।

যিশুর জন্ম-রহস্য বোঝা ও জন্মোৎসবের সামাজিক প্রভাব

প্রভু যিশুর জন্মোৎসব উদ্‌যাপন পৃথিবীব্যাপী খ্রিস্টান বসতিগুলোতে তো অবশ্যই, এমনকি গোটা বিশ্বে-ই সামাজিকভাবে এমন এক মেলবন্ধন সৃষ্টি করে যার দ্বারা পৃথিবীতে এক শান্তি ও আনন্দের পরিবেশ পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বর তাঁর নবজাতক পুত্র যিশু খ্রিস্টের রক্তমাংসের দেহধারণের মাধ্যমে আমাদের প্রতি যে অকৃত্রিম ভালোবাসা দেখিয়েছেন, তা আমাদের জন্য বিরাট ঐশরিক আনন্দের ব্যাপার। এই আনন্দ ও ভালোবাসা আমাদের প্রতিবেশিদের প্রতিও ছড়িয়ে পড়ে। যখন আমরা আমাদের প্রতিবেশিকে ভালোবাসি ও সেবা করি, তখন আমরা ঈশ্বরকেই ভালোবাসি ও সেবা করি। আর এটি করার মাধ্যমে আমরা পৃথিবীতে আমাদের আসার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণ করি এবং আমাদের আনন্দ ও সুখ সম্পূর্ণ হয়। আমাদের এই উপলব্ধিও আসে যে, আমরা সকলেই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট এবং সেজন্যই সকল মানুষ একে অপরকে সম্মান করে বা করা উচিত।

তাই প্রভু যিশুর জন্ম-রহস্য বোঝা আমাদের জন্য খুবই দরকার। শাস্ত্রে বিভিন্নভাবে এটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এবং আমাদের ধর্মীয় শিক্ষাতেও আমরা তা শিখেছি। তারপরেও সহজভাবে বললে এইভাবে বলা যেতে পারে যে, মানুষের স্রষ্টা মানুষ হয়ে উঠলেন, মানুষের প্রকৃতি ও স্বরূপ ধারণ করতে সম্মত হলেন। যাকে আমরা উপাসনা করি, তিনি মানুষের বেশে এই মাটির পৃথিবীতে আমাদের মধ্যে বাস করেছেন তেত্রিশ বছর ধরে। খ্রিস্ট অবতারের এই রহস্য আমাদের অবশ্যই বোঝার চেষ্টা করতে হবে, তা নাহলে আমরা নিজেদেরকে চিনতে পারব না। শিশু যিশুর এই জন্ম রহস্য এতটাই শক্তিশালী যে, মানুষের কর্তৃত্ব, ক্ষমতা, রাজত্ব কোন কিছুই আর টিকতে পারে না। তার মানে ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াবার মত যোগ্যতা আসলে মানুষের নেই এবং কোনদিনই থাকবে না। আবার প্রভু যিশু যখন বলেন যে, মানুষ জল ও আত্মা থেকে জন্মগ্রহণ না করলে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না; এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, এই জন্ম কোন শারীরিক জন্ম নয়, এটা হলো আধ্যাত্মিক জন্ম, এবং এটা অত্যাবশ্যক। কারণ ঈশ্বর আদিতে মাটি ও জল দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু তা

অকার্যকর হয়ে পড়েছিল। তাই এখন জল ও আত্মা দিয়েই মানুষকে নবজন্ম লাভ করতে হবে, এবং এতেই তার পরিত্রাণ লাভ সম্ভব হবে।

মানুষের মাঝে বাস করে তিনি মানুষকে জল ও আত্মা দিয়ে তৈরি করে নবজন্ম দিতে চাইলেন। কিন্তু মানুষ তাঁকে চিনতে চাইলো না, বুঝতে চাইলো না, বরং তাঁকে বিপদে ফেলার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। প্রবক্তা যিশাইয়ার গ্রন্থে যেমন বলা হয়েছে- "একটি ষাঁড় তার মালিককে চিনে, একটি গাধা তার মালিককে চিনে, কিন্তু ইস্রায়েল তার মনিবকে চিনে না, আমার লোকেরা আমাকে বোঝে না" *(ইসাইয়া ১:৩)*। কঠিন হৃদয়ের মানুষের স্বভাব তা-ই। তাইতো সহজ সরল নিরীহ রাখালদের কাছেই প্রথমে প্রভু যিশুর জন্ম রহস্য প্রকাশিত হয়েছিল। অন্ধকার ও সমস্যায় ভরা পৃথিবীতে ঈশ্বরের আলো ছড়ানো হলো। লুক লিখিত সুসমাচারে যেমন বলা হয়েছে-"হঠাৎ প্রভুর এক দূত তাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন; প্রভুর মহিমা তখন তাদের ঘিরে উজ্জ্বল দীপ্তি ছড়াতে লাগল, এক আশ্চর্য ভীতিতে ভরে উঠল তাদের অন্তর" *(লুক ২:৯)*। ঈশ্বরের মহিমা যেখানে প্রদর্শিত হয়, সেখানেই আলো ছড়িয়ে পড়ে। সাধু যোহন যেমন বলেন-"অন্ধকারে সেই আলোর উদ্ভাস; আর অন্ধকার তাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি" *(যোহন ১:৫)*। অর্থাৎ আলো-ই জীবনের উৎস। বেথলেহেমের সেই জন্ম-রহস্য দ্বারা ঈশ্বর আমাদেরকে এই আলোর পথটি দেখালেন। সেই শিশু যিশুকে যদি আমরা অনুসরণ করি, তবে আমরা সেই আলোর সন্ধান পাব।

দ্বিতীয় আগমন বার্তার বিশেষত্ব: প্রভু যিশু মৃত্যুর তিনদিন পরেই স্বশরীরে পুনরুত্থান করে ঈশ্বরত্বের প্রমাণ দেন এবং এই পৃথিবীতে আরো কিছুদিন থেকে প্রেরিত শিষ্যদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়ার পর স্বর্গে ফিরে যান। যিশুর দ্বিতীয় আগমন হলো-খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করেন যে, স্বর্গারোহনের পর কোন একদিন প্রভু যিশু আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। তবে তিনি কবে আসবেন, তা কেউ জানে না। তাই খ্রিস্টবিশ্বাসীদের সর্বদা প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। তিনি আসবেন বিচার করতে ও তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন করতে। তিনি আবার আসবেন পরিত্রাণের পরিকল্পনা সম্পন্ন করার জন্য, যার মধ্যে রয়েছে আমাদের পুনরুত্থান, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আমাদের উপস্থিতি এবং নতুন পৃথিবীতে তাঁর সাথে অনন্তকালের জন্য জীবন লাভ।

যিশুর দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের অনেক জায়গায় উল্লেখ আছে। "জেনে রাখ, শীঘ্রই আসছি আমি। মানুষের কাজের জন্য আমার যা দেবার আছে, তা সঙ্গে নিয়েই আসছি আমি; প্রত্যেককে আমি দেব তাদের কাজের যোগ্য প্রতিফল" *(প্রত্যাদেশ ২২:১২)*। "তাই তোমরা প্রস্তুত হয়েই থেকো, কারণ মানবপুত্র এমনই এক সময়ে আসবেন, যখন তোমরা তাঁর আসবার কথা ভাবছই না" *(মথি ২৪:৪৪)*। "দেখ, মেঘে পরিবৃত হয়েই আসছেন তিনি তাঁকে দেখতে পাবে প্রতিটি চোখ; দেখতে পাবে তারাও, যারা তাঁকে বিদ্ধ করেছে। তাঁরই শোকে এবার বিলাপ করবে পৃথিবীর সমস্ত জাতির মানুষ। হ্যাঁ, তাই ঘটবে" *(প্রত্যাদেশ ১:৭)*। "তিনি এইভাবে চলে যাচ্ছেন আর তাঁরা আকাশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন, এমন সময় হঠাৎ সাদা পোশাক-পরা কারা দু'জন পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁরা বললেন, একি গালিলেয়ার মানুষেরা, তোমরা এখানে আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? এই যে যিশু, যিনি তোমাদের কাছ থেকে স্বর্গে উন্নীত হলেন, জেনে রাখ, তাঁকে যেভাবে স্বর্গে যেতে দেখলে, সেভাবেই তিনি আবার ফিরে আসবেন" *(শিষ্যচরিত ১:১০-১১)*। "কেননা যখন উচ্চারিত হবে ঐশ আদেশ, যখন শোনা যাবে মহাদূতের আহ্বান আর স্বয়ং পরমেশ্বরের তূর্য সংকেত, প্রভু নিজেই তখন স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন; খ্রিস্টের স্মরণাপন্ন অবস্থায় মৃত হয়েছিল যারা, তারাই তখন প্রথমে পুনরুত্থান করবে। তারপর আমরা, যারা তখনও বেঁচে আছি, এই পৃথিবীতে তখনও রয়ে গেছি, আমাদেরও তাদেরই সঙ্গে মেঘবাহনে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে, যাতে আকাশের বুকে খ্রিস্টের সঙ্গে আমাদের মিলন ঘটে। আর এইভাবে আমরা চিরদিন প্রভুর সঙ্গে সঙ্গেই থাকব" *(১ থেসালোনিকীয় ১:১৬-১৭)*। "আমিই আলফা, আমিই ওমেগা, আদি এবং অন্ত-একথা বলছেন স্বয়ং প্রভু পরমেশ্বর, যিনি আছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আসছেন, সেই সর্বনিয়ন্তা যিনি" *(প্রত্যাদেশ ১:৮)*।

যিশুর দ্বিতীয় আগমন হলো খ্রিস্টবিশ্বাসীদের এই প্রত্যাশা যে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সব কিছুর নিয়ন্ত্রণে আছেন এবং তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞাতে বিশ্বস্ত আছেন। যিশুর প্রথম আগমনে ঠিক যেভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, ঠিক সেভাবেই এই পৃথিবীতে শিশু হয়ে বেথলেহেমে জন্ম নিয়েছিলেন। যিশু সম্পর্কিত সকল ভবিষ্যদ্বাণীই তাঁর জন্ম, পার্থিব জীবন, প্রচার কাজ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। প্রভু যিশু সম্পর্কে এমন আরো কিছু ভবিষ্যদ্বাণী আছে যেগুলো এখনও সম্পন্ন হয়নি। পৃথিবীতে যিশু আবার আসার মধ্য দিয়েই, অর্থাৎ পৃথিবীতে তাঁর দ্বিতীয় আগমনের মধ্য দিয়ে অপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সম্পন্ন হবে। তবে যিশু খ্রিস্ট তাঁর প্রথম আগমনে একজন কষ্ট ভোগকারী নির্যাতিত মানুষ থাকলেও দ্বিতীয় আগমনে যিশু হবেন একজন বিজয়ী রাজা। প্রথম আগমনে যিশু এসেছিলেন সবচেয়ে দরিদ্র পরিবেশে, কিন্তু দ্বিতীয় আগমনে তিনি তাঁর চারপাশে স্বর্গীয় দূতবাহিনী সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন। প্রভু যিশু তাঁর প্রথম আগমনে কষ্টভোগকারী দাসরূপে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত সফলভাবে পালন করেছিলেন। যিশু তাঁর দ্বিতীয় আগমনে ইস্রায়েলীয়দের উদ্ধারকর্তা ও রাজা হিসাবে তাঁকে দেয়া দায়িত্বগুলো সম্পন্ন করবেন। প্রত্যাদেশ গ্রন্থের ১৯ অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিষদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে-...পরে আমি দেখলাম স্বর্গ খোলাই আছে, আর সেখানে একটা সাদা ঘোড়া রয়েছে। যিনি সেই ঘোড়ার উপর বসেছিলেন তাঁর নাম হলো বিশ্বস্ত ও সত্য। তিনি ন্যায়ভাবে বিচার ও যুদ্ধ করেন। তাঁর চোখ জ্বলন্ত আগুনের মত, আর তাঁর মাথায় অনেক মুকুট ছিল। ...তাঁর নাম হলো ঈশ্বরের বাক্য। তিনি লোহার দন্ড দিয়ে সব জাতিকে শাসন করবেন। তিনি রাজাদের রাজা, প্রভুদের প্রভু।

যিশুর দ্বিতীয় আগমনের ফল: প্রভু যিশুর প্রথম আগমন যেমন কয়েকটি কারণে হয়েছিল, যেমন- পাপী মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করা জন্য, মুক্তির মূল্য হিসাবে যিশুর জীবন উৎসর্গ করার জন্য, শয়তানের কাজ ধ্বংস করার জন্য, মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য, আমাদেরকে অনন্ত জীবন দেয়ার জন্য ইত্যাদি। যিশুর দ্বিতীয় আগমনও কয়েকটি উদ্দেশে ঘটবে- পরিত্রাণের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করবেন, সমস্ত কিছুর উপর প্রভু যিশুর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবেন, এবং ন্যায়বিচার করার মাধ্যমে মানুষকে তার কর্মফল দিবেন। পবিত্র বাইবেল অনুসারে আরো যা কিছু ঘটবে, তা হলো বর্তমান মহাকাশ এবং পৃথিবীসহ সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র আগুনে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং নতুন মহাকাশ ও নতুন পৃথিবীর সৃষ্টি হবে। সব কিছুর উপর প্রভু যিশুর রাজত্ব কায়েমের মাধ্যমে সৃষ্টিজগতে সম্পূর্ণ ন্যায্যতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হবে। স্বর্গ ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু খ্রিস্টের শাসনের অধীনে নিয়ে আসা হবে।

আমরা খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমনে বিশ্বাস করি। স্বর্গ থেকে তাঁর আগমন হবে দৃশ্যমান এবং মহিমান্বিত। এক কথায় বলতে গেলে যিশুর দ্বিতীয় আগমন তাঁর জন্ম, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে তিনি যা শুরু করেছিলেন, তা সম্পূর্ণ করবে। তাঁর প্রতিশ্রুত নতুন স্বর্গ ও নতুন পৃথিবীর বাসিন্দা হতে হলে আমাদেরকে তার যোগ্য করেই গড়ে উঠতে হবে। নচেৎ সেখানে আমাদের জায়গা নাও হতে পারে। তাই আমাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন হোক প্রভু যিশুর সেই প্রধান আদেশ পালন করেই- তোমার প্রভু ঈশ্বরকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসবে এবং তোমার প্রতিবেশিকেও নিজের মতই ভালোবাসবে।

নতুন অনুভবে ভক্তি আর প্রেমে জারিত হোক বড়দিন উৎসব

সুনীল পেরেরা

পরম পরাক্রমশালী নিরাকার অদৃশ্য ঈশ্বরকে দেখতে পাওয়া যায় না, ছোঁয়া যায় না, কেবল শুদ্ধ অন্তরে অনুভব করা যায় ধ্যানে, প্রার্থনায়, গানে গানে। সূর্যের আলো যেমন দেখা যায় না, ধরা যায় না, ঠিক তেমনি।

প্রেমময় ঈশ্বরের প্রিয় সৃষ্টি মানুষ। সেই মানুষেরা তাদের আত্মঘাতী কর্মের পরিণামে শাপগ্রস্থ হলে। ঈশ্বর চরম ক্রোধে তাদের নির্বাসিত করলেন পরম সুখের রাজ্য এদেন বাগান হতে চরম দুঃখের পৃথিবীতে। ব্যথিত ঈশ্বর তবু প্রতিজ্ঞা করলেন যে, পতিত মানবজাতিকে উদ্ধারের জন্য তিনি একজন পরিত্রাতাকে পাঠাবেন। এই বিশ্বাসে মানুষ যুগ যুগ ধরে, অপেক্ষা করেছেন।

প্রত্যেক নবজাত শিশুই ঈশ্বরের দান। ঐশ প্রতিশ্রুতির ফলে আদি পুরুষ ইসায়াক, যাকোব, সামসন, সামুয়েল ও দীক্ষাগুরু যোহন পৃথিবীতে এসেছিলেন। ফলে যত শিশু জন্মেছেন তাদের মধ্যে যিশুর মধ্যে দিয়েই ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি স্বার্থকতা লাভ করেছে। একমাত্র যিশু ব্যতিত যত ধর্মপ্রবর্তকই এসেছে এ পৃথিবীতে তাদের কারও জীবনের নিদর্শন বা পূর্ব বিজ্ঞপ্তি কোন দেশের, কোন কালেও কোনজাতির ইতিহাসের পাতায় প্রতিফলিত হয়নি। সকল ধর্ম প্রবর্তককেই নিজে এসে মানুষের কাছে দাখিল করতে হয়েছে স্বীয় পরিচয়পত্র। যিশুই ঈশ্বরের অঙ্গীকৃত মুক্তিদাতা স্বয়ং ঈশ্বর।

ইহুদীদের পুরাতন নিয়মসহ বিভিন্ন প্রাচীন জাতির ইতিহাসে তার আগমনের তথ্যাবলী সাক্ষী দিচ্ছে। কুলপতিগণের নিকট ভগবানের প্রতিশ্রুতি "তাদের মধ্য দিয়ে সমগ্র জাতি আশীর্বাদিত হবে, যুদা বংশ হবে হিব্রুকূলে অগ্রগণ্য, তিনি দেশকাল জাতির হবেন চিরমান্য, কুমারী গর্ভে হবে তার জন্ম, তার নীরব দুঃখবরণ ও জীবনোৎসর্গ এ সমুদয়ই পূর্বলিখন ও ভাববাণী"।

ঈশ্বর সেই সৃষ্টির আদিকাল থেকে তাঁর মানসকন্যা কুমারী মারীয়াকে মনোনীত করে রেখেছিলেন মানব মুক্তি পরিকল্পনায়। স্বর্গদূতের কথায় বিশ্বাস করে মারীয়া বললেন, আমি প্রভুর দাসী। আপনি যা বলেছেন, আমার প্রতি তাই হোক।" মারীয়ার এই সম্মতিদানের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হলো এক নতুন যুগ, শুরু হলো এক নতুন ইতিহাস। অপূর্ব সেই মুহূর্ত। মারীয়ার সম্মতি দানের সেই মুহূর্তে অনন্তকাল ব্যাপী নিস্তব্ধ অসীম শূন্যতা হতে অন্তহীন উর্ধ্বলোকের ঈশ্বর মানবদেহ ধারণ করে ঈশ্বরত্ব ও মানবত্বের মধ্যে এক অপূর্ব সংযোগ স্থাপন করলেন।

কুমারী মারীয়া শত প্রতিকূলতার মাঝেও সমাজের ভারে ভীত হননি। করেন নি কোন দুর্নামের ভয়। তিনি ছিলেন ঈশ্বরের প্রতি অনুগত। মারীয়ার মধ্যে মাতৃত্ব ও কুমারীত্বের অপূর্ব সংযাগ স্থাপন করলেন স্বয়ং পবিত্র আত্মা। একজন চিরকৌমার্য ব্রতধারী স্বামীর পবিত্র স্নেহ ছায়ায় বসবাসকারী একজন কুমারী গর্ভে দেহধারণের মাধ্যমে ঈশ্বরের মহান রহস্যের প্রতিফলন হলো।

এক হীম শীতল রাতে, কোন সুরম্য রাজপ্রাসাদে নয়, কোন বিত্তবানের গৃহেও নয়, পরম পবিত্রাতা প্রভুর জন্ম হলো বেথলেহেম নগরের গোশালায়। কারণ আদমশুমারীর জন্য পান্থশালায় কিংবা কোন গৃহে কেউ তাদের আশ্রয় দেয়নি। চরম তুচ্ছতার মাঝে তার জন্ম হলো, তার জন্ম-সজ্জা হলো খড় বিচালির যাবপাত্রে। মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য মানব-ঈশ্বর এলেন অপার করুণা প্রকাশ করতে এবং তাঁর দয়ার সুপ্ত রহস্য প্রকাশ করতে। ভাববাদী ইসাইয়া বলেন, "ঐ দেখ একটি শিশুর জন্ম হলো, আমাদের দেওয়া হলো একটি শিশু। তিনি অপূর্ব শক্তিশালী ঈশ্বর, যুগ-যুগান্তের পিতা, শান্তিময় রাজা"*(ইসা ৯:৬)*।

মানব মুক্তি পরিকল্পনায় সহবর্তী হয়ে মারীয়া হাসি মুখে জন্ম দিলেন এক দেব শিশু, যার নাম যিশু পরিত্রাতা- ইম্মানুয়েল। তিনি তার শিশু পুত্রকে উপহার দিলেন। বড়দিনের উজ্জ্বল বিভায় উদ্ভাসিত হয়ে স্বর্গদূতেরা গেয়ে ওঠে, "উর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের মহিমা, পৃথিবীতে শান্তি।" স্বর্গীয় সঙ্গীতের সুর মূর্চ্ছনায় দিকদিগন্তে মুখরিত হলো। সেই সঙ্গীত ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বভূবনের ঘরে ঘরে, পথে প্রান্তরে, প্রতিটি মানুষের অন্তরে।

সাধারণ মানুষের ন্যায় জন্মগ্রহণ করায় যিশু তার ঐশ ক্ষমতা প্রকাশ করতে পারতেন না। এবং এও প্রমাণ করতে পারতেন না যে, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। তাই একজন কুমারী মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে তিনি ঠিকই করেছেন, যাতে কেউ ভাবতে না পারে যে, আদমের অন্যান্য বংশধরদের মত তিনি সাধারণ মানুষের মত জন্মগ্রহণ করেছেন। যিশুকে জন্ম দিয়ে মারীয়া তার কুমারীত্ব অক্ষুণ্ন রেখেছেন, এতে ঐশ মাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহেই তিনি আদিপাপ হতে মুক্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন।

দূতের মুখে শিশু রাজার জন্মবারতা প্রথম প্রচারিত হয় শ্রদ্ধায়, সম্মানিত যারা তাদের কাছে নয়, অবহেলিত, অবজ্ঞাত দীনহীন, তুচ্ছ রাখালদের কাছে। তারাই জনগণের প্রতিনিধি হয়ে উঠল। তারাই পৃথিবীর ভক্তমণ্ডলীর প্রতিনিধি হয়ে সর্বপ্রথম শিশুরাজার দর্শন পেয়ে তাকে ভক্তিভরে পূজো করল। তারা মহানন্দে জাগানিয়া গানে গানে যিশুর জন্মবারতা প্রচার করল। সে গান মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে, সাহস যুগিয়েছে, প্রত্যাশায়, বিশ্বাসে বলীয়ান হয়েছেন নবজাত রাজার আগমনে।

আলোকের রাজা শিশু। তার জন্মের প্রতীক আকাশে উদিত হলো এক উজ্জ্বল তারা। সেই তারা দর্শনে আর শাস্ত্র জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হয়ে, সুদূর পূর্বদেশ থেকে ছুটে আসেন রাজরাজন্য, জ্যোতির্বিদ, পণ্ডিতগণ। আকাশের এ তারাই তাদের অগ্রে পথ নির্দেশ করে বেথলেহেম নগরের গোশালায় নিয়ে আসে। পণ্ডিতগণ শিশুরাজাকে বহু মূল্যবান তথা স্বর্ণ, ধূপধুনো আর গন্ধনির্যাস উপহার দিয়ে শ্রদ্ধা জানায়। স্বর্ণ দ্বারা সূচিত হলো যিশুর রাজকীয় মর্যাদা, ধূপধুনো দ্বারা তার ঐশ মর্যাদা এবং সুগন্ধি দ্রব্যাদি দ্বারা তার মানবত্বের মর্যাদা। তাই বড়দিনে আমরাও যেন শিশু যিশুকে উপহার দেই আমাদের পবিত্র হৃদয়খানি। তবেই বড়দিনের আনন্দ পূর্ণতা পাবে।

জন্মের পর যিশু আমাদের দ্বারে এসে কড়াঘাত করছেন। "দ্বার খুলো, দেখো আমি তোমাদের দ্বারে উপস্থিত। আমি এসেছি তোমাদের হৃদয় গোশালায় থাকতে, তোমাদের ভালোবাসতে।" তাই আমরা যারা পাপের অন্ধকারে নিমজ্জিত, আমরা যেন আমাদের হৃদয়দ্বার খুলে দেই যিশুর জন্য, মা মারীয়ার জন্য। কারণ মা মারীয়ার জন্যই আমরা যিশুকে পেয়েছি।

বর্ষ পরিক্রমায় যে দিনটি সব চাইতে ছোট সেই দিনটিকেই খ্রিস্টীয় জগতে বলা হয় বড়দিন বা ক্রিসমাস। এ দিনটিতে পৃথিবীতে এমন একজন অমৃতপুরুষ মহামানবের জন্ম হয়েছে বলেই এই অর্থপূর্ণ নামকরণ করা হয়েছে। বড়দিন প্রাণের উৎসব, মহানন্দের মহোৎসব। বড়দিন নিজেদের নবায়ন করার দিন। ঈশ্বর মানুষকে ভালোবেসেই তাঁর প্রিয় পুত্রকে বিলিয়ে দিয়েছেন। বড়দিন তাই

বিলিয়ে দেওয়ারও উৎসব। আমরাও যেন অপরের জন্য নিজেদের বিলিয়ে দিতে পারি। ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্রকে আমাদের জন্য দান করলেন উপহার হিসেবে। যেন আমরাও তাঁর পুত্রের মাধ্যমে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, ভালোবাসি এক অপরকে। বড়দিনে আমরাও যেন আমাদের হৃদয়খানি উপহার দেই, যেখানে বাস করবেন আমাদের শিশুরাজা যিশু। আমরা যেন বড়দিনে শুধু বাহ্যিক সাজসজ্জায় মত্ত না হই, বরং নিজেদের নতুন করে সাজাই। পূত পবিত্র অন্তরে যিশুকে গ্রহণ করি। তবেই বড়দিনে নতুন আত্মার অধিষ্টান লাভ হবে। বড়দিন নতুন ভাবে নতুন হয়ে ওঠার দিন। বড়দিন ভালোবাসা বিলিয়ে দেবার পরম উৎসব।

মূলত বড়দিনের একমাস আগে থেকেই এ উৎসবের পদধ্বনি অনুভূত হতে থাকে নানা আয়োজনে, উৎসবে, অনুষ্ঠানে, ধ্যান-প্রার্থনায়, গানে গানে। পুরো মাস জুড়েই বিশ্বময় সাজ সাজ রব ওঠে। চলে নতুন প্রস্তুতি। একদিকে আমাদের বাংলাদেশে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস অন্য দিকে ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন। দু'টো অনুষ্ঠানেই গোটা দেশ অনুষ্ঠান, আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয় আমাদের চূড়ান্ত বিজয় উল্লাস পাক বাহিনীর নাগপাশ হতে, মুক্ত হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। অন্যদিকে ২৫ ডিসেম্বর মুক্তিদাতা যিশুর আগমনে মানুষ ফিরে পায় স্বর্গের হারানো অধিকার। ডিসেম্বরের প্রতিটি দিবসই আনন্দের, প্রত্যাশার, প্রাপ্তি ও বিজয়ের। এ মাসে আমাদের হৃদয়তন্ত্রীতে বাজতে থাকে সুমধুর সুর সেই শুরু থেকেই। সে সুর আমাদের দিন রাত্রির প্রতিটি মুহূর্তকে ভরিয়ে তোলে এক আগমনী অনুভবে।

বড়দিন উৎসবের প্রধান উৎস যিশু। বড়দিন এলেই আমাদের বুকের অনুভবে এক আশ্চর্যবোধ জন্ম নেয়। যিশু প্রতি বড়দিনই আমাদের মাঝে আসেন প্রেম আর ভালোবাসা বিলাতে। তাই আমরা তার আগমনে প্রত্যাশী হয়ে অপেক্ষা করি। নানা বর্নিল সাজে বাড়ি-ঘর, গির্জা সাজাই। আলোকিত গির্জার এক কোণে গোশালা সাজিয়ে শিশু যিশুকে প্রণাম করা হয়। পরিবারে সবার জন্য নতুন জামাকাপড় কেনা হয়। বাজার থেকে আনা হয় নারিকেল, গুড়, তেল, কলা, চালের গুড়িসহ অন্যান্য নিত্যপণ্য। আগের রাতেই কেক-পিঠা বানাবার ধূম পড়ে যায়। সন্ধ্যায় সমবেত মালা প্রার্থনা করে একে অন্যের সাথে বড়দিনের শুভেচ্ছা বিনিময় করা হয় পরম শ্রদ্ধায়। যিশুকে প্রণাম করে কেক-পিঠা খাওয়া হয়। সাজানো হয় আলোকোজ্জ্বল ক্রিসমাস ট্রি। বড় উজ্জ্বল জন্ম-তারা টাঙ্গানো হয় বাড়ির ছাদে না হয় গাছের মগডালের উপর। পার্বণের আগেই বন্ধুবান্ধব আর আপন জনদের মাঝে বিতরণ করা হয় ক্রিসমাস কার্ড। শিশুরা অপেক্ষায় থাকে রাতে কখন বুড়ো সান্তাক্লজ দাদু তাদের জন্য উপহার নিয়ে আসবে।

বড়দিনের গান-কীর্তন আমাদের সীমাহীন আবেদনে উদ্বুদ্ধ করে, অনুপ্রেরণা যোগায়, নতুন করে বাঁচার সংগ্রামে সাহায্য করে। তাই আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই আনন্দে মেতে ওঠে বড়দিনের গান-কীর্তনে। নৃত্য-গীতে, খোল-করতালের তালে তালে মুখর হয়ে ওঠে বড়দিনের দিনগুলি। বড়দিনের দিনগুলো আনন্দধ্বনিতে রূপ লাভ করতে থাকে শুধু বাহ্যিক আড়ম্বরে নয়, আধ্যাত্মিকতায়ও। বড়দিনের তাৎপর্য, আমাদের মাঝে নিয়ে আসে নতুন অনুভব। এমনিভাবে ভক্তি আর প্রেমে জারিত হয়ে ওঠে আমাদের অন্তর।

বড়দিন আমাদের পথ নির্দেশ করে দিয়েছে, যে পথ চলে গিয়েছে সুদূর বেথলেহেম নগরে। প্রতিটি মানুষের অন্তরে উদিত হোক সেই আলোকিত জন্ম-তারা, যে তারার আলোয় মূঢ় রাখালেরা আর বিজ্ঞ ভীনদেশী জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণ চিনতে পেরেছিল শিশু রাজার জন্ম গোশালা। তাই প্রাণের উৎসব বড়দিনে আমরা যেন শিশু যিশুকে আমাদের জীবন যাপনের সঙ্গী করে নিই। এই মহীমময় দিনটিতে ধনী-গরীব, পণ্ডিত-মূর্খ সকলেই যেন সমস্বরে গাই শিশু যিশুর জয়গান।

বৎসরান্তে বড়দিনে আমাদের চিন্তায়, মননে, প্রাত্যহিক জীবন যাপনের অনুভবে একটা নতুন মাত্রা যোগ হয়। অন্তরে অনন্য মূল্যবোধ তৈরি হয় যে, স্বয়ং ঈশ্বর ইম্মানুয়েল আমাদের মাঝে চলে এসেছেন আমাদের নতুন জীবন পথে পরিচালনার জন্য। যিশু চান প্রত্যেক হৃদয় গোশালা হোক তার জন্মভূমি। এই মহোত্তম মানুষটিকে নিয়েই বড়দিনে যত আয়োজন, যত উৎসব। তাই আমরা যেন অন্তরে তার জন্য প্রদীপ জ্বেলে রাখি, যেন তাকে শুদ্ধচিত্তে বরণ করতে পারি শুধু বড়দিনে নয়, সারা বছরই যেন আমরা প্রস্তুত থাকি তাকে গ্রহণ করতে, বরণ করতে। যেন তার চরণে সমর্পিত হই পাওয়ার আনন্দে।

অথচ আমরা সারা বছর যিশুকে ভুলে যাই অনীহায়, অবহেলায়, ব্যস্ততার অনুযোগে। আবার বৎসরান্তে ঘটা করে তার জন্য গোশালা সাজাই, নানা লোক দেখানো আয়োজন উৎসবে মেতে ওঠি। এ তো তাকে বরণ করা নয়, বরং তাকে উপহাস করা। বড়দিনের আনন্দের উৎস শিশু যিশু, রাজাধিরাজ। অথচ সেই রাজ শিশুর জন্মাবার কোন স্থান ছিলনা। মূলত যিশু নিজেই চেয়েছেন কোন প্রাসাদে নয়, প্রতিটি মানুষকে ভালোবেসে, মানুষকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন সেই অন্তহীন আনন্দ লোকে। মানুষের মনের অভ্যন্তরে এক নতুন বোধ জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। এ বোধের নাম প্রেম বা ভালোবাসা। মানব-ঈশ্বর যিশু, তাই ঈশ্বর এখন আর দূরে নয়, আমাদের অতি কাছের। আমরা তাঁকে ভুলে গেলেও তিনি আমাদের কখনো ভুলে যান না।

ফুল-লতাপাতায় সজ্জিত গোশালার প্রতীকে, বড়দিনের আনন্দ কীর্তনে, গির্জায় ঘন্টাধ্বনির মৃদুসুরে শিশু যিশুর জন্মদিনটি এক পরমোৎসব হয়ে ওঠে। বড়দিনের উৎসবে মানুষ যদি তার নিজের গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে এসে ভালোবাসার উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে দাঁড়ায়, প্রতিবেশিদের সাথে সহভাগিতা করে, একমাত্র তাহলেই বড়দিনের উৎসব স্বার্থক হবে।

মায়ের স্বর্গরাজ্যে গমনের ১০ম বছর

প্রয়াত খ্রীষ্টিনা বটলেরু
জন্ম : ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১০ ডিসেম্বর, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ
স্বামী : প্রয়াত যোসেফ বটলেরু
গ্রাম ও ধর্মপল্লী : শুলপুর, মুন্সিগঞ্জ।

পৃথিবীতে যার প্রেম ভরা মন
তার ভাল কাজ করোগো স্মরণ

সময়ের নিষ্ঠুর গতি-বিধিতে ফিরে এলো বেদনা ভরা ১০ ডিসেম্বর। মা, তুমি ১০ বছর পূর্বে আমাদের ছেড়ে তোমার আকাঙ্ক্ষিত বাড়ি সেই স্বর্গরাজ্যে চলে গেছো পরম পিতার একান্ত আশ্রয়ে।

মাগো, বিগত ১০টি বছর তোমার উপস্থিতির ভালোবাসাময় শূন্যতা অনুভব করে যাচ্ছি। তোমার ত্যাগ ও কষ্টময় জীবনের অসংখ্য স্মৃতি, অনুপ্রেরণা, মায়া-মমতা আমাদের হৃদয়ে অমলিন এবং তা স্মরণে আজও কাঁদায়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি স্বর্গে পিতার নিকট রয়েছ। আমাদের আশীর্বাদ কর মা, আমরা যেন তোমার আদর্শে ভাল থাকি এবং একদিন পরকালে তোমার সাথে মিলিত হতে পারি।

আমাদের প্রিয় মা, মৃত্যুর পূর্বে ৫ বছর শয্যাশায়ী ছিলেন। মায়ের কষ্টময় শেষ জীবনে যারা সেবা, শারীরিক শ্রম, সান্ত্বনা, সাহচর্য, সাহায্য-সহযোগিতা এবং প্রার্থনা করেছেন, আপনাদের কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের পক্ষে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ধন্যবাদান্তে,
ফাদার হ্যামলেট বটলেরু সিএসসি।

বড়দিন: বিনম্র সেবক হওয়ার আহ্বান

ডানিয়েল লর্ড রোজারিও

বড়দিন বড় হওয়ার দিন কারণ মহান প্রভু এসেছেন দীন বেশে, দীন মানুষের হাত ধরতে। আমরা দীন তাই তিনিও দীন হয়েই এ ধরায় জন্মে ছিলেন আর তাইতো এ উৎসব আমাদের বড় হওয়ার উৎসব। যিশু পরিপূর্ণভাবে ঈশ্বর ও মানুষ ছিলেন। ঈশ্বররূপে তিনি পিতা ও পবিত্র আত্মার সমকক্ষ; তিনিও অসীম, অনন্ত ও সর্বশক্তিমান। আমাদের পরিত্রাণের নিমিত্তে তিনি মানবদেহ ধারণ করলেন। ঈশ্বর মারীয়ার মধ্য দিয়ে একটি অসীম কর্ম সাধন করলেন এবং পুরাতন যুগের অবসান ঘটিয়ে নতুন যুগের সূচনা করলেন। খ্রিস্ট মণ্ডলী মারীয়াকে যিশুর মা হিসেবেই সম্মান করে থাকে। ইহুদি জাতির প্রত্যাশানুসারে তিনি হলেন আশার চিহ্নস্বরূপ। অন্যদিকে খ্রিস্টানদের কাছে তিনি হলেন মণ্ডলীস্বরূপ যিনি যিশুকে ধারণ করেছিলেন। দীক্ষাগুরু যোহন এবং প্রেরিতশিষ্যদের মত মঙ্গলসমাচার প্রচার মারীয়ার কাজ ছিলো না। কিন্তু যিশুর সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক ছাড়াও তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল *(লুক ৮:১৯-২১)*। এ বিশেষ ভূমিকার মধ্যে তাঁর গোটা সত্তা নিহিত ছিল। মারীয়া ছিলেন এমন একজন, যিনি বিশ্বাস করেছিলেন। যেমন সাধু লুক লিখেছেন, "আহা, ধন্যা সেই নারী, যে বিশ্বাস করেছে যে, প্রভুর নামে তাঁকে যা বলা হয়েছে, তা সত্য হয়ে উঠবে, *(লুক ১:৪৫)*।" অন্য কথায় মারীয়া খ্রিস্টকে গর্ভেধারণ করার পূর্বে অন্তরে ধারণ করেছিলেন। তাঁর আগমন মানুষের রক্ত মাংস ও ইচ্ছার কারণে নয়- একমাত্র ঈশ্বরের ইচ্ছায়। তিনি ঈশ্বর হলেও পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে মাটির ঘরে এসেছিলেন। ইতিহাসে এটি হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা কারণ ঈশ্বরপুত্র মানুষ হয়েছেন। প্রতিবছর আমরা যখন বড়দিন উদ্‌যাপন করি তখন আমাদের অন্তরে এক নবচিন্তার উদয় হয় কারণ আমরা আহ্বান পাই বিনম্র হওয়ার। বড়দিন হলো একটি উপযুক্ত সময় যখন আমাদের অন্তর মন পূর্ণ করতে হয় যিশুর ভালোবাসাপূর্ণ ঐশ্বর্যসম্ভারে। আর তাইতো আমাদের অন্তর আনন্দে গেয়ে উঠে,

"আজ প্রভু এসেছেন আমাদের ক্ষুদ্র গোশালায়
তাই চলো যাই, চলো যাই পূজি গো তাঁহায়"

যিশুর জন্মের আধ্যাত্মিকতা

খ্রিস্টের জন্মোৎসব বা বড়দিন শুধু কথায় বড়দিন নয়, বরং আমাদের জীবনাচরণ দ্বারা এটি প্রভাবিত হচ্ছে কিনা- সেটিই বিবেচ্য বিষয়। পারিবারিক দিক থেকে যদি চিন্তা করি, তবে যে বিষয়টি পরিলক্ষিত হয় সেটি হলো- প্রত্যেকটি পরিবারই খ্রিস্টের জন্মতিথিকে কেন্দ্র করে আনন্দ উৎসবে পরিবেষ্টিত হয়। পরিবারের সকল সদস্য, আত্মীয়-স্বজন একত্রে মিলিত হয়ে এই শুভ মুহূর্ত বা সন্ধিক্ষণটিকে জাঁক-জমকপূর্ণভাবে উদ্‌যাপনের মাধ্যমে সকলের সাথে ভালোবাসা-প্রেম-প্রীতি সহভাগিতার চেষ্টা করে। মূলত, সবাই মিলন-ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। অনুরূপভাবে, ঐশরিক দৃষ্টিকোণ থেকে, আমাদের সৃষ্টিকর্তা যিনি, স্বয়ং প্রভু ঈশ্বর তাঁর প্রিয় পুত্র যিশুখ্রিস্টকে এই জগতে প্রেরণের মাধ্যমে আমাদের সাথে তথা সমগ্র মানব-জাতির সাথে মিলিত হলেন

এবং ভালোবাসার সন্ধি স্থাপন করলেন। ঈশ্বর আমাদের সাথে মিলিত হলেন যেন, আমরাও তাঁর সাথে মিলিত হয়ে পরিত্রাণ লাভ করতে পারি। শাস্ত্রে যেমনটি লেখা আছে, "পরমেশ্বর জগৎকে এতই ভালোবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র প্রিয় পুত্রকে তিনি দান ক'রে দিয়েছেন, যাতে, যে-কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে, তারা যেন বিনাশ না হয়, বরং সে যেন লাভ করে শাশ্বত জীবন। পরমেশ্বর জগৎকে দন্ডিত করতে তাঁর পুত্রকে এই জগতে পাঠাননি; পাঠিয়েছিলেন, যাতে তাঁর দ্বারা জগৎ পরিত্রাণ লাভ করতে পারে।" *(যোহন ৩: ১৬-১৭)*। তাই খ্রিস্টের জন্মলগ্ন শুধুই আনন্দ উৎসব নয়, বরং ঈশ্বরের সাথে ভালোবাসার সন্ধি স্থাপনের এক উপযুক্ত সময়। এর পাশাপাশি প্রতিবেশি ভাই-বোনদের সাথে আত্মিকতা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ারও মহৎ সন্ধিক্ষণ। ভালোবাসার বিষয়ে যিশু নিজেই যেমন আদেশ-বাণী দিয়েছিলেন, "প্রধান আদেশটি হল এই: শোন, ইস্রায়েল- আমাদের ঈশ্বর প্রভুই একমাত্র প্রভু! আর তোমার ঈশ্বর স্বয়ং প্রভু যিনি, তাঁকে তুমি ভালোবাসবে তোমার সমস্ত অন্তর দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত মন দিয়ে আর তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে। দ্বিতীয় প্রধান আদেশটি হলো এই: তোমার প্রতিবেশিকে তুমি নিজের মতোই ভালোবাসবে" *(মার্ক ১২: ২৯-৩০)*। কাউকে ভালোবাসার জন্য অন্তর থেকে উপলব্ধি করা এবং অন্তরাত্মায় মিলিত বা এক হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাই ঈশ্বর ও প্রতিবেশিকে ভালোবাসার মাধ্যমে মিলন ও ভ্রাতৃত্বের সন্ধি স্থাপনের জন্য সর্বপ্রথম অন্তর থেকে তাগিদ অনুভব করতে হবে। আর বড়দিন আমাদের সেই বিষয়েরই ইঙ্গিত দেয়, যেন আমরা ঈশ্বর ও মানুষের সাথে একাত্ম হতে পারি। বড়দিনের মহান এই লগ্নে, আমরা যদি সকলের সাথে মিলন বন্ধনে আবদ্ধ হতে না পারি তবে আমাদের জন্য বড়দিন বা খ্রিস্টের জন্মোৎসব পর্ব উদ্‌যাপন করাটাই বৃথা হবে।

যিশুর জন্মোৎসব বড়দিন ও আমাদের প্রতি তার আহ্বান

যিশু খ্রিস্ট ঈশ্বরপুত্র হয়েও তিনি মাটির ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন অতি দীনবেশে, তিনি রাজপ্রাসাদে জন্ম নেননি। সম্পদশালী কিংবা শিক্ষিত পিতা-মাতার ঘরেও তাঁর জন্ম হয়নি। তিনি জন্ম নেন খুবই সাধারণ ও তুচ্ছস্থানে, গোয়ালঘরের এককোণে, বিনয়ী ও দরিদ্র পিতা-মাতার ঘরে, যাদের গর্ব করার কিছু ছিল না। এই গভীর তাৎপর্য আমাদেরকে আধ্যাত্মিকভাবে স্মরণ করিয়ে দেয় যিশু ছিলেন পূর্ণ বিনয়ী ও নম্র এবং অন্তরে দীন। সত্যিকারের নম্রতা যিশুকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণের অবিচ্ছেদ্য বিষয়। তাহলেই সহজ-সরল ও পুণ্য হতে পারি এবং জাগতিক সম্পদ ও জ্ঞানের গর্ব আহরণের আকাঙ্খা পরিত্যাগ করতে পারি। যিশু জগতে জন্ম নিলেন অজ্ঞাতভাবে এবং অন্ধকারের অস্পষ্টতায়, কোন ব্যক্তির অন্তরে খ্রিস্টের আগমন স্থান পায় যখন তার থাকে আত্মবিলোপ ও আত্ম-অস্বীকার। যেখানে আত্মগর্ব ও অসারতা থাকে সেখানে তিনি প্রবেশ করতে পারেন না কারণ আমিত্বের প্রকাশ ঐশ সচেতনতার পথে বাধা সৃষ্টি করে। বর্তমান সময়ে মানুষের মাঝে নৈতিক মূল্যবোধের অভাব প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। স্বার্থপরতার বশবর্তী হয়ে মানুষ অনায়াসে একে অন্যের ক্ষতি করছে।

মিথ্যাচার, অন্যায্যতা, পরচর্চা-সমালোচনার মাধ্যমে বিনষ্ট করছে একে অন্যের জীবন। যুদ্ধ, সহিংসতা, সাম্প্রদায়িকতা, কোলাহল, সংঘর্ষ-দলাদলি, ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদির দ্বারা মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে, দেশে-দেশে, সমগ্র বিশ্বে সৃষ্টি হচ্ছে বিভেদ। তাই বিশ্বের প্রতিটি মানুষের দিকে যদি বিভেদ, স্বার্থপরতা, সহিংসতা ও প্রতিশোধের দৃষ্টিতে না তাকিয়ে, ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকাই তবেই বিশ্বে প্রেম, আনন্দ, শান্তি, মিলন ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তাই খ্রিস্টের জন্মোৎসব আমাদের জীবনে হয়ে উঠুক, ভালোবাসার মাধ্যমে সকলের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করার শুভ মুহূর্ত। বড়দিনের সকল আনন্দ-উৎসব তখনই সার্থক হবে, যখন আমরা সকল হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে সবার সাথে মিলন বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ভ্রাতৃত্বের সন্ধি স্থাপন করতে সমর্থ হতে পারব। আমাদের সবার হৃদয়ে যেন ধ্বনিত হয় এই বাণী, "জয় ঊর্ধ্বলোকে পরমেশ্বরের জয়! ইহলোকে নামুক শান্তি তাঁর অনুগৃহীত মানবের অন্তরে!" *(লুক ২: ১৪)*।

ভালোবাসাময় হৃদয় ও মনোভাব: বড়দিনের সবচেয়ে বড় গল্প হলো ভালোবাসার গল্প যা আমরা উপলব্ধি করি। প্রথমেই আমরা অনুভব করি স্বর্গীয় পিতার ভালোবাসা তার সন্তানদের জন্য। "তিনি জগতকে এতই ভালোবাসলেন যে তাঁর একমাত্র পুত্রকে এ জগতে প্রেরণ করলেন" *(যোহন ৩:১৬)*। এখানেই ঈশ্বরের ভালোবাসার চরম প্রকাশ পায় আমাদের জন্য। বড়দিনে আমরা ভালোবাসার শক্তি ও ভালোবাসায় অবস্থান করার ক্ষমতা অনুভব করি। তাইতো বড়দিন হলো ঈশ্বর ও মানুষের মিলন এবং মানুষে মানুষে মিলন। ঈশ্বর যেমন তাঁর প্রিয় পুত্রকে আমাদের মাঝে প্রেরণের মাঝে ভালোবাসার প্রকাশ ঘটিয়েছেন তেমনি আমাদের আহ্বান হলো তাঁর ভালোবাসায় নিজেকে সমর্পণ করা। তাই বড়দিনের একটি বড় আধ্যাত্মিক শক্তি হলো ভালোবাসা। পবিত্র মঙ্গলসমাচারকে যদি আমরা এক কথায় প্রকাশ করতে চাই তাহলে দাঁড়ায় 'ভালোবাসা'। পৃথিবীতে বিদ্যমান যুদ্ধ, মারামারি, হানাহানি, ঝগড়া-বিবাদ, অরাজকতা, মনোমালিন্য ও অন্যান্য সকল সমস্যার প্রধান কারণ হলো ভালোবাসার অভাব। আমরা যখন একে অপরকে ভালোবাসতে পারি না তখনই আমাদের দ্বারা উপরিযুক্ত ভুলগুলো সংগঠিত হয়। তবে যখন আমরা বড়দিন উদ্‌যাপন করছি তখন যিশুর জীর্ণ-শীর্ণ গোশালা আমাদের ভালোবাসার আহ্বান জানাচ্ছে। আমাদের ভালোবাসা নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলেই হবে না বরং আমাদের ভালোবাসা পৌঁছে দিতে হবে তাদের প্রতি যারা নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত, দুঃখী, অভাবী ও লাঞ্ছিত তাদের প্রতি। আর এর মধ্য দিয়েই বড়দিনের প্রকৃত ভালোবাসার পরিস্ফুটন ঘটবে; ভালোবাসা আমাদের মাঝে আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

বিনম্র সেবক হওয়ার আহ্বান: "তোমরা তোমাদের শত্রুকে ভালোবাস; যারা তোমাদের ঘৃণা করে, তাদের উপকার কর; যারা তোমাদের অভিশাপ দেয়, তোমরা তাদের শুভ কামনা কর; যারা তোমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে তাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর *(লুক ৬: ২৭-২৮)*।" যিশুর এ বাণী যদি আমরা মেনে চলি তাহলে আমাদের কোন শত্রু থাকবে না এবং পৃথিবীতে কোন যুদ্ধ সংঘাত দেখা দিবে না। সংকটময় এ পৃথিবীতে যিশুর জন্ম আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় বিনম্রতা সকল গুণের আধার। আমরা যখন বিনম্র অন্তরে একে অপরকে গ্রহণ করতে পারি তখন আমরা পরস্পর ঈশ্বরের বাহুডোরে বসবাস করি। যিশু যেভাবে ঈশ্বরপুত্র হয়েও অতি দীনবেশে আমাদের পৃথিবীতে বিনম্রতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তখন আমাদেরও কতই না উচিত তার মতো বিনম্র মানুষ হওয়া। আমরা যখন বিনম্র হতে পারি তখনই কেবল আমরা হৃদয়ে মনোভাবে বেড়ে উঠতে পারি।

দরিদ্রতার মধ্য দিয়ে জীবনকে উপভোগ করার আহ্বান: জগত সংসারে আমাদের যত রাজত্ব তার সব কিছুই ম্লান ও অর্থহীন হয়ে পড়বে যদি আমরা তা অপরের কল্যাণে ব্যবহার না করি। প্রভু যিশু জন্মের মধ্য দিয়ে আমাদের শিখিয়ে গেছেন দরিদ্রতার মাঝেও জীবনকে উপভোগ করা যায়। আমরা অনেকবার আক্ষেপ করি দরিদ্র ঘরে জন্মগ্রহণের জন্য আবার পিতা পরমেশ্বরের কাছে অভিযোগও দেই। তবে যিশু তাঁর জীবনদশায় আমাদের দেখিয়ে গেছেন অতি দীনবেশেও জীবন উপভোগ করা যায়। আমাদের হৃদয় আত্মিক সৌন্দর্যে মহিমান্বিত ও প্রেমে পরিপূর্ণ হবে তখনই যখন আমরা পাপ ও জগতের মোহ-মায়া ত্যাগ করবো, হৃদয়ে যিশুর উপস্থিতি অনুভব করতে পারব।

দয়া ও ক্ষমার মানুষ হওয়ার আহ্বান: বর্তমান পৃথিবীতে অনেক মানুষ অভাব ও অনাহারে দিনযাপন করছে। তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসা ও দয়ার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে আমরা এক শান্তিপূর্ণ ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত দেশ গঠন করতে পারি। যুদ্ধ-বিগ্রহের বড় একটি কারণ হলো আমরা একে অন্যকে ক্ষমা করতে পারি না। আর যখনই আমরা ক্ষমা না করে কোন ব্যক্তির প্রতি রাগ ক্ষোভ পুষে রাখি তখনই যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। তাই এবারে যিশুর জন্মোৎসব আমাদের আহ্বান করে দয়া ও ক্ষমার মানুষ হয়ে উঠার জন্য। আমরা যখন এ ধরণের মন-মানসিকতা অর্জন করি কেবল তখনই আমরা হৃদয়ে মনোভাবে বেড়ে উঠতে পারি।

ত্যাগ ও নিঃস্বতায় ধনবান হওয়ার আহ্বান: ঈশ্বরপুত্রের মানব দেহগ্রহণের মধ্য দিয়ে স্বর্গের ঈশ্বরত্ব থেকে মর্তে আগমন, নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিঃস্ব করে মর্তে মানুষের জন্য বিলিয়ে দেন। তিনি ঈশ্বরত্ব ধরে রাখলেন না বরং মানবত্ব ধারণ করলেন যেন মানব হয়ে জীবনধারণ করে ঐশমহিমা প্রকাশ করতে পারেন। আজকে তিনি নিঃস্ব ও দরিদ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করে আমাদের দরিদ্র হওয়ার আহ্বান জানান। আমরা যদি সত্যিকার ভাবে নিজেকে নিঃস্ব করতে পারি তাহলে জীবনে সবচেয়ে বেশি আনন্দিত মানুষ হতে পারবো।

শান্তি-সম্প্রীতির বন্ধন গড়ে তোলার আহ্বান: যিশুখ্রিস্ট হলেন শান্তিরাজ, তার রাজ্য শান্তির রাজ্য। যিশু এই পৃথিবীতে এসেছেন শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে। তিনি সকল বিভেদ-বৈষম্য দূর করে ন্যায্যতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। জাতি-বিজাতি সকলের কাছে ঘোষণা করেছেন শান্তি-সম্প্রীতির বার্তা। আমরা বর্তমান ভোগবিলাসিতার কারণে প্রায় প্রতিনিয়তই অশান্তি ও অরাজকতার বেড়াজালে আবদ্ধ। তাই আমাদের প্রতি নবজাতক যিশুর আহ্বান শান্তি-সম্প্রীতির রাজ্য গড়ে তোলা।

প্রতিবছরই ঘুরে আসে মহামিলনের এই দিন 'বড়দিন'। 'বড়দিন' হলো শান্তিরাজ ও প্রেমদাতা যিশুর জন্মদিন, একতা ও মিলনের দিন, উৎসবের দিন, হৃদয়ে বড় হবার দিন। ঈশ্বর পুত্র খ্রিস্ট পৃথিবীর ধরাতলে এসেছিলেন যেন আমরা সকলে পরিত্রাণের স্বাদ অন্তরে লাভ করতে পারি। খ্রিস্টের দেহধারণের এই উৎসব বড়দিন আমাদেরকে আরও বেশি উন্মুক্ত ও নম্র হতে আহ্বান করে। আমাদের আশে-পাশে যে দরিদ্র অসহায় মানুষগুলো রয়েছে তাদের প্রতি যেন দেখাতে পারি শান্তিরাজ খ্রিস্টের দয়া-ভালোবাসা ও শান্তি-আনন্দ। আমরা শুধু নিজের জন্য নয়, অন্যদের আনন্দের জন্য যেন উদারভাবে সহযোগিতা, সহভাগিতা করতে পারে তা হবে বড়দিনের প্রকৃত আনন্দ। আর এই আনন্দই আমাদের মধ্যে খ্রিস্টের মহৎ হৃদয়ে স্থান দেয়। এভাবে জীবন-যাপন করতে পারলেই আমরা বড়দিনের বড় হৃদয় নিয়ে বহুদূর অগ্রসর হতে পারি। তাই এবারের বড়দিন হোক হৃদয়ে ও মনোভাবে বেড়ে উঠার দিন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

- *মঙ্গলবার্তা*
- *সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, বড়দিন সংখ্যা ২০১৯ ও ২০২০।*
- *প্রস্তর, ২০২৪।*

বড়দিন এসেছে ভালোবাসার এবং ঐশ-শান্তির নববারতা নিয়ে

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

যিশু খ্রিস্টের জন্ম হয়েছে অতি দীনহীন দরিদ্র যোসেফ-মারীয়ার পরিবারে। তাঁর জন্ম হয়েছে যুদেয়া প্রদেশের বেথলেহেমের এক গোয়ালঘরে। সে সময় কোন পান্থশালায়, তাঁদের আশ্রয়ের সুযোগ হয়নি। কোথাও স্থান না পেয়ে, যোসেফ তাঁর আসন্ন প্রসবা স্ত্রী মারীয়াকে নিয়ে একটি গোশালায় আশ্রয় নেন। সেখানেই কনকনে শীতার্ত রাতে জন্ম নেন, বিশ্বের সকল মানুষের মুক্তিদাতা যিশু খ্রিস্ট। তখন প্রান্তরে গবাদিপশু চৌকিতে ব্যস্ত রাখালদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে দিতে, এক স্বর্গদূত রাখালদের সামনে উপস্থিত হন। তাঁর দীপ্তি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। তাতে অবুঝ রাখালরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। তখন দূত তাদেরকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'ভয় করো না। আমি এক মহানন্দের সংবাদ তোমাদের জানাতে এসেছি। সেই আনন্দ সকল মানুষেরই হবে। আজ দায়ুদ নগরীতে তোমাদের ত্রাণকর্তা জন্মেছেন। তিনি সেই খ্রিস্ট। স্বয়ং প্রভু। কাপড়ে জড়ানো একটি শিশুকে, তোমরা দেখতে পাবে।' *(লুক ২ অধ্যায়: ৯-১২ পদ)*।

হতাশা, ভয় ও জড়তার অন্ধকারে আচ্ছন্ন শীতার্ত অতি সাধারণ রাখালদের কাছে স্বর্গদূতের অভয়-বাণী বিপুল আনন্দের ও প্রত্যাশার সঞ্চার করেছে। স্বর্গদূতের কথা রাখালরা শুনেছে। কারণ তারা, কনকনে শীতের রাতে, না ঘুমিয়ে জেগেছে। তারা বুঝতে সক্ষম হয়েছে, ঈশ্বরের দেয়া সুখবর তাদের কাছে প্রকাশিত হয়েছে। তাই দূতের কথা মতো, তারা কাজ করেছে। তারা গহীন রাতের অন্ধকার ও দুর্গম পথের বাধা উপেক্ষা করে, স্বর্গদূতের নির্দেশ মত কাজ করেছে। রাখালেরা তাদের জড়তা, হতাশা, দুঃখবোধ সমস্ত ভুলে, সামনের দুস্তর পথের বাধা অতিক্রম করার অমিত সাহস সঞ্চয় করে, অদম্য গতি নিয়ে তাদের গন্তব্যের উদ্দেশে যাত্রা করেছে।

অবশেষে তারা স্বর্গদূতের বর্ণিত সেই গোয়াল ঘরে গিয়ে হাজির হয়। তারা সেখানে, গবাদিপশু পরিবেষ্টিত একটি যাবপাত্রে কাপড়ে জড়ানো ছোট শিশু যিশুকে ঠিকই দেখতে পায়। পাশেই রয়েছেন তাঁর মা মারীয়া এবং পালক পিতা যোসেফ। এই অবস্থায় শিশু যিশুকে দেখে রাখালেরা তাঁকে শ্রদ্ধা জানায়। তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে নাচে গানে মেতে ওঠে। পরে তারা নিজেদের এলাকায় ফিরে গিয়ে, সকলের কাছে তাদের দেখা ঘটনা প্রকাশ করে।

জগতস্রষ্টা ঈশ্বর তিনি একান্ত নীরবে নিভৃতে এই জগতে, মহৎ এবং অভূতপূর্ব একটি ঐশরিক ঘটনা ঘটালেন। এই ঘটনার পূর্বাভাস দিয়েছিলেন ঈশ্বর প্রেরিত নবী, প্রবক্তা এবং ভাববাদী সকলে। ইহুদীরা মনে করতো, শাস্ত্রে বর্ণিত, তাদের আকাঙ্ক্ষিত ত্রাণকর্তার আগমন হবে ধূমধাম করে। জাঁকজমক পূর্ণ অনন্য এক পরিবেশে তিনি তাদের মাঝে এসে উপস্থিত হবেন। কিন্তু তা হয়নি। যিশু খ্রিস্টের জন্মের নিদর্শন দেখতে পান, পূর্বদেশীয় তিনজন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত। তাঁরা পশ্চিম আকাশে একটি নতুন তারকা দেখে নিশ্চিত হয়েছিলেন, এটি নতুন কিছুর ইঙ্গিত করছে। শাস্ত্রে সম্বন্ধে তাঁদের ছিল অগাধ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। তাই তাঁদের বুঝতে কষ্ট হয়নি, নতুন আরেক যুগের সূচনা হয়েছে! সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের মহাপরাক্রমের প্রকাশ শুরু হয়ে গিয়েছে! ইসাইয়া এবং অন্যান্য ভাববাদীদের লিখে যাওয়া, বার্তা বাস্তবে রূপ নিয়েছে! সত্য সত্যই ঈশ্বর-প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তা জন্ম নিয়েছেন! তাঁরা নিশ্চিত হন, আকাশে দেখা নতুন এই তারাকে অনুসরণ করলেই ত্রাণকর্তার সাক্ষাৎ মিলবে! তাই তাঁরা অতি মূল্যবান, স্বর্ণ-কুন্দুরু-গন্ধরস ও নতুন জামা-কাপড় ইত্যাদি উপহার সামগ্রী নিয়ে পথে নেমে পড়েন। উটের পিঠে সওয়ার হয়ে, নতুন তারাকে লক্ষ্য করে; পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করেন সময়ের অভিযাত্রী এই তিনজন। এবং তাঁরা আশ্চর্যের সাথে লক্ষ্য করেন, তাঁদের পথ নির্দেশ করে আগে আগে এগিয়ে চলেছে নতুন এই তারাটি!

যিশু খ্রিস্টের জন্মের কথা নিশ্চিত হওয়ার জন্য, যাত্রাপথের অনেকটাই অতিক্রম করে তাঁরা, গন্তব্যের কাছাকাছি জেরুসালেমের শাসক হেরোদের দরবারে গিয়ে উপস্থিত হন। তাঁরা হেরোদের মুখোমুখি হয়ে, যিশুর জন্মের বৃত্তান্ত জানিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'আমরা নিশ্চিত হয়েছি, ইহুদীদের রাজা হয়ে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করেছেন! তিনি কোথায়? আমরা তাঁকে দেখতে এসেছি।' পণ্ডিতেরা সরল মনে তাঁদের পরিচয় দিয়ে বলেন, 'পূর্বদেশ দেশ থেকে অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে আমরা এ পর্যন্ত এসেছি। তাঁর অবস্থান থেকে খুব বেশী দূরে নই আমরা! আপনার এলাকায়, কোথাও রয়েছেন তিনি! আপনি আমাদের সাহায্য করুন! তাঁকে আমরা দেখবো। অভিনন্দন এবং সম্মান জানাবো। তাঁর জন্য উপহার সামগ্রী নিয়ে এসেছি আমরা।' তাঁদের কথা শুনে, স্বৈরশাসক হেরোদ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। সিংহাসনে নড়েচড়ে বসেন তিনি। তিনি জানতেন, ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি অনুসারে, মানুষের মুক্তিদাতা ভবিষ্যতে ইহুদী বংশেই জন্ম নেবেন। তিনি 'ইহুদীদের রাজা' ও 'ত্রাণকর্তা' হিসেবে পরিচিত এবং সম্মানিত হবেন! তাই তিনি পণ্ডিতদের বর্ণিত, নবজাত এই শিশুকে তাঁর প্রধান প্রতিযোগী হিসেবেই গণ্য করলেন। তিনি, কালবিলম্ব না করে, জেরুসালেমের প্রধান যাজক এবং অধ্যাপকদের ডেকে নবজাত শিশু, যিশুর জন্মের কথা জানতে চান। তাঁর অবস্থান নিশ্চিত হতে চান। মনে মনে কর্ম-পরিকল্পনার 'নীল-নকশা' তৈরি করে ফেলেন। হেরোদ তাঁর রাজ্যের তালিকাভুক্ত শাস্ত্রীয় পণ্ডিতদের জরুরী তলব করেন। নবজাত ইহুদীদের রাজা এবং ত্রাণকর্তা ও নতুন তারা দেখার আদ্যোপান্ত জানতে চান। তাঁর রাজ্যের শাস্ত্রীয় পণ্ডিতেরা জানালেন, 'আকাশে নতুন তারা প্রমাণ করে, 'ঘটনা ঘটে গিয়েছে!' হেরোদ প্রমাদ গুণলেন। তাঁর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গিয়েছে যেন! নিজেকে যথাসম্ভব সংযত করে, শান্ত হয়ে তিনি পণ্ডিতদের বললেন, 'আমার রাজ্যের কোথাও তিনি আছেন। নতুন জন্ম নেয়া এই রাজা ও ত্রাণকর্তাকে দেখে আসুন! ফেরার পথে আমার এখানে এসে, আপনারা অবশ্যই আমাকে নিশ্চিত করবেন! তাতে আমি রাজা হেরোদ নিজে, তাঁকে অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা জানাতে যাবো!' হেরোদের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পণ্ডিতগণ, আকাশে আবার সেই তারকা দেখতে পান। তাঁরা তাই আগের মতই, সেই তারকাকে অনুসরণ পথ চলতে শুরু করেন।

এ ভাবে দীর্ঘ সময় চলার পর, এক সময় থেমে যায় তারার গতি। সেটি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। তিন পণ্ডিত এগিয়ে যান সামনের দিকে। চলতে চলতে এক সময় তাঁরা দেখেন, পাহাড়ময় মরু প্রান্তরে দেখা যাচ্ছে, গবাদি পশুর আস্তানা। সেখানে সমবেত রাখালরা তাদের পশুপালের সাথে অবস্থান করছে। পণ্ডিতরা দেখতে পান, সেই তারার নিচেই সেই রকম গবাদিপশু পরিবেষ্টিত একটি গোয়াল ঘর। তাঁরা লক্ষ করেন, গবাদি পশুর মাঝে একটি যাবপাত্র সামনে রেখে অবস্থান করছেন একজন নারী এবং একজন পুরুষ। খুব সহজেই রাখালদের আলাদা করা যাচ্ছে। দ্রুত পা চালিয়ে এগিয়ে যান তিন পণ্ডিত। তাঁরা অবাক হয়ে দেখেন, সেই যাবপাত্রে একটি নবজাত শিশু রয়েছে! শীত নিবারণের জন্য, তাঁকে খড়-কুটো ও কিছু কাপড় দিয়ে জড়িয়ে রাখা হয়েছে। এই দৃশ্য দেখে পণ্ডিতরা নিশ্চিত হন, শাস্ত্রে বর্ণিত 'মসীহ' (ত্রাণকর্তা) জন্ম নিয়েছেন! শাস্ত্রে উল্লেখিত ইনি সেই মহান শিশু! স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর যাঁকে পাঠাবেন বলে, মানুষকে

কথা দিয়েছিলেন। তাঁরা এগিয়ে গিয়ে, শিশুর মা-বাবাকে শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা জানান এবং মাথা নুয়ে, হাঁটু গেঁড়ে প্রণাম করেন শিশুকে। তাঁরা, তাঁদের সঙ্গে নিয়ে আসা স্বর্ণ, কুন্দুরু, গন্ধরস এবং নতুন জামা-কাপড় উপহার সামগ্রীর রাখেন যাবপাত্রের পাশে। স্বর্গদূতের নির্দেশ মোতাবেক, অন্য পথে তাঁরা নিজেদের দেশে ফিরে যান।

পবিত্র বাইবেল থেকে জানা যায়, নিষ্ঠুর হেরোদ পণ্ডিতদের ফিরে আসা দেখতে না পেয়ে হতাশ এবং ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন। তাই তিনি, ঐ সময়ে নবজাত থেকে দু'বছরের নিচের বয়সের সমস্ত ছেলে শিশুদের হত্যার আদেশ দেন। তাঁর বিশ্বাস, এতে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী যিশুও নিশ্চিত মারা যাবেন। হেরোদের ঘোষিত শিশুহত্যার কথা স্বর্গদূত, যোসেফ এবং মারীয়াকে জানিয়ে তাঁদেরকে মিসরে গিয়ে আশ্রয় নিতে বলেন। তাই যিশুর প্রাণরক্ষার জন্য তাঁর মা মারীয়া এবং পালক-পিতা যোসেফ গোপনে মিসরে গিয়ে আশ্রয় নেন। সে সময় হেরোদের আদেশে, দুই বৎসর ও তার কম বয়সী শিশুদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়! তাতে বেথলেহেম ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় এক হৃদয়বিদারক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়! এ সময় ভুক্তভোগী পরিবারের সকল মানুষের কান্না ও আর্তনাদে এলাকার বাতাস ভারী হয়ে ওঠে! হেরোদের আক্রোশের শিকার পরিবারগুলোর বসতি এলাকায় এক মর্মান্তক দৃশ্যের অবতারণা হয়! পরে হেরোদের মৃত্যু হলে, মা মারীয়া এবং পালক-পিতা যোসেফ শিশু যিশুকে নিয়ে গালিলের নাজারেথে ফিরে যান।

বড়দিন, ঈশ্বরের বাক্য প্রকাশিত হওয়ার দিন: যিশুর জন্মের অনেক আগেই ভাববাদী ইসাইয়া *(৭:১৪)* লিখে গিয়েছিলেন, 'অতএব প্রভু আপনি তোমাদিগকে এক চিহ্ন দেবেন, দেখ, এক কন্যা গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে, তো তাঁহার নাম ইম্মানুয়েল [আমাদের সহিত ঈশ্বর] রাখিবে।'। এই জগতে মানববেশ নিয়ে যিশু খ্রিস্টের জন্ম ইহুদীদের শাস্ত্রে (পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মে) বর্ণিত সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি রূপে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি তাঁর সৃষ্ট মানবের সাথে এক নব সন্ধি স্থাপন করেছেন। যিশু খ্রিস্টের মাধ্যমে তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতির এবং নব সন্ধির নিদর্শন প্রকাশ করেছেন।

বড়দিন, ঈশ্বরের ভালোবাসা প্রকাশের দিন: খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের সারমর্ম হল, ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে জগতের পরিত্রাণের জন্য দান করে, মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও অনুগ্রহ চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করেন। বড়দিন তাই ঈশ্বরের ভালোবাসার, অনুগ্রহের এবং ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর। যিশু খ্রিস্ট তাঁর জীবন দিয়ে, শুধুমাত্র মানুষকে পাপ থেকে ক্ষমার পথই খুলে দেননি। মানুষের জীবনকে, ঈশ্বরের পথে পরিবর্তিত করার জন্যও জীবন দিয়েছেন। পাপের দাসত্ব থেকে মানুষের জীবনকে মুক্ত করে, মহান পবিত্র ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত করার সুযোগ করে দিয়েছেন।

স্বর্গদূতের দেয়া সেই আনন্দবার্তা হল, ইসাইয়ার বেথলেহেমের দায়ুদ নগরে ঈশ্বরপুত্র যিশু খ্রিস্ট মানুষ হয়ে; ত্রাণকর্তা রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাই, মানুষ যারা মহান ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি এবং মহানুভবতার প্রকাশ অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে, তাঁরা এই সুখবর পেয়ে আনন্দিত হয়েছে। তারা বিশ্বাস করেছে, এই অলৌকিক বাণী, সরাসরি মহান ঈশ্বরের কাছ থেকেই এসেছে!

এ জগতের কিছু মানুষ লোভ-লালসার এবং ভোগ-বিলাসের মাঝে আনন্দ খুঁজতে গিয়ে সুখ, আনন্দ কোনটাই পায় না। আমরা মানুষ, আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কীভাবে আনন্দ করি? কিসের মাঝে নিরন্তর, আমাদের প্রশান্তি খুঁজে মরি? এই জাগতিক অলীক ও ক্ষণস্থায়ী আনন্দের এবং ভোগের প্রশান্তি কি প্রকৃত অর্থেই, আমাদের সুখী করতে পারে? না, পারে না! ঈশ্বরের দেয়া সেই অনন্ত আনন্দের এবং স্বর্গীয় সুখবরের পথে না হেঁটে, আমরা বিপথেই ধাবিত হচ্ছি প্রতিনিয়ত।

আমরা মানুষ, আমাদের সহজাত স্বভাবের কারণেই বারবার পাপে পতিত হই এবং আমাদের কৃত পাপের কারণেই, প্রতিবার ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যাই। জাগতিকতার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে, দিব্যি মহান স্রষ্টার কথা ভুলে যাই! ভুলে যাই, আমাদের প্রতি তাঁর অসীম অমিয় ভালোবাসার কথা! অনেক সময়, তাঁকে আমরা অস্বীকারও করে বসি! আর তখন মহান ঈশ্বর নন, দুর্বৃত্ত শয়তান আমাদের প্রভু হয়ে যায়! হয়ে ওঠে উপাস্য দেবতা! আমরা পাপী মানুষ আমাদের সমস্ত সত্তা নিয়ে, অবলীলায় শয়তানের সামনে মাথা নত করি! তার হতে নিজেদের সমর্পণ করি। কার্যতঃ তখন মহান ঈশ্বরের উপর আমাদের বিশ্বাস ও আস্থা বিলুপ্ত হয়! আমরা সচেতন হয়েই, আমাদের মাথার উপর থাকা ঈশ্বরের ভালোবাসার শামিয়ানার বাইরে চলে আসি! এবং দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে, স্বেচ্ছাচারী হয়ে উপর্যুপরি এবং লাগামহীন যত অপকর্ম করতে থাকি! একপ্রকার সচেতন হয়েই আমরা, আমাদের দু'কাঁধে থাকা যিশু খ্রিস্টের প্রসারিত হাতের নাগাল থেকে বেরিয়ে আসি! তখন আমরা আমাদের মনে প্রকৃত ঐশ-শান্তি অনুভব করতে পারি না। ঈশ্বরকে আমরা দূরে ঠেলে দেই! ফলে প্রকৃত অর্থেই, আমাদের মাঝে ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারি না আমরা! আমরা তখন উদ্ভ্রান্তের মত আচরণ করতে শুরু করি। খুব সহজেই আমরা শয়তানের প্রলোভনে পতিত হই। পাপ করি এবং আধ্যাত্মিক মৃত্যুর মুখে পতিত হই! 'এই জগতের সবকিছু আমার! যত প্রভাব-প্রতিপত্তি, যত ক্ষমতা-পেশী-শক্তি, যত সম্মান-পদ-পদবী, এই জগতের আমার সবই' বলে হুংকার ছাড়তে থাকি! এমনকি আমাদের প্রতিপক্ষের ও দুর্বলের উপর সবলে আঘাত করি! তাদের অস্তিত্ব ধ্বংস করতে প্রবৃত্ত হয়ে পড়ি! কিন্তু মহান ঈশ্বর আমাদের অসুস্থ-অসুন্দর আচরণ পছন্দ করেন না। তিনি চান, আমরা যেন সচেতন হই। শয়তানের অন্ধকার জগত ত্যাগ করে তাঁর শরণাগত হই। আমাদের কৃত পাপের জন্য যেন, আমরা অনুতপ্ত হই। ঈশ্বরের কাছে নিজেদের সমর্পণ করি! আমাদের সকল পাপের জন্য, ক্ষমা প্রার্থনা করি। 'পাপের পথে আর ফিরে যাবো না' বলে তাঁর কাছে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হই। এবং ঈশ্বরের দেখানো আলোর পথে যেন, আবার ফিরে আসি আমরা। তখন আমরা যিশু খ্রিস্টের তথা ঈশ্বরের প্রিয়-ভাজন হয়ে উঠি। আমাদের মুক্তিদাতা যিশু খ্রিস্ট তখনই পরম মমতা নিয়ে আমাদের দিকে তাঁর দু'হাত প্রসারিতে করে, আমাদের আহ্বান করেন, 'এসো! এসো তোমরা, ঐশ করুণাধারায় সিক্ত হবে! এসো আমার কাছে! আমি তো তোমাদের জন্যই অপেক্ষার করছি!'

এই জগতে মানবসভ্যতা বিকাশের শুরু থেকেই, সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর মানুষের মন্দ স্বভাব পরিত্যাগ করে, তাঁর পথে ফিরে আসার জন্য তাঁর মনোনীত প্রবক্তা, ভাববাদীদের মাধ্যমে তাঁর শিক্ষা এবং বাণী প্রচার করেছেন। কিন্তু বারবারই মানুষ তাঁদের কথা অমান্য করেছে। তাঁর ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছে! জগতকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়েছে। তারা তাদের কল্পিত বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রতিমা এবং মূর্তিপূজায় নিজেদের মত্ত রেখেছে। পরিশেষে মহান ঈশ্বর তিনি তাঁর একজাত পুত্র যিশুখ্রিস্টকে মানব রূপে, মানুষের মাঝে পাঠালেন তাদের মুক্তিদাতা হিসেবে।

তাই বড়দিন, পরস্পরকে ভালোবাসার দিন। ভালোবাসা বিনিময়ের দিন। পরস্পর ভালোবাসায় আপ্লুত হয়ে, আত্মায় মিলনের দিন। ঈশ্বর নিজেই ভালোবাসা। ভালোবাসায় তাঁর আবাস। ভালোবাসায় তাঁর অবস্থান ও অস্তিত্ব। এই ভালোবাসা একান্তই স্বর্গীয় এবং মহান ঈশ্বর থেকে জাত ও সঞ্চারিত। ঈশ্বর তাঁর অকৃত্রিম অপার ভালোবাসা দিয়ে; ঘিরে রেখেছেন প্রতিটি মানুষকে। আগলে রেখেছেন তাঁর স্নেহের, আমাদের সবাইকে। এই ঐশরিক ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবেই, তিনি তাঁর একজাত পুত্র যিশু খ্রিস্টকে পাঠিয়েছেন এই মানব-জগতে। এই অভূতপূর্ব অপার্থিব ঘটনার মধ্য দিয়ে মানুষের সাথে তিনি রচনা করেছেন এক নবসন্ধি। তিনি তাঁর এবং মানুষের মধ্যকার ব্যবধান ঘুচিয়েছেন। বড়দিনের মধ্য দিয়ে; তিনি মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন। তাই, বড়দিনের শুভ-লগ্নটি স্বর্গীয় ভালোবাসায় মণ্ডিত। ঈশ্বরের আশীর্বাদে পরিপূর্ণ! পবিত্র আত্মার সহযোগে যিশু খ্রিস্ট বিশ্বাসী সকল মানুষকে বাস্তবেই সঙ্গ দিচ্ছেন। তাঁর অবারিত ভালোবাসা দিয়ে

সিক্ত করে রাখছেন। তাঁর প্রতি বিশ্বাসীবর্গের প্রতি তাঁর প্রত্যাশা, তাদের সকলের সাথে তাঁর স্বর্গীয় উপস্থিতি এক মুহূর্তের জন্যও যেন ভুলে না যায় তারা।

বড়দিন, ঈশ্বরের সাথে মানুষের পুনর্মিলনের দিন: মানুষের আদি পিতা-মাতা আদম ও হবার পাপে পতিত হয়েছিলেন। তাঁরা ঈশ্বরের আদেশ-নির্দেশ অমান্য করে, তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। আদম-হবার প্রজন্ম যুগে যুগে, একই পথে বিচরণ করেছে। তাই ঈশ্বর তাঁর প্রেরিত প্রবক্তা, ভাববাদীদের মাধ্যমে মানুষের কাছে তাঁর ভালোবাসার কথা পৌঁছে দিয়েছিলেন। ঈশ্বর মানুষের আধ্যাত্মিক মুক্তির ব্যবস্থা করবেন, এমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি যিশু খ্রিস্টকে পাঠালেন, তাদের মুক্তিদাতা হিসেবে। যিশুখ্রিস্ট তাঁর আদর্শ ও শিক্ষা দিয়ে জীবন দিয়ে, মানুষের কাছে ঈশ্বরকে প্রচার করেছেন। পরিশেষে, নিজের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন, মানুষের কাছে প্রতিশ্রুত ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তা। তাঁর মাধ্যমেই তিনি মানুষের জাগতিক ও আত্মিক মুক্তির ও শান্তির বন্দোবস্ত করেছেন। তাঁর পথে আগত সকল মানুষের, অনন্তকালস্থায়ী আবাস স্বর্গের দ্বার খুলে দিয়েছেন। মানুষের আদি পিতা ও মাতা, আদম-হবার পাপের ফলে স্বর্গের দুয়ার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মুলত যিশু খ্রিস্টের মাধ্যমেই সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর ও তাঁর সৃষ্ট মানুষের মধ্যে পুনর্মিলন ঘটেছে। যিশুখ্রিস্ট তিনি, ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে পুনর্মিলনের পথ সহজ ও সুগম করে দিয়েছেন।

যিশু খ্রিস্টের জন্ম হয়েছে মানুষের কাছে ঈশ্বরকে প্রকাশ করার জন্য। মানুষের মাঝে ঈশ্বরকে, ঈশ্বরের পরিকল্পনার, প্রতিশ্রুতির এবং ভালোবাসার কথা প্রকাশ এবং প্রচার করার জন্য। তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যু হয়েছে মানবীয় সত্তায় এবং তিনি ঐশরিক সত্তা নিয়ে কবর থেকে উত্থাপিত হয়েছেন। তাঁর গৌরবময় পুনরুত্থান হয়েছে, নিজেকে ঈশ্বরপুত্র হিসেবে প্রমাণ করার জন্য, স্বর্গে সগৌরবে আরোহণ করার জন্য তাঁর এবং ঈশ্বরের প্রতি মানুষের বিশ্বাসকে সংহত করার জন্য। তাঁর জীবনের মাধ্যমে, ঈশ্বরের প্রতি চূড়ান্ত বাধ্যতার প্রকাশ দেখিয়েছেন তিনি। ঈশ্বরের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও মহা পরিকল্পনা অনুসারে সবই করেছেন তিনি।

তাঁর জীবনকালে বিপথে পরিচালিত ইহুদীদের একাংশের হাতে চরম ভাবে অপমানিত ও নির্যাতিত হয়ে, তিনি ক্রুশীয় মৃত্যুকে বরণ করেছেন। কবরে গিয়েছেন। মৃত্যুর তিন দিন পর, কবর থেকে পুনরুত্থিত হয়ে যিশুখ্রিস্ট সশরীরে স্বর্গে গিয়ে মহান ঈশ্বরের পাশে অবস্থান নিয়েছেন এবং তাঁর আবাসেই তিনি, মানুষের জন্য অনন্তকালীন সুখ ও শান্তিতে ভরপুর, আনন্দময় জীবন নিশ্চিত করেছেন। সেখানে ঈশ্বরের পাশেই, সমস্ত সাধুদের এবং পুণ্যাত্মাদের সম্মিলনে অধিষ্ঠিত থাকবেন চিরকাল।

যিশু খ্রিস্ট ঈশ্বর হয়েও মানব বেশে জন্ম নিয়ে এই জগতে এসেছেন, মানুষের আত্মিক মুক্তির জন্য। যিশু খ্রিস্টের অপর নাম 'ইম্মানুয়েল'। অর্থাৎ 'আমাদের সাথে ঈশ্বর'। প্রকারান্তরে যিশু খ্রিস্টের মাধ্যমেই, মানুষ আমাদের সাথে ঈশ্বরের সম্মিলন ঘটেছে। ঈশ্বরের সত্তা নিয়ে তিনি, তাঁকে বিশ্বাসী আমাদের মধ্যেই বিরাজ করেন।

যিশুখ্রিস্ট মানব বেশে জন্ম নিয়ে এই জগতে এসেছেন, মানুষের আত্মিক মুক্তির জন্য। তিনি তাঁর শিক্ষার, আদর্শের মধ্য দিয়ে মানুষকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। তাঁর জীবন দিয়ে মানুষের মুক্তিও নিশ্চিত করেছেন তিনি। মৃত্যুর তিন দিন পর কবর থেকে পুনরুত্থান করে, প্রমাণ করেছেন সত্যই তিনি ঈশ্বর পুত্র। এ জগতে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে, সশরীরে তাঁর শিষ্য এবং অন্যান্য আরও অনেক মানুষের সামনেই উর্ধ্বাকাশে উন্নীত হয়েছেন তিনি। এ জগতে আবার তাঁর আগমন হবে। কিন্তু ত্রাণকর্তা হিসেবে নয়। বাস্তবে দৃশ্যমান হয়েই, আবার তিনি আসবেন। তখন তাঁর আগমন হবে, মানুষের বিচারক হিসেবে। প্রতিটি মানুষের বিচার করবেন তিনি। তাদের পুরষ্কার এবং শাস্তি হিসেবে স্বর্গের এবং নরকের অনন্ত জীবন নিশ্চিত করবেন।

বড়দিন, শান্তি প্রতিষ্ঠার দিন: বর্তমান জগতে সম্পদ ও সুযোগের অসম বণ্টন রয়েছে। সর্বত্রই দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার চলছে। চলছে বেকারত্ব, দ্রব্যমূল্যের অসহনীয় চাপ, বিচারহীনতা। একই সাথে চলমান যত অনৈতিক, বিবেক বর্জিত মানবতা বিরোধী যত আগ্রাসী কর্মকাণ্ডে বিশ্বমানব সকলেই নিষ্পেষিত। চলছে, দেশে দেশে শক্তিধর যুদ্ধবাজদের এবং স্বৈরশাসকদের দোর্দণ্ড প্রতাপ! এতকিছু দেখে প্রতীয়মান হয়, এ জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক; তা তারা চায় না। নিজেদের স্বার্থের উর্ধ্বে, 'বিশ্বমানবতা' বলে কোন বিষয় তাদের বিবেকে সাড়া জাগায় না। অসহায় মানুষের করুণ পরিস্থিতি দেখে, তাদের হৃদয় বিগলিত হয় না। ধর্মীয়, সামাজিক ও নানা ধরনের বৈষম্যের শিকার হয়ে, অনেক মানুষ মানবেতর-জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। নিজেদের জন্মভূমিতেই 'পরবাসী' হয়ে, সকল নিগ্রহ সহ্য করতে হচ্ছে তাদের। তাই নিরীহ অসহায় মানুষ, নিজেদের জন্মভূমি ছেড়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভিনদেশে ছুঁটে যাচ্ছে প্রাণ বাঁচাতে। দুর্গম ও দুর্ভেদ্য পথযাত্রায় অনেকে মৃত্যুকে বরণ করে নিচ্ছে! তারা উদ্বাস্তু অভিবাসী হয়ে, ভিন্ন পরিবেশে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। বর্তমান যুগে নির্যাতিত মানুষের আহাজারিতে, প্রকম্পিত হচ্ছে এ পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্ত। যা দেখে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠছে। মনে হয়, কতিপয় অমানুষের অমানবিক কর্মকাণ্ড দেখে, তাঁর চোখও ভিজে যায়! কিন্তু শোষক, নির্যাতক কেহই তা অনুধাবন করে না। উল্টো, তাদের নিষ্ঠুর, ক্রোর হাসি দেখতে হচ্ছে শান্তি-প্রত্যাশী বিশ্ববাসী সবাইকে। একটি বছর পরে, এবারের বড়দিন এসেছে নতুন পরিসরে। যিশু খ্রিস্টের পুণ্য জন্মতিথি এসেছে, আশার অমিয় এবং শান্তির অমৃত ললিত বাণী নিয়ে মানুষের মনে প্রত্যাশার স্পন্দন জাগাতে।

এবারের বড়দিনের নতুন সূর্যোদয়ের সাথে, আমাদের বিশ্বের সকলের যত হতাশা, ভয় ও জড়তার অন্ধকার দূরীভূত হোক! সকলের সামনে জ্বলে উঠুক, প্রত্যাশার উজ্জ্বল রশ্মি! স্বর্গদূতের সেই অভয় ও শান্তির ললিত বাণী নতুন স্বরে অনুরণিত হোক বিশ্ববাসী সকলের হৃদয়ে! এখন নিরানন্দের, সংশয়ের, অশান্তির জরাগ্রস্তা বিশ্ববাসী সকলেই নব উদ্যোগে আশীর্বাদে পরিপুষ্ট আসন্ন ২০২৬ খ্রিস্টবর্ষকে বরণ করে নিতে উন্মুখ হয়ে আছে! তাঁরা সকলেই দেখছে, এই বড়দিনে সকলের হৃদয়-গোশালার উপর প্রকাশিত হয়েছে এক নব উজ্জ্বল তারা। স্বর্গীয় আভা নিয়ে উদ্ভাসিত, এই আশ্চর্য তারা, মানুষের প্রতি ঈশ্বরের প্রদত্ত আশীর্বাদের এবং প্রতিশ্রুত মুক্তির প্রতীক! মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসার প্রতীক। এই জগতে মানুষের ত্রাণকর্তা রূপে যিশু খ্রিস্টের আগমনের বাস্তব নিদর্শন! এই তারা জগত সৃষ্টির পর, আকাশে কখনও দেখা যায়নি এবং ভবিষ্যতে কখনও দেখা যাবে না! মানুষের ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিস্টের জন্মলগ্নেই মানুষ অবাক হয়ে, আকাশে দেখেছে এই তারা! এই তারা নতুন যুগের প্রতীক হিসেবে, মানুষের সামনে উপস্থিত হয়েছে! এই আশ্চর্য তারা দর্শন করেই মানুষ, ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তা যিশুখ্রিস্টের আগমনের সাক্ষী হয়েছে! এই তারার উজ্জ্বল প্রভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, সকল মানুষের অন্তরাত্মা; মানবীয় সত্তা।

শান্তিরাজ যিশুখ্রিস্ট তিনি এই বড়দিনে, নতুন আবেশে জন্ম নিচ্ছেন মানুষের মাঝে। তাঁর এই জন্মের মর্মবাণী অনুধ্যান করে, মানুষ আমরা সবাই নবীকৃত হয়ে উঠবো! আমরা মানুষ, এই জগতে স্বর্গীয় শান্তি প্রতিষ্ঠায় সকলেই উদ্যোগী হয়ে উঠবো। নিশ্চয়, আমাদের মাঝে শান্তিরাজ যিশুখ্রিস্ট তাঁর দাতব্য শান্তির নববারতা নিয়ে, নতুন আবহে জন্ম নিচ্ছেন বিশ্বমানব সকলের মাঝে! তাই সকলেই ঐকতানে গেয়ে উঠেছে এবার, 'আজ এল সেই বড়দিন! প্রাণে তাই বাজে বীণ! রঙিন স্বপ্ন ওঠে জাগিয়া! ছন্দে ছন্দে ওঠে মাতিয়া!' সকলের সাথে আমাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হোক একই সুরলহরী। সমন্বিত তাল-ছন্দে মেতে উঠি আমরা সকলেই!

এই বড়দিনে, নবোদিত সূর্যের সোনালী আলোয় পরিস্নাত হয়ে আমরা, একযোগে একে অন্যকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠি, 'শুভ বড়দিন!'

পাহাড়ি ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের বড়দিন উদ্‌যাপন

জ্যাষ্টিন গোমেজ

বাংলাদেশের পার্বত্য জেলা বান্দরবান, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়িতে ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের বড়দিন উদযাপন শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়; এটি তাদের সংস্কৃতি, শিক্ষা, আচার এবং সামাজিক একতার এক অনন্য উদাহরণ। বছরের এই সময়ে গ্রামগুলো জীবন্ত হয়ে ওঠে সংগীত, নাচ, প্রার্থনা, পিঠা, মিলন-ভোজ এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্যের মাধ্যমে।

ত্রিপুরা সমাজে বড়দিন উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি শুরু হয় প্রায় এক মাস আগে। গ্রামের যুবক-যুবতী, প্রবীণ, মুরব্বি এবং পরিবারের সবাই মিলে কমিটি গঠন করে। এই কমিটিগুলি মূলত তিনটি: সাংস্কৃতিক কমিটি, উপাসনা কমিটি এবং সামাজিক কমিটি। সাংস্কৃতিক কমিটি নাটক, নাচ এবং গানের অনুষ্ঠান আয়োজন করে। উপাসনা কমিটি গির্জা সাজানো এবং প্রার্থনা পরিচালনার দায়িত্বে থাকে। আর সামাজিক কমিটি গ্রামের প্রতিটি পরিবার থেকে তহবিল সংগ্রহ এবং শুকর কেনা, খাওয়ার ব্যবস্থা প্রভৃতি কাজ করে।

একজন সহকারী প্রাথমিক শিক্ষক, জনিরাম ত্রিপুরা বলেন, "বড়দিন আমাদের জন্য কেবল উৎসব নয়; এটি সামাজিক একতার প্রতীক। গ্রামের দরিদ্র পরিবার থেকে ধনী, সবারই অংশগ্রহণ থাকে। আমরা একসাথে কীর্তন করি, গান গাই, প্রার্থনা করি এবং প্রীতি ভোজের আয়োজন করি। ছোটদের সঙ্গে বড়রাও মেলামেশা করে, যা আমাদের সমাজে মিলনের মানসিকতা তৈরি করে।"

তাদের গ্রামের বড়দিন উদ্‌যাপনের ধারায় দেখা যায় এক বিশেষ মিলন। ২৪ ডিসেম্বর রাতে সকলেই কীর্তনে বের হয়। ছেলে-মেয়েরা ঘরে ঘরে গান গায়, প্রার্থনা করে এবং পাহাড়ি মদ বা সামর্থ্য অনুযায়ী অনুদান সংগ্রহ করে। ফাদারদের আগমনের সময় গ্রামের প্রতিটি পরিবার তাদের বরণ করে পা ধুয়ে দেয়া, ফুলের মালা পরানো এবং স্বাগত জানায়।

একজন গৃহিনী, বিনীতা ত্রিপুরা বলেন, "বড়দিনে আমরা পিঠা বানাই, বাঁশে পিঠা, কলা-পিঠা, ভাজার পিঠা। পরিবারের সবাই একসাথে অংশগ্রহণ করে। যারা সামর্থ্যবান, তারা দরিদ্রদের জন্য খাবার ভাগাভাগি করে। শিশুদের নতুন জামা-গাউন পরানো, ঘর সাজানো, ফুলের মালা তৈরি, সবই আমাদের আনন্দ বাড়ায়। বড়দিনের আনন্দ শুধু খাওয়া-দাওয়ায় সীমাবদ্ধ নয়; এটি সামাজিক বন্ধন, আচার ও পারিবারিক ঐক্যের প্রকাশ।"

ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের বড়দিন উদ্‌যাপনে আর্থিক ও সামাজিক সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৮০ বছর বয়সী প্রবীণ, বিকাশ ত্রিপুরা বলেন, "ধনী-গরিব সবাই মিলে শুকর জবাই

করি এবং প্রীতি ভোজ করি। কোনো ঝগড়া হয় না; আমরা একসাথে আনন্দ করি। বড়দিন শুধু উৎসব নয়; এটি মুক্তিদাতা যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন। আমরা ছোটবেলা থেকে বড়দিন উদ্‌যাপন করি, তাই এটি আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।"

খাগড়াছড়িতে কর্মরত কাথলিক ধর্মযাজক, ফাদার জয় জানান, "ত্রিপুরা সমাজে বড়দিন কেবল ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়; এটি সামাজিক মিলনমেলারও প্রতীক। হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান সবাই একসাথে অংশগ্রহণ করে। আমরা গ্রামের মানুষদের জন্য প্রার্থনা ও মিশনারী কার্যক্রম পরিচালনা করি। তবে ভাষাগত সীমাবদ্ধতা এখনও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। অনেক গ্রামে বাংলা ভাষা পুরোপুরি বোঝা যায় না। তাই স্থানীয় ভাষায় ধর্মশিক্ষার প্রচেষ্টা চলমান।"

ত্রিপুরা সম্প্রদায়ে বড়দিন উদ্‌যাপনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো আধ্যাত্মিকতা। ফ্রান্সিস ত্রিপুরা, কাথলিক ধর্মযাজক প্রার্থী, বলেন, "ত্রিপুরা সমাজে বড়দিনে ছেলে-মেয়েরা হোস্টেল থেকে বাড়ি আসে। পরিবারের সবাই আনন্দে থাকে। বড়দিনের প্রস্তুতি নভেম্বর থেকেই শুরু হয়। সাংস্কৃতিক, উপাসনা ও সামাজিক কমিটি সবাইকে একত্র করে। বড়দিন আমাদের একতার এবং বিশ্বাসের উৎসব।"

বড়দিন উদ্‌যাপন ত্রিপুরা সমাজে শিক্ষার প্রসারেও প্রভাব ফেলেছে। জনিরাম ত্রিপুরা উল্লেখ করেন, "আমাদের সমাজে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। হোস্টেলে থাকা ছেলে-মেয়েরাও বড়দিনে বাড়িতে ফিরে আসে। একসাথে মিলিত হওয়া এই আনন্দ বড়দিনের উৎসাহকে আরও বাড়িয়ে দেয়। আমরা নতুন প্রজন্মকে সমাজের সঙ্গে যুক্ত রাখতে চেষ্টা করি, যাতে তারা আধুনিকতার সঙ্গে নিজেদের সংস্কৃতির মূল্যও ভুলে না যায়।"

ত্রিপুরা সমাজে বড়দিনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো নারী অংশগ্রহণ। বিনীতা ত্রিপুরা জানান, "আগে আমাদের মেয়েরা অনেক কাজের বাইরে থাকত, কিন্তু এখন তারা ছেলে-মেয়ের মতো প্রতিটি কাজে অংশ নেয়। রান্না-বান্না, ঘর সাজানো, পিঠা তৈরি সবই তারা করে। এভাবে মেয়েরাও সমাজের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত থাকে।"

ত্রিপুরাদের বড়দিন উদ্‌যাপনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো খাবার এবং সামাজিক

বিনিময়। ঈশিতা ত্রিপুরা বলেন, "আমরা বিনি চাল দিয়ে বিভিন্ন পিঠা বানাই। বাঁশ ব্যবহার করেও নানা রকম পিঠা তৈরি করি।

মাঝে মাঝে যুবক-যুবতীরা সম্মানের জন্য 'গানা' নামে একটি মদসদৃশ খাবার তৈরি করে বড়দের সঙ্গে ভাগাভাগি করে খায়, এটি আমাদের সংস্কৃতিরই অংশ। বড়দিনে শুকর জবাই করা ত্রিপুরাদের সবচেয়ে বড় ঐতিহ্য।"

গ্রামের প্রধান বা 'কারবারি' বিশ্বচন্দ্র ত্রিপুরা জানান, "গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে আমরা গিয়ে কীর্তন করি। যারা অনুষ্ঠান করতে চায়, তারা পাহাড়ি মদ এবং সামর্থ্য অনুযায়ী অনুদান পান। সমাজের সবাই অংশগ্রহণ করে, বড়-ছোট মিলেমিশে উৎসব পালন করে। বড়দিন আমাদের কাছে এক ধরনের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক মিলনের উৎস।"

ত্রিপুরাদের বড়দিন শুধু আধ্যাত্মিক ও সামাজিক মিলন নয়; এটি শিক্ষার প্রসার, সমাজের ঐক্য, এবং নতুন প্রজন্মের মধ্যে সংস্কৃতি ও আচার ধারণের মাধ্যমে তাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করে। পাহাড়ের এই ছোট গ্রামগুলোতে বড়দিন আসে আনন্দ, মিলন এবং নতুন বছরের আশার বার্তা নিয়ে।

খাগড়াছড়ি ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার জয় জোসেফ কুইয়া উল্লেখ করেন, "ত্রিপুরা গ্রামগুলোর আরেকটি সমস্যা হলো অর্থনৈতিক দুর্বলতা। যোগাযোগ ব্যবস্থা সীমিত, বাজার এবং আয়ের উৎস কম। পুরো বছর জুম চাষের ওপর নির্ভরশীল। তাই বড়দিনে সঞ্চিত অর্থ দিয়ে খাদ্য, কাপড় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস কেনা হয়। তবে বড়দিনই তাদের আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক জীবনকে দৃঢ় করে।"

ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের বড়দিন উদ্‌যাপনে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো প্রজন্মের সংযোগ। ছোটরা হোস্টেল থেকে ফিরে আসে, পরিবারে মিলিত হয় এবং সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে অংশ নেয়। এতে পুরনো ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবিত হয়। বিকাশ ত্রিপুরা বলেন, "আমি বিশ্বাস করি মানুষের মধ্যে দুটি জগৎ আছে, জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক। বড়দিন আমাদের এই দুই জগতের সমন্বয় শেখায়। আমরা খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাস করি এবং কাজের মাধ্যমে তা প্রমাণ করি।"

বড়দিনের সময় ত্রিপুরাদের আতিথেয়তা বিশেষভাবে চোখে পড়ে। অতিথি এলে প্রথমে হাত-পা ধুয়ে দেওয়া হয়, নতুন কাপড় বিছিয়ে বসানো হয়, ফুলের মালা দিয়ে স্বাগত জানানো হয় এবং তারপর পিঠা, নাস্তা এবং পানীয় পরিবেশন করা হয়। নারী-পুরুষ সবাই মিলে রান্না, আড্ডা ও উৎসবের আয়োজন করে। দরিদ্র পরিবারগুলোকে বড়দিনে খাদ্য, কাপড় বা শীতবস্ত্র দেওয়া হয়।

ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের বড়দিন উদ্‌যাপন একটি সামষ্টিক মিলনমেলার চিহ্ন। এটি ধর্মীয় উৎসব, সামাজিক একতা, সাংস্কৃতিক পরিচয়, এবং পারিবারিক আনন্দের এক অনন্য সমন্বয়। পাহাড়ি ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের কাছে বড়দিন মানে নতুন আশা, একতার বার্তা, এবং সমাজে বিভাজন ভুলে যাওয়ার এক সুযোগ।

বছরের ২৪, ২৫ ও ২৬ ডিসেম্বর ত্রিপুরা গ্রামগুলো জীবন্ত হয়ে ওঠে। গান-বাজনা, কীর্তন, নাটক, পিঠা, প্রীতি ভোজ, মিলন-ভোজ, আধ্যাত্মিক শিক্ষা সবই একত্রিত হয়ে একটি জোয়ার সৃষ্টি করে। এই জোয়ার না শুধু তাদের বড়দিন উদ্‌যাপনকে সমৃদ্ধ করে, বরং প্রজন্মের মধ্যে ঐতিহ্য, আচার ও সমাজবদ্ধতার শিক্ষা বহন করে।

ত্রিপুরা সমাজের বড়দিন উদ্‌যাপন আমাদের শেখায়, যে একটি সম্প্রদায় শুধু ধর্মীয় উৎসবের মধ্যেই নয়, আচার, শিক্ষা এবং সামাজিক সহযোগিতার মাধ্যমে নিজের সাংস্কৃতিক পরিচয় ধরে রাখতে পারে। পাহাড়ি এই ছোট গ্রামগুলোতে বড়দিন আসলে আনন্দের, মিলনের এবং বিশ্বাসের এক জীবন্ত উদাহরণ।

সু-খবর ! সু-খবর ! সু-খবর !

"সবারে করি আহবান, এসো উৎসুক চিত্ত, এসো আনন্দিত প্রাণ"
"নবীন প্রবীণ মিলন মেলায়, চলো ফিরে যাই ছোট বেলায়"

"তুমিলিয়া বালিকা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১২৫ বছরপূর্তি জয়ন্তী উৎসব"

তুমিলিয়া বালিকা মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১২৫ বছর পূর্তি জয়ন্তী উৎসব আগামী ৩০ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার মহাসমারোহে উদ্‌যাপন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ঐতিহ্যবাহী এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন সকল ছাত্রীদের এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিতি ও অংশগ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

এই জয়ন্তী উৎসবে অংশগ্রহণের জন্য রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ ১০০০/= (এক হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। প্রাক্তন সকল ছাত্রীদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা ও রেজিস্ট্রেশন করার জন্য অনুরোধ করছি। রেজিস্ট্রেশন-এর শেষ তারিখ আগামী ২০/০১/২০২৬ খ্রিস্টাব্দ। ম্যাগাজিনে বিজ্ঞাপন দিয়ে জুবিলী ম্যাগাজিনকে/অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ ও সাফল্যমন্ডিত করারও সুবর্ণসুযোগ রয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই এই মহান উদ্যোগে আন্তরিক সহযোগিতা পূর্বক আমাদের সাথে নিম্নোক্ত নম্বরে যোগাযোগ করবেন।

ধন্যবাদান্তে,

সিস্টার মেরী তৃষিতা, এসএমআরএ,
প্রধান শিক্ষক ও সহ-কোঅর্ডিনেটর

লাকী ফ্লোরেন্স কোড়াইয়া
সহ-আহ্বায়ক রেজিস্ট্রেশন কমিটি

ফাদার কুঞ্জন কুইয়া
আহ্বায়ক ও বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান।

জয়ন্তী উদ্‌যাপন কমিটি

জয়ন্তী উদ্‌যাপন কমিটি
মোবাইল: ০১৭১৫৪২১১৯৪

দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের ধর্মপল্লী

মোবাইল: ০১৭০৫১১৩৩১২ (বিকাশ নম্বর)
E-mail : rozarioleoni532@gmail.com

Teresa Rebeiro
Born: 31st May 1939
Died: 26th February 2025

In Loving Memory of Teresa Rebeiro Reminiscences by "Her Grandchildren"

MY SOUL GLORIFIES THE LORD AND MY SPIRIT REJOICES IN GOD MY SAVIOR, FOR HE HAS BEEN MINDFUL OF THE HUMBLE STATE OF HIS SERVANT.

LUKE 1: 46-48

The names of the children of Bablu and Teresa Rebeiro are: Tripti Gonsalves, Bobby Rebeiro and Bishaw Rebeiro.

Aloysius Brave Rebeiro
Son of Bobby Rebeiro

Good greetings to all. I am not a good speaker or good writer or reader or good with anything to do with language, but I'll try my best to talk about my grandmother Teresa Rebeiro.

Let's start with who she was as a person. If I had to use one word to describe her, I would say faithful, if I had to use two words, I would say powerfully faithful.

She was faithful and held a steadfast belief in God, especially Mother Mary about whom she would always say "Pray to Mary and she will tell Jesus to assist you." She would often host, plan or join different prayer services where she would drag me and my sisters to join. I have lost count on how many different prayer groups and services I've attended; there were

so many. Some prayers lasted for hours, and as a kid, I would be bored out of my mind. But attending all these services helped me develop patience when waiting through other long programs in life. So those long 3-hour prayer sessions not only allowed me to practice various aspects of my religion but also improved my patience. For that, I will always be grateful.

She was also devoted to her family. From caring for and loving her husband and children to doing the same for her grandchildren. She was a nurse, so she became the family doctor. If we had any health-related issues, we would consult her first instead of going to the doctor, until she explicitly told us to see a doctor or literally dragged us there herself. The remedies she gave always worked, so we essentially had a cost-free medical professional in the house, which we all completely took advantage of. She was always happy to advise us, and she would even get mad if we didn't tell her about our health issues. I have also lost count of how many times she took care of me when I was sick or asked if I was taking medicine when I had a cough. The first thing she asks whenever we talk on the phone in America is if I am okay health-wise. I will really miss her care for us.

Due to her upbringing in an orphanage and then her work with the United Nations, the Nurses Guild, and several other Catholic communities, she became a woman with not only a big heart but also a strong will. She was kind but strict in her kindness, a balance that not many people possess. It's a skill I am trying to learn from, but I have not yet been able to fully grasp it. Another thing I am grateful to her for.

Besides all the love and care, she would always listen to every single one of our family's problems. From her husband all the way down to me, we could all find someone to share our life's trials and tribulations with. I know my dad would confide in her, and she would advise him a lot. She would always remind me of her advice and follow up on the issues I was facing. It was slightly annoying, but I knew she wanted what was best for us. She was a super-duper ultra – worry wart. She would worry about anything and everything to do with us. No matter how many times we told her that everything is fine or that everyone is okay, she would keep worrying. It was comforting, however, to know how much she worried, and it would help me in trying to improve myself to make her not worry.

I am an introvert, meaning that I do not like to talk to people much, but she was an extrovert. So, our ideals clashed a bit here and there and we would discuss how she dealt with people and how I deal with people. I would always ask her to talk about her experiences in the UN, or with the nurse's guild or with any of the other Catholic communities she interacted with. It was always fun and informative to know about all the troubles, successes and failures she went through in her life and really helped shape my perspective of people and interactions with them.

One story I remember is when she was working in the United Nations as a nurse. One of her colleague nurses was jealous of her as the doctor she worked with was greatly impartial to her, due to her high skill as a nurse. So, the colleague nurse complained about her to the head office, and she was called by them in a letter to talk to them. She was panicking and anxious about her job as she was the only Bangladeshi there with no friends surrounded by European foreigners. All she could do was to talk to the doctor she was working with about this complaint. And the doctor immediately wrote her a letter and told her to give this letter to the head office members when she went to talk to them. On the day of the meeting with the head office members she went there with the letter with great anxiety. After she handed the office members the letter they asked her no questions, apologized for the trouble her colleague nurse called and sent her back. She got completely in and out of trouble only due to the fact that he was hardworking and honest and the doctor she worked with recognized her skill and hard work. She told several other fun and informative stories like these and I always enjoyed learning and listening to them. I would always ask her to tell me more every time I was with her.

She was a kind, faithful, loving and caring woman and I will miss her a lot. Thank you everyone who has come to show their respects for her in this service. I hope she finds peace and can go to heaven and is finally free from worrying for us. Thank you everyone again.

Marian S. Gonsalves
Daughter of
Tripti Gonsalves

I skipped a very important class yesterday. I could not push myself to get up from my bed to face the world. A world where we are to put on a strong face to deal with reality. A reality where we put on a facade and submit to pretentious conversations and relationships, while fighting to achieve our daily life's goals. Even though this is what many comprehend life to be, it is difficult and emotionally draining. It takes energy and a bulletproof mindset to have to deal with everyday interactions.

On Wednesday, February 26th, 2025, my beloved grandmother had passed away. As I mention this, I do not ask or need anyone's sympathy/condolences. To me they are mere words shared for recognition. I do not entirely believe that anyone can be wholeheartedly sympathetic. My Dida

(maternal grandma) was truly a warrior. She set a staunch example of what a fighter should be. Despite her passing, she has lived every day of her life being the best version of herself. Not only did she serve her life as a nurse for 30 years, but she was ideal in her role as a grandmother. It is because of the kind of person she was that keeps her spirit alive in me and everyone in the family.

It is sad that we are bound to tie ourselves to the physical world, we are bound to oblige to achieving material things to survive. We are BOUND to get caught up in worldly affairs to avoid physical suffering. And I hate that, I HATE IT. But I accept it, and I have to fight to accept it (I believe it's a process). However, when I remember death, the line between the physical world and the spiritual world suddenly appears blurry to me. I have not yet come to terms with my grandmother's passing, as they will break my heart slowly but surely. However, I must continue to fight and live on, just as she did in her life. দিদা, আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি। আমি আশা করি তুমি আমাকে ভুলো নাই।

Aloysius Brian Rebeiro
Son of Bishaw Rebeiro

There are so many things I could say about my grandmother, but to truly capture who she was is nearly impossible. She was the closest person I've ever been around—filled with love, joy, and deep empathy. She wasn't just my grandmother; she was my guide, my protector, my home.

She lived a life of remarkable service. Military hospital nurse, a Holy Family Hospital (known as Red Crescent Hospital), and a president of Bangladesh Catholic Nurses Guild—the number of lives she saved with her hands, her knowledge, and her experience is beyond counting. It's almost that in her final moments, it felt as if she was testing the very doctors, nurses, and surgeons who cared for her. She knew exactly what was wrong, how she needed to be treated, and how she would pass. While the doctors huddled in groups to discuss, she had already figured it out—her mind sharper than three of them combined.

I will forever be grateful to have had someone like her in my life, someone who took care of me whenever I was sick, hurt, or recovering. She knew everything - from A

to Z. But I don't want her knowledge to be misunderstood. A nurse's expertise isn't just about medicine, anatomy, or treatments - it's about understanding people at their deepest levels. Her knowledge of the human mind, emotions, and spirit was unmatched. Any question I asked, she had an answer. Any problem I had, she had advice. No one was undeserving of love in her eyes - she took care of everyone, showing kindness and remorse even when others might not have. Despite the barriers of language and culture, she always insisted on understanding, on guiding.

Her life was filled with obstacles she had to overcome, and every piece of knowledge she gained, she wanted to pass down to me, to all of us. She lived a successful life, not just in work or studies, but in love, in family, in faith. She never had regrets.

She understood me in ways no one else did. When I struggled with depression, anxiety, or felt lost, she was the bridge between me and the world. When my parents didn't understand, she became my liaison, my translator for emotions. And now, I find myself asking - what am I supposed to do without her? I feel regret, guilt, doubt. I regret the times I lied to her, the times I left her alone, the times I snuck out while she sat waiting for me, only to come back to her asking, "Where did you go? Did you eat anything?" From the moment I was born, she was obsessed with me - bathing me, dressing me, feeding me, loving me more than anything she could ever imagine. She traveled back and forth to Bangladesh just to be with me, sacrificing so much just to spend more time together. And now, I sit here feeling selfish, as if I kept such an incredible person all to myself when she had so much love to give to the world. She was too special. Her smile, her laugh, her beauty, her voice - everything about her was irreplaceable. The late-night conversations, the shared meals, even the arguments - they are all etched into my mind. Those moments, when it was just me and her, are memories I will cherish forever.

Everything she did was intentional, precise, and calculated—whether it was her organization, her cooking, or the way she cared for people. Even when she was weak, tired, and alone, she was obsessed with making sure I grew into a good person. I wish I could say more. I wish I could tell you everything about her, how incredible she was, how much she meant to me. But her dying wish was simple: for me to graduate, to live a good life, to be faithful and fulfilled—just like she was.

Her faith, her attention to detail, her love for symmetry in all things - those are qualities I can only hope to live up to. Last night, I dreamt about her. She was still here, talking to me. I didn't want to wake up. But when I did, I realized something—now, I have to wait every night just to go to sleep, just to see her and talk to her again. But enough sadness. She wanted this. She wanted to be with Grandpa. And yet, she waited 13 years for us to leave a lasting impact, to make sure we were okay before she left.

Today is not just a day of mourning. It's a day of celebration—of her life, her love, everything she gave to us. And with the amount of love she had, this celebration should last forever. Thank you all. Your prayers mean everything to me and my family. And I know she hears them all.

Martha Anannya Rebeiro
Elder Daughter of
Bobby Rebeiro

I will always remember the days we spent time together. From being an adolescent to the last time I was with her, all the memories we shared, to the ones that are still stuck in my mind to this day. My grandmother used to do many things for us that cannot be explained in words.

She had a unique ability to listen and give advice that always seemed to come at the right moment. One of my favorite memories of her was when she used to take us to and from school. After picking us up from school, she would take us straight to freshen up. Bathing each one of us with her own hand. After finishing our bath, she would heat up the food for us and serve it according to the youngest to the eldest. Before eating, we said our prayers and then started to eat. She was the foundation of everything we do till this day. Praying before eating and before going to sleep was her teaching, which we still observe persistently.

As she was a nurse, it felt like she had an understanding of every illness known. Sharing all kinds of experiences, providing service, and trying to execute every detail possible. One story I often reminisce about is from an afternoon when we were having lunch, and everything seemed perfectly normal.

I had overeaten that day, and without thinking, I poured my leftover food back into the pot in front of me. Suddenly, a loud voice struck like a thunderbolt. When I turned to see who it was, my grandmother was giving me the scariest look I had ever seen. I froze for a moment, realizing what I had just done. With just one scolding, she brought me back to my senses. After that happened, she said some harsh words out of anger, which put me into melancholy. I was too little to understand the deeper

meaning of it and why my grandmother had scolded me for it. It was in her teaching that she had when she was little, which enabled her to justify what was right and wrong. Now, as I grow up, these memories come flooding back to me like it was yesterday.

Though she was a stern woman, her heart was as soft as a feather. Her way of forgiving and consoling was very different. She found me standing in the veranda one day after she had berated me, as all her harsh words were inside my head. She understood I felt bad - but not as much as she did. Her hands then cupped around my cheeks, our eyes locked and she gave me a warm hug, saying she was sorry.

My grandmother was a mind reader, a nurse, a doctor, and could transform herself into many roles depending on the situation. From the veranda incident onward, I tried to acknowledge it. She taught me how to be humble, patient, caring, and supportive to others, and most importantly, how to remain close to God by reading and meditating on holy scriptures, engaging in prayer and worship, performing acts of charity and kindness, and participating in community with fellow believers. She bequeathed me her nature, good deeds, and what gave me the strength to move forward.

No words can explain how she was; she has only left traces of her memories, and her life is a never-ending story. We honor her not only with tears but with gratitude for all she gave, all she endured, and all the love she poured into our lives. She may no longer walk beside us, but she lives on in every act of kindness we do, every tradition we carry, and every memory we cherish. May her soul rest in peace and be granted eternal peace.

Teresa Borninee Rebeiro
Youngest Daughter of
Bobby Rebeiro

A Special Message from Your Youngest Grandchild Who Shares Your Name. I would be delighted to share a little about my beloved grandmother, with whom I

share a name, and who holds a special place in my heart. She was truly an amazing woman—fearless and loving. For me, she was a genuine idol, and I cherished every moment we spent together.

In her nursing profession, she served the most well-known hospitals, starting with Holy Family Hospital (known as Crescent Hospital) before the liberation war of Bangladesh in 1971, then in the Combined Military Hospital (CMH), and afterwards the sister nurses and doctors told her to join the Holy Family to serve the wounded freedom fighters as there was a lack of nurses and she resigned from CMH at that time. After the victory of Bangladesh, she retired from the United Nations Clinic in Bangladesh, where she had served for 21 years before ending her nursing career. Whenever my siblings and I had a wound or a cold, she was the first person we would turn to for advice. She was the heart and soul of our family, and I could always talk to her about anything. I have such fond memories of how she helped us with our showers, dressed us nicely, fed us healthy food, and gathered us together for family prayers. Some of my favorite moments were when she shared her stories with us—times that flew by, leaving us with a deep sense of warmth and connection. Whenever she would call from America, she always checked in on our health and studies. She even taught me religious songs, and now I lead the Church choir! If there was a song I did not know, I would just call her to learn it.

I also fondly remember that she enjoyed sewing. Whenever she could find the time, she would sew, providing our family with a wonderful collection of blankets, sweaters, and mufflers that we still cherish and wear. They remind us that she is always with us in spirit. From her, my sister and I learned how to sew and to do wool work. She was such a kind person that whenever my sister and I felt bored at home, she would take us out to visit places, have some street food together, and enjoy. I can still vividly recall the last time I spoke with her. She was admitted in the hospital in America, and while it was night there, it was morning here in Bangladesh. My dad wanted us to say hello, but she was in and out of consciousness and couldn't respond. My sister, mom, and I called her name several times, and it broke our hearts not to hear her reply. Our eyes were filled with tears. Eventually, we had to hang up because it was time for class. Around 12:05 p.m., my dad called, but I missed it while I was in class. Seeing his message gave me a sinking feeling - I somehow knew something was wrong. My grandmother passed away. In that moment, I was left speechless, and when I called him back, we both ended up sharing our tears. Losing her was incredibly tough because she played so many important roles in my life. I will always carry her love and strength with me.

She was such a lovely lady! Just as we need a strong connection for Wi-Fi to work, she had a unique way of connecting with everyone around her. She was

exceptional and truly irreplaceable. Words can hardly express the depth of her love for us and the unwavering support she gave to everyone in our family. I hope she finds peace in heaven, where God has welcomed her with open arms for the incredible person she was throughout her life.

This picture beautifully shows a cherished moment of a grandmother with her grandchildren in America, the last picture with her highlighting the warmth of family connections

St. Margaret's RESIDENCES

- 1250 SQ.FT. APARTMENTS
- LOCATION : 66 NOIPARA, MAIJGAON, VADUN, PUBAIL, GAZIPUR
- ON MIRER BAZAR EXPRESSWAY VIA 300 FEET
- NEAR CHURCH, SCHOOLS, MARKETS, HOSPITALS ETC.
- 45 MINUTES FROM DHAKA CITY
- OCCUPANCY FROM WINTER 2027

CONTACT US

Ranjit Perera +880 191 3526307
National Investment Co-Operative Ltd.
Genetic Plaza, Level -3,
House # 16, Road # 16 (Old 27),
Dhanmondi, Dhaka - 1209

**বড়দিনের আলোর রোশনাই আপনার জীবনকে আলোকিত করুক
এবং বিশ্বে শান্তি এবং সুখ আনুক।
গ্রেসী এয়ার ট্রাভেলস লিঃ এবং গ্রেসী স্টাডি অ্যাব্রড-এর পক্ষ থেকে
সবাইকে জানাই বড়দিন ও ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা।**

Merry X'mas

GRACY AIR TRAVELS LTD.

ATAB IATA

এয়ার টিকেটিং ॥ ভিসা প্রসেসিং ॥ ট্যুর প্যাকেজ

ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও শেনজেনভুক্ত দেশসমূহের ভিসা প্রসেসিং আমরা দক্ষতা, দ্রুততা ও সর্বোচ্চ যত্নের সাথে সম্পন্ন করি। ভিসা প্রসেসিং-এর উপর বিশেষ প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ টিমের মাধ্যমে আপনার ডকুমেন্টেশন, অ্যাপয়েন্টমেন্ট ও ভিসা গাইডলাইন নিশ্চিতভাবে পরিচালনা করে থাকি। নির্ভরযোগ্য পরামর্শ ও সফল ভিসা পাওয়ার সহজ সমাধান দিতে আমরা সর্বদা প্রস্তুত।
এছাড়া, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সব রুটে দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য এয়ার টিকেটিং সেবা প্রদানই আমাদের প্রতিশ্রুতি। আপনার ভ্রমণকে ঝামেলামুক্ত ও সহজ করতে আমরা আছি সর্বদা আপনার পাশে।

ভিসা ফি ও সার্ভিস চার্জঃ

গন্তব্য	ভিসা ফি ও সার্ভিস চার্জ (জনপ্রতি)	শুধুমাত্র সার্ভিস চার্জ (জনপ্রতি)
থাইল্যান্ড	৬০০০/-	—
সিঙ্গাপুর	৫৮০০/-	—
মালয়েশিয়া	৪৫০০/-	—
ফিলিপাইন	৮০০০/-	—
চায়না	ফাইলের উপর নির্ভর করবে	—
জাপান	—	২০০০/-
দঃ কোরিয়া	—	২০০০/-
ইন্দোনেশিয়া	—	২০০০/-

গন্তব্য	ভিসা ফি ও সার্ভিস চার্জ (জনপ্রতি)	শুধুমাত্র সার্ভিস চার্জ (জনপ্রতি)
যুক্তরাষ্ট্র	—	৬০০০/-
কানাডা	—	৬০০০/-
অস্ট্রেলিয়া	—	৬০০০/-
নিউজিল্যান্ড	—	৬০০০/-
যুক্তরাজ্য	—	৫০০০/-
ফ্রান্স	—	৫০০০/-
ইতালি	—	৫০০০/-
অন্যান্য শেনজেন দেশসমূহ	—	৫০০০/-

AUTHORIZED AGENT OF-

Biman NOVOAIR AIRASTRA AirAsia AirArabia flydubai SalamAir Jazeera IndiGo FitsAir

GRACY Study Abroad

বিদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেতে গ্রেসী স্টাডি অ্যাব্রড আপনাকে দিবে সঠিক দিকনির্দেশনা, বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন সহায়তা এবং দ্রুত ভিসা প্রসেসিং। আমাদের অভিজ্ঞ পরামর্শকদের দক্ষ সেবা আপনার স্বপ্ন পুরণের পথে আনবে নিশ্চয়তা ও আত্মবিশ্বাস।

Holding#Kha-11(3rd floor), Shahjadpur, Gulshan, Dhaka-1212.
01637666000; 01708455246; 01708455240; 01708455243
gracyairtravels@gmail.com travelwithgracy

বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীতে যারা অক্লান্ত সাধনা করে শিক্ষাক্ষেত্রে গোড়াপত্তন করে গেছেন এবং প্রৈরিতিক কাজে নিজেদেরকে বিলিয়ে দিয়ে রেখে গেছেন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা আজ তাঁদের প্রায় ভুলতে বসেছি। আজ, তাঁদের আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি; যাদের সাথে সৌভাগ্যক্রমে আমি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছিলাম এবং যাদের কাছে আমি চিরঋণী।

সকল আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবের প্রতি রইলো আমার এবং পরিবারের পক্ষ থেকে বড়দিন এবং নববর্ষের শুভেচ্ছা

শুভেচ্ছান্তে

ড. অগাস্টিন ক্রুজ ও পরিবারবর্গ

প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সেন্ট জুডস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ঢাকা

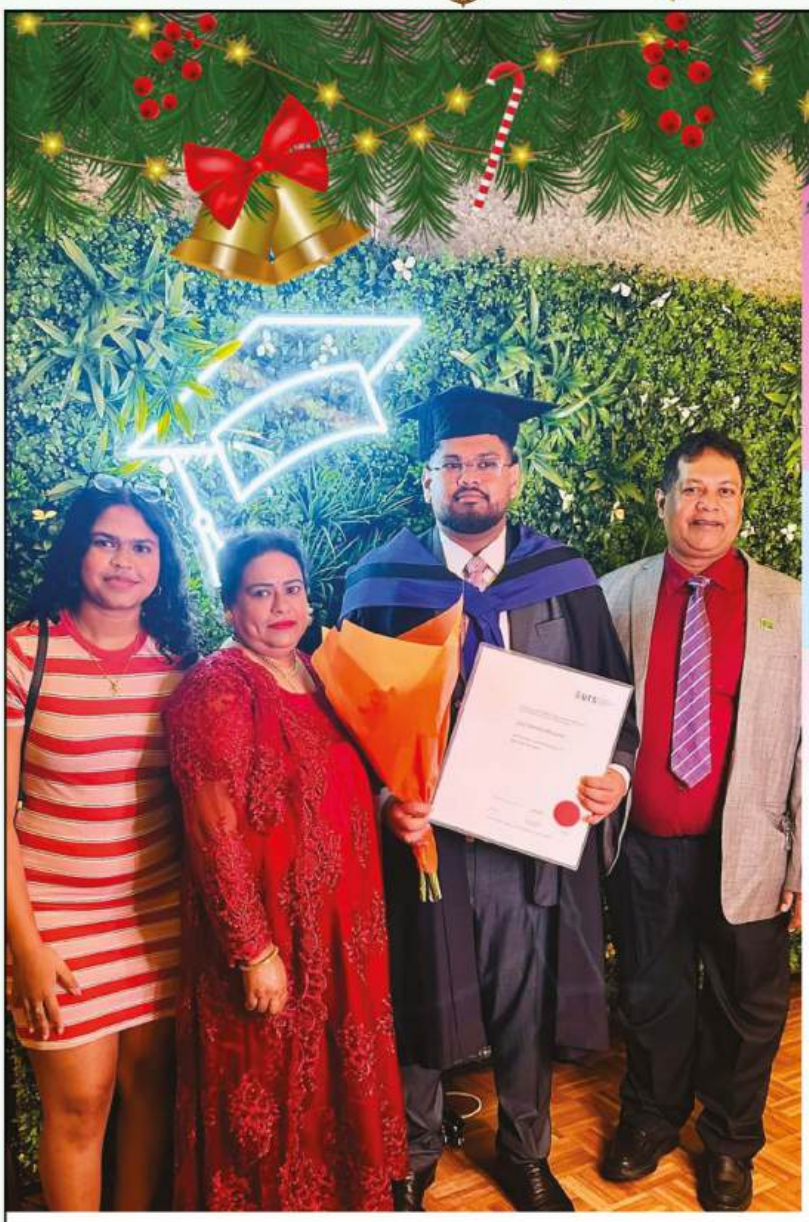

কৃতিত্ব

আমাদের একমাত্র জ্যৈষ্ঠ পুত্র **"জয় ক্লেমেন্ট রোজারিও"** **Bachelor of Business Law (LLB)** অর্জন করেছে। আমরা ঈশ্বরকে অনেক স্তুতি ও ধন্যবাদ জানাই। সকলের কাছে "জয়" প্রার্থনা ও আশীর্বাদ প্রার্থী।

এসো বিশ্বের যত দেশ, যত জাতি, গাও উল্লাসে প্রভুর নামে স্তবগীতি। শুভ বড়দিনের কীর্তন ও গাও জয়গান, তারে সাথে হৃদয়-মাঝে ভরে উঠুক জগতের সকল মানব-জাতির ভালবাসা ও শান্তির কলতান। এই আমাদের প্রার্থনা বিশ্ববাসী ও সকল পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি রইল বড়দিন ও নববর্ষ ২০২৬-এর প্রীতি-শুভেচ্ছা।

শুভাকাঙ্ক্ষীতে

Mintu & Parven

Joy & Joyee

Sydney-Australia

দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে মঙ্গলালোক
তবে তাই হোক .....

প্রয়াত ইমেল্ডা গমেজ
জন্ম: ১ মার্চ, ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৪ জানুয়ারি, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত সিস্টার মেরীয়ান তেরেজা গমেজ সিএসসি
জন্ম: ২৭ নভেম্বর, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৫ জুন, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

শ্রদ্ধেয়া মা ও দিদি,

মৃত্যু এমন একটি স্পর্শ কাতর বিষয় যা আমাদের শোকাভিভূত করে। পক্ষান্তরে সেই মৃত্যুই আবার স্বর্গের মঙ্গলালোকে নিয়ে যায়, দান করে অনন্ত সুখ-শান্তি। তোমরাও চলে গেছ, সেই আলোকে অবগাহন করছ, তা আমরা বিশ্বাস করি। তোমরা আমাদের আশীর্বাদ কর, যেন আমাদের সন্তানেরা তোমাদের আদর্শে বেড়ে উঠে।

এবার বড়দিন সবার জন্য বয়ে আনুক আনন্দ আর শান্তি। সবাইকে জানাই বড়দিনের শুভেচ্ছা।

তোমাদের স্নেহধন্য
ডা. লরেন্স গমেজ ও সুজান গমেজ
এবং
পরিবারবর্গ
পদ্রিকান্দা প্রামানিক বাড়ি।

আসন্ন বড়দিন ও ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পাঠক-পাঠিকাসহ
সকলকে জানাই
আন্তরিক প্রীতিও শুভেচ্ছা।

- কারিতাস অর্থ "দয়ার কাজ" বা "সর্বজনীন ভালোবাসা"।
- কাথলিক মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার আলোকে কারিতাস বাংলাদেশ এমন একটি সমাজ বিনির্মানের স্বপ্ন লালন করে, যে সমাজ মুক্তি ও ন্যায্যতা, শান্তি ও ক্ষমাশীলতার মূল্যবোধসমূহকে ধারণ করে এবং সবাই মিলে পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্মানের সাথে মিলন সমাজে বসবাস করে।
- কারিতাস বাংলাদেশ মানুষের সহযোগী হতে চায়; বিশেষতঃ সেইসব মানুষের-যারা সমাজে গরীব ও প্রান্তিক জীবনাবস্থায় আছে। সবার প্রতি সম-মর্যাদার দ্বারা কারিতাস এমন একটি সমন্বিত উন্নয়ন অর্জন করতে প্রয়াসী যার লক্ষ্য হলো: মানব-মর্যাদা নিয়ে মানুষ সত্যিকার মানুষের মতো জীবন যাপন করবে এবং অপরকে দায়িত্বশীলতার সাথে সেবা করবে।
- জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কারিতাস সকল মানুষের সাথে কাজ করে।

কারিতাস বাংলাদেশ
২ আউটার সার্কুলার রোড
শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭

Bangladesh Christian Association Europe

বাংলাদেশ খ্রিস্টান এ্যাসোসিয়েশন ইউরোপ

Executive Committee for 2024-2026

মিস সুচিত্রা তেরেজা রোজারিও
সভাপতি

মি: ভিক্টর শেখর রোজারিও
সিনিয়র সহ-সভাপতি

মি: মিল্টন কস্তা
সহ-সভাপতি

মি. রোনাল্ড রিবেরু
সহ-সভাপতি

মি.রঞ্জন কোড়াইয়া
সহ-সভাপতি

মি.বিবি যোসেফ পেরেরা
সাধারণ সম্পাদক

মিসেস জ্যাকলিন কস্তা
সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক

মিসেস নিপুন মনিকা বটলেরু
সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক

মি.কল্যান কোড়াইয়া
সাংগঠনিক সম্পাদক

মিসেস ম্যাগদালিনা গনসালভেস
সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক

মি.জুড মার্ক রোজারিও
কোষাধ্যক্ষ

মিসেস সম্পা এমিলিয়া হাওয়াদার
মহ-কোষাধ্যক্ষ

মিসেস সবিতা গ্রেগরী
সহ-কোষাধ্যক্ষ

মি: রিকি স্ট্যানলি ডি ক্রুজ
শিক্ষা ও তথ্য প্রযুক্তি সম্পাদক

মি: এলভিস কস্তা
সহ-শিক্ষা ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক

মিসেস রিমা রোজারিও
সাংস্কৃতিক সম্পাদক

মিসেস জ্যাকলিন পান্ডে
সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক

মি: লিপন রোজারিও
আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক

মি: উজ্জ্বল রোজারিও
ধর্মীয় সম্পাদক

মি: সামুয়েল এল. ডায়েস
সহ-ধর্মীয় সম্পাদক

মি: কিশোর সরেন
সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক

মি: জন সংগ্রাম গমেজ
সহ-সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক

মি: লর্ড গোমেজ
দপ্তর সম্পাদক

মি: অপূর্ব গোমেজ
সহ-দপ্তর সম্পাদক

মি: রিংকু বিশ্বাস
ক্রীড়া সম্পাদক

মি: স্ট্যানলি পালমা
সহ-ক্রীড়া সম্পাদক

মি: নিক্কন কস্তা
প্রচার সম্পাদক

মি: শশী গোমেজ
সহ-প্রচার সম্পাদক

মি: অ্যান্ডি লেনার্ড ডায়েস
নির্বাচিত সদস্য

মি: নোয়েল দ্বীপ সরকার
নির্বাচিত সদস্য

মি: লিটন গাইন
নির্বাচিত সদস্য

মিসেস হেনরী ডি'কস্তা
উপদেষ্টা

মি: অজিত রোজারিও
উপদেষ্টা

মি: এডওয়ার্ড গমেজ
উপদেষ্টা

মি: ব্রাইন ডিয়াম
উপদেষ্টা

মি: শ্যামল প্রধান
উপদেষ্টা

মি. শংকর ভাস্কর পালমা
নির্বাচিত সদস্য

মি. আলেক্স রোজারিও
উপদেষ্টা

মি. জীবন পিরিচ
উপদেষ্টা

মি. লরেন্স পিউরিফিকেশন
উপদেষ্টা

মি. মিকি ডায়েস
উপদেষ্টা

মি. পিটু বৈরাগী
উপদেষ্টা

মি. লিও এস. গমেজ
উপদেষ্টা

www.bcae.eu

দেশ-বিদেশের সকল খ্রিস্টভক্তসহ ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সবাইকে
জানাই শুভ বড়দিন ও নববর্ষের শুভেচ্ছা।
মুক্তিদাতা খ্রিস্টের আগমনে বয়ে আনুক অনাবিল সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তিময় বিশ্ব।

+8801701010141 নীড় 22/1, Block-A, Demorpara, Pubail, Gazipur

হাউজিং সোসাইটির সদস্যদের কল্যাণে দৃশ্যমান আয়বর্ধকমূলক প্রকল্প

সুবিধা সমূহ

f https://www.facebook.com/NeerResort info@neerresort.com https://neerresort.com/

রিসোর্টে আবাসিক সুবিধার পাশাপাশি দুইটি সুপ্রশস্ত ডাইনিং হল, তিনটি সম্মেলন কক্ষ, বিস্তৃত কিচেন, দুইটি সুইমিংপুল, জ্যাকুজি, জিম, শিশুদের জন্য প্লে-গ্রাউণ্ড ও বিভিন্ন রাউডস, তিনটি খেলার মাঠ, বাস্কেটবল-ব্যাডমিন্টন-টেনিস কোর্ট, বৃহৎ কার পার্কিং,কনসার্ট স্টেইজসহ অন্যান্য সকল সুবিধা বিদ্যমান।

হাউজিং সোসাইটির 'নীড় রিসোর্ট এন্ড রেস্টুরেন্ট' ও
'শান্তির নীড় গেস্ট হাউজ'-এ
অবকাশ যাপন, পারিবারিক অনুষ্ঠান,
সভা-সেমিনার, পিকনিক করার জন্য বুকিং করুন।

শান্তির নীড়
+8801701010191
info@shantirneer.com
www.shantirneer.com

সুবিধা সমূহ

চার ক্যাটাগরির রুমের ব্যবস্থা, ডাইনিং এর সুব্যবস্থা, সুসজ্জিত কনফারেন্স হল, সুইমিং পুল ও জ্যাকুজি, উন্মুক্ত খেলার মাঠ, গাড়ী পার্কিং এর ব্যবস্থা, সামাজিক অনুষ্ঠান ও পিকনিকের সুব্যবস্থা, সারাদিনের জন্য ভাড়া নেয়া যাবে, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা, সার্বক্ষণিক, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ফ্রি ওয়াইফাই সুবিধা।

ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্র ফার্মগেট সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে পড়াশোনা ও থাকার জন্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান "নীড় ছাত্রী হোস্টেল"।

নীড়
থীমপার্ক এন্ড রেস্টুরেন্ট

সুবিধা সমূহ

ওয়েস্টার্ন এক্সপ্রেস ট্রেন, হানি সুইং, টুইস্ট, পাইরেট শিপ, মেরী গো রাউন্ড, প্যারাট্রোপার, সোয়ান এডভেঞ্চার, ওয়ান্ডার হুইল, প্যাডেল বোর্ড, হর্স কিডি রাইড, মেরী গো রাউন্ড-০২, বিগ আইস ফিস হেলিকপ্টার, স্মাইল কিডি রাইড, সফ্ট প্লে এরিয়া, ট্রেম্পলিন, এলিফেন্ট কেডি রাইড, ডরিমন কেডি রাইড, প্লেন কিডি রাইড, টয়ট্রেন কিডি রাইড, মিকি ট্রেইন।

বিনিয়োগ সমৃদ্ধির প্রথম পদক্ষেপ, স্বাবলম্বী হোন, অধিক মুনাফা অর্জন করুন!!!

নীড়
প্লট ও ফ্ল্যাট প্রজেক্ট

সোসাইটির ফ্ল্যাট প্রকল্প সমূহ:

কাফরুল-নীড় ১০, নীড় ১৩, পাগাড়-নীড় ১৪,
দক্ষিণখান-নীড় ১৫, পাগাড়-নীড় ১৬,
রাজাবাজার-নীড় ১৭, পাগাড়-নীড় ১৮, হাসনাবাদ-নীড় ২০,
রাজাবাজার-নীড় ৩০, উত্তরা-নীড় ৩৭, নন্দা-নীড় ৪৪,
রাজাবাজার-নীড় ২০৬, মিরপুর-নীড় ৩৭, উত্তরা-নীড় ৮৬,
মনিপুরীপাড়া-নীড় ৯৬, নন্দা-নীড় ১০০, ধানমন্ডি-নীড় ১০১,
মনিপুরীপাড়া-নীড় ১০৮, রাজাবাজার-নীড় ১১৬,
ভাটারা-নীড় ১৪১, দক্ষিণখান-নীড় ১৫৭,
রাজাবাজার-নীড় ১৭৯,ভাটারা-নীড় ১৯১

হাউজিং সোসাইটির একটি প্লট বা ফ্ল্যাট এককালীন মূল্য পরিশোধে বা সহজ কিস্তিতে বুকিং দিয়ে একজন গর্বিত মালিক হোন।

সোসাইটির প্লট প্রকল্প সমূহ:

পাগাড় প্রকল্প-১৪, সাভার প্রকল্প-০১, সাভার প্রকল্প-০২, মাউসাইদ প্রকল্প-০১, মঠবাড়ী প্রকল্প-০১ ব্লক-এ, ব্লক-বি, ব্লক-সি, ব্লক-ডি, ব্লক-ই, ব্লক-ই, ব্লক-এফ, ভাদুন প্রকল্প-০১, তুমিলিয়া প্রকল্প-০১, গুলপুর প্রকল্প, পূবাইল প্রকল্প-০১

HOTLINE
01623222555

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

প্রতাপ আগস্টিন গমেজ
চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা কমিটি

পেপিলন হেনরি পিউরীফিকেশন
সেক্রেটারি, ব্যবস্থাপনা কমিটি

দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ
THE METROPOLITAN CHRISTIAN CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.
আর্চবিশপ মাইকেল ভবন, ১১৬/১, মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ +৮৮ ০২ ৫৫০২৭৬৯১-৯৪ info@mcchsl.org www.mcchsl.org

খোলা জানালা

বাংলাদেশে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ইতিহাস ও ভূমিকা

প্রদীপ পিটার গমেজ

বাংলাদেশে খ্রিস্টান ঐতিহ্যকে যদি ৪০০ বছরে ধরতে চাই, তাহলে আমরা দেখা পেতে পারি–একটি বহুমাত্রিক ইতিহাস: বণিক ও মিশনারী আগমন, উপনিবেশিক সংগ্রাম ও সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ, ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিসেবে সামাজিক পরিষেবা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান, এবং স্বাধীনতার পরে নাগরিক জীবনে প্রতিপত্তি ও চ্যালেঞ্জ।

১) প্রথম আগমন: বণিক ও যাজক (১৬শ – ১৭শ শতাব্দী)

বাংলার আপাতত প্রাচীনতম খ্রিস্টান উপস্থিতি এসেছে পর্তুগিজ বানিজ্য এবং যাজক দলের মাধ্যমে – হুগলি, চট্টগ্রাম ও সমুদ্রবাণিজ্যের কেন্দ্রগুলোতে তারা বসতি গড়েছিল এবং প্রাথমিক মিশনারী কাজ চালায়। এই পর্যায়ে ধর্মীয় প্রচারণার সাথে বাণিজ্য ও হাসপাতাল/বিদ্যালয় স্থাপনের কাজও ছিল মিশে থাকা একটি কৌশল। সেই প্রাথমিক সময় থেকে খ্রিস্টান উপস্থিতি আঞ্চলিক সামাজিক সেবার বীজ বপন করেছিল।

২) কোটিপক্ষীয় মিশনারী আন্দোলন ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগ (১৮০০-১৯০০)

১৮-১৯শ শতকের এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হল ব্রিটিশ প্রটেস্ট্যান্ট মিশনারীদের সংগঠিত আগমন– Baptist, CMS, LMS ইত্যাদি সংস্থাগুলো। তারা শুধু ধর্ম প্রচারই করেনি; একই সঙ্গে বাংলা ভাষার অনুবাদ (উদাহরণ–বই ও বাইবেল অনুবাদ), শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আনাচে-কানাচে স্কুল স্থাপন এবং চিকিৎসা সেবা চালু করেছিল। ফলত গ্রামীণ ও উপজাতি অঞ্চলে অনেক মানুষ ধর্মান্তরিত হওয়া অথবা খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের অধীনে সামাজিকভাবে সুরক্ষা ও নতুন সামাজিক কাঠামো খুঁজে পায়।

৩) শিক্ষা ও স্বাস্থ্য: দীর্ঘমেয়াদী অবকাঠামোগত অবদান

খ্রিস্টান সংস্থাগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ করেছে– বিদ্যালয়, কলেজ, খ্রিস্টান হাসপাতাল, অন্যদের মাধ্যমে সমাজে সেবা পৌঁছে দিয়েছে। স্বাধীনতার পরও বিশেষত ১৯৬০-১৯৮০ দশকে এই প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্যোগ সহায়তা, ক্ষুধা ত্রাণ ও মৌলিক স্বাস্থ্যসেবায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। ফলে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রকৃত সামাজিক প্রভাব শুধুমাত্র সংখ্যার ভিত্তিতে বিবেচ্য নয়; তাদের প্রতিষ্ঠানগত অবদান দেশের জনকল্যাণে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রেখে এসেছে। খ্রিস্টান মিশনারীরা বাংলাদেশে প্রায় ৫০টির বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ২৫টির বেশি চার্চ এবং ১৫টির বেশি হাসপাতাল স্থাপন করেছে।

চার্চ, স্কুল ও হাসপাতালের একটি সংক্ষিপ্ত টেবিল দেওয়া হলো –

বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষ উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ

ক্র.নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	ধরণ	প্রতিষ্ঠা সাল	অবস্থান (জেলা/শহর)	প্রতিষ্ঠাতা/সংগঠন	বর্তমান অবস্থা ও প্রভাব
০১	নটর ডেম কলেজ	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১৯৪৯	ঢাকা	হলি ক্রস সোসাইটি	(Holy Cross Fathers)
০২	সেন্ট গ্রেগরী'স হাই স্কুল	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১৮৮২	ঢাকা	কংগ্রিগেশন অব দ্য হলি ক্রস	বহু নামকরা শিক্ষার্থী গড়ে তুলেছে
০৩	সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স চার্চ	চার্চ	১৬০০-এর দশক	চট্টগ্রাম	পর্তুগিজ মিশনারি	প্রথম দিকের চার্চগুলোর একটি
০৪.	সেন্ট প্লাসিড হাই স্কুল	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১৮৫৩	চট্টগ্রাম	ব্রাদারস অব হোলি ক্রস	আধুনিক শিক্ষার প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা
০৫.	সেন্ট যোসেফ হাই স্কুল	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১৯৫৪	ঢাকা	কংগ্রিগেশন অব দ্য হলি ক্রস	মানসম্মত ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা প্রদান
০৬.	হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	হাসপাতাল	১৯৫৩	ঢাকা	সিস্টার্স অব চ্যারিটি	সিস্টার্স অব চ্যারিটি
০৭.	সেন্ট মেরিস্ ক্যাথেড্রাল	চার্চ	১৮৯৭	রামনা, ঢাকা	রোমান কাথলিক আর্চডায়োসিস	জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কেন্দ্র
০৮.	কারিতাস বাংলাদেশ	সমাজ উন্নয়ন সংস্থা	১৯৬৭	ঢাকা (জাতীয় সদর)	বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মেলন	সারা দেশে দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করছে
০৯.	মিশন হসপিটাল	হাসপাতাল	১৮৬০	দিনাজপুর	রোমান কাথলিক মিশন	উত্তরাঞ্চলের প্রাচীন হাসপাতাল
১০.	লরেটো কনভেন্ট স্কুল	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১৮৪৫	কলকাতা	(তৎকালীন বাংলা,প্রভাব বাংলাদেশে)	লরেটো সিস্টার্স আধুনিক নারী শিক্ষার পথিকৃৎ
১১.	লালগোলা মিশন	চার্চ ও স্কুল কমপ্লেক্স	১৭৮০	রাজশাহী অঞ্চল	পর্তুগিজ পাদ্রি	স্থানীয় সমাজে শিক্ষা-ধর্ম প্রচার
১২.	সেন্ট পল'স চার্চ	চার্চ	১৮৪০	খুলনা	ইংলিশ মিশনারি	দক্ষিণাঞ্চলে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে ভূমিকা
১৩.	সেন্ট ফিলিপস্ হাই স্কুল	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১৯৩৮	দিনাজপুর	কাথলিক ডায়োসিস	স্থানীয় মানসম্পন্ন স্কুলগুলোর একটি
১৪.	সেন্ট লুক'স ক্লিনিক	হাসপাতাল	১৯২৫	বরিশাল	মেডিক্যাল মিশন সিস্টার্স	দরিদ্রদের জন্য

৪) ১৯৭১: মুক্তিযুদ্ধ ও খ্রিস্টান সমাজের অংশগ্রহণ: খ্রিস্টান ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠান মোটামুটি সীমিত সংখ্যায় সরাসরি অস্ত্রধারী মুক্তিযোদ্ধা হতে পারে, তবুও তারা ত্রাণ, আশ্রয়, চিকিৎসা ও আন্তর্জাতিক লবিংয়ের মাধ্যমে স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করেছে। অনেক সংখ্যালঘু খ্রিস্টান পরিবার ও মিশনারী কর্মী ১৯৭১-এর মানবিক সংকটে তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদান করে মর্যাদাসম্পন্ন অবদান রেখেছিল। অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে সরাসরি লড়াই সহ সাপোর্ট সিস্টেমে তাদের ভূমিকা লক্ষণীয়।

৫) জনগোষ্ঠী, ভূগোল ও সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান: ২০২২ খ্রিস্টাব্দে আদমশুমারি অনুযায়ী (প্রাথমিক রিপোর্ট ও সাম্প্রতিক গণনা সূত্রে) বাংলাদেশের খ্রিস্টান জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার খুব ছোট অংশ – প্রায় ০.৩-০.৪%। এই গোষ্ঠী মূলত কনিষ্ঠ হারবাহিত উপজাতি অঞ্চল–চট্টগ্রাম হিল ট্র্যাক্টস, কিছু জেলা ও শহরে কেন্দ্রভিত্তিক। অর্থাৎ সংখ্যায় অল্প হলেও সাংগঠনিক ও প্রতিষ্ঠানগত উপস্থিতি এখনও দৃশ্যমান।

৬) বিশ্লেষণ: সফলতা, সীমাবদ্ধতা ও বিতর্ক

সফলতা: দীর্ঘস্থায়ী প্রতিষ্ঠানগত অবদান: স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল–এই নেটওয়ার্ক দেশের সেবাখাতে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে এবং জনগণের জীবনে সরাসরি পরিবর্তন এনেছে।

সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ: সংখ্যাগত দুর্বলতা ও রাজনৈতিক ভঙ্গিমা: সংখ্যালঘু হওয়ায় রাজনৈতিক প্রভাব/নিরাপত্তা সীমিত কয়েকবার সাম্প্রদায়িক স্পর্শকাতর পরিস্থিতিতে তাদের ভঙ্গুর অবস্থান প্রকট হয়েছে।

৭) আধুনিক ভূমিকায় পরিবর্তন: ২০০০-এর পর থেকে বর্তমান গত দুই-তিন দশকে খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠানগুলো আরও প্রফেশনাল ধরনের এনজিও / সামাজিক উদ্যোগে জড়িয়েছে–শিক্ষা রিফর্ম, স্বাস্থ্য সচেতনতা, মানবাধিকার কাজ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ বেড়েছে।

৮) ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও নীতিগত সুপারিশ:

১. তথ্যসমৃদ্ধ গবেষণা প্রয়োজন: ইতিহাসে অনেক বাংলা-ভিত্তিক আর্কাইভ এবং স্থানীয় মৌখিক ইতিহাস অদেখা আছে। সরকারি ও বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক উৎসগুলোকে ব্যবহার করে ব্যাপক গবেষণা জরুরি।

২. সংহত নীতি ও সংলাপ: সংখ্যালঘু নিরাপত্তা, মুক্ত ধর্মাবলম্বনের নিশ্চয়তা এবং সাম্প্রতিক বিতর্ক নিয়ন্ত্রণে নীতিনির্ধারকদের সাথে চলমান সংলাপ দরকার।

৩. সেবামূলক কাজের স্বচ্ছতা: এনজিও/ধর্মীয় সংস্থাগুলোকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে তাদের কাজের স্বচ্ছতা বাড়াতে হবে যাতে স্থানীয় জনগণের আস্থায় কোনো ফাটল না পড়ে।

বাংলাদেশে খ্রিস্টান সম্প্রদায় সংখ্যায় ছোট, কিন্তু প্রতিষ্ঠানগতভাবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় তাদের অবদান দেশের সামাজিক কাঠামোকে স্পর্শ করেছে। ভবিষ্যতে যদি গবেষণা, নীতি ও স্বচ্ছতার ওপর মনোনিবেশ করা যায়, তখন খ্রিস্টান সম্প্রদায় দেশের বহুমাত্রিক উন্নয়নে আরও কার্যকরভাবে অবদান রাখতে পারবে।

STUDY ABROAD/ VISIT & WORK PERMIT VISA in EUROPE

STUDY VISA
• Degrees:
a) Language Program
b) Diploma
c) Bachelor
d) Master's & Ph.D.
Japan/ S. Korea/ UK/ Australia/ Romania
Norway/ Denmark/ Hungary/ Malta
Sweden & other Schengen countries.

WORK PERMIT VISA
Hungary/ Poland/ Romania
Lithuania & Croatia
• Job Category:
Hotel/ Restaurant/ Factory Worker
Food Delivery Men/ Drivers

VISIT VISA
USA/Canada/Australia Schengen countries Japan& India.

গ্লোবাল ভিলেজ একাডেমী
(আপনার স্বপ্ন পূরণের একান্ত সহযোগী)
ঠিকানাঃ গ্লোবাল ভিলেজ একাডেমি, বাড়ি # ১১ (৩য় তলা), রোড # ২/ই, ব্লক-জে, বারিধারা, ঢাকা-১২১২, (আমেরিকান দূতাবাসের পূর্বপাশে, বাঁশতলা বাসস্ট্যান্ডের সন্নিকটে)

আগ্রহী প্রার্থীগণ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন :
প্রয়োজনে আমরা ব্যাংকিং ও স্পন্সরশিপ সহযোগিতা দিয়ে থাকি।
আমরা একমাত্র খ্রিস্টান মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বিগত ২৩ বছর যাবৎ দক্ষতা, পেশাদারিত্ব ও সফলতার শীর্ষে অবস্থান করছি।

+8801901-519721
+8801901-519722
+8801827-945246
info@globalvillagebd.com
www.globalvillagebd.com
@globalvillageacademybd

পরিবেশ ও প্রকৃতি ধ্বংসে ধরিত্রী মাতার চোখে জল- হে মানুষ তুমি কেন দেখছো না

বিভুদান বৈরাগী

কথায় বলে, "মানব শিশুরা ৩/৪ বছর বয়সে ভাল করে কথা বলা শেখে কিন্তু মানুষ ৪০ বছরেও কোথায়, কখন, কি কথা বা কিভাবে কথা বলতে হবে তা শিখতে ৪০ বছর পার হয়ে যায়"। মানুষ তার ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও ভোগবাদ এবং স্বার্থপরতার কারণে যেভাবে পরিবেশ ও প্রকৃতির সৌন্দর্য ধ্বংস করছে তা দেখে ধরিত্রী মাতা যেন কাঁদছে, ধরিত্রী মাতার চোখে জল। মানুষ তা দেখে, শুনে, বুঝেও তা যেন উপলব্ধি করছে না। জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান অবস্থায় বিশ্বব্যাপী একটি প্রধান ইস্যু (Vital issue)। ক্রমাগত কার্বন নিঃসারণে বিশ্ব উষ্ণ হয়ে উঠছে। গলছে বরফ, অনির্ধারিত বৃষ্টিপাত, খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি এরই ফল। হে জগতপতি, তুমি সৃষ্টি করেছ প্রকৃতি, এই সুন্দর ধরিত্রী তোমারই দান-আমরা মানব জাতি করছি এর অপমান। জলবায়ু পরিবর্তনের দু'টি কারণ হলো প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট। সন্তান মায়ের গর্ভে আসার সাথে সাথে বিশ্ব প্রভু মাতৃ স্তনে সন্তানের জন্য খাদ্য (দুধ) তৈরি করে রেখেছেন। তেমনি ধরিত্রী মাতার বুকে গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, সাগর, নদী-নালা, খাল-বিল, জীব-জন্তু, পশু-পাখী, জলজ প্রাণী, ফল-মূল ও ফসল ফলিয়ে দিয়ে বিশ্ব বিধাতা করেছেন বৈচিত্র্যময় মানুষের বেঁচে থাকা ও ভোগের জন্য। "ঈশ্বর এদেন নামে এক উদ্যান প্রস্তুত করিলেন, সেই স্থানে আপনার নির্মিত মনুষ্যকে (আদম) রাখিলেন, আর সর্ব জাতীয় সুদৃশ্য ও সুখাদ্যদায়ক বৃক্ষ উৎপন্ন করিলেন" *(আদি ১:৮-৯)*। এই সুন্দর বৈচিত্র্যময় ভূ-প্রকৃতিকে আমরা মানুষেরা ধ্বংস করে অসুন্দর করছি। জন্মদাত্রী মাকে সন্তান কষ্ট দিলে মা গোপনে চোখের জল ফেলেন। তেমনি আজ ধরিত্রী মাতার চোখে জল; ধরিত্রী মাতার সম্পদ, জীববৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যকে ধ্বংস করছি; বনজ সম্পদ উজাড় করে, বন্য প্রাণী ও জীব-জন্তু হত্যা করে, নদী-খালের পানি দূষণ করে, নদী ভরাট করে স্বাভাবিক প্রবাহে বাঁধাগ্রস্ত করে, পাহাড়-পর্বত কেটে, পশু-পাখী নিধন করে প্রকৃতি ও পরিবেশের সৌন্দর্য বিলীন করছি। ধরিত্রী মাতার আর্তনাদ ও দরিদ্র মানুষগুলোর আর্তনাদ বিশ্ব বিধাতার অগোচরে নয়। জলবায়ু পরিবর্তনে পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য ও জীবন-জীবিকায় পড়ছে এর বিরূপ প্রভাব; এর জন্য কম-বেশি হলেও আমরা মানব জাতি দায়ী। কারণ আমরা মানব জাতি প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশকে ধ্বংস, পানি ও বায়ু দূষণ করছি। গ্রাম বাংলায় একটি প্রবাদ প্রচলিত ছিল,"খন্ড খন্ড মেঘ, আউলা-ঝাউলা বাতাস-লোকে বলে ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস"। ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের ফাল্গুন-চৈত্র মাসে আকাশে এক টুকরো মেঘ দেখা যায়নি। পুরো এপ্রিল মাস ছিল বাংলাদেশের ৩৫ বছরের ইতিহাসে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা।

প্রাকৃতিক সম্পদ আমরা যেমন ভোগ ও ব্যবহার করছি তেমনি এর সংরক্ষণ ও যত্ন করার দায়িত্বও আমাদের। আমাদের অতি মাত্রায় লোভ-লালসা ও লাগামহীন অফুরান চাহিদায় ঢাকা পড়েছে মমতা, নেই ধরিত্রী মাতার প্রতি যত্ন ও ভালোবাসা। আমাদের নিজেদের বসতগৃহ, ঘর-বাড়ি কত সুন্দর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সাজিয়ে পরিপাটি করে রাখি, নামী-দামী টাইলস্, আসবাবপত্র আরো কত শত উপকরণ কি দিয়ে জৌলুস ও চাক-চিক্য করে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করি। অথচ যে প্রকৃতি, পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগ ও ব্যবহার করে আমরা মানব জাতি বেঁচে থাকি। সেই ধরিত্রীকে যত্ন, সুরক্ষা ও ভালোবাসতে আপ্রাণ চেষ্টা করি না। বিশ্ব বিধাতা, পরম দয়ালু সৃষ্টিকর্তা পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ দান করে প্রকৃতিকে সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছেন এদেন উদ্যানের মত মানব জাতির জীবন-জীবিকা সুরক্ষার্থে, জীবন ধারণ করার জন্য। অথচ আমরা প্রকৃতি ও পরিবেশের সেই সৌন্দর্য কেটে-কুটে ক্ষত-বিক্ষত করছি। ধরিত্রী মাতা করছে আর্তনাদ। হৃদয়ের কর্ন দিয়ে মানুষ সে আর্তনাদ আজ যেন শুনছে না। আমরা যুদ্ধ করে মানব সৃষ্ট সম্পদ/স্থাপনা ধ্বংস করে ও পরিবেশের ক্ষতি করছি; যুদ্ধে ক্ষয়-ক্ষতি, নিহত ব্যক্তিদের স্বজনদের আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠছে। প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি যত্ন ও ভালোবাসার সংস্কৃতি গড়ে উঠলে তবেই প্রকৃতি সুরক্ষা পাবে; এর জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা ও মানুষের প্রয়োজন চেতনায়নে ও মননে পরিবর্তন আনা। প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনা; অতি মাত্রায় ভোগ-বিলাসিতা পরিহার করার মনোভাব সৃষ্টি করা। আজ বিশ্বব্যাপী এ'রূপ পরিস্থিতিতে কাথলিক মণ্ডলীর প্রধান ধর্মগুরু প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবন-জীবিকা সুরক্ষার্থে "লাউদাতো সি অ্যাকশন প্লাটফর্ম" এ সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি তাঁর এই সর্বজনীন পত্রে মৌলিক কিছু উপদান নিয়ে গভীর মনোযোগ দিতে পরামর্শ দিয়েছেন। যেমন- ভূমি বা মাটি, বায়ু, আগুন, জল ইত্যাদি যা আমাদের জীবন-যাপনের অপরিহার্য উপাদান। পত্রে আরো উল্লেখ করেছেন জগতের আর্তনাদে সাড়াদান, টেকসই সহজ-সরল জীবনধারা গ্রহণ, পরিবেশ সুরক্ষা ও সংরক্ষণ, উদ্দীপ্ত আধ্যাত্মিকতা অনুশীলন, সমাজকে সম্পৃক্তকরণ ও অংশগ্রহণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ। সেই লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীও এ'ব্যাপারে মানুষকে সচেতনায়নে বিভিন্ন পর্যায়ে সভা/সেমিনার আয়োজন করছেন।

প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য: প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে কিছু লেখার চেষ্টা করছি। আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে যেমন, নদী-নালা, খাল-বিল, সাগর, হাওড়-বাওড়, বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, খনিজ সম্পদ যা প্রকৃতগতভাবে সৃষ্ট তাই প্রাকৃতিক পরিবেশ বা প্রাকৃতিক সম্পদ। পরিবেশ দু'রকমের। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশ। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী পরম দয়ালু সৃষ্টিকর্তা মানুষের বেঁচে থাকা ও উপভোগের জন্য এগুলো সৃষ্টি করেছেন। হাট-বাজার, অফিস-আদালত, বড় বড় স্থাপনা, রাস্তা-ঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ইত্যাদি সামাজিক পরিবেশ, অর্থাৎ এ'গুলো মানুষ তৈরি করেছে। আমরা প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ পরিমণ্ডলে বসবাস করছি। পৃথিবীতে অসংখ্য জীব রয়েছে, সকল জীবের সম্মিলনেই জীববৈচিত্র্য, মানুষও এর বাইরে নয়। জীববৈচিত্র্য বলতে সব রকমের জীব অর্থাৎ উদ্ভিদ, প্রাণী ও অনুজীবের সমষ্টি এবং সম্মিলিতভাবে এদের সৃষ্ট প্রতিবেশকে বোঝানো হয়। বনে-জঙ্গলে বন্য জীব-জন্তু থাকবে, গাছে পাখি থাকবে, আকাশে পাখি উড়বে, পাখির কিমির-মিচির শব্দ শোনা যাবে, পানিতে মাছসহ জলজ প্রাণী থাকবে, বিল-বাওড়ে শাপলা-শালুক থাকবে, পুকুরে মাছ ও হাঁস থাকবে, এটাই স্বাভাবিক; এটাই প্রতিবেশ। কথায় বলে,"বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে"। ২২ মে আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ২২ মে নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত জীববৈচিত্র্য বিষয়ক কনভেনশনের দিনটিকে আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। উদ্দেশ্য বৈশ্বিক পরিমন্ডলে জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণা ও

সচেতনতা বৃদ্ধি এবং করণীয় নির্ধারণে দিবসটি গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামীণ জীবনে বিভিন্ন পেশার মানুষ ও তাদের কর্মসংস্থানের সঙ্গে জীববৈচিত্র্যের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। প্রাণ ও প্রকৃতির ভিত্তি হচ্ছে জীববৈচিত্র্য। জীববৈচিত্র্য বলতে বোঝায় উদ্ভিদ, প্রাণী ও অনুজীবসহ গোটা জীবসম্ভার, তাদের অন্তর্গত জীন ও সেগুলোর সমন্বয়ে গঠিত বাস্তুতন্ত্র। এখানে একে অন্যের পরিপূরক। সৃষ্টির শুরু থেকে প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে একে অপরের এই নির্ভরশীলতা চক্রাকারে চলছে।

জীববৈচিত্র্যের আরেকটি প্রধান ক্ষেত্র বন। ৮০% স্থল প্রজাতির প্রাণী বনে-জঙ্গলে বাস করে। ৮৩০০ প্রজাতির প্রাণীর মধ্যে ৮% বিলুপ্ত এবং ২২% বিলুপ্তির ঝুঁকিতে রয়েছে। ৭ কোটি আদিবাসীসহ প্রায় ১৬০ কোটি মানুষের জীবিকা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল। তবে গাছ থেকে প্রাপ্ত অক্সিজেন বিবেচনায় নিলে পৃথিবীর সব মানুষই গাছ তথা বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল। জলবায়ুর নেতিবাচক পরিবর্তন রোধেও গাছের ভূমিকা অপরিসীম। পৃথিবীতে ৮০ হাজার প্রজাতির গাছের মধ্যে মাত্র ১ভাগ গাছের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার নিয়ে গবেষণা রয়েছে। এ'ছাড়া বর্তমান বিশ্বে গ্রামে যারা বসবাস করে, তাদের প্রায় ৮০ ভাগ ভেষজ ঔষুধ ব্যবহার করে, যার মূল উৎস বনজ সম্পদ।

জীববৈচিত্র্য সুরক্ষার অর্থ সব প্রাণীর বেঁচে থাকার নিরাপদ পরিবেশ। জীববৈচিত্র্য পানি, মাটি, বনজ সম্পদের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। পানি ছাড়া সব প্রাণই অচল। পানি মানে ভূ-উপরিভাগ, যেমন-পুকুর, খাল-বিল, নদী-নালা, লেক, সাগর ও মহাসাগর, ভূগর্ভ ও বৃষ্টির পানি। এর মধ্যে ভূ-উপরিভাগের সব পানিতেই মাছসহ নানারকম জীব বাস করে। পুষ্টির অন্যতম প্রধান উপাদান মাছ, সেই মাছেরও বিচরণ ক্ষেত্র পানি এবং ৩০০ কোটি মানুষের ২০ ভাগ প্রোটিন মাছ থেকে পাওয়া যায়। পানি দূষণ হলে মাছসহ পানি নির্ভর সব জীবের বাসস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। দূষিত পানিতে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায়, তখন কোনো জীবের পক্ষে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে যায়। অতি মাত্রায় দূষণের ফলে বুড়িগঙ্গায় মাছ বা জলজ প্রাণী নেই বললেই চলে। ঢাকার আশে-পাশে নদী-নালাগুলোতে শিল্প কল-কারখানার বর্জ্য ফেলাতে পানি দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেছে, মাছের স্বাভাবিক প্রজনন ব্যাহত হচ্ছে। পুকুর, বিল, বাওড়ে পাম্প দিয়ে সেচে মাছ ধরাতে ডিমওয়ালা মাছ আর থাকছে না, বর্ষাকালে কারেন্ট বা চায়না জাল দিয়ে ছোট ছোট মাছ ধরাতে দেশীয় মাছের আকাল দেখা দিয়েছে। তাছাড়া শুকনো মৌসুমে ধানের জমিতে কীটনাশক ব্যবহার করাতেও মাছের স্বাভাবিক প্রজনন ব্যাহত হচ্ছে। থার্মোকল দিয়ে তৈরি ওয়ান টাইম প্লেট ও গ্লাস এর ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলছে। ব্যবহারের পর এ'গুলো না পুড়িয়ে নদীতে,খালে, বিলে, পুকুর ও বাড়ীর আশে-পাশে ফেলে দেয়। এতে পানি দূষিত হয়, মাছসহ জলজ প্রাণী মারা যায় এবং বাড়ীর পরিবেশও নষ্ট হয়। তাছাড়া ওয়ান টাইম প্লেটে খাওয়া স্বাস্থ্য সম্মত নয়। মানুষ সময় বাঁচানো এবং ধোয়া-মোছার ঝামেলা এড়াতে এসব ব্যবহার করছে। সম্প্রতি কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে কয়েকটি ডলফিন মরে ভেসে উঠে। পরীক্ষা করে জানা যায় তাদের পেটে পলিথিন ছিল। আটলান্টিক মহাসমুদ্রে একটি মরা তিমি ভাসতে দেখা যায়; পরীক্ষায় সেই তিমির পেটেও প্লাষ্টিক জাতীয় দ্রব্যের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। আমাদের স্বভাবে রয়েছে "ছুঁড়ে ফেলার" সংস্কৃতি। নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে না ফেলে আমরা পলিথিনের ব্যাগ, ঠোঙ্গা, ডাবের খোসা এবং ময়লা-আবর্জনা পলিথিনে পুরে ড্রেন বা আশে-পাশে ছুঁড়ে ফেলি। এতে ড্রেন আটকে যায় এবং পরিবেশ দূষণ হয়। নদী-খালে এগুলো ফেললে শেষমেষ সমুদ্রের পানিতে গিয়েই মিশে।

বাংলাদেশে নানা কারণে জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে। আগ্রাসী ও ভুল উন্নয়ন নীতি যেমন দায়ী তেমনি মানুষের লোভনীয় দৃষ্টিভঙ্গিও দায়ী। ভুল নীতির কারণে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে ঢাকার পার্শ্ববর্তী নদীগুলোর পানি মারাত্মকভাবে দূষিত হয়েছে। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নদী, খাল ও জলাশয় দখল ও ভরাট করে ভবন ও সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। ফলত: অনেক প্রজাতির দেশীয় মাছ দ্রুত কমে যাচ্ছে। ইদানিং সরকার বুড়িগঙ্গা ও তুরাগ নদীর পাড়ে নির্মিত অবৈধ স্থাপনা ভেঙ্গে দিচ্ছে, যা ইতিবাচক পদক্ষেপ। অন্যদিকে শুষ্ক মৌসুমে ভারত পানি আটকে রাখায় অধিকাংশ নদী, খাল-বিল শুকিয়ে যায়, যা কৃষি ও পানি নির্ভর জীববৈচিত্র্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

বাংলাদেশে জীববৈচিত্র্যের প্রধান স্থান সুন্দরবন, যেখানে রয়েল বেঙ্গল টাইগারসহ বনের অভ্যন্তরে নানারকম জীবের বসবাস। পশু-পাখি, মৌমাছি, সরিসৃপ'তো আছেই। সুন্দরবনে এমন অনেক মাছ পাওয়া যায়; যা দেশের অন্যত্র পাওয়া যায় না। সুন্দরবন দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলকে সামুদ্রিক ঝড়-তুফান থেকে রক্ষা করে; তাই সুন্দরবনকে প্রকৃতির সবুজ দেয়াল বললে অত্যুক্তি হবে না। সুন্দরবন থেকে উপকূলীয় এলাকার মানুষ মাছ, মধু ও কাঠ সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে। সুন্দরবন একটি পর্যটন কেন্দ্র। দেশ-বিদেশের অনেক মানুষ সুন্দরবন দেখতে আসে; এতে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পায়। অত্যন্ত সংবেদশীল হওয়ায় সুন্দরবন রক্ষায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া উচিৎ। তা'ছাড়া সুন্দরবনের ভিতরে গেলে দেখা যায় ফাঁকা-গাছ নেই, অসাধু ঠিকাদারা ১০টা গাছ কাটার পারমিশন পেলে কেটে নিয়ে যায় ১০০টা; মনিটরিং করার মত কেউ নেই। অতিরিক্ত লবণাক্তার কারণে অনেক সুন্দরী গাছের আগা মরে গেছে; উপকূলীয় এলাকায় গাছপালার হয়েছে রুগ্ন দশা, এখন গাছে বাঁধে না আর পাখির বাসা। হরিণ বাঘের প্রধান খাদ্য, অসাধু ব্যক্তিরা হরিণ শিকার করছে; এতে হরিণের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। বাঘ খাবার না পেয়ে লোকালয়ে চলে আসে। প্রকৃতিতে রয়েছে খাদ্যজাল। বন-জঙ্গল বন্য জীব-জন্তু ও হিংস্র প্রাণীদের আবাসস্থল। মানুষ বন-জঙ্গল কেটে বসতি গড়ছে। সুন্দরবনের নিকটবর্তী রামপালে সরকার বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করেছে। পরিবেশবিদরা বলছেন, এতে বনের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে; যদিও সরকার বলছে, সুন্দরবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। কিন্তু ক্ষতি হলে দায়ভার কে নিবে? বিদ্যুৎ আমাদের দরকার, তাই বলে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে নয়। সুন্দরবন বাংলাদেশের অমূল্য প্রকৃতিক সম্পদ, যার দ্বিতীয়টি তৈরি করা যাবে না। তাই এটি রক্ষা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

তামাক চাষের প্রভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের উপর মারাত্মক হুমকি দেখা দিয়েছে। তামাক চাষে কীটনাশক ও সার

প্রয়োগ করায় তা পানির সঙ্গে মিশে নদীতে পড়ছে ও মাটির নীচে যাচ্ছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের নদীগুলোতে মাছসহ জলজ প্রাণী ও কেঁচোসহ মাটির প্রাণী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আবার তামাক পাতা প্রক্রিয়া করণের জন্য নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন করা হচ্ছে। তাছাড়া দেশের ইটভাটাগুলো নামে মাত্র কিছু কয়লা সামনে রাখে, কিন্তু মূলতঃ ইট পোড়ায় কাঠ দিয়ে। অনেক সময় পরিবেশ অধিদপ্তরের নিয়ম নীতি মানা হয় না। গত বছর পরিবেশ অধিদপ্তর অনেক ইটভাটার মালিককে জরিমানাও করেছিল। এক গবেষণায় বলা হয়েছিল, বাংলাদেশে প্রতিবছর যে হারে বনজ সম্পদ কমছে তার ৩০ ভাগ তামাক পাতা প্রক্রিয়াজাত করতে ব্যবহৃত হচ্ছে। আবার পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড় কেটে বসতি স্থাপন করছে, ফলে পাহাড় ধসে প্রতিবছর লোক মারা যাচ্ছে। পাহাড় পরিবেশের একটি অংশ।

জীববৈচিত্র্যের সন্নিবেশ এবং সমাহারে সৃষ্ট প্রকৃতি এবং প্রতিবেশ এর উপর ভিত্তি করে টিকে আছে আমাদের জীবন। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হলেও বিশ্বজুড়ে প্রকৃতি, পরিবেশ ও প্রতিবেশ বিনষ্ট এবং বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী এবং উদ্ভিদের বিলুপ্তির মূলে রয়েছে মানুষের অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ড। মানুষের অতিমাত্রায় ভোগ বিলাসিতা ও চাহিদা মেটাতে শিল্প কল-কারখানা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এর ধোয়ায় ও বর্জ্যে বায়ু, পানি ও মাটি দূষিত হচ্ছে। বায়ু দূষণের দিক থেকে ঢাকা শহর হুমকির মুখে রয়েছে; বায়ু দূষণে শাসকষ্ট বেড়ে যায়। বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত বায়ুর শহরগুলোর মধ্যে ঢাকা একটি। গত প্রায় ৩ মাস ধরেই ঢাকার বায়ুমান বিপজ্জনক অবস্থায় থাকছে। কখনো কখনো বিশ্বের মধ্যে বায়ুদূষণের শীর্ষে চলে আসছে রাজধানী ঢাকা। এই দূষণে সবচেয়ে বেশী ভুগতে হচ্ছে শিশুদের। রক্ষা পাচ্ছে না অন্তঃসত্বা নারী ও শিশুরা। আইসিডিডিআরবি এর এক গবেষণায় বলছে, গর্ভাবস্থায় বায়ুদূষণে ভোগা মায়েদের সময়ের আগে (প্রিটার্ম বার্থ) ও কম ওজনের সন্তান প্রসবের ঝুঁকি অনেক বেশী, (তথ্য সূত্র: ড. এনামুল হক, অধ্যাপক,ঢাবি এর লেখা প্রবন্ধ "বায়ু দূষণে জন্মেই ধুঁকছে শিশু", আমাদের সময়, ১১ মার্চ ২০২৩)। গত জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে দিল্লী শহরে বায়ু দূষণের মাত্রা এত বেড়ে গেল যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রায় ২০ দিন বন্ধ ছিল। বিশুদ্ধ বায়ু ও পানি মানুষের বেঁচে থাকার জন্য একান্তই অপরিহার্য উপাদান যা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা মানুষকে দিয়েছেন। আমরা পরিণাম ভাবি না; এখানেই আধ্যাত্মিকতা ও জীবনধারায় পরিবর্তন আনা দরকার। নৈতিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেম থাকা দরকার।

বিশ্বব্যাপী জীববৈচিত্র্য এবং প্রতিবেশ অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে অনেক বেশী হুমকীর সম্মুখীন। জাতিসংঘের তথ্য মতে, প্রকৃতি ধ্বংসের বর্তমান ধারা চলতে থাকলে আগামী দশ বছরের মধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রায় ১০ লাখ প্রজাতি বিলুপ্ত হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন যেভাবে হচ্ছে তা চলতে থাকলে ২০৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রতি তিনটির মধ্যে একটি প্রজাতি বিলুপ্ত হতে পারে। গত ৫০ বছরে গড়ে ৬০ শতাংশের বেশি বন্যপ্রাণী হ্রাস পেয়েছে। সে হিসেবে গত ১০ মিলিয়ন বছরের তুলনায় বর্তমানে প্রজাতি বিলুপ্তির গড় হার ১০ থেকে ১০০ গুণ বেশি। পৃথিবীর ৭৫ শতাংশ ভূ-ভাগে মানুষ ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন করেছে। বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ সামুদ্রিক প্রতিবেশ আজ পরিবেশগত হুমকীর সম্মুখীন। ২০১০-২০১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ৩২ মিলিয়ন হেক্টর বনভূমি ধ্বংস হয়েছে। আমরা যদি পরিবেশগত এ অবক্ষয় রোধ করতে না পারি তাহলে ব্যাপকভাবে জীববৈচিত্র্য এবং প্রতিবেশ ধ্বংসের কারণে মানুষের খাদ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে অতি মাত্রায় উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ায় গত বছর আমাজান জঙ্গলে আগুন লাগে যা নিয়ন্ত্রণে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। আমাজানকে বলা হয় বিশ্বের ফুসফুস। কারণ এখান থেকেই বেশি অক্সিজেন উৎপন্ন হয়।

২০৩৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বিশ্বের অর্ধেকের বেশি মানুষ মুটিয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। সম্প্রতি ওয়ার্ল্ড ওবেসিটি ফেডারেশনের এক গবেষণায় এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বের ৪০০ কোটির বেশি মানুষ অতিরিক্ত ওজনের সমস্যায় ভুগবে। প্রতিবেদনে নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে স্থুলতার ব্যাপকতার প্রভাবও বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী যে ১০টি দেশে সবচেয়ে বেশি স্থুলতা বৃদ্ধির আশংকা রয়েছে, এর মধ্যে ৯টি আফ্রিকা ও এশিয়ার নিম্ন বা নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ। স্থুলতা বৃদ্ধির অন্যতম কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে-প্রক্রিয়াজাত খাবার খাওয়া, অতিরিক্ত শুয়ে-বসে সময় কাটানো, খাদ্য সরবরাহ ও বিপণন নিয়ন্ত্রণে দুর্বল নীতি এবং ওজন ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্য শিক্ষার অনুন্নত ব্যবস্থা। কিশোর-কিশোরী ও যুবারা ইন্টারনেট ও ফেসবুকে ডুবে থাকে, খেলাধুলা করে না। ফলে মুটিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তাদের মধ্যে বেশি *(তথ্য সূত্র: আমাদের সময় পত্রিকা, ১০ মার্চ ২০২৩)*।

পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উপায়:

- গাছ না কাটা এবং প্রচুর গাছ লাগানো।
- পাহাড় কাটা বন্ধ করতে হবে।
- নদীর পানি দূষণ করা যাবে না।
- নদী ও খাল অবৈধ দখলমুক্ত করা এবং ভরাট হওয়া নদী ও খাল পুনঃখনন করা।
- পাখি শিকার বন্ধ করতে হবে।
- রাস্তা-ঘাটের কুকুর-বিড়াল না মারা। মৃত পশু-পাখি মাটিতে পুতে ফেলতে হবে, যেখানে-সেখানে ফেলা যাবে না।
- ছুঁড়ে ফেলার সংস্কৃতি পরিহার করা।
- বাড়ী-ঘরের চারপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং বাড়ীর ময়লা-আবর্জনা নির্দিষ্ট গর্তে জমিয়ে তা পঁচে গেলে সার হিসেবে ব্যবহার করা।
- 'অর্গানিক কৃষির' প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা।
- শখের বসে পাখি খাঁচায় আটকে রাখা যাবে না।
- প্লাস্টিক ব্যবহার কম করা ও তা পরিবেশে না ফেলা।
- অতি মাত্রায় কার্বণ নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণে আনা।
- শিশু ও সব শিক্ষার্থীদের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত সচেতনতা বাড়াতে পাঠ্যপুস্তকে জ্ঞান অন্তর্ভূক্ত করতে হবে এবং এ ব্যাপারে জনমনে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভ্রাম্যমান চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে।
- বন, নিম্নাঞ্চল, মরু অঞ্চল ও পাহাড়সহ ভূ-উপরিভাগের সুপেয় পানির আধাঁরগুলোকে সংরক্ষণ; ক্ষতিগ্রস্তগুলোকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- সব ধরণের বন উজাড় প্রতিহত ও ক্ষতিগ্রস্ত বন পুনর্বাসনসহ বনাঞ্চল বৃদ্ধি করতে টেকসই ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন করা।
- বন্য প্রাণী শিকার বন্ধ করা ও জীববৈচিত্র্যর ক্ষতি ঠেকাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থাকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। পানি ও বায়ু দূষণ রোধ করা।
- ক্ষতিকর কিটনাশক ও রাসায়নিকমুক্ত প্রাকৃতিক কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।
- পরিবেশের অন্তরায় এমন শিল্প-কারখানা গড়ে উঠতে না দেওয়া।
- সম্প্রতি ঢাকার গুলিস্তানে সিদ্দিকবাজারে গ্যাস বিস্ফোরণে ২৪ জন লোক অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে এবং অনেকে আহত হয়েছে। সে জন্য উচ্চ বিল্ডিং নির্মাণে 'বিল্ডিং কোড' মানায় কড়াকড়ি নীতি অবলম্বন করা।

সরকার জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরূপপ্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশ (Bangladesh Climate Change strategy and

action plan- BCCSAP) ক্লাইমেট চেঞ্জ ষ্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড প্ল্যান প্রণয়ন করেছে। এতে ৬টি থিমের আওতায় প্রায় ৪৪টি প্রোগ্রাম এর অধীনে উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পসমূহের মধ্যে জীববৈচিত্র্য এবং প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার বিষয়ক প্রকল্পও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করণে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি সকল উন্নয়ন মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাসমূহের বাজেটে সুনির্দিষ্ট আর্থিক সংস্থান অন্তর্ভুক্ত করে জীববৈচিত্র্য এবং প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশগত মান উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী সার্বজনীন সচেতনতা সৃষ্টি এবং জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংরক্ষণ কাজ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (ইউএনইপি) এর উদ্যোগে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে সারা বিশ্বে প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়ে আসছে। এ'ছাড়াও জাতিসংঘ ২০১১-২০২০ এ দশকে ইউএনডিকেড অন বায়োডাইভার্সিটি হিসেবে উদ্‌যাপন করেছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং প্রতিবেশ পুনরুদ্ধারকে গুরুত্ব দিয়ে জাতিসংঘ ২০২১-২০৩০ এ দশককে UN-decade Ecosystem হিসেবে ঘোষণা করেছে। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, মানুষের জীবনযাপনে বিলাসিতার আধিক্য ও অপরিকল্পিত উন্নয়ন জীববৈচিত্র্যকে ধ্বংস করছে। পরিবেশ বান্ধব বাসযোগ্য বিশ্ব গড়ে তুলতে জীববৈচিত্র্য রক্ষা জরুরী। এজন্য প্রয়োজন সবাইকে সচেতন হওয়া। মনে পড়ে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য এর 'ছাড়পত্র' কবিতার দু'টি লাইন, "এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য ক'রে যাব আমি- নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার"। আগামী প্রজন্মের জন্য সুন্দর বাসযোগ্য ধরিত্রী দেখতে চাইলে সবার আগে প্রাণ, প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের প্রতি ভালোবাসার সংস্কৃতি ধারণ ও লালন করতে হবে, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে যত্নবান ও দরদী হতে হবে, পরিমিত ব্যবহার করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে পৃথিবীর সংকটময় পরিস্থিতিতে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ও সংরক্ষণে মানুষের মনন ও চিন্তায় যাতে পরিবর্তন আসে সে লক্ষ্যে প্রতি বছর ৫ জুন পালিত হয় বিশ্ব পরিবেশ দিবস।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় ও সংরক্ষণে চিন্তা করতে হবে বিশ্বব্যাপী, পরিকল্পনা করতে হবে স্থানীয়ভাবে এবং কাজ করতে হবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে। তাই ইংরেজীতে একটা কথা আছে, "Think Globally, plan locally, act individually". প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ উপহার বিশ্ব মানব জাতির জন্য। এইসব নিয়ে অনুধ্যান করা উচিৎ, চিন্তা করা ও একটু ভাবার সময় এসেছে। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে আধ্যাত্মিকতার অনুশীলন প্রয়োজন, ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন; ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মের মধ্যে সৃষ্টিকর্তাকে আবিষ্কার করা, সৃষ্টির মাঝে সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজে পাই। মুণি-ঋষি ও সাধকগণ বৃক্ষরাজির সুশীতল ছায়াতলে ও পাহাড়-পর্বতের গুহায় বসে ধ্যান করে পরম দয়ালু সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য লাভ করেছেন। সৃষ্টির উৎসের মধ্যে রয়েছে সত্য ও সৌন্দর্য। আসুন, আমরা সবাই মিলে প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের প্রতি ভালোবাসার সংস্কৃতি গড়ে তুলি, রক্ষা করি ধরিত্রী, রক্ষা করি সৃষ্টির মাধুর্য। পরিবেশ ও প্রকৃতির সৌন্দর্য প্রতিনিয়ত মানুষ ধ্বংস করছে-তা দেখেও কেন দেখছ না এবং বুঝেও কেন বুঝছ না হে মানুষ! ধ্যান করি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুন্দর বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যেতে চাই। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার কথায় নব জাতকের এ আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার।

তথ্যসূত্র: *ইন্টারনেট, ড. মো: নিয়ামুল নাসের এর একটি লেখা।*

মহাখালী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

ক-১১৮/৫, মহাখালী দক্ষিণ পাড়া, গুলশান, ঢাকা-১২১২

স্থাপিত: ১৫ মে, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ, নিবন্ধন নং ২২২, তারিখ-২১/১২/১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ

সংশোধিত নিবন্ধন নং-৪৪, তারিখ-১০/০৮/২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

মোবাইলঃ ০১৩২৯৬৭৩৮৮২, ফোনঃ ০২-৪৮৮১২৪৮৮, ই-মেইলঃ mcccultd@gmail.com

মহাখালী খ্রীষ্টান কো-আপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: এর সকল সদস্য-সদস্যা, ব্যবস্থাপনা কমিটি, উপ-কমিটি ও কর্মীবৃন্দের পক্ষ থেকে **শুভ বড়দিন ও ইংরেজী নববর্ষ** উপলক্ষে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর "বড়দিনের বিশেষ সংখ্যা"-এর সকল পাঠক, পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদেরকে **"শুভ বড়দিন ও ইংরেজী নববর্ষের"** প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মহাখালী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:-এর আকর্ষণীয় প্রডাক্টসমূহ

ডিপোজিট প্রোডাক্টসমূহ :

সাধারণ সঞ্চয়, উৎসব সঞ্চয় প্রকল্প, সোনামনি সঞ্চয় প্রকল্প, মাসিক সঞ্চয় প্রকল্প, মেয়াদী আমানত প্রকল্প, দ্বিগুণ আমানত প্রকল্প এবং মাসিক ও ত্রৈমাসিক বেনিফিট স্থায়ী আমানত প্রকল্প।

ঋণ প্রোডাক্টসমূহ :

সাধারণ ঋণ, বিদেশে অবস্থানরত সদস্যদের জন্য ঋণ, দ্বিগুণ আমানত, মেয়াদী আমানত ও মাসিক ও ত্রৈমাসিক বেনিফিট স্থায়ী আমানত প্রকল্পের বিপরীতে ঋণ, মর্টগেজ ঋণ, ব্যাংক সলভেন্সি ঋণ, আপদকালীন বিশেষ ঋণ, ফ্ল্যাট ক্রয়/হাউজ বিল্ডিং লোন, টপ-আপ ঋণ, পুনরাবৃত্তি/রিভলভিং ঋণ, ব্যবসায়িক ঋণ ও উদ্যোক্তা ঋণ।

উল্লেখিত প্রডাক্টসমূহের সুবিধা গ্রহণের জন্য সম্মানিত সদস্য-সদস্যাগণকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

প্রণয় রিচার্ড সরেন
সম্পাদক

সঞ্চয় করুন - সুখী সমৃদ্ধ জীবন গড়ুন

বেনেডিক্ট ডি'ক্রুজ
সভাপতি

বই পড়ার গুরুত্ব

আলেক রোজারিও

বিশ্ববাসী জানেন বই এর অর্থ হলো পুস্তক, গ্রন্থ। আবার বই এর অর্থ হয় বহন করা বা বয়ে বেড়াই এমন। বই অর্থ ব্যতীত, ছাড়া, ভিন্ন। তবে আমি বই-পুস্তক-গ্রন্থের কথাই লিখছি। তবে বাংলা সাহিত্যে পাঠক বোঝানোর খাতিরে বই এর বানান দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। পড়া অর্থ হলো পাঠ করা, অধ্যয়ন করা, বই পড়া, মন্ত্র পড়া, পুঁথি পড়া। আবার পড়া বানান লিখি উপুড় হয়ে পড়া, সিঁড়ি দিয়ে পড়া, আকাশ হতে পড়া, গায়ে পড়া, শুইয়ে পড়া, রোগে পড়া ও গরম পড়া। অর্থ ভেদে পড়া লেখা একই বানান প্রয়োগ করছি। গুরুত্ব অর্থ আমরা বুঝি অতিশয় জোর দেওয়া, অতিশয় বিবেচনা করা, অতিশয় দৃষ্টিক্ষেপণ করা। প্রয়োজনে, দরকারে ও স্বার্থে সর্বাধিকার ভাবে পদক্ষেপে কর্ম করাকেই গুরুত্ব বলে থাকি। গুরুত্বের ভিতর অন্য কোন ধর্ম নেই। গুরুত্বের জরুরি তাগিদে কখনো বিশ্রাম করতে নেই এবং আইনেরও কোন তোয়াক্কা চলে না। উদাহরণ; হঠাৎ আগুন লাগলে তখন আইন অনুমতি ধর্মবিধান দেখতে নেই। শাস্ত্রে কথা আছে, হাতির বিশাল দেহ থাকলেও হাতি প্রয়োজনের তাগিদে মাথা নত করে। আমরা লেখাপড়া করে বৃহৎ শিক্ষিত হওয়ার পরও জ্ঞান প্রয়োগের জন্য জ্ঞান চর্চায় বই পড়ার গুরুত্ব রয়েছে নিত্যদিন এবং বই এর কাছে মাথা নত করতে হয়। আমরা যতক্ষণ বই পড়ি ততক্ষণ জ্ঞানী থাকি। জ্ঞানকে সর্বদা শাণ দেওয়ার জন্য বই পড়ার গুরুত্ব অতিশয়। "মহামানবের মাধ্যমে আল্লাহর প্রথম বাণী পড়" (আল-কোরান)। একটি পবিত্র ধর্মের স্রষ্টার প্রথম বাণী হচ্ছে "পড়া"। তা হলে পড়াকে পবিত্র গ্রন্থে সর্বাগ্রে স্থান করেছে। প্রতিটি ধর্মই পবিত্র। সে পবিত্র হিসাবে আমরাও পড়াকে পবিত্র হিসাবে গ্রহণ করি। এখানে বই পড়াকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। বিশ্বজন স্বীকৃত আমরা নিত্যক্ষণ বই এর জ্ঞান ৯০% ব্যবহার করি ও বাকি ১০% জ্ঞান প্রকৃতির জ্ঞান ব্যবহার করি। যেখানে ৯০% জ্ঞান ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে ৯০% শতকরাকে নিত্য বই পড়ে যত্নসহকারে শাণ দিয়ে রাখি না! পূর্ব সঞ্চিতকে বার বার নাড়াচাড়া করে কোন মতে চলি বেশির ভাগ জনতাই। বিশ্ব নেটওয়ার্ক এর সাথে তাল দিয়ে নব নব আবিষ্কারে নিজেকে তৈরি করছি না বই পড়ে। নিত্যদিন বই পড়লে নিত্য মর্যাদাবোধ জন্ম নেয় ও জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। সমাজে চলার জন্য সর্বদা মর্যাদাবোধ জন্মাতে ও মর্যাদা রাখতে হয়। "বই পড়তে যে ভালোবাসে তার শত্রু কম"- *চার্লস ল্যাম্ব*। বই পড়ার অভ্যাসের জ্ঞানের ফলে সকাল বেলা গোলাপী হাতি দেখতে হয় না, লিভার পচে পটল তুলতে হয় না। একটা রাষ্ট্রের স্থপতির চতুর্থ পিলার হলো লেখক সাংবাদিকগণ আর জাতির সঠিক পথের পরিচালনের দিশারী হলো বই। বই জ্ঞান ছাড়া বিশ্বের কোন রাষ্ট্রই সার্বভৌম-শান্তি, শৃঙ্খলা, শিক্ষায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নায়ক গড়তে পারে না। "দেশে সুনাগরিক গড়ে তোলার প্রধান উপায় একটাই, তা হল সুলিখিত এবং সৃষ্টিশীল ও মননশীল বই" *-ক্যানভিল কলিজা*। বই পড়ে জ্ঞান অর্জনেই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের আজ বিশ্ব জয় জয়গান। বিজ্ঞান বইকে অনুসরণ করে। উন্নত বই পড়া থেকেই প্রতিটি রাষ্ট্রই সভ্যতায় আবিষ্কার। বই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও জ্ঞান বাহক। পরিতৃপ্তিতে ও সুখে-শান্তিতে বাসবাসের সহায়ক হচ্ছে বই ও বইপড়া। "বই-ই আমার প্রভু এবং আমার সহচর"---*জোসেফ হল*। মন্দিরে, মসজিদে ও গির্জায় গিয়ে মাথা ঠুকে স্রষ্টা প্রভুকে সহচর করতে না পারলেও বই পড়ে প্রভুকে সহচর করা যায়। মানুষ হিসেবে মানুষের বন্ধুর দরকার হয় আর প্রকৃত বন্ধু হলো বই আজ ও চিরকালের জন্য। মানুষ বন্ধু ব্যঙ্গ করতে পারে কিন্তু বই বন্ধু তা করে না বরং সর্বদা সহায়তা দেয় প্রতিষ্ঠিত সফল বাঁচার জন্য। জীবনে উৎকৃষ্ট বন্ধু হলো বই আর গৃহের উৎকৃষ্ট আসবাবপত্রের মধ্যে বই এর তাক। জীবন সুন্দর আর ঘর সুন্দরের মধ্যেই বই সেঁতুবন্ধন হয়ে আছে। "বই বিশ্বাসের অঙ্গ, বই মানব সমাজকে সভ্যতা টিকিয়ে রাখার জ্ঞান দান করে, অতএব বই হচ্ছে সভ্যতার রক্ষাকবচ" *-ভিক্টর হুগো*। একমাত্র প্রাণী মানুষ রান্না করে খাদ্য খায় তেমনি মানুষ বই পড়ে জ্ঞান নেয়। বই পড়ে বিশ্বজগতকে ঘরে বসে অনায়াসে পরিভ্রমণ করা যায়। অতিসহজে পরিভ্রমণের ও বিশ্ব জ্ঞানের অবহিত করলেও দ্বিতীয় আর কোন সহজ রাস্তা নাই। তাই তো জ্ঞানীরা ও জ্ঞান পিপাসিতরা বই ব্যবহার করে। প্রযুক্তি ডিজিটাল নেট জগতের জয় জয়গানে বই পড়ার প্রবণতা দিন দিন কমে যাচ্ছে তা বিজ্ঞগণের মন্তব্য। এ প্রজন্মের ছাত্র/ছাত্রীরাও নিত্য পাঠ পুস্তক বই পড়া হতে ছিঁটকে যাচ্ছে। ডিজিটেলের প্রবাহে পড়ায় কেবলই উদাসীন ও অমনোযোগী। নিত্য দায়িত্বের অধ্যয়নের চেয়ে মুঠো ফোনের আসক্তি বেশি এ প্রজন্মের ছাত্র/ছাত্রীদের। ছাত্র কর্তব্য অধ্যয়ন বাদ দিয়ে মুঠো গেমে সাচ্ছন্দ্যবোধ করে বেশি। এ ডিজিটাল সমাজ সংস্কৃতি থেকে বাহির হয়ে আসার জন্য এক্ষণই সচেতন মা বাবার পদক্ষেপ নিতে হবে। নব পরিবারে নবজাত সন্তান আগমনে যদি দেখে মা বাবা কর্ম ফাঁকে বই পড়ার অভ্যাস গড়া আছে তবে আগত সন্তানও বই পড়বে তা মনোবিজ্ঞানের উক্তি। মায়ের স্তনপানে শিশু মায়ের চিন্তাধ্যান স্বভাবজাত ইতিবাচক অনেক কিছু পেয়ে যায়। বিজ্ঞদের কথার সূত্র ধরে যদি মা বিশ মিনিট শিশু সন্তানকে বুকের দুধ পান করাতে বসে। এ বসায় দুগ্ধপানে যদি মা হাতে কিছু একটা বা বই পড়ে তবে মার বই পড়ার ইতিবাচক মনোবৃত্তি শিশু পেয়ে যাচ্ছে সহজ চর্চায়। গর্ভবতী মা যদি গর্ভে সন্তান নিয়ে নিয়মিত কর্ম ফাঁকে বই পড়ে এবং বই পড়ার সুনির্মল ধারা নবজাত সন্তান পায়। সুখী পরিবারের ও ধর্ম অনুশাসনে সন্তানদের পড়তে দিয়ে যদি মা ও বাবা উভয়েই বই পড়ে তবে ফল দ্বিগুণ হয়। যদি সন্তানদের পড়তে দিয়ে অভিভাবকগণ মোবাইল ব্যবহার করে ও টিভি দেখে তবে তার ফল হয় বিপরীত। ফলে সুপরিবারের আদর্শ থাকে না। শাস্ত্রে কথা আছে, কামলার সাথে কাজ করলে দ্বিগুণ ফল আসে। তেমনি ছেলেমেয়েদের সাথে পড়লেও ফল দ্বিগুণ আসে। যেসকল পরিবারের ছোট বড় সবার পড়ার অভ্যাস আছে, সে সকল পরিবারগুলো বংশ পরিক্রমায় পড়ার অভ্যাস পায়। বর্তমান জগতে প্রতিটি পিতামাতারা কম করে হলেও যেকোন পড়া পড়তে পারে সুতরাং পরিবারের ছোট বড় সকলে পড়ার অভ্যাসে সহজেই তৈরি হতে পারে। দিনের একটা সময় প্রার্থনার জন্য রেখে নিত্য চর্চায় থাকে তবে পরিবারের সন্তানরা ধর্মীয় অনুশাসনেই সুমানুষ হবে। নিত্য প্রাণহারা, বিশ্রাম, ব্যায়াম-খেলাধুলা, প্রার্থনা, কর্ম ও পড়াশোনা এ ছয় কর্ম রুটিন করে একটি পরিবার চর্চায় থাকলে তবে সে সব পরিবারগুলো সুখ, আনন্দ, অগ্রগতি, উন্নতির জোয়ারে ভাসবে। ডিজিটাল সমাজ সংস্কৃতির ও রাষ্ট্রীয় প্রভাবের যত ঝড়ই আসুক কোন ক্ষতি হবে না। স্রোতের ধারায় দার সোজায় নৌকা নদী পাড় হয়ে যাবে এবং সোনাতে সোনা ফলবে। তখন সমাজ প্রবাহে মা বাবার চিন্তা আসবে না সন্তানকে চ্যালেঞ্জে মানুষ করার। বীজতলা উর্বর করতে হয় আগেই। অনেক অল্প শিক্ষিত পরিবারের সন্তানও সুশিক্ষিত হয়। সেক্ষেত্রে সন্তানরা নিজ বিবেককে সঞ্চালিত করে শিক্ষার আলোতে প্রভাবিত হয়ে উচ্চ শিক্ষিত এবং পরিবারের আশীর্বাদ হয়। আমাদের প্রজন্ম গোবরে পদ্ম ফুল হোক এ প্রত্যাশা। সমাজ ও গণমাধ্যমকেই

বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য গণজোয়ার দিয়ে কাজ করতে হবে। প্রাচীন ও ডিজিটাল পড়ার অভ্যাসকে জাগরিত করাই শিক্ষিতদের কর্তব্য হবে। যদি অক্ষর জ্ঞান সম্পন্নরা এগিয়ে আসে বই পড়ার গুরুত্বের স্লোগান নিয়ে, সমাজ প্রজন্মরা অবশ্যই আগ্রহী হবে। এ বছর বেশি করে লক্ষণীয় ছিল স্কুল-কলেজ ও গ্রাম্য সমাজ সংঘগুলো ঈদ ও পূজা উপলক্ষ্য করে বিজ্ঞান মেলা, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতিযোগিতা আয়োজন করার। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণও ছিল চোখে পরার মত। তবে এ শুভ আয়োজনকে আমি সাধুবাদ জানাই ও চলমান ধারাবাহিক হোক এ শুভ প্রত্যাশা করি আয়োজক কর্তাদের কাছে। তবে পরিতাপের বিষয় হলো যেখানে স্কুল, ছাত্র, পড়া, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি রয়েছে সে অনুষ্ঠানে কোন বই উপহার নেই। অথচ ৯০% বইয়ের জ্ঞান দিয়ে এ আয়োজন হয় প্রজন্মকে পেশায় উৎসাহী ও প্রতিভার সাফল্যমণ্ডিত করতে। উপহার ক্রেস নিয়ে ঘরে সাজাবে জয়ীরা ফলে ঘরে সৌন্দর্য বর্ধন হবে কিন্তু জ্ঞান বর্ধন হবে না। যদি বই উপহার হতো তবে জ্ঞান সৌন্দর্য উভয় বৃদ্ধি হতো। ঘরের শ্রেষ্ঠ সুন্দর আসবাবপত্র হলো বই। ক্রেস্ট পাঁচ বছরে মরিচা ধরবে আর বই যুগ যুগ ধরে শত শত আলো ছড়াবে। বই হলো শ্রেষ্ঠ উপহার অথচ স্কুল-কলেজে ছাত্রদের বই উপহার দেয় না। স্কুল মানেই তো বই অথচ বইকে গুরুত্ব দেয় না। শিক্ষার আলো নিয়ে বইকে অবহেলা করা শিক্ষার মর্যাদা পায় না। বই এর মর্যাদা শিক্ষা অনুসারেই করা উচিত। মর্যাদা লাভ হয় জ্ঞানের মাধ্যমে আর জ্ঞান আসে বই থেকে। সৌন্দর্যের সুষমা বিকাশিত হয় শিষ্টাচারের মাধ্যমে বই জ্ঞান থেকে। শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। শিক্ষার বিকল্প নাই। বই পড়ার গুরুত্ব চাই। জাতির আসল সম্পদ হলো শিক্ষা। জ্ঞান জ্ঞানী জাতির বড় ধনসম্পদ। মানবের জ্ঞানই শক্তি। "জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র বস্তু জগতে আর কিছুই নাই" -*পবিত্র গীতা*। জ্ঞানে উন্নত, সম্মান, ঐশ্বর্যে ভরপুর। স্মার্ট ফোনের যুগে ছাত্র/ছাত্রীরা দ্বিগুণ হারে পড়ার গুরুত্ব কমিয়ে দিয়েছে এর প্রমাণ মেট্রিকে ১৩৪টি স্কুল ও এইচএসসিতে ২০২টি কলেজ থেকে পরীক্ষায় পাসের হার শূণ্য। আমরা ফোঁটায় ফোঁটায় পড়া কিংবা এক মগ পানি দিয়ে গোসল করতে পারি না। তবে যদি ফোটায় ফোটায় পড়া বা এক মগ পড়া পানি সময় নিয়ে বড় বালতিতে জমা করি তবে জমা পানি দিয়ে সহজেই শুভ্র, পবিত্র গোসল করতে পারি। তেমনি আমরা যদি নিয়মিত পড়ার অভ্যাস করি তবে পরীক্ষায় বই এর যে কোন স্থান হতে প্রশ্ন আসলেই উত্তর করে পাস করতে পারব। যদি সারা বছর পড়া না করে পড়া জমিয়ে রেখে পরীক্ষার কাছে ব্যস্ত হয়ে পড়া করতে যাই তবে ফোঁটা ফোঁটা ও এক মগ পানি দিয়ে গোসলের ন্যায় হবে। পড়া জমিয়ে ভালো ফলাফলের আশা করা যায় না। পড়াশোনা ও পরীক্ষা ব্যথিত ছাত্র হওয়া যায় না। অনেক ছাত্ররা পড়াশোনা ও পরীক্ষাকে ভয় করে। প্রকৃত ছাত্র তারাই যারা নিয়মনীতি, নিষ্ঠাবান, সৎচরিত্র, সাহসী ও শক্তিশালী। প্রতিটি আলোর পিছনেই ছায়া আছে আবার প্রতি চুলেরও একটি নিজস্ব ছায়া আছে তেমনি ছাত্রদেরও একটা নিয়মনীতি, শৃঙ্খলা ও ছয় অভ্যাসের সুষম প্রয়োগ করা প্রয়োজন। পড়া মানুষকে জ্ঞানী করে, লেখক-কবিদের বুদ্ধিমান করে, প্রাকৃতিক দর্শন গভীর নিয়মনিষ্ঠা করে, গণিতবিদেরা করে অন্তদর্শী ও কষ্টদায়ক সন্তুষ্টির পথে নিয়ে যায়। কিছু কিছু ভাল বইগুলো বার বার পড়া ভাল। ভাল বই একান্ত শ্রেষ্ঠ বন্ধু হয়। "যতদিন লেখাপড়ার ও পড়ায় প্রতি আকর্ষণ থাকে, ততদিন মানুষ জ্ঞানী থাকে। আর যখনই তার ধারণা জন্মে যে, সে জ্ঞানী হয়ে গেছে, তখনই মূর্খতা তাকে ঘিরে ধরে"--- *সক্রেটিস*। আসুন বই পড়ার গুরুত্ব দিয়ে আর মূর্খতায় না যাই। লোভী মানুষকে বিধাতা ঘৃণা করে আর পড়ুয়া জ্ঞানীদের বিধাতা পছন্দ করে। বিধাতার প্রিয় হতেই বই পড়ার গুরুত্ব স্বীকার্য। জ্ঞানার্জনের সৌন্দর্য হচ্ছে অনুসরণ করা, আর দানের সৌন্দর্য নীরবে দেওয়া। প্রতিটি জ্ঞানের নিজস্ব শক্তি আছে; গুরুত্ব আছে।

তোমাদেরই স্মরণে

**পৃথিবীতে সব কিছু শেষ হয়, বসন্ত গান মুকুলিত প্রাণ ক্ষণকাল রয়,
তারপর স্মৃতিটুকু ব্যথাময়।**

প্রয়াত জেরাল্ড হিপু গমেজ
জন্ম: ৭ জুন, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৩ জুলাই ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত ড. এলিয়াস করুন বড়ুয়া
জন্ম: ২২ আগস্ট ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১২ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত মারীয়া মায়া গমেজ
জন্ম: ৩১ জানুয়ারি ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৬ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত পিউস গমেজ ও প্রয়াত রমনা প্রীতি গমেজ

জন্ম: ২০ জুলাই ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ **জন্ম:** ১৭ ডিসেম্বর ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৩ জানুয়ারি ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ **মৃত্যু:** ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রভু যিশুর জন্মোৎসবে তাঁর চরণে এই নিবেদন রাখি তিনি যেন তোমাদের আত্মার চিরশান্তি প্রদান করেন

পরিবারের পক্ষে
এলেন, এলিথিয়া, এঞ্জেলা, এনথিয়া, ক্যাথি ও পিউস এলড্রিন

কারিতাস বাংলাদেশ: ভালোবাসাপূর্ণ সেবার এক অনন্য নিদর্শন

কারিতাস ইনফরমেশন ডেস্ক: কারিতাস বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর একটি সংস্থা, যা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের উন্নয়ন ও সমাজে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জানুয়ারি Christian Organization for Relief and Rehabilitation (CORR) নামে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন আইন ১৮৬০ এ নিবন্ধিত হয়। সংস্থাটি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে কারিতাস বাংলাদেশ নামধারণ করে এবং পরবর্তীতে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাংলাদেশ এর অধীনে নিবন্ধন লাভ করে।

দিকদর্শন: কাথলিক মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার আলোকে কারিতাস বাংলাদেশ এমন একটি সমাজের স্বপ্ন দেখে যেখানে মর্যাদা, স্বাধীনতা, ন্যায্যতা, শান্তি ও ক্ষমাশীলতার মূল্যবোধসমূহকে সমুন্নত রেখে জনগণ ভ্রাতৃত্ববোধ, পারস্পরিক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার চেতনা নিয়ে মিলন সমাজে বসবাস করতে পারে।

লক্ষ্য: কারিতাস বাংলাদেশ জনগণের বিশেষভাবে দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত, প্রান্তিক ও সীমান্তবর্তী জনগোষ্ঠীর অংশীদার হয়ে সকলের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে অন্তর্ভুক্তিমূলক, সমন্বিত ও সামগ্রিক উন্নয়ন সাধন এবং আমাদের অভিন্ন বসতবাটির যত্নের জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করে যেন প্রত্যেকেই সত্যিকার অর্থে মর্যাদা নিয়ে বসবাস করতে পারে এবং অন্যদেরকে দায়িত্বশীলতা, বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার সঙ্গে সেবা প্রদানে সমর্থ হয়।

কারিতাস বাংলাদেশ নিম্নলিখিত কর্মসূচিসমূহকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ করে-

- বিপন্ন-জনগোষ্ঠীসমূহের জন্য সমাজ কল্যাণ ও ভালোবাসার সেবা
- প্রতিবেশগত সংরক্ষণ, জলবায়ু ন্যায্যতা ও টেকসই খাদ্য ব্যবস্থা
- মানবিক সাড়া ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
- শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি
- স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টি ও শিক্ষা
- আদিবাসী জাতিসমূহের উন্নয়ন
- সমন্বিত মানব উন্নয়ন
- প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও স্থায়িত্ব

উল্লিখিত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কারিতাস ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ১৩ লক্ষেরও অধিক জনগণের কাছে এর সেবা পৌঁছে দিয়েছে। নিচে ছবির মাধ্যমে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কারিতাসের কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম তুলে ধরা হলো।

বিপন্ন-জনগোষ্ঠীসমূহের জন্য সমাজ কল্যাণ ও ভালোবাসার সেবা সেক্টরের আওতায় পথশিশু, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী এবং মাদকাসক্ত ব্যক্তিসহ মোট ৬৮,৩৮৭ জনকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

কারিতাসের মানবিক সাড়া ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সেক্টরের অধীনে মোট ৭২৭,৪৭৭ (৫৫% নারী) জনকে সহায়তা করা হয়েছে।

শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি সেক্টরের অধীনে ২,০২৬ জন যুবা কারিগরি প্রশিক্ষণ নিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন।

শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি সেক্টরের মাধ্যমে ৭৬,৬৬৬ জন প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থী, ঝরে পড়া শিশু, সুবিধাবঞ্চিত ও ঝুঁকিপূর্ণ সম্প্রদায়ের শিশু এবং শিশুশ্রমিকেরা সহায়তা পেয়েছেন।

আদিবাসী জাতিসমূহের উন্নয়ন সেক্টরের অধীনে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৮,১৭৬ জন আদিবাসী জনগণকে সেবা দেয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টি ও শিক্ষা সেক্টরের অন্যান্য সেবার পাশাপাশি স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনা সভা, সেমিনারের মাধ্যমে ১০২,০৭৮ জন দরিদ্র স্বাস্থ্য সুবিধা বঞ্চিত মানুষকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

কারিতাস মাইক্রো ফাইন্যান্স প্রোগ্রাম হতে ঋণ ও শিক্ষা সহায়তা পেয়ে ২৯০,৭৩০ জন গ্রামীণ দরিদ্র মানুষ (নারী ২৫৩,১৩২) স্বাবলম্বী হয়েছেন।

প্রতিবেশগত সংরক্ষণ, জলবায়ু ন্যায্যতা ও টেকসই খাদ্য ব্যবস্থা সেক্টরের আওতায় মোট ১৯,৬৩০ জনকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

খ্রিস্টীয় লোকাচার ও প্রসঙ্গকথা

ফাদার সুরেশ পিউরীফিকেশন

প্রতিটি জাতি গোষ্ঠীর নিজস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও লোকাচারের মধ্য দিয়ে নিজেদের জীবনে সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাসের অনুশীলন করে থাকে। কৃষ্টি-সংস্কৃতি-লোকাচার নিয়েই মানব জীবনধারা প্রবাহিত হয়। মানুষের প্রাত্যহিক জীবন যাত্রা, বাস্তবতা, কৃষ্টি, লোকাচার, বিশ্বাস, ভক্তি, আদান-প্রদান তথা সামাজিক সামগ্রিক জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে মানুষ বিশ্বাসের চর্চা বা অনুশীলন করে। এই কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও খ্রিস্টীয় লোকাচার ভাওয়াল খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ শত শত বছর ধরে রেখেছে যা অমাদের খ্রিস্টবাণী প্রচার ও খ্রিস্টাদর্শ স্থাপন করতে ভূমিকা রেখেছে। আমাদের ভাওয়াল খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ নিজেদের কৃষ্টি-সংস্কৃতির বিভিন্ন লোকাচার সংস্কার ও বিশ্বাসগুলো খ্রিস্টীয় লোকাচার হিসেবে খ্রিস্টের পরিচয় বা সাক্ষ্যবহন করে যাচ্ছে।

কথিত আছে, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে ঢাকার ভাওয়াল অঞ্চল থেকে বাঙ্গালীরা ধর্মপ্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলে বসতি গড়ে তোলে। তবে কখন থেকে ভারতের আদিবাসীগণ রাজশাহীতে এসে বসবাস শুরু করে তা সঠিক ভাবে বলা যায় না। কিন্তু ঢাকার ভাওয়াল অঞ্চল থেকে কখন থেকে শুরু হয় তার একটি চিত্র ইতিহাস ঘাটলে আমরা পাই। জানা যায় যে, ভাওয়াল অঞ্চলের "পলু শিকারীর" আগমনের মধ্য দিয়ে রাজশাহীতে খ্রিস্টভক্তদের আগমন শুরু হয়। আনুমানিক ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে পলু শিকারী, তার ভাই ডেঙ্গুয়া গমেজ ও নাগর রোজারিও সহ আরো বেশকিছু মানুষ মথুরাপুর বসতি গড়ে তোলে। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ভাওয়ালের লোকদের বসতির ফলেই বনপাড়া ধর্মপল্লী গড়ে ওঠে। অন্যদিকে প্রতিটি ধর্মপল্লীতেই ভাওয়ালের লোকের দেখা পাওয়া যায় বা শোনা যায়। তবে এত সবকিছুর পিছনে পলু শিকারীর নাম সব সময়ই ওঠে আসে কেননা তার দ্বারাই ভাওয়াল থেকে রাজশাহীতে খ্রিস্টভক্তদের আগমন শুরু হয়। ভাওয়াল থেকে আসার পর কিন্তু তারা নিজস্ব কৃষ্টি সংস্কৃতির চর্চাই করতেন ভাওয়াল থেকে আগত বাঙ্গালী খ্রিস্টান লোক সংস্কৃতির সাথে সেই একই খ্রিস্টবিশ্বাস ওতোপ্রোতভাবেই জড়িত।

ভাওয়াল কৃষ্টি/সংস্কৃতি/লোকাচার: ভাওয়াল কৃষ্টিতে লোকাচার রয়েছে যা খ্রিস্টবিশ্বাস প্রচার ও প্রসারে অনেক অগ্রগতি লাভ করেছে। এগুলোকে আবার খ্রিস্টীয় লোকাচারও বলা হয়ে থাকে। এই লোকাচারগুলো অনেকটা মানুষের সত্তার সাথেই মিশে গেছে। ভাওয়াল লোকাচার ও কৃষ্টিগত দিকগুলোর মধ্যে রয়েছে- বাইবেলের বিভিন্ন ঘটনা ও যিশুর জন্ম কাহিনী ও যাতনাভোগের কাহিনী নাটক, পালাগান কীর্তন ও পালা গানের মাধ্যমে খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের চর্চা করা। ভাওয়াল কৃষ্টি-সংস্কৃতির মধ্যে বিভিন্ন ধরণের বাদ্যযন্ত্রেরও ব্যবহার রয়েছে। যেমন- ঢোল, খোল, করতাল, বাঁশি, তবলা, হারমোনিয়াম, খোমক ইত্যাদি। এছাড়া বিভিন্ন আচার-প্রথা, রীতিনীতি, মানত তীর্থ উৎসব, ধর্মীয় জিনিসপত্রের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন, নিশি জাগরণী প্রার্থনা উপবাস, জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহের রীতিনীতি বা সংস্কার খ্রিস্টীয় লোকাচার হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে যা খ্রিস্টবিশ্বাসের প্রচারেরও একটা মাধ্যম হিসেবে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। ভাওয়াল থেকে আগত বাঙ্গালী খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ এখনও পর্যন্ত নিজস্ব কৃষ্টি- সংস্কৃতি ও লোকাচারগুলোর মধ্য দিয়ে বিশ্বাসের চর্চা করে যাচ্ছে যার কিছু কিছু দিক নিম্নে তুলে ধরা হল:

বসতবাড়ি/আবাসস্থল: ভাওয়াল থেকে আগত আমাদের খ্রিস্টবিশ্বাসীগণের বাড়িঘর তৈরি ক্ষেত্রেও এই লোকাচার নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। ভাওয়াল খ্রিস্টান বাঙ্গালীরা রাজশাহী অঞ্চলে আসার পর বিভিন্ন জায়গায় বসতি স্থাপন করে। ঐতিহ্যগতভাবেই ভাওয়াল খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ তাদের বসতবাড়িতে বিশ্বাসের কোন কোন চিহ্নের মাধ্যমে খ্রিস্টীয় পরিচয় প্রকাশ করে থাকে। প্রায় প্রতিটি পরিবারে ঘরের চালে ক্রুশ দিয়ে থাকে যাতে অন্য মানুষ বুঝতে পারে যে এরা খ্রিস্টান বা এটা খ্রিস্টান পরিবার। ঘরে দেওয়ালে আলতার বানানো হয় সেখানে বিশেষভাবে আলতার বানিয়ে রাখতো যেখানে পবিত্র বাইবেল, মূর্তি রাখা হয়। চেনার আরও একটি মাধ্যম হল তারা গলায় ক্রুশ পরিধান করার মধ্য দিয়ে খ্রিস্টান হিসেবে পরিচয় বহন করে।

জপমালা/রোজারি প্রার্থনা: ভাওয়াল থেকে আসা খ্রিস্টবিশ্বাসীদের খ্রিস্টীয় লোকাচারের মধ্যে প্রার্থনা বা র‍্যাজার হল বিশ্বাস অনুশীলনের একটি মাধ্যম। তারা জপমালা প্রার্থনায় ধন্যবাদের ডালি ও সকল যাচ্না মা মারীয়ার মধ্যস্থতায় পিতার নিকট তুলে ধরতেন। অনেক আগে থেকেই এটা একটা রীতি ছিল সন্ধ্যা বাতি দেওয়ার পর পর বাড়ির ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের বাধ্যগতভাবে ঠাকুর মা ও ঠাকুর দাদাদের সাথে প্রতিদিন প্রতিটি পরিবারে পবিত্র রোজারি মালা প্রার্থনা করা হতো। অনেক সময় দেখা যেত ভোরে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করা এবং সন্ধ্যা বেলায় শত কাজের ফাঁকে সকলে মিলে জপমালা প্রার্থনা করাটা ছিল খ্রিস্টভক্তদের একটি দৈনিক নিয়ম। এই জপমালা প্রার্থনা আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের দৃঢ়তাকে আরো সক্রিয় ও মজবুত করে তুলে। আগের মানুষের মধ্যে একটা সুন্দর অনুশীলন ছিল যে প্রতিটি গ্রামে বয়স্কদের নিয়ে একটি প্রার্থনা দল থাকতো যারা গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে সময় করে জপমালা প্রার্থনা করতো ঐ বাড়ির এবং সকলের মঙ্গল কামনা করে।

ঐতিহ্যবাহী বৈঠকী গান: ভাওয়াল সংস্কৃতিতে বৈঠকী গান ও কীর্তন খুবই ঐতিহ্যবাহী যা খ্রিস্টীয় লোকাচার হিসেবেও বিবেচিত। বড়দিন বা পাস্কা পর্বের সময় বিশেষভাবে এই গান দলগতভাবে করা হয়। এই গানের জন্য বিভিন্ন ধরণের বাদ্যযন্ত্রও ব্যবহার করা হয়। যেমন ঢোল, খোল, করতাল, হারমোনিয়াম ইত্যাদি। এই গানগুলো করার সময় নাচ-গান ও বাজনার সুন্দর একটি শৈল্পিক দিক ফুটে ওঠে। বৈঠকী গানগুলো মূলত পবিত্র বাইবেলের বিভিন্ন ঘটনার একটি সুন্দর চিত্র তুলে ধরে। এই গানগুলো শুনলে মনে হয় যেন বাইবেল থেকে যিশুর জন্মকাহিনী তালে ও ছন্দে সুরের মাধুর্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করা হয়। যেমন-

– ঈশ্বরের আদেশ পাইয়া, স্বর্গীয় দূত আসিয়া --- বলেন মেরীর পাশে দাঁড়াইয়া

– যিশু চলিলেন বেড়াইতে গো ---- একদিন সাগর মাঝে

ঐহিত্যবাহী কীর্তন গান: ভাওয়াল এলাকায় কীর্তন গান কৃষ্টি-সংস্কৃতির একটি বিশেষ দিক। বিশেষভাবে বড়দিন ইস্টারের সময় এই কীর্তন গান খুবই ঐহিত্যবাহী যা বড়দিন ও ইস্টার উৎসবকে আরও আনন্দময় করে তোলে। ভাওয়াল থেকে আগত বাঙ্গালী খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ এখনও এই ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। বড়দিনের অনেকদিন আগে থেকেই চলে এই কীর্তন প্রস্তুতি। অনেক ধর্মপল্লীতে বড়দিনের সময় কীর্তন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। মূলত এই গানগুলো যিশুর জন্ম কাহিনীর বর্ণনা যা ছন্দে তালে ও গানের সুরে উপস্থাপন করা হয়। যেমন;

– দূতে খবর দিলো রাখালগণে, জন্মেছেন যিশু ঐ গোশালে

- আজি ঘুমাইও না আর ঐ শোনা যায়, আকাশেতে দেবদূতেরা মৃদঙ্গ বাজায়

কষ্টের গান যিশুর যাতনাভোগের গান: ভাওয়াল লোক সংস্কৃতিতে বিভিন্ন ধরণের পালা গান রয়েছে যা খ্রিস্টবিশ্বাসী চর্চা বা অনুশীলনের একটি মাধ্যম। এই গানগুলোর বয়স অনেক প্রাচীন যা যুগ যুগ ধরে মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসছে। প্রায়শ্চিত্তকালের গোটা সময় যিশুর কষ্টের পালাগানের মধ্য দিয়ে তাঁর যাতনাভোগের

কথা স্মরণ করা হয়। আমাদের ভাওয়াল অঞ্চলে এই গানটিকে বলা হয় কষ্টের গান বা যিশুর যাতনাভোগের গান। এখনও কোন কোন ধর্মপল্লীর গ্রামে গ্রামে এই কষ্টের গান করা হয়।

ঠাকুরের গীত বা সাধু আন্তনীর পালাগান: ভাওয়াল এলাকায় আরও একটি বিশেষ পালাগান রয়েছে তা হল ঠাকুরের গীত বা সাধু আন্তনীর পালাগান। এই পালাগানের মোট ১২টি প্যারা রয়েছে। এই গানের যিনি দলনেতা থাকেন তাকে বলা হয় ঠাকুর। ঠাকুর এর সাথে দোয়ারে একজন থাকেন আর বাজনা বাদক কয়েকজন থাকেন যারা দোয়ারে গান করেন। কোন পরিবারে যখন সাধু আন্তনীর কাছে মানত করা হয় তখন এই মানত পূরণের জন্য সাধু আন্তনীর পালা গান করা হয়। যেমন-

"দুই শয়তান চলে গেল/ ট্যারাটুরি দুই শয়তানে/ছোট শয়তান উঠিয়া বলে/ কি প্রকারে দিবা ভাঙ্গি.....

লাগছে কহিবারে/ ছোট শয়তান উঠিয়া বলে / এই মতে না পারিলাম ভক্তের..."

জারি গান, যাত্রা ও চিত্রনাট্য: ভাওয়াল কৃষ্টি-সংস্কৃতির আরেকটি দিক হল জারি গান। যদিও এই জারি গান আমাদের বাঙ্গালি কৃষ্টির একটি ঐতিহ্যবাহী গান তবুও আমাদের ভাওয়াল খ্রিস্টানগণ এই জারি গান বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে গেয়ে থাকেন। এই জারিগানগুলো অনেক সময় বাইবেল এর বিভিন্ন ঘটনার আলোকেও প্রস্তুত করা হয়।

সাধ্বী আগ্নেশের পালা গান: সাধ্বী আগ্নেশের পালা গান ভাওয়াল সংস্কৃতির একটি ধর্মীয় পালা গান। এই পালা গানের মধ্যে মূলত সাধ্বী আগ্নেশের জীবন কাহিনী তুলে ধরা হয়। এছাড়া সাধ্বী ফিলোমিনার পালাগানও প্রচলিত ছিল। বর্তমানে যদিও আগ্নেশের পালা গান, সাধ্বী ফিলোমিনার পালা গান কম দেখা যায় কিন্তু কষ্টের গান বা যিশু লীলা এখনো পর্যন্ত গাওয়া হয়।

মৃতদেহ সমাধিস্থ/মরা মাটি: ভাওয়াল বাঙ্গালী খ্রিস্টান কোন মানুষ মারা গেলে কিছু রীতিনীতি বা সংস্কার অনুসারে মৃতদেহ সমাধি করা হয়। মৃত ব্যক্তির মাথার কাছে একটি ছোট্ট ক্রুশ দেয়া হয়, মোমবাতি ও আগর বাতি জ্বালানো হয়। প্রচলিত বিশ্বাস আছে কোন মানুষ মারা গেলে তাকে সমাহিত করা না পর্যন্ত ঐ বাড়িতে চুলা জ্বালানো যাবে না এমনকি নিরামিষ খেতে হবে। আত্মীয়স্বজন সবাই না আসা পর্যন্ত মৃতদেহ রাখা হয়। গ্রামের মহিলা সেনাসংঘ আত্মীয়স্বজন মৃত ব্যক্তির পাশে বসে প্রার্থনা করেন। নিয়ম অনুসারে মৃতদেহ গোসল করানোর পর পোশাক পড়ানো হয় এবং কফিনে সাদা কাপড় দিয়ে মৃতদেহ জড়িয়ে রাখা হয়। মৃতদেহ যখন বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া হয় তখন একটা মগে করে পানি ঢালতে ঢালতে বিদায় জানানো হয়। গির্জায় নিয়ে মৃতদেহ রাখা হয় এবং যাজক সমাধির জন্য প্রার্থনা করেন, শেষে কবর আর্শিবাদ করে মৃতদেহ সমাহিত করা হয়। ভাওয়াল কৃষ্টিতে কীর্তন করতে করতে মৃতদেহ সমাধি স্থানে নিয়ে যাওয়ারও প্রচলন আছে।

নিরামিষ, চল্লিশা, শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান: প্রচলিত একটা বিশ্বাস আছে যে কোন ব্যক্তি মারা গেলে মৃত ব্যক্তির আত্মা বাড়ির আশেপাশে ঘুরে বেড়ায় তাই তিনদিনের দিন নিরামিষ অনুষ্ঠান করা। বিশেষভাবে তার আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করা হয় এবং মাছ ভাত খেয়ে থাকে তবে তে-মাথা রাস্তায় সেই ব্যক্তির আত্মার কল্যাণে ভোগ দেওয়া হয় যেন তার আত্মা শান্তি পায়।

নিশিজাগরণী ও রোজামুখে প্রার্থনা: নিশিজাগরণী প্রার্থনা ভাওয়াল কৃষ্টিতে একটি বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠান। এই প্রার্থনা মূলত সেনাসংঘের মহিলারা বা প্রার্থনার দল কোন বাড়িতে প্রার্থনার জন্য আহ্বান করলে সন্ধ্যা থেকে এই প্রার্থনা শুরু করেন এবং সকালে শেষ করেন। কোন পরিবারে যদি বিশেষ উদ্দেশ্য মানত করে তাহলে এই প্রার্থনা করাতেন। আবার আরেক ধরণের বিশেষ প্রার্থনা আছে তা হল রোজামুখে প্রার্থনা। এই প্রার্থনাটি গ্রামের প্রার্থনা দলের মহিলাগণ বা সেনাসংঘের দল মহিলাগণ করে থাকেন।

প্রায়শ্চিত্তকালীন ক্রুশের পথ ও প্রার্থনা: প্রায়শ্চিত্তকালে ক্রুশের পথ একটি ধর্মীয় দিক আছে তারপরও মানুষ গ্রামে গ্রামে এই ক্রুশের পথ করে থাকে। ক্রুশের পথের মধ্য দিয়ে যিশুর সেই যন্ত্রনাময় কষ্ট ও ক্রুশ মৃত্যুর কথা স্মরণ করেন। তপস্যাকালে গির্জায় প্রতি শুক্রবার ক্রুশের পথ করা হয়। পূণ্য শুক্রবারে বা এর আগের শুক্রবারে যিশুর যাতনাভোগের কাহিনী অভিনয়ের মাধ্যমে জীবন্ত ক্রুশের পথ করা হয়ে থাকে। এই অভিনয়ের মধ্য দিয়ে যিশুর কষ্ট ও যন্ত্রনাময় জীবনযাত্রা ফুটিয়ে তোলা হয়।

ভাওয়াল কৃষ্টিতে বিবাহের রীতিনীতি: ভাওয়াল কৃষ্টিতে বিবাহের অনেক রীতি-নীতি ও নিয়ম কানন রয়েছে। প্রথমেই ছেলেমেয়ের পরিবারের মধ্যে দেখাশোনা ও কথা বার্তা চলে। তারপর বান লেখার জন্য দিন তারিখ নির্ধারণ করা হয়। বান লেখার পর মেয়ের বাড়িতে থেকে পানমাছ অনুষ্ঠান করা হয়। এখানে পরিবারের আত্মীয় স্বজন ও সমাজের প্রধানদের সামনে ছেলেমেয়েদের জবাজব শোনা হয়। গির্জায় তিন রবিবার বান পরার পর বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিয়ের আগের দিন ছেয়েমেয়ের গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান হয় যা কামানি-গাদ্দানি অনুষ্ঠানও বলা হয়। বিয়ের দিন গির্জায় বিবাহ আশীর্বাদ অনুষ্ঠান হয়। নববধু ও বরকে বেগুন ফুলের মালা দিয়ে ও শাড়ি বিছিয়ে ঘরে বরণ করে নেওয়া হয়। এছাড়া বিয়ের পরে মেয়ের বাড়িতে কুটুম্ব সাদর ও ফিরিনি অনুষ্ঠানও হয়।

বিভিন্ন ভোজ-উৎসব রীতি ও অনুষ্ঠান: ভাওয়াল কৃষ্টি-সংস্কৃতিতে বিভিন্ন ধরণের ভোজ উৎসব হয়ে থাকে। যেমন- বিয়ে, শ্রাদ্ধ, নিরামিষ, চল্লিশা, জন্মদিন। এই সকল উৎসব অনুষ্ঠানে যেখানে বহু মানুষ সমবেত হয় সেখানে সমাজের প্রধান, মাতব্বর, কার্জারু সকল অনুষ্ঠানের শুরুতে ঈশ্বরের আশীর্বাদ চেয়ে ও শেষে ধন্যবাদমূলক প্রার্থনা করে। যেমন- বিবাহ উৎসবে গায়ে হলুদের আগে ও পরে, ভোজের আগে প্রার্থনা করা হয়।

বিবিধ রীতি নীতি ও প্রথা: ভাওয়াল লোকসংস্কৃতিতে বেশ কিছু রীতি নীতি রয়েছে যার মাধমে খ্রিস্টবিশ্বাস প্রকাশ পায়। ভাওয়াল লোকসংস্কৃতিতে বিবাহ অনুষ্ঠানে আশীর্বাদ দেওয়ার রীতিকে বলা হয় 'ব্যাছান দেয়া'। এক্ষেত্রে বড় গুরুজনেরা যখন আশীর্বাদ দিবে তখন কপালে ক্রুশ চিহ্ন একে আশীর্বাদ দিবে আর বর-কনে তাদের কাছ থেকে আশীর্বাদ গ্রহণ করবে। এছাড়া অন্যান্য অনুষ্ঠান গুলোতেও ছোটরা বড়দের কাছ থেকে আশীর্বাদ নেওয়ার প্রচলন আছে। এমনকি কোথাও যাওয়ার আগে ছোটরা বড়দের আশীর্বাদ নিয়ে থাকে।

বিভিন্ন তীর্থস্থান ও তীর্থোৎসব পালন: আমরা জানি, ভাওয়াল খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ ধর্মানুরাগী মানুষ। তাই বিভিন্ন তীর্থ উৎসবে যোগদানের জন্য দূরদুরান্ত থেকে আসে। আমাদের রাজশাহীতে মূলত তিনটি স্থানে মানুষ বেশি তীর্থ উৎসবে যোগ দিয়ে থাকে। কাতুলিতে সাধু আন্তনীর তীর্থ, মুহিপাড়াতে সাধু আন্তণীর তীর্থ ও নবাইবটতলা রক্ষাকারিণী মা মারীয়ার তীর্থ উৎসব। এই তীর্থ উৎসবে ভাওয়াল খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ নিজেদের মানত, প্রার্থনা নিবেদন করেন। অনেকে আবার মানতের বিভিন্ন পশুপাখি, ফল-ফলাদি ও দ্রব্যাদি উৎসর্গ করেন।

কুমারী মারীয়ার মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা: আমাদের ভাওয়াল কৃষ্টিতে কুমারী মারীয়ার মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা করার একটা ঐতিহ্য আছে। বিশেষ করে মে মাসে মারীয়া সংঘ মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা করে প্রার্থনা করে। মে মাসের শেষ দিয়ে বিভিন্ন গ্রাম থেকে মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা করে গির্জায় আসেন ও প্রার্থনা করেন খ্রিস্টভক্তরা। ভাওয়াল থেকে আগত খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ এই ঐতিহ্য এখনো ধরে রেখেছে। ঐ দিনে গ্রামের মহিলা-পুরুষ-শিশু সবাই মিলে এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে।

সাধু-সাধ্বীদের জীবনী ভিত্তিক গীতি নাট্য: ভাওয়াল কৃষ্টিতে মঙ্গল সমাচারের বিভিন্ন ঘটনা অভিনয়ের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। প্রভু যিশুর জন্ম কাহিনী, যাতনাভোগ কাহিনী ও বাইবেলের বিভিন্ন ঘটনা অভিনয়

করে দেখানো ভাওয়াল লোকসংস্কৃতির একটি পুরোনো ঐতিহ্য। এছাড়া বিভিন্ন সাধু-সাধ্বীদের জীবনকাহিনীর উপর নাচ, গান, যাত্রা ও নাটকের মধ্য দিয়ে তুলে ধরে। অনেক অখ্রিস্টান ভাইবোনেরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে জানতে পারে। যদিও বর্তমানে এই অভিনয়গুলো আগের মত করা হয় না তবে কোন কোন ধর্মপল্লীর জনগণ এখন পর্যন্ত ধরে রেখেছে। প্রভু যিশুর যাতনাভোগ কাহিনীর অভিনয় মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে বিশ্বাসকে আরও গভীর করে। যেমন-

"দিয়াবল: ওহে যিশু তুমি কেন ক্ষুধায় মরছ? তুমি তো ঈশ্বরের পুত্র, তবে এই পাথরগুলিকে রুটিতে পরিণত কর

দিয়াবলের গান: ক্ষুধায় কেন মরগো? ঈশ্বরের পুত্র হয়ে ক্ষুধায় কেনে মরগো?

যিশু: ওহে, মানুষ কেবল রুটিতে বেঁচে থাকে না। শুধু ঈশ্বরের বাক্যেই মানুষ বেঁচে থাকে।"

আগমনকালীন নভেনা: বড়দিনের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির মধ্যে একটি বিশেষ দিক হল আগমনকালীন নভেনা। প্রতিটি ধর্মপল্লীতে খুবই গুরুত্বের সাথে এই নভেনা প্রার্থনা করা হয়। বড়দিনের নয়দিন আগে থেকেই আগমনকালের নভেনা শুরু হয়। খ্রিস্টভক্তগণ সেই নভেনার প্রার্থনায় অত্যন্ত ভক্তিময় ভাব নিয়ে নভেনা প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করে থাকে। বড়দিনের আগে মানুষ আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে যেন বড়দিনে যিশুকে নিয়ে আরও বেশি আনন্দ করে পারে। বড়দিনকে আরও বেশি অর্থপূর্ণ করতে মানুষ প্রার্থনা করে থাকে। এছাড়া আবার কেউ কেউ উপবাস থাকার মাধ্যমেও নিজেদের হৃদয় মন প্রস্তুত করে থাকে। বড়দিনের বেশ অনেকদিন আগে থেকেই মহিলা সেনাসংঘ বা অন্যান্য প্রার্থনার দল গ্রামের প্রতিটি পরিবারে গিয়ে প্রার্থনা করে থাকে। বিশেষভাবে, ভাওয়াল অঞ্চলে আমরা এই ঐতিহ্যগত দিকটি দেখতে পাই। বড়দিনকে ঘিরে মানুষের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির একটি বিশেষ দিক হল পরিবারে প্রার্থনা অনুষ্ঠান।

বড়দিন ও পাস্কা উৎসব: বড়দিন, ইস্টার এর সময় মানুষ আগে থেকেই বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক অনেক ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। গ্রামে বড়দিনের প্রায় একমাস আগে থেকেই বাড়িতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ শুরু করা হয়। ছোটবেলায় দেখেছি, বড়দিনকে কেন্দ্র করে প্রস্তুতির ধুম পড়ে যেতো, বাড়িতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, ধোঁয়ামুছা, চালের গুঁড়ি কোটা, ঘরের দেওয়ালে ফুল আঁকা, শুভ বড়দিন লেখা, সন্ধ্যায় কীর্তন অনুশীলন করা সবই যেন বড়দিনের একটা আমেজ তৈরি করার মাধ্যম। আগের দিনে যেহেতু বেশিরভাগ মাটির ঘর ছিল তাই মাটির ঘর লেপা-মুছা করতো, আবার অনেক বাড়িতে গাছের মধ্যেও চুনকাম করে সুন্দর করে সাজাতো। এছাড়া বাড়িতে কাপড়-চোপড় ধুইয়ে পরিষ্কার করে নতুন ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতো। বিভিন্ন ধরনের রঙ্গিন কাগজ, ফুল, জরি, বেলুন ঝালট দিয়ে বাড়ির উঠান ও ঘর সাজানো, কলাগাছ দিয়ে সাজানোর প্রচলন ছিল অনেক বেশি।

ইস্টারের আগে পুণ্য বৃহস্পতিবারে পিঠার পায়েস রান্না করা হয়। ইস্টারের দিন দই মিষ্টি- খই, মুড়ি, চিড়া-গুড়, কলা খাওয়ার একটা প্রচলন আছে তাই আগে থেকে এগুলো কিনে রাখে বা বাড়িতেও কিছু কিছু তৈরি করে থাকে। বড়দিন বা পাস্কাকে কেন্দ্র করে শুধু যে বাহ্যিক প্রস্তুতিই মানুষ গ্রহণ করতো তা নয়। বড়দিনের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির জন্য নয়দিন আগে থেকেই আগমনকালের নভেনা শুরু হয়। খ্রিস্টভক্তগণ সেই নভেনা প্রার্থনায় অত্যন্ত ভক্তিময় ভাব নিয়ে অংশগ্রহণ করতো। এখনও সেটা হয় তবে অংশগ্রহণ খুবই কম! এমনকি বড়দিনের আগে যে পাপস্বীকার সংস্কারের আয়োজন করা হয় ইস্টারের সময়ও একই ভাবে আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি থেকে এখন পাপস্বীকারের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া বড়দিন ইস্টারে একে অন্যের বাড়িতে আশীর্বাদ নিতে যাওয়া, সমাজে বৈঠকি গান করা, বাড়ি বাড়ি কীর্তন করা, বৈঠক খাওয়া প্রচলিত ঐতিহ্য আছে।

খ্রিস্টযাগে প্রথম ফসল ঈশ্বরের কাছে নিবেদন: অতীতে সাধারণ খ্রিস্টভক্তগণ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে খুব বেশী ভক্তিপূর্ণ এবং যাজক নির্ভর ছিল। উপাসনায় যদিও তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল না অর্থাৎ না বুঝেই অনেক সময় উত্তর দিতেন এবং যাজককে অনুসরণ করতেন তথাপি তাদের ভক্তি ও বিশ্বাসের মধ্যে এতটুকুও ঘাটতি ছিল না। বরং বিশ্বাসের দৃঢ়তায়, আবেগ-অনুভূতি প্রকাশে তারা ছিল সদা বিশ্বস্ত এবং তৎপর। বর্তমান সময়ে খ্রিস্টভক্তদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান থেকে ভক্তির ভাব অনেকটা কমে গেছে। যদিও এখন সাধারণ খ্রিস্টভক্তগণ আগের থেকে অনেক বেশি সচেতন তবুও তাদের বিশ্বাসের প্রকাশের ক্ষেত্রে অনেকটা ঘাটতি দেখা যায়।

অন্যান্য আরও কিছু লোকাচার: ভাওয়াল কৃষ্টি-সংস্কৃতি বা লোকাচার অনেক সমৃদ্ধ। এই গুলোকে সম্বল করে খ্রিস্টবিশ্বাসীরা তাদের সাক্ষ্য দিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে অনেকের কাছে তা কুসংস্কার বা অবিশ্বাস্য বলেও মনে হতে পরে। যেমন- পুণ্য শনিবারে আশীর্বাদিত জল ও আগুন ঘরে আনা, তালপত্র পরিবারে খেজুর পাতা বাড়িতে রাখা। কথিত আছে যখন বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য মাসে ঝড় হয় তখন সেই আশীর্বাদিত খেজুরপাতা ছিটিয়ে দিলে বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কারো মৃত্যুবার্ষিকীতে ও অন্যান্য সময়ে মৃতদের স্মরণে প্রার্থনা করা ও খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য দান, প্রায়শ্চিত্তকালে রোজা রাখা, প্রায়শ্চিত্তকালের শুক্রবার গুলোতে নিরামিষ খাওয়া। পরিবারে কোন নতুন সন্তানের জন্ম হলে মা ও শিশুকে আটদিন ঘরে থাকতে হয় এবং পরে একটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নবাগত সন্তানকে আত্মীয় স্বজনদের দেখানো হয়, সবাই সেই শিশুকে আশীর্বাদ করেন। আবার অনেক সময় দেখা যায় কোন কোন পরিবারে সন্ধ্যায় ধূপ জালিয়ে বাড়ির আশে পাশে দেওয়া হয় অমঙ্গল থেকে রক্ষা পেতে। এছাড়া আরও অনেক ধরণের লোকাচারে বিশ্বাসী হয়ে ভাওয়াল খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ নিজেদের বিশ্বাসের সাক্ষ্য দিয়ে যাচ্ছে। মূলত প্রত্যেকটি লোকাচারের অর্ন্তনিহিত অর্থ আছে যা খ্রিস্টীয় বিশ্বাসকে আরও বেশি সুদৃঢ় করে তোলে।

সময়ের আবর্তে ভাওয়াল ও রাজশাহী অঞ্চলে খ্রিস্টীয় লোকাচার মানুষের বিশ্বাস বিস্তার লাভে অনেকাংশে সাহায্য করেছে। বিশ্বাসের যাত্রায় এখনকার খ্রিস্টভক্তগণ চরম শিখরে পৌঁছতে না পারলেও তাদের বিশ্বাসের সাক্ষ্যদান কিন্তু একেবারে ফেলে দেবার মত নয়। খ্রিস্টীয় বিশ্বাস মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসার দান। ভাওয়াল খ্রিস্টভক্তগণ প্রায় পাঁচ শতাব্দী ধরে এবং রাজশাহীতে আগত ভাওয়াল খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ বিগত ১০০ বছর যে বিশ্বাস হৃদয়ে লালন করে আসছে তা সমকালের জাগতিকতায় কোন ভাবেই মলিন হতে পারে না। এই বিশ্বাস যে তাদের একমাত্র খ্রিস্টীয় পরিচয়। তাই আত্মপরিচয় সমুন্নত রাখতে ভাওয়াল ও রাজশাহী অঞ্চলের ধর্মপ্রাণ জনগণের অবশ্যই খ্রিস্টকে হৃদয়ে রাজত্ব করতে দিতে হবে যেন সকলেই সেই কাঙ্ক্ষিত ঐশরাজ্যের অংশীদার হতে পারে। অতীতে বিভিন্ন গ্রামে যিশুলীলা, আগ্নেশের পালা, ঠাকুরের গীত, সাধু আন্তনীর গান এ সমস্ত লৌকিক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে জনগণ খ্রিস্টীয় বিশ্বাসে আরো দৃঢ়তা লাভ করতো। গ্রামের খ্রিস্টভক্তদের খ্রিস্টবিশ্বাস ধরে রাখার অন্যান্য উপায় এইসব লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানগুলো গ্রামের ঐতিহ্য থেকে আজ হারিয়ে যেতে বসেছে বা হারিয়ে গেছে।

সহায়ক গ্রন্থাবলী:

১. *রোজারিও, যোহন উত্তম: ভাওয়াল লোকসংস্কৃতিতে খ্রীষ্টবিশ্বাসের প্রকাশ, স্মরণিকা, রজত জয়ন্তী, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ খ্রীষ্টাব্দ।*

২. *কস্তা, ফাদার দিলীপ এস.: বাণী প্রচারের শত মঞ্জরীতে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ, স্মরণিকা, বিশপীয় অভিষেক, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ, ২২ মার্চ, ২০০৭।*

৩. *গমেজ, জনি হিউবার্ট: ভাওয়াল অঞ্চলে খ্রীষ্টিয় বিশ্বাস একাল ও সেকাল, দীপ্ত সাক্ষ্য, ৩৮শ বর্ষ, জুন, ২০১২।*

প্রান্তের আলো : বড়দিন ও বাংলাদেশের সংখ্যালঘু রাজনীতি

অপু প্লাসিড

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হওয়া মানে কী?

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হওয়া মানে হচ্ছে রক্তমাংসের শরীর থাকার পরও দেশের কাছে, সরকারের কাছে আপনি অদৃশ্য! মানে আপনার নাগরিকত্ব সংবিধানে লেখা থাকলেও বাস্তবে তা আসলে কাজীর গরু খাতায় আছে কিন্তু গোয়ালে নেই অবস্থা। আপনার সম্পত্তি আইনের বইতে সুরক্ষিত থাকলেও যেকোনো মুহূর্তে তা দখল হতে পারে। যেকোনো রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রতিটি ঢেউয়ে আপনিই প্রথম আঘাতপ্রাপ্ত হবেন। আপনার উৎসব, আপনার উপাসনা, এমনকি আপনার অস্তিত্ব নিজেই একটা রাজনৈতিক বক্তব্য কেবল মাত্র। ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে এই বড়দিনে, যখন পৃথিবীর বাকি অংশে খ্রিস্টানরা আলোকসজ্জিত রাস্তায়, উৎসবমুখর গির্জায় এবং সামাজিক উদ্‌যাপনে মগ্ন, বাংলাদেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায় উদ্‌যাপন কিভাবে করবে? অনুমিত হতে পারে কিছুটা নীরবে। ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বরে চট্টগ্রামের পাহাড়ি খ্রিস্টধর্মাবলম্বী বড়দিনের প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করতে যাওয়ায় তাঁদের বসতবাড়ি আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। আর এবার একের পর এক খ্রিস্টান চার্চ - স্কুলে বোমা হামলা, তীর্থস্থানে ভাংচুর-লুটপাট, চার্চের সম্পত্তিতে অগ্নিসংযোগ করার পর এবার নিরাপত্তা তো চোখের দেখায় বেশ কড়া-ই বলে মনে হচ্ছে। সামরিক সুরক্ষার মধ্যে উদ্‌যাপন হচ্ছে বড়দিন। এটাকে এখন কোনো উৎসব নয়, বরং মনে হচ্ছে কোনোমতে বেঁচে থাকার শেষ চেষ্টা! এই নমুনাটাই হলো আজকের বাংলাদেশের সংখ্যালঘু বাস্তবতার সবচেয়ে নিখুঁত প্রতিচ্ছবি।

২০২৪-২৫ : ব্যর্থতার একটি কেস স্টাডি

২০২৪ খ্রিস্টাব্দের ৫ আগস্ট। লম্বা সময় ধরে ক্ষমতায় থাকা এক সরকারের ভূমিধস পতন। ছাত্র আন্দোলনের নামে শুরু হওয়া বিক্ষোভ রাজনৈতিক পালাবদলে রূপ নেয়। কিন্তু এই পালাবদলের সবচেয়ে বড় মূল্য দিতে হয়েছে সংখ্যালঘুদের। Open Doors-এর তথ্য অনুযায়ী, আগস্ট ২০২৪ থেকে এ পর্যন্ত ৩৬টি ভ্যারিফায়েড আক্রমণ হয়েছে শুধুমাত্র খ্রিস্টান সম্প্রদায় এবং তাদের সম্পত্তির ওপর। ১০০+ পরিবারকে জোরপূর্বক চাপ দিয়ে ধর্মত্যাগ করানো হয়েছে। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ রিপোর্ট করেছে ২,১৮৪টি সহিংসতার ঘটনা সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র ৪ আগস্ট থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ এর মধ্যে। বাংলাদেশ পুলিশ নিজেই স্বীকার করেছে ১,৭৬৯টি আক্রমণ এবং হামলার ঘটনা। রাজনৈতিক হোক বা সাম্প্রদায়িক, শিকার সবসময় একই -ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা এবং সবচেয়ে ভয়াবহ যে বিষয়টি: দায়মুক্তি। হামলাকারীরা গ্রেফতার হচ্ছে না, বিচার হচ্ছে না। রাষ্ট্র হয় অক্ষম, নয়তো অনিচ্ছুক আর দু'টোর যেকোনোটাতেই ব্যর্থ কিন্তু রাষ্ট্রই।

Majority Communalism: বেনামী ক্ষমতা

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নিপীড়নের সবচেয়ে ভয়ংকর দিক হলো এটি কোনো একক দল বা সরকারের কাজ নয়। এটি একটি Structural Phenomenon - যা সব সরকার, সব দল, সব শ্রেণীর মধ্যে সমানভাবে বিদ্যমান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল বারাকাতের গবেষণা (২০০০) দেখিয়েছে যে অর্পিত সম্পত্তি আইনের মাধ্যমে সম্পত্তি দখলের সুবিধাভোগীরা সবাই ছিলো রাজনৈতিক দলের মানুষ। এই আন্তঃদলীয় সহমত সংখ্যালঘু নিপীড়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সবচেয়ে উদ্বেগজনক বাস্তবতা। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও একই প্যাটার্ন। ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে আগস্ট-সেপ্টেম্বরে যখন হামলা হয়েছিল, তখন Open Doors-এর কাছে ভুক্তভোগীরা বলেছিলেন: "মুসলিম নেতৃবৃন্দরা বাংলাদেশকে একটি শরীয়াহ শাসিত শতভাগ ইসলামিক দেশ হিসেবে প্রচার করতে আর এর সমর্থনে খ্রিস্টানদেরকে সরাসরি শত্রু হিসেবে দাঁড় করাচ্ছে।" এটা এখন কোনো প্রান্তিক অ্যাখ্যান নয়। এটা মূলধারার অংশই হয়ে উঠছে ইতোমধ্যে এবং ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচনের দিকে এগোতে এগোতে এই মিথ্যাচারটিই আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। কারণ বাংলাদেশে সংখ্যালঘু-বিরোধীতা রাজনৈতিকভাবে খুবই লাভবান একটি বিষয়।

অর্পিত সম্পত্তি আইন: জমি দখলের বৈধতার দলিল

খ্রিস্টান সম্প্রদায় ছোট হলেও তাদের অনেকেই আদিবাসী (যেমন: বম, সাঁওতাল, গারো)। এবং আদিবাসী মানেই ভূমি এবং ভূমি মানেই অর্পিত সম্পত্তি আইনের আওতায় Systematic Dispossession।

কিছু তথ্য :

- ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে শত্রু সম্পত্তি আইন (পরে অর্পিত সম্পত্তি আইন) চালু।

- অধ্যাপক বারাকাতের গবেষণা থেকে পাওয়া যাচ্ছে ১.৬৪ মিলিয়ন একর বা ৬,৬৪০ বর্গ কিলোমিটার জমি হিন্দু সম্প্রদায় থেকে দখল, যা তাদের মোট জমির ৫৩% এবং বাংলাদেশের মোট ভূমির ৫.৩%।

- ৭,৪৮,৮৫০টি পরিবার বাস্তুচ্যুত।

- আনুমানিক ক্ষতির পরিমাণ: ৮৫৫ বিলিয়ন (২০০৭ এর হিসাবে)।

এবং এই আইন শুধু হিন্দুদের বিরুদ্ধে নয়, এটি সব সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছে, বিশেষত আদিবাসী খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে সাঁওতাল খ্রিস্টানদের ওপর হামলায় ৩ জন নিহত, হাজার হাজার গৃহহীন হয়েছিল।

প্রক্রিয়াটি খুবই সহজ :

১. কোনো পরিবারের একজন সদস্যও ভারতে গেলে পুরো সম্পত্তি 'শত্রু সম্পত্তি' ঘোষণা।

২. স্থানীয় প্রভাবশালী, ভূমি কর্মকর্তা এবং রাজনৈতিক গুন্ডারা মিলে দখল।

৩. আইনি লড়াইয়ে যেতে গেলে দশকের পর দশক, অশেষ অর্থব্যয় - অধিকাংশই শেষে আর না পেয়ে ছেড়ে দেয়।

২০০১ খ্রিস্টাব্দে অর্পিত সম্পত্তি ফেরত আইন পাশ হলেও তার বাস্তবায়ন প্রায় শূন্য। কারণ এই আইনের বাস্তবায়ন মানেই সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি ফেরত দেওয়া আর যা কোনো সরকারই চায় না।

প্রাতিষ্ঠানিক জটিলতা : আসল সমস্যা

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নিপীড়ন কোনো ব্যতিক্রম নয়, এটা একটা পুরোনো সিস্টেম। এবং এই সিস্টেমে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান জড়িত:

১. পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী

২০২৪-২৫ খ্রিস্টাব্দের ঘটনাগুলোতে একটা প্যাটার্ন স্পষ্ট: হামলার সময় পুলিশ অনুপস্থিত, হামলার পর পুলিশ 'তদন্ত করছে'। গ্রেফতার নেই, বিচার নেই। Open Doors জানাচ্ছে, 'আক্রমণকারীরা মোটামুটি সবাই-ই জিহাদি ইসলামিক জঙ্গি গোষ্ঠীর সদস্য আর তাদেরকে কখনোই বিচারের মুখোমুখি করা হয় না তাই।" এমনকি যখন গ্রেফতার হয়, তখন দেখা যায় দায় চাপানো হচ্ছে বিরোধী মতের ওপর (যেমন: ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর-নভেম্বরে চার্চ ও মিশনারী স্কুলে বোমা হামলার ঘটনা), কিন্তু বিস্তৃত প্যাটার্নটা

ধর্তব্যের মধ্যেই আনা হচ্ছে না ইচ্ছা করেই।

২. বিচার ব্যবস্থা: অর্পিত সম্পত্তি আইনের ঘটনাটাই দেখুন। বিশেষ ট্রাইব্যুনাল করার কথা ছিল, হয়নি। সাধারণ জমির আইনে মামলা চলে, তারিখের পর তারিখ পরে আর রায় এলেও তা কার্যকর করা হয় না। কারণ বিচার ব্যবস্থা ক্ষমতাবানদের বিরুদ্ধে যেতে কোনোভাবেই রাজি নয়।

৩. রাজনৈতিক দলগুলো: সব দল সংখ্যালঘুদের "ভোট ব্যাংক" হিসেবে দেখে, কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব দেয় না। সংখ্যালঘুরা রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত প্রণয়নেও নেই - সংসদে, মন্ত্রিসভায়, স্থানীয় সরকারে, কোথাও না।

৪. সিভিল সোসাইটি ও মিডিয়া: মূলধারার মিডিয়া সংখ্যালঘু সহিংসতা কভার করে "পাশ কাটিয়ে" - ছোট খবর, পেছনের পাতায়, "বিচ্ছিন্ন ঘটনা"-র তকমা লাগায় এবং যখন কভার করে, তখন "দুই পক্ষের কথা" শোনানোর নামে মিথ্যার বেসাতি সাজায়।

বড়দিনের রাজনৈতিক ধর্মতত্ত্ব: এখন প্রশ্ন হলো: বড়দিন আমার এই নাতিদীর্ঘ এই বিশ্লেষণে কোথায়? এটা কি শুধু একটা এন্ট্রি পয়েন্ট নাকি এর কোনো সংযোগ আদৌও আছে? আছে সংযোগ এবং সেটা গভীর। বড়দিনের মূল ন্যারেটিভ হলো: ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে প্রান্তে একটি জন্ম, যা পরবর্তীতে সমাজ পরিবর্তনের শক্তি হয়ে ওঠে। যিশু জন্মেছিলেন:

- রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে একটি দখলকৃত এলাকায়।

- একটি প্রায় শরণার্থী পরিবারে, কারণ আদমশুমারির জন্য মারীয়া ও যোসেফ বাস্তুচ্যুত অবস্থায় পড়েছিলেন।

- প্রান্তিক পরিচয় নিয়ে। একজন সূত্রধরের ছেলে, যার জন্মও হয়েছিলো বেথলেহেমের গোশালায়। এবং তার পুরো জীবন ছিল ক্ষমতার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো ধর্মকে আধিপত্যবাদের হাতিয়ার বানানোর বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে, সামাজিক বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে রাষ্ট্রীয় সহিংসতার শিকার হতে হয়েছিল।

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বিশেষত খ্রিস্টানরা, এই একই বাস্তবতার মুখোমুখি। তারা Structurally Marginalized, তাদের অস্তিত্ব প্রতিটি মুহূর্তে প্রশ্নবিদ্ধ, তাদের উৎসব হয়ে যায় এক একটা রাজনৈতিক কাণ্ড। বড়দিন উদ্‌যাপন করা মানে বলা: "আমরা এখানে আছি, আর আমরা এখানেই থাকব।"

কিন্তু এখানেই থামলে চলবে না। বড়দিনের ধর্মতত্ত্ব শুধু টিকে থাকা নয়, এটা প্রতিরোধও। এটা বলে যে ন্যায়বিচার কেন্দ্র থেকে আসে না, আসে প্রান্ত থেকে। এটা বলে যে ক্ষমতাবানরা যাই করুক, প্রান্তিকদের কণ্ঠস্বর শেষ পর্যন্ত শোনা যাবেই।

আশা নাকি আত্মপ্রবঞ্চনা?

এখন আসে সবচেয়ে কঠিন প্রশ্নটা: বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য আশা কী? সস্তা আশাবাদ এখানে কোনো কাজে আসবে না। "সব ঠিক হয়ে যাবে" বলা মানে অস্বীকার করা। কিন্তু নিরাশাবাদও সমাধান নয়। প্রয়োজন বিবেচনাপূর্ণ আশা - যে আশা বাস্তবতা দেখে, কিন্তু পরিবর্তনের সম্ভাবনা অস্বীকার করে না।

এই আশার জন্য দরকার :

১. জবাবদিহিতা প্রক্রিয়া: দায়মুক্তি শেষ করতে হবে। সংখ্যালঘু নিপীড়নে প্রতিটি ঘটনার দ্রুত এবং দৃশ্যমান ন্যায়বিচার চাই। স্বাধীন ট্রাইব্যুনাল, দ্রুত বিচার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

২. সাংবিধানিক সংস্কার: বাংলাদেশের সংবিধান-এ ধর্মনিরপেক্ষতা আছে, কিন্তু কার্যকরভাবে নেই। রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। এই দ্বন্দ্ব সমাধান না হলে সংখ্যালঘুরা কখনোই সম্পূর্ণ নাগরিকরূপে পরিগণিত হবে না।

৩. ভূমি অধিকার সুরক্ষা: অর্পিত সম্পত্তি আইন এবং এর সব সংস্করণ সম্পূর্ণ বাতিল। বাজেয়াপ্ত চুক্তি ফেরত, ক্ষতিপূরণ, এবং ভবিষ্যতে সুরক্ষা।

৪. রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব: টোকেনিজম নয়, বরং প্রকৃত ক্ষমতা। সংখ্যালঘুদের আসনে দলগুলোর নেতৃত্বের পদ দিতে হবে। তাদের পক্ষে রাজনৈতিক দলগুলো গঠনের অধিকার স্বীকার করতে হবে।

৫. সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের দায়িত্ব: এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সংখ্যালঘু অধিকার শুধু সংখ্যালঘুদের দায়িত্ব নয়, এটা সংখ্যাগরিষ্ঠেরই দায়িত্ব। মুসলিম সম্প্রদায়কে সক্রিয়ভাবে এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। কেননা, নীরবতার মধ্যে জটিলতার উৎস।

প্রান্ত থেকে কেন্দ্রে: ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের বড়দিন বাংলাদেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের জন্য আরেকটি নীরব উদ্‌যাপন হবে। সামরিক সুরক্ষা থাকবে, কিন্তু মানসিক নিরাপত্তা থাকবে না। আনন্দ থাকবে, কিন্তু সেই আনন্দের স্তরে স্তরে থাকবে ভয়, আতঙ্ক।

কিন্তু এই নীরব উদ্‌যাপনই কিন্তু একটা স্টেটমেন্ট। এটা প্রমাণ করে যে সংখ্যালঘু খ্রিস্টানরা হার মানেনি। তারা টিকে আছে এবং টিকে থাকাটাই প্রথম প্রতিরোধ। বড়দিনের আলো প্রান্তে থেকে যাবে যতদিন না বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে সিদ্ধান্ত নেয় যে সংখ্যালঘুরা সম্পূর্ণ, সমান নাগরিক। যতদিন না Institutional Complicity ভাঙা হয়। যতদিন না Majority Communalism-কে চ্যালেঞ্জ করা হয়।

এবং যখন সেই দিন আসবে, যদি আসে তখন বড়দিনের আলো শুধু প্রান্তেই পড়ে থাকবে না, ছড়িয়ে পড়বে কেন্দ্রেও। কারণ ইতিহাস বলে, আসল পরিবর্তন সবসময়ই একদম প্রান্ত থেকেই আসে।

কিন্তু সেই পরিবর্তনের জন্য শুধু সংখ্যালঘুদের সংগ্রাম যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন সংখ্যাগরিষ্ঠের সচেতনতা, সাহস এবং সংহতি। প্রয়োজন রাষ্ট্রের জবাবদিহিতা। প্রয়োজন একটা সম্মিলিত সিদ্ধান্তের যে, আমরা কেমন দেশ চাই? যেখানে প্রান্তিকরা নিরাপদ, নাকি যেখানে তারা চিরকাল দুর্বল।

এই বড়দিনে, প্রশ্নটা শুধু খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের নয় - প্রশ্নটা বাংলাদেশের সবার। আমরা কি প্রান্তের আলো দেখতে পাচ্ছি? নাকি আমরা চোখ বন্ধ করে রেখেছি?

তথ্যসূত্র:

- Open Doors World Watch List 2025

- Bangladesh Hindu Buddhist Christian Unity Council Reports (2024-25)

- Abul Barkat, "Inquiry into Causes and Consequences of Deprivation of Hindu Minorities in Bangladesh through the অর্পিত সম্পত্তি আইন" (2000)

- UK Home Office Country Policy Report: Bangladesh Religious Minorities (June 2025)

- International Christian Concern Reports (2024-25)

- Catholic News Agency Bangladesh Coverage (2025)

দাও বারতা, দাও আলো

মার্ক অজিত বৈদ্য

দাও বারতা মোর হৃদয়ে
অন্তর কর শুদ্ধ,
চারিদিকের হানাহানি,
ক্ষমতার মিছে বাহাদুরী
শান্তি দাও প্রভু আঁধার ভুবনে,
বন্ধ কর যত যুদ্ধ।
দাও চেতনা, তোমায় চেনার
এই জীবনপথ চলার,
চাল চলনে দাও দৃঢ়তা
বুঝতে দাও সেই বারতা,
তোমার আলোয় কর আলোকিত
হৃদয় কর পুলকিত
তোমার আগমনে,
যেন নব জন্মে হতে পারি 'নবজাত'
অন্তর গোশালে তোমায় পেয়ে
যেন থাকি সদা অবনত।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ব্যবহার্য বৈচিত্র্যময় বস্তু, সাহিত্য ও সংস্কৃতি

রিপন ত্রিপুরা

প্রায়শঃ আমরা খুবই সীমিত অর্থে 'সংস্কৃতি'র ব্যাখ্যা দিয়ে থাকি। সাধারণত নাচ, গান, অভিনয় অর্থাৎ প্রমোদদায়ক সামাজিক উপাদানগুলোকে আমরা 'সংস্কৃতি' হিসাবে বুঝে থাকি। প্রকৃত পক্ষে, সংস্কৃতি খুবই ব্যাপক একটি বিষয়। সমাজ বিজ্ঞানী ও নৃ-বিজ্ঞানীরা মনে করেন, মানুষের জীবন ধারণ ও তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য যা কিছু সৃষ্টি করেছে বা করছে সবকিছুই সংস্কৃতি। সংস্কৃতি মানুষের বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, আইন-কানুন, নৈতিকতা শিল্পকলা এবং অন্যান্য সামর্থ্য ও দক্ষতার যৌগিক সমন্বিত রূপ, যা একজন মানুষ সমাজের সদস্য হিসাবে অর্জন করে। 'সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের সৃষ্টি একটি সামগ্রিক রূপ। এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকা এবং নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য মানুষ শুধু সৃষ্টিই করেনি; সে ধ্বংসও করেছে এবং করছে। আবার অন্যদিকে নতুন করে সৃষ্টিও করেছে এবং করছে- এ সবকিছুই সংস্কৃতি। সংস্কৃতি দুই ধরনের-বস্তুগত ও অবস্তুগত। যা চোখে দেখা যায়, স্পর্শ করা যায় সেগুলো হচ্ছে বস্তুগত সংস্কৃতি, ঘরবাড়ি, পোষাক-পরিচ্ছদ, অলংকার আসবাবপত্র ইত্যাদি। অবস্তুগত সংস্কৃতির উপাদানগুলো শুধু অনুভব করা যায়- ব্যক্তি চিন্তাধারা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, গান, শিল্প-সাহিত্য, ধর্ম, খাওয়ার ধরন, আচার-আচরণের ধরন ইত্যাদি।

সংস্কৃতি প্রকৃত পক্ষে স্থির নয়। এটি পরিবর্তনশীল। বিভিন্নভাবে সংস্কৃতির পরিবর্তন সাধিত হয়। একাধিক জনগোষ্ঠীর দীর্ঘদিন ধরে বাস করার ফলে, ধর্ম পরিবর্তনের ফলে, চাষাবাদ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে, আগ্রাসনের মাধ্যমে, সরকারী নীতি-নির্ধারনের মাধ্যমে একটি সংস্কৃতিতে পরিবর্তন সাধিত হয়। এমনকি সংস্কৃতি কখনো কখনো প্রাপ্ত হয়।

আদিবাসীদের বৈচিত্র্য সংস্কৃতি- প্রকার ও প্রকরণঃ প্রাকৃতিক উপকরণ, আদিবাসী জ্ঞান ও দক্ষতা ব্যবহার করে আদিবাসীরা তাদের নৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় গার্হস্থ্য সামগ্রী, বসতবাড়ী, পোষাক-পরিচ্ছদ ও অলংকার সামগ্রী তৈরি করে। আদিবাসীরা মৃৎ পাত্র, ধাতু নির্মিত সামগ্রী, অলংকার ও হাতিয়ার তৈরিতে তেমন সিদ্ধহস্ত না হলেও অন্যান্য গার্হস্থ্য দ্রব্যাদির নির্মাণ শৈলিতে সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রাখে। পার্বত্য এলাকায় সহজলভ্য উপকরণ হলো বাঁশ, বেত ও কাঠ। অধিকাংশ গার্হস্থ্য দ্রব্য সামগ্রী, ঘরবাড়ি ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করা হয় এসব উপকরণ দিয়ে। বিশেষ করে বাঁশের ব্যবহার অত্যধিক। এছাড়া ছন, পাতা, তুলা, পশুপাখির চামড়া, পালক, শুকনো ফলের খোল ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

বাঁশের তৈরি ঝুড়ি আদিবাসীদের জনজীবনে একটি বহুল ব্যবহৃত ও অপরিহার্য সামগ্রী। বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র রাখার জন্য আদিবাসীরা বিচিত্র ধরনের ঝুড়ি তৈরি করে। এছাড়াও শিশুদের দোলনা, বসার জন্য মোড়া, খাবার পরিবেশনের জন্য মাঁইচা (আসন), মাথার টুপি (লাখু), ফুলের ঝুড়ি, বিভিন্ন জিনিসপত্র বহন করার জন্য ঝুড়ি (নখাই), পরিবারের দামী কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য দামী জিনিসপত্র সংরক্ষিত রাখার জন্য উন্নতমানের ঝুড়ি, ধান রোপনের জন্য ব্যবহৃত ঝুড়ি (কাইন্লিং), মাছ ধরার জন্য ঝুড়ি (স্লাঁ), ধাতু, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র পুংক্লুংমা, মাদু, জাওফা খ্লমা, কসুমুঁ, দাংদুং সহ বাদ্যযন্ত্র বাঁশের দক্ষ ব্যবহার লক্ষণীয়। বাঁশ নির্মিত বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রীর সাথে স্থানীয় জাতের বেতও নিপুণভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আদিবাসীদের সমাজে কাঠের ব্যবহারও অত্যন্ত ব্যাপক। বসতবাড়ির খুঁটি, মাচাংয়ের

ত্রিপুরা আদিবাসীদের 'বখউ'

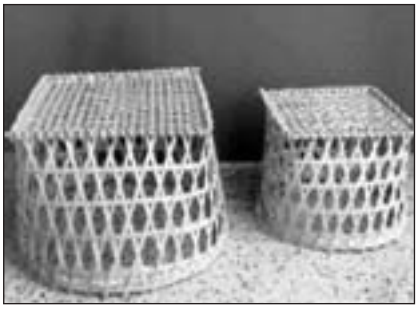

অতিথিদের খাবার টেবিল 'মাউচাঁ'

ধান, তিল, মাপার ঝুড়ি 'তঁ'

কাঠ, উঠানের সিঁড়ি, ধান ভাঙ্গার সরঞ্জাম (রিসাঁ, রম, ডেংগি) মুরগি ও শুকরের খাবার পাত্র (ওয়াও আতু, তাও আতু), গরুর গলার ঘন্টা (খ্লুংখ্লুংমা), সুতা তৈরির চরকা চরকি, (চখা, চখি), রসাঁফি, নৌকা, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র (সেঁদা, চপ্রাইং,খাঁইং) তৈরিতে কাঠ ব্যবহার করা হয়।

গার্হস্থ্য সামগ্রী নির্মাণে অন্যান্য প্রাকৃতিক উপকরণের ব্যবহারও উল্লেখযোগ্য। পাহাড়ি জুমে রোপনকৃত তিতা লাউয়ের শুকনো খোলকে খাবার পানি রাখার পাত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এক জাতীয় লাউয়ের খোল দিয়ে চামচ ব্যবহার করা হয় ও বিভিন্ন শষ্য বীজ রাখার জন্য পাত্র হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। শিকার করা জন্তুর মাথা শো-পিচ, চুরুটের পাইপ, মাথার চিরুনী, বিভিন্ন গাছের পাতা ও বীজের সাহায্যে সৌখিন দ্রব্যাদি নির্মাণে শৈল্পিক নৈপুণ পরিলক্ষিত হয়।

বস্তু তৈরিতেও আদিবাসীরা আত্মনির্ভরশীল। জুম থেকে উৎপন্ন তুলা দিয়ে সুতা কেটে নিজস্ব প্রযুক্তি নির্ভর কোমর তাঁতের মাধ্যমে আদিবাসীরা নিজস্ব প্রয়োজনীয় অধিকাংশ বস্ত্র সামগ্রী তৈরি করে থাকে। হাতির দাঁত ও পশুর হাঁড়ের বিভিন্ন অলংকার তৈরিতে আদিবাসীদের দক্ষতা উল্লেখযোগ্য। তামা, লোহা, রূপা, অষ্টধাতু, সোনা ও পুটির তৈরি বিভিন্ন অলংকার, ঘন্টা ইত্যাদি ব্যাপক থাকলেও পার্বত্য অঞ্চলে এসব তৈরির উপকরণ পাওয়া যায় না এবং এ ধরনের সামগ্রী তৈরির কারিগরি দক্ষতা আদিবাসীদের মধ্যে নেই। তবে এসব ধাতব সামগ্রীতে আদিবাসীদের ঐতিহ্যের ছাপ দৃশ্যমান।

আদিবাসীদের বসতবাড়িঃ পার্বত্যাঞ্চলে আদিবাসীরা উঁচু পাহাড়ের শীর্ষে কিংবা নদী

উপত্যকায় মাচাং ঘর তৈরি করে। চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তংচঙ্গ্যা, খিয়াং আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রধানতঃ নদী উপত্যাকায় এবং ম্রো, লুসাই, বম, খুমী পাংখোয়া, চাক আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকেরা উঁচু পাহাড় শীর্ষে বসত-বাড়ী নির্মাণ করেন। এগুলোর প্রধান উপকরণ গাছ, বাঁশ, বেত ও ছন। আদিবাসী সম্প্রদায় ভেদে বাড়িগুলো আঙ্গক ও কক্ষবিন্যাস স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যেমন: ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের লোকেরা সাধারণত পাহাড়ের কোল ঘেঁষে মাটি থেকে তিন চার হাত উঁচুতে, ম্রো, খুমি, বম, সম্প্রদায়ের লোকেরা মাটি থেকে দশ বারো হাত উঁচুতে মাচাং ঘর নির্মাণ করে। কোন কোন মাচাং ঘরে গৃহস্বামী-স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও অতিথিদের পৃথক শয়ন কক্ষ, খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রামের কক্ষ আছে। আবার কোন কোন মাচাং ঘরে সবাই একসঙ্গে একটি খোলামেলা কক্ষেই খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম ও শয়নের ব্যবস্থা করে। কারো কারো মাচাং ঘরে প্রবেশ মুখে হাত, পা, মুখ ধোঁয়ার পানির ব্যবস্থা, শস্য রাখার জন্য পৃথক গোলাঘর ও রান্নাঘর থাকে। কোন কোন মাচাং ঘরে এ সবের ব্যবস্থা পৃথ কভাবে নেই। তবে প্রত্যেক মাচাং ঘরের নিচে গৃহপালিত পশু, শুকর, ছাগল, হাঁস-মুরগী খোয়ার ও জ্বালানী কাঠ মজুত রাখা হয়। কোন কোন বাড়িতে গবাদি পশু, হাঁস-মুরগী, শুকর, ছাগল ও জালানী কাঠ রাখার জন্য আলাদা মাচাং ঘরের ব্যবস্থা করা হয়।

তবে বর্তমানে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, লুসাই, বম, ম্রো, তংচঙ্গ্যা আদিবাসীসহ কিছু কিছু অগ্রসর আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে মাটির ঘরের পাশাপাশি হাফ পাকা ও বিল্ডিংয়ের ঘর নির্মাণ করতেও দেখা যায়।

গৃহকর্মে ব্যবহার্য বাঁশ বেত তৈরির সামগ্রী: জুম ক্ষেত থেকে বিভিন্ন ফসলাদি বাড়িতে সংগ্রহে আনা বা বাজারে বা অন্য কোথাও মালামাল বহন নিয়ে যাওয়ার জন্য বাঁশের বেতের তৈরি এক ধরনের ঝুড়ি (নখাই) আদিবাসীরা ব্যবহার করে থাকে। সাধারনত গাছের বাকলের চামড়ার দড়ি (ফাথি মকু) তৈরি করে মাথার তালুর সাথে তানা দিয়ে মালামাল সমেত এ ঝুড়ি পিঠের উপর ঝুলিয়ে নেওয়া হয়। প্রায় সব জিনিসই এতে বহন করা যায়। তবে অন্যান্যদের তুলনায় খুমি, বম, ম্রোদের কালোয়াং অত্যন্ত উন্নত। বাঁশ বেতের তৈরি ঢাকনাযুক্ত উন্নতমানের কারুকাজময় ঝুড়িকে (বক্ষউ) বলা হয়। সাধারনত গৃহস্থের মূল্যবান জিনিসপত্র ও পোষাক-পরিচ্ছদ (বক্ষউ) এ সংরক্ষণ করা হয়। বিবাহ অনুষ্ঠানের গহনাপত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ ও প্রসাধনী সামগ্রী (বক্ষউ)এ নেওয়া হয়। শস্য রাখার জন্য বড় ঝুড়ির নাম হলো (ডেংঙ্গিরা)। এতে জুমের ধান, তিল, সুতা আলাদা আলাদা করে ডেঙ্গিরাতে রাখা হয়। মিটিঙ্গা বাঁশ থেকে খুব সুক্ষ্ম বেত তুলে চাপাও তৈরি হয় সাধারনত পান সুপারী ও জরুরী ব্যক্তিগত জিনিস রাখার জন্য চাপাও ব্যবহার করা হয়। খাদ্য শস্য রাখার জন্য বড় আকারের ঝুড়িরে ডুল বা ঢালা বলা হয়। বাঁশের তজ্জা দিয়ে ডুল বা ঢালা তৈরি নকশা হয়। মাচাং ঘরের এক কোনে নির্দিষ্ট স্থানে এই ডুল বা ঢালা বসানো হয়। এটি সহজে স্থানান্তরযোগ্য। তবে কোন কোন মাচাং বাড়িতে স্থায়ীভাবে এই ডুল বা ঢালা বসানো হয়। ডলু বাঁশের বেত দিয়ে জাংখোং তৈরি করা হয়। শস্য ধান, তিল, সুতা, মরিচ শুকানোর জন্য জাংখোং ব্যবহার করা হয়। জাংখোং সাধারনত সাত ফুট আর দশ ফুট লম্বালম্বী সাইজ হয়ে থাকে। প্রয়োজন অনুসারে জাংখোং বড় ছোট বানানো যায়।

গৃহকর্মে ব্যবহার্য গাছ ও কাঠ নির্মিত সামগ্রী: পার্বত্য অঞ্চলে গাছ ও কাঠ সহজলভ্য উপকরণ। উন্নত যন্ত্রপাতি ও কারিগরী দক্ষতা ব্যতিরেকেই আদিবাসী জনগণ বেশ কিছু কাঠের গার্হস্থ্য সামগ্রী নির্মাণ ও ব্যবহার করে। এসব সামগ্রীর অধিকাংশই দা দিয়ে খোদাইকৃত ফলে তা অমসৃণ ও সাধামাটা ধরনের হয়ে থাকে। পার্বত্যাঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে চরকা, চরকি (চখা, চখি) ব্যাপক ব্যবহার লক্ষণীয়। চরকা, চরকি (চখা, চখি) জুমে উৎপাদিত সুতাকে তুলা তৈরি করে সুতা বানানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। এসব চরকা, চরকি (চখা, চখি) নির্মাণ আদিবাসীদের শৈল্পিক নৈপণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ধান ভানার জন্য আদিবাসীরা দুই ধরনের সরঞ্জাম ব্যবহার করে। চাকমা, ত্রিপুরা, তংচঙ্গ্যা, মারমা আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকেরা ধান ভানার জন্য ঢেঁকি ব্যবহার করে। অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকেরা কাঠের গুড়ি দিয়ে তৈরি এক ধরনের হামান (রিসাঁ) দিস্তা ব্যবহার করে। একটি বড় কাঁঠের গুড়িতে গর্ত খোদাই করে তাতে ধান রেখে একটি কাঠের গোলাকৃতি দণ্ড দিয়ে সজোরে আঘাত করে ধান ভানার কাজটি সম্পন্ন করা হয়। চিকন ওগোই হলো ছোট আকৃতির কাঠ নির্মিত হামান দিস্তা বিশেষ। এতে পান, মসলা, তামাক, কফি, মরিচ ইত্যাদি গুড়ো করা হয়। আদিবাসীরা একধরনের নৌকা তৈরিতেও বিশেষ দক্ষতা পরিচয় দেয়। একটি আস্ত সোজা গোল গাছকে কুঁড়াল দিয়ে খোদাই করে এবং প্রক্রিয়ায় গাছের দু'প্রান্তকে উচু করে নৌকা তৈরি করা হয়। মারমা, ত্রিপুরা, খুমী, ম্রো প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায়ের নারী পুরুষ নির্বিশেষে কাঠের তৈরি চিরুনী মাথার চুলে গুঁজে রাখে। পাতলা কাঠের তৈরি এসব চিরুনীতে দৃষ্টিনন্দন নকশা খোদাই করা হয়। লুসাই, বম, ত্রিপুরা, ম্রো, মারমা ও চাকমা প্রভৃতি আদিবাসীরা তৈরি কাঠ দিয়ে থালা, বাতি, চামচ ব্যবহার করে। এ ছাড়াও আদিবাসীরা কাঠের তৈরি গরুর গলার ঘন্টি, পাদুকা/খড়ম, পশু খাদ্যের পাত্র, শিকার লব্ধ পশুর মাথার শো-পিচ প্রভৃতি সামগ্রী নির্মাণে যথেষ্ট পারদর্শিতা প্রদর্শন করে।

গৃহকর্মে ব্যবহার্য অন্যান্য প্রাকৃতিক উপকরণ তৈরি সামগ্রী: পার্বত্যাঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপকরণ ব্যবহার করে গার্হস্থ্য সামগ্রী তৈরির দক্ষতা রয়েছে। এসব উপকরণের মধ্যে লাউ, তাল ও সুপারী গাছ, পাতা, চামড়া, শিং, দাঁত, হাড়, ফুল, ফল ও বিচি উল্লেখযোগ্য। লাউয়ের খোলে পানি রাখার পাত্র, শস্য রাখার পাত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ছোট লাউয়ের খোল দিয়ে চামচ ব্যবহার করা হয়। তাল ও সুপারী গাছ দিয়ে ছোট ছড়া পারাপারের জন্য সাঁকো ও মাচাং ঘরে উঠার জন্য সিঁড়ি তৈরি করা হয়। তালপাতা ও জঙ্গি কিছু মজবুত পাতা দিয়ে তৈরি হয় চমৎকার নকশা, আঁকা হাত পাখা। আদিবাসীরা কোমড় তাঁতে ব্যবহারের জন্য মহিষের চামড়া ও শিকারলব্ধ পশুর চামড়া দিয়ে তামসি চাম বা স্পাঁ ব্যবহার করে। বম, পাংখোয়া, লুসাই প্রভৃতি আদিবাসীরা পানি পান করার জন্য অনেক সময় গয়াল ও মহিষের শিং ব্যবহার করে। আদিবাসীরা হাতির দাঁত ও হাড়ের তৈরি ফুলদানী, কৌটা, কলম, পাখা প্রভৃতি কারুকার্য মন্ডিত দ্রব্যাদি ব্যবহার করে। মেয়েরা হাতির দাঁতের বালা ব্যবহার করে। আদিবাসীরা দৈনন্দিন গৃহকর্মে বেশ কিছু ধাতব সামগ্রী ব্যবহার করে। এগুলোর মধ্যে লোহার তৈরি দা, বল্লম, কোদাল, কাঁচি এবং তামা এলোমিনিয়াম ও রূপার তৈরি বিভিন্ন পাত্র, বোতাম, মূর্তি, ধর্মীয় পাত্র ও কারুকার্য মন্ডিত চড়ুপ পাইপ উল্লেখযোগ্য। তবে এসব সামগ্রী নির্মাণের জন্য তারা উপজাতীয় কারিগরদের উপর নির্ভরশীল।

অলংকার সামগ্রী: আদিবাসী সমাজে অলংকার প্রিয়তা সর্বজনবিদিত। বিশেষ করে আদিবাসী রমনীরা বৈচিত্র্যপূর্ণ অলংকার পরিধানে অত্যন্ত উৎসাহী। অধিকাংশ অলংকার রূপা, তামা, লোহা জাতীয় ধাতু দ্বারা নির্মিত। এছাড়া হাতির দাঁত, পশুর হাড়, পুঁটি ও নানা রকম ফলের বীজ দিয়েও মনোরম অলংকার তৈরি করা হয়। তবে অধিকাংশ অলংকার তৈরির উপকরণ ও কারিগরি দক্ষতা আদিবাসীদের নেই। চাকমা রমনীদের পরিদেয় হাঁসুলী, চন্দ্রহার, বাজুবন্ধ, তাজব, ঝুমকো, কোমরের বিছা ইত্যাদি তৈরির নির্মাণ কৌশল ও নকশার সিন্ধু সংস্কৃতি ও বাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির সামঞ্জস্য রয়েছে। চাঁদি রূপার টাকা, আধুলি ও সিঁকি দিয়ে তৈরি গলার হার পরতে দেখা যায় চাকমা আদিবাসী রমনীদের। এছাড়াও রূপার তৈরি বিশেষ ধরনের পেঁচানো লতার বালা বা কুচি খাড়ু পরতে দেখা যায়। চাক, খুমী, খিয়াং ও ম্রো আদিবাসী সম্প্রদায়ের রমনীদের বড় ছিদ্রওয়ালা কানে বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ কানের অলংকার পরিধান করতে দেখা যায়। চাকমা ত্রিপুরা, চাক, খুমী, খিয়াং

ও ম্রো আদিবাসী সম্প্রদায়ের রমণীদের তামা ও রূপার তৈরি কোমরের বিছা পরিধান করে। কোন কোন আদিবাসীরা কড়ি কিংবা ফলের বীজ দিয়ে তৈরি করা বিছা পরিধান করে। পুটির তৈরি জামছড়া তংচঙ্গ্যা রমনীদের ঐতিহ্যবাহী অলংকার। ম্রো, খুমী, বম, পাংখোয়া আদিবাসী রমণীরাও পুটির তৈরি মালা, কানফুল ও চুলের কাঁটা পরে থাকে। অনেক আদিবাসী পুরুষ হাতে ধাতু নির্মিত বালা, কানে রূপা ও তামার অলংকার, মাথার চুলে ধাতব অলংকার গুঁজে রাখে। ত্রিপুরা আদিবাসী রমণীদের তামা, রূপা ও ধাতব দিয়ে তৈরি অলংকার কানে ওয়াখং, ওয়ারেই, নাবাও পরিধান করে থাকে। মাথার চুলে সাংঙ্গাই, স্রাং নামে অলংকার পরিধান করে থাকে। গলায় বিভিন্ন রঙ্গের মিশ্রনে পুঁটি (লকো), আংকিল, চন্দ্রহার, রসা, রাংবাও, কানথি, রাংবাও সাগ্নাং নামে অলংকার পরিধান করে থাকে। হাতে ট্র, জাওসো,জাওস্থাঁ নামে অলংকার পরিধার করে থাকে। কোমরে আধুলি ও সিঁকি পরিধান নামে অলংকার পরিধান করে থাকে। পায়ে বেঙ্গি নামক অলংকার পরিধান করতে দেখা যায়। ত্রিপুরা আদিবাসী পুরুষরা হাতে ধাতু নির্মিত বালা, কানে রূপা ও তামার অলংকার, মাথার চুলে ধাতব অলংকার গুঁজে রাখে।

মারমা, চাকমা, ত্রিপুরা, তংচঙ্গ্যা, খুমী, পাংখোয়া, বম, লুসাই আদিবাসী রমণী

পোষাক-পরিচ্ছদ: আদিবাসীরা বস্ত্র উৎপাদনে প্রায় স্বনির্ভর। আদিবাসীদের বস্ত্র তৈরির প্রধান কাঁচামাল জুমের উৎপাদিত তুলা থেকে তৈরিকৃত সুতা। কোমড় তাঁতের দ্বারা আদিবাসী রমণীরা বিভিন্ন বস্ত্রাদি তৈরি করে। তুলা থেকে চরকি ও চরকা (চখি, চখা) দ্বারা সুতা তৈরি করে প্রাকৃতিক উপাদানে জঙ্গি লতা-পাতা রংকরণ করে, সর্বশেষ কোমড় তাঁতের মাধ্যমে বস্ত্র তৈরি প্রতিটি ক্ষেত্রে আদিবাসীরা জ্ঞান, দক্ষতা ও সৃজনশীলতার পরিচয় রাখে। একটি কোমড় তাঁত দৈর্ঘ ৮/১০ ফুট ও প্রস্থ ৪/৭ ফুট পর্যন্ত টানানো হয়। সকল আদিবাসীদের কোমড় তাঁতের সরঞ্জামাদি, বুনন পদ্ধতি অভিন্ন হলেও সম্প্রদায় বিশেষ বস্ত্রের ডিজাইন ও মোটিফে ভিন্নতা রয়েছে। বস্তুত দৈহিক গড়ন, মুখায়বে সাদৃশ্যপূর্ণ সত্বেও আদিবাসী রমণীকে খুব সহজেই তাদের পরিধেয় পোষাক দেখে পৃথক করা যায়।

চাকমা: চাকমা রমণীদের পরনের কাপড় পিনন, সাধারণত এর দৈর্ঘ্য ৪.৫/৩ ফুট, প্রস্থ ৩/১.৫ ফুট হয়ে থাকে। পিননের একদিকে নকশা খচিত আঁচলা, তাকে বলা হয় চাকুগি। পিননের জমিন সাধারণ কালো রঙের হয় এবং উপরে নিচে দু'টো রঙ্গিন বিভিন্ন নকশা আকারে ৩/৪ ইঞ্চি চওড়া বর্ডার থাকে। মেয়েদের বক্ষবন্দনীকে খাদি বলে। এটি সাধারণত দৈর্ঘ্য ৪/২ ফুট এবং ২/৩ ফুট হয়ে থাকে। খাদিতে বিভিন্ন ফুল/নকশা আঁকা হয়। খবং হচ্ছে নারীদের মাথার পাকরী। কখনো কখনো পুরুষরাও মাথার খবং পরে থাকে। জম্মুছিলুম জুমে অথবা জঙ্গলে চাকমা সম্প্রদায়ের পুরুষ ও নারীরা কাজের সময় নকশাবিহীন পরিধান করে থাকে। আলাম চাকমা আদিবাসী সম্প্রদায়ের নকশার দলিল। এতে বিভিন্ন ধরনের নকশা বুনে রাখা হয়। রং বেরঙের অসংখ্য ফলফুল, পশুপাখি ইত্যাদি পোষাকের মাঝে ফুটিয়ে তোলা হয় যা পরবর্তী প্রজন্মের ঐতিহ্যবাহী কাপড় বুনন দক্ষতা অর্জনের সহায়তা করে। চাকমা আদিবাসী পুরুষরা শার্ট, ধুতি, গামছা বা স্বল্প দৈর্ঘ্যের এক টুকরো কাপড় পরে, যুবকরা শার্ট , প্যান্ট, লুঙ্গি পরে। অভিজাতদের মধ্যে ধুতি, পাঞ্জাবি পরার চল আছে।

মারমা: মারমা আদিবাসী সম্প্রদায়ের পোষাক-পরিচ্ছদে আরাকান ও মায়ানমারের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য লক্ষণীয়। মারমা নারীদের পোষাক-পরিচ্ছদ রং ও ডিজাইনের বৈচিত্র্য বিদ্যমান। মারমা পুরুষরা মোটা সুতার তৈরি লুঙ্গি এবং গায়ে মোটা কাপড়ের তৈরি কয়েকটি পকেটযুক্ত ও কলার বিহীন বিশেষ ধরনের আংগি পরিধান করে। বয়ষ্ক পুরুষরা মাথায় সাদা পাকড়ী পরে। মারমা রমণীরা নকশা করা থামি পরে। বয়ষ্ক নারীরা ফুলহাতা আংগি পরে। আর মারমা যুবতী রমণীরা বিভিন্ন রঙ্গের হাফহাতা আংগি বা জামা পরে। বয়ষ্ক নারীরা মাথায় সাদা পাকড়ী পরে।

ত্রিপুরা: ত্রিপুরা আদিবাসী সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষের পোষাক নারীরা কোমর তাঁতে বুনে থাকে। ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের নারীদের পোষাক-পরিচ্ছদ রং ও ডিজাইনের তেমন বৈচিত্র্য নাই, সাদা পোষাকের হাতলের শেষাংশে ও জামার শেষাংশে ১/১.৫ ইঞ্চি ফুল, ফল বা কারুকাজ ডিজাইন দেওয়া কুটাই বা জামা পরে থাকে। ত্রিপুরা নারীদের থামি বা রিনাই-এ বিভিন্ন রকমের ডিজাইনের নকশা খচিত আচলা রিনাই স্মুং করা থাকে। সাধারনত দৈর্ঘ্য ৪.৫/৩ ফুট, প্রস্থ ৩/১.৫ ফুট হয়ে থাকে। আর ওড়না বা রিসাতেও এ বিভিন্ন রকমের ডিজাইনের নকশা খচিত আচলা রিসা স্মুং করা থাকে। এটি সাধারণত দৈর্ঘ্য ৪/২ ফুট এবং ২/৩ ফুট হয়ে থাকে। বয়ষ্ক নারীরা মাথায় সাদা পাকড়ী পরে। ত্রিপুরা যুবতী রমণীরা বিভিন্ন রঙের হাফহাতা কুটাই বা জামা পরে। বয়ষ্ক নারীরা মাথায় সাদা পাকড়ী পরে। ত্রিপুরা পুরুষরা নিজেদের তৈরি গামছা পরে। কেউ কেউ ধুতি বা কাঁসা পরে। পোষাক-পরিচ্ছদ রং ও ডিজাইনের তেমন বৈচিত্র্য নেই, সাদা পোষাকের হাতলের শেষাংশে ও জামার শেষাংশে ১/১.৫ ইঞ্চি ফুল, ফল বা কারুকাজ ডিজাইন দেওয়া কুটাই বা জামা পরে থাকে। বয়ষ্ক পুরুষরা মাথায় সাদা পাকড়ী পরে। ত্রিপুরা আদিবাসী পুরুষরা শার্ট, ধুতি, গামছা বা স্বল্প দৈর্ঘের এক টুকরো কাপড় পরে। যুবকরা শার্ট, প্যান্ট, লুঙ্গি পরে। অভিজাতদের মধ্যে ত্রিপুরা আদিবাসীদের ধুতি, পাঞ্জাবি পরার চল আছে।

খিয়াং: খিয়াং আদিবাসী পুরুষরা নিজেদের তৈরি গামছা বা ধুতি আকারে কাপড় পরে। খিয়াং আদিবাসী পুরুষরা নিজেদের তৈরি পোষাক বা জামা হাতলের শেষাংশে ও জামার শেষাংশে ২/২.৫ ইঞ্চি বিভিন্ন কারুকাজ আকৃতি ডিজাইনের জামা পরে থাকে। বয়ষ্ক পুরুষরা মাথায় সাদা পাগড়ী পরে। খিয়াং আদিবাসী নারীরা নিজেদের তৈরি লুঙ্গি ও আরাকান বা মায়ানমারের ডিজাইনে করা লুঙ্গি পরিধান করে। খিয়াং আদিবাসী যুবক ও যুবতীরা নিজেদের তৈরি পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করে সাথে শার্ট, ধুতি, গামছা, ওড়না, জামা বা শার্ট, প্যান্ট, লুঙ্গি পরে।

ম্রো: ম্রো আদিবাসী সম্প্রদায় আদিবাসীরা সাধারণত স্বল্প বসনধারী। রমনীরা নয় ইঞ্চি চওড়া 'ওয়াংক্লাই' কোমরে জড়িয়ে রাখে। সাধারণত এতে কালো জমিনের উপর একপাশে ছোট ছোট লাল হলুদ রঙ্গের নকশা করা থাকে। কোমরের মাপ অনুযায়ী এর দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করা হয়। ম্রো রমনীরা কোন বক্ষবন্ধনী ব্যবহার করে না। তবে মাঝে মধ্যে এক প্রস্থ রঙ্গিন কাপড় 'ওয়ানচা' চাদরের মত গায়ে জড়িয়ে রাখে। ম্রো পুরুষরা কোমড়ে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের কাপড় পরে। কাপরের দু'প্রান্ত সামনে পিছনে ঝুলানো থাকে। এটিকে বলা হয় দং। অনেক ম্রো পুরুষ মাথায় সাদা কাপড় পরে। ম্রোদের মত খুমী নারীরাও নয় ইঞ্চি চওড়া কাপড় কোমরে জড়িয়ে রাখে। তবে এর রং ও ডিজাইনে ভিন্নতা রয়েছে। এছাড়াও নারীরা হাতাযুক্ত সাধারণ জামা ও দোপাট্টা জাতীয় কাপড় গলায় ঝুলিয়ে রাখে। মাথায় পরে লাল বা নীল রঙের কাপড়। খুমী পুরুষরা নিম্নাঙ্গে এক টুকরো কাপড় পরে। এর দু'প্রান্তে সামনে এবং

পিছনে ঝুলে থাকে। সুদূর অতীতে পশু শিকারী অরণ্যচারী বম, পাংখোয়া, খুমী, লুসাই আদিবাসীরা পশুর চামড়া পরিধান করতো। পরবর্তীতে তারা কোমর তাঁতের তৈরি বস্ত্র পরিধানে অভ্যস্থ হয়। এসব সম্প্রদায়ের নারীরা দু'প্রান্তে পুঁতির কারুকাজ খচিত মোটা কাপড়ের তৈরি এক প্রকার বস্ত্র পরিদান করে। তাছাড়াও বড় আকৃতির কাপড় ও সাদা রঙের জামাও পরে। পুরুষরা পরে মোটা সুতার তৈরি জামা। অতীতে এরা মাথায় সাদা কাপড় পরে তাতে পাখির পালক গুজে রাখে।

আদিবাসীরা পোষাক-পরিচ্ছদ ছাড়াও কোমড় তাঁতের কাপড় দিয়ে নানা নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী তৈরি করে। এগুলোর মধ্যে চাকমাদের গিলাপ বা বর্গী, পাশা খেলাঘর, ত্রিপুরা ও মারমাদের গায়ের চাদর, থলে, পাংখোয়া, বম, লুসাইদের থলে। চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তংচঙ্গ্যা, বম, লুসাই আদিবাসী নারীরা উল ও রেশম সুতা দিয়ে বিভিন্ন রকম শীতের কাপড় তৈরি করে থাকে। বম আদিবাসী নারীরা কোমড় তাঁতে বিশেষ পদ্ধতিতে তুলার সাহায্যে কার্পেট তৈরিতে দক্ষতা পরিচয় দেয়।

আদিবাসীদের বাদ্যযন্ত্রঃ আদিবাসীদের সামাজিক সাংস্কৃতিক উৎসবাদি ও অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার লক্ষণীয়। বৈচিত্র্যপূর্ণ আকৃতি ও বিশেষ বৈশিষ্টপূর্ণ এসব বাদ্যযন্ত্রের আদিবাসীদের স্বকীয় শিল্পসত্তার উজ্জ্বল নিদর্শন। অধিকাংশ বাদ্যযন্ত্র প্রাকৃতিক উপকরণ দিয়ে তৈরি যেমন-বাঁশ, বেত, কাঠ, লাউয়ের খোল, বন্যজন্তুর চামড়া ইত্যাদি দিয়ে তৈরি।

ম্রোদের আদিবাসীদের বাদ্যযন্ত্রঃ ছোট-বড় বিভিন্ন সাইজে প্লুং বাঁশি, যেতা ম্রোদের ঐতিহ্যবাহী বাঁশি নামে পরিচিত। ম্রোদের বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের সময় এই প্লুং বাঁশিটা বাজানো হতো। তিতা লাউয়ের খোল ও সরু বাঁশের নল দিয়ে এটি তৈরি করা হয়। বাঁশের নলের সংখ্যা অনুসারে প্লুং এর নাম সুরের ব্যঞ্জনায় পার্থক্য রয়েছে। লাউয়ের খোল ও বাঁশের নলের তৈরি বিশেষ ধরনের বাঁশির নাম 'তুঁ' । ম্রো ও খুমী আদিবাসীরা কোন মনোবাঞ্ছা পূরণের উদ্দেশে আয়োজিত অনুষ্ঠানে 'তুঁ' বাঁশিটা বাজিয়ে থাকে।

চাকমা আদিবাসী সম্প্রদায়ের বাদ্যযন্ত্রঃ চাকমা ভাষায় বাজি শব্দের অর্থ বাঁশি। এটি বাঁশ নির্মিত এবং বিভিন্ন আকৃতির কারুকাজ হয়ে থাকে। চাকমা আদিবাসী সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ঢোল, বাঁশি ব্যবহার লক্ষণীয়।

মারমা আদিবাসী সম্প্রদায়ের বাদ্যযন্ত্রঃ মারমা আদিবাসীদের ছোট আকৃতির ঢোলকে বঙ্গু বলা হয়। এটি সাধারণত লম্বায় ১০ ইঞ্চি প্রস্থে ৭ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়ে থাকে। বুঙ্গের নির্মাণ অত্যন্ত চমৎকার ও মজবুত। বঙ্গু কাঠের খোল ও বন্য পশুর চামড়া দিয়ে তৈরি। মারমা আদিবাসীদের অপেক্ষাকৃত বড় আকৃতির ঢোলকে বলা হয় পেহ্। এটি সাধারণত ২ ফুট লম্বা ও ১ ফুট চওড়া হয়ে থাকে। সাধারণত কাঠি দিয়ে এটি বাজানো হয়। গঙ্গ অষ্টধাতুর তৈরি গোলাকার ঘন্টা বিশেষ। প্রায় সকল আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গঙ্গ ব্যবহৃত হয়। একটি কাঠের দন্ড দিয়ে এটি বাজানো হয়। খেং খরং (কসুমু) মুখের সাথে ধরে হাত দিয়ে সুতা টেনে বিশেষ পদ্ধতিতে সুর তোলার যন্ত্র বিশেষ। সাধারণত বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি এ বাদ্য যন্ত্রটি চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা ও তংচঙ্গ্যা আদিবাসীরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাজিয়ে থাকে। ক্রয়-চয় মারমা আদিবাসী সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র। কাঠ ও কাঁসা দিয়ে তৈরি করা হয়।

ত্রিপুরা আদিবাসী সম্প্রদায়ের বাদ্যযন্ত্রঃ খাইং (ঢোল) কাঠের খোল ও বন্য পশুর চামড়া দিয়ে তৈরি। বাঁশি (কসুমু) এটি বাঁশ নির্মিত এবং বিভিন্ন আকৃতির কারুকাজ হয়ে থাকে। ত্রিপুরা আদিবাসী ভাষায় সেঁদা। সাধারণত দুই-তিন ফুট ও লম্বা এক ফুট চওড়া এক খন্ড গাছকে খোদাই করে এই বাদ্যযন্ত্রটি তৈরি করা হয়। ফাঁপা অংশটি চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে।

এইটা ত্রিপুরা আদিবাসী এক ধরনের গিটার। সাধারণত তিনটি সংযুক্ত থাকে। এর বাজানো পদ্ধতি একটি বাঁশের কঞ্চি বেত নিয়ে ঐ বেতে একটি বিশেষ ধরনের সুতা দিয়ে বেঁধে ধনুক আকারে বাঁকিয়ে সুতার সাথে তিনটি তারে ঘসে বাজাতে হয়, তখন সুরেলা সুরে সুর বের হবে। ত্রিপুরা আদিবাসী ভাষায় আরেকটি বাদ্যযন্ত্রের নাম চম্প্রাইং। এই বাদ্যযন্ত্রটিও একই মজবুত ও শক্তজাতের গাছের গুড়িকে খুঁড়িয়ে খোদাই করে তিনটি তাঁর সংযুক্ত দিয়ে ফাঁকা জায়গায় চামড়া অথবা শক্ত হালকা কাঠের পিচ দিয়ে ঢাকা দিতে হবে। চম্প্রাইং ত্রিপুরা আদিবাসীদের এক ধরনের গিটার। ধুধুক বাঁশ নির্মিত এক ধরনের বেহালা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। সাধারণত দু'হাত লম্বা বাঁশের দু'প্রান্তে বন্ধ রেখে বাঁশের ঠিক মাঝ বরাবর একটি গোলাকৃতির ছিদ্র থাকে। বাঁশের পিঠ থেকে বেত তোলার মত করে দুটি সরু বাখারী বের করে এই বাদ্যযন্ত্র বেহালার মত তৈরি করা হয়।

আদিবাসীদের হাতিয়ার সামগ্রীঃ সকল আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকেরা সব ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার করে থাকে। যেমন-দা, বর্শা, ফি, বল্লম, তলোয়ার, কুড়াল, কোদাল, বটি, শাবল, গুলতি, ছিলুম (ধনুক) পাখি ধরার ফাঁদ, কাঁচি, ছুরি, বন্য পশু শিকারের জন্য ফাঁদ ইত্যাদি। অপরাপর আদিবাসীদের ব্যবহার্য হাতিয়ার সামগ্রীর নাম আকৃতি ও ডিজাইনের পার্থক্য থাকলেও ব্যবহার গত সাদৃশ্য বিদ্যমান।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ব্যবহার্য বস্তু ও সংস্কৃতির পরিবর্তন প্রবণতাঃ সুদুর অতীতকাল থেকে বাংলা ভাষাভাষী বৃহত্তর জনগোষ্ঠী তথা আদিবাসী সংস্কৃতি থেকে ভিন্নতর সাংস্কৃতিক সত্তার সঙ্গে পাশাপাশি অবস্থানের ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রভাবশালী বৃহত্তর সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে আদিবাসী সংস্কৃতি। তদুপরি নিজেদের অসচেতনতা, সারল্য, অন্য সংস্কৃতিকে সাবলীলভাবে গ্রহণের মনমানসিকতা এই পরিবর্তনকে অনিবার্য করেছে। আদিবাসী সমাজে ভাষাগত বৈচিত্র্যের কারণে ডায়ালেক্ট হিসাবে বাংলা ভাষার উপর নির্ভরশীলতা দীর্ঘকালের। বর্তমানে ব্যক্তিগত আলাপচারিতা, সভা-সমিতি, উপাসনায় বাংলা ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। আদিবাসীদের পোষাক-পরিচ্ছদে, বাঙালি ও বিদেশী সংস্কৃতির ছাপ অত্যন্ত প্রকটভাবে দৃশ্যমান। ফ্যাশনের প্রতি আকর্ষণ, মূল্য সুবিধা এবং ব্যবহারের উপযোগিতা এর প্রধান কারণ। তবে গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বিশেষ করে নারীরা এখনো আদিবাসীদের বস্ত্র পরিদানে বেশী সাচ্ছন্দ্যবোধ করে। পুরুষদের মধ্যে তেমনটা দেখা যায় না, অনেকটা কম দেখা যায়। খাদ্য উপাদান, রন্ধন প্রণালী, খাদ্যপদ নির্বাচনে বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে বিবাহ অনুষ্ঠান, নববর্ষ অনুষ্ঠান, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে পোলাও, কোরমা, নুডলস, পায়েস ইত্যাদি প্রচলন দেখা যাচ্ছে। ইদানিং ফাস্টফুডের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার কিছু কিছু রেস্টুরেন্টের খাবারে আদিবাসী নাম ব্যবহৃত হলেও স্বাদে গন্ধে তার পরিচয় পাওয়া যায় না। আদিবাসীদের মধ্যে সোনা, রূপা ও ইমিটেশনের গহনা ও অলংকার সামগ্রীর চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে ঐতিহ্য অলংকার এখন দুষ্প্রাপ্য। বিভিন্ন জাদুঘর বা প্রদর্শনীতে তা দেখা যায়। তবে গ্রামাঞ্চলে ঐতিহ্যবাহী অলংকার কদর এখনও বিদ্যমান। আদিবাসী সমাজে আসবাবপত্র ও গার্হস্থ্য সামগ্রীর ধরণ ও ব্যবহারগত পরিবর্তন লক্ষ্যনীয়। আদিবাসীদের তৈরি গার্হস্থ্য সামগ্রীর পরিবর্তে বাজারে সহজলভ্য ও টেকসই সামগ্রীর প্রতি আকর্ষণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত বাদ্যযন্ত্রের পরিবর্তে বর্তমানে দেশীয় বেড়া, ঘরবাড়ি তৈরি বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে মাচাংঘর তৈরি দিন দিন কমে আসছে। আদিবাসীদের মধ্যে আগের আচার-অনুষ্ঠান পালন, সামাজিক রীতি-

নীতির ব্যাপক পরিবর্তন বর্তমানে লক্ষণীয়। শহরে বসবাসরত আদিবাসী মানুষের মধ্যে এ প্রবণতা বেশিমাত্রায় লক্ষণীয়। নানা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক টানাপোড়নে সরলতা, সততা, অতিথি পরায়নতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলো এখন ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে।

আদিবাসীদের সংস্কৃতির সংকট উত্তরণের করণীয়সমূহ: সমৃদ্ধ আদিবাসীদের বৈচিত্র্যময় বস্তু সংস্কৃতির বৃহদাংশ আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে। আধুনিক শিক্ষার প্রসার, সংস্কৃতির পরিবর্তন, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিল্প প্রযুক্তির প্রসার, সাশ্রয়ী মূল্যের টেকসই গৃহস্থালী দ্রব্যাদি ও পোষাক-পরিচ্ছদের সহজলভ্যতা, প্রাকৃতিক উপকরণের অপ্রাপ্যতা, জীবনধারণের জন্য মানুষের কর্ম ব্যস্থতা, সর্বোপরি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিমুখতা এই সমৃদ্ধ সংস্কৃতিতে আজ বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। সমাজ জীবনে নানা অসন্তোষ, অস্থিরতা, মূল্যবোধের অবক্ষয় এ প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করেছে।

পরিবর্তনের এ ধারা অনিবার্য হলেও তা সভ্যতার ক্রমবিকাশের পরিপূরক কিনা তা প্রশ্ন সাপেক্ষ রয়ে যায়। বিশ্বব্যাপী আজ যন্ত্র সভ্যতার চাপে ক্লিষ্ট মানুষ মুক্তি অন্বেষায় তার হৃৎ ঐতিহ্যর পুনরুদ্ধার, জীবনযাপনে আদি ও অকৃত্রিম পদ্ধতি অনুসন্ধান ও পুনঃস্থাপনের অধিক মনোযোগী হয়েছে। ঐতিহ্য, বৈচিত্র্য, সংস্কৃতি বিমুখতা নয় বরং আধুনিকতার সাথে সক্ষমতা স্থাপনই হতে পারে আদিবাসী অথবা অ-আদিবাসী যে কোন সম্প্রদায়ের অস্থিত্বের রক্ষা কবচ। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনার জন্য প্রয়োজনের দাবী রাখে।

সচেতনতা: আদিবাসী বৈচিত্র্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকল আদিবাসীদের সচেতনতা বিষয়গুলো বাঞ্চনীয়। আদিবাসীদের অস্তিত্ব, স্বকীয়তা রক্ষা ও নিজেদের সম্প্রদায়ের পরিচয় তুলে ধরার জন্য বৈচিত্র্য ও সংস্কৃতি ধরে রাখা যে অতি প্রয়োজনীয় এবং সংস্কৃতি যে প্রত্যেকের গর্বের বিষয় জানা প্রয়োজন এবং জানতে হবে।

নিজস্ব মাতৃভাষা রক্ষা ও সংরক্ষণ করা: ভাষা সংস্কৃতির সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। মানুষ যখন লিখিত অক্ষর আবিষ্কার করেনি তখন থেকেই মুখের ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে। নিজস্ব ভাষা যদি হারিয়ে যায়, ব্যবহার সংরক্ষিত না হয় তাহলে নিজেদের সংস্কৃতি রক্ষা করা যাবে না। তাই নিজ নিজ ভাষার চর্চা ও সংরক্ষণ অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। আমাদের আদিবাসী সংগঠনগুলো বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুর পাশাপাশি ভাষা চর্চা, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের ভূমিকা রাখতে পারে।

নিজেদের বস্তুগত নিদর্শন রক্ষা ও প্রচলন: আদিবাসীদের অনেক বস্তুগত সংস্কৃতি ক্রমাগত অপব্যবহারের ফলে হারিয়ে গেছে এবং সীমিত আকারে যেগুলো আছে সেগুলোও হারিয়ে যাবার পথে। আদিবাসীদের হারিয়ে যাওয়া বস্তুগত নিদর্শনাদি তৈরি করার কৌশল যারা জানেন তাদের মাধ্যমে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় 'প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা সংঘ দ্বারা পরিচালনা করা দরকার।

আদিবাসীদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ: আদিবাসীদের সাহিত্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুখে মুখেই রক্ষিত হয়েছে, চর্চা করা হয়েছে এবং মুখে মুখেই হস্তান্তরিত হয়েছে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীরা নিজেদের অবহেলা ও অসচেতনতার জন্য সেগুলোও এখন হারিয়ে যাবার পথে। আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে অভিজ্ঞ বয়স্ক মানুষজনদের নিয়ে ক্রমে বিষয়ভিত্তিক আসর বসিয়ে যেমন-গল্পের আসর, আদি গানের আসর, বিভিন্ন নীতি নির্ধারনী আচার-অনুষ্ঠানের সংলাপ, ইতিহাস বিষয়ক আসর প্রভৃতির বিষয়ে বিষয়ভিত্তিক আসর আয়োজন করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই আদিবাসী সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশের জন্য স্থানীয় জনপ্রতিধি তথা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও আন্তরিকতা প্রয়োজন। আদিবাসীদের আদি বৈচিত্র্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বস্তুগত সংরক্ষণাগার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোতে প্রয়োজনীয় সংস্কার, যথোপযুক্ত ব্যক্তিকে নিয়োগদান ও প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানের মাধ্যমে সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশের সহায়ক হিসাবে সংরক্ষণ করে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

আদিবাসী বিষয়ক গবেষণাকর্ম পরিচালনা: আদিবাসী সমাজের নিজ গ্রাম, পাড়া, মহল্লার সমাজ ও সংস্কৃতি সর্ম্পকে যা জানবে অন্য সমাজের লোকের পক্ষে তা সহজসাধ্য নয়। কিংবা নিজ আদিবাসীর পক্ষে খুটিয়ে খুটিয়ে বিভিন্ন তথ্য বের করে আনা সম্ভব হলেও বাঙালি বা বিদেশীর পক্ষে তা করা খুবই দুরহ কাজ। তাই নিজ নিজ সমাজ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানা ও সংরক্ষন করার লক্ষ্যে আদিবাসীদের নিজেদের সমাজ সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণাকর্ম পরিচালনা অতি প্রয়োজন এবং অতি শিগগিরই তা করা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয়ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ পার্বত্য অঞ্চল তথা আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের আদিবাসী বৈচিত্র্য এবং আর্থ-সামাজিক মানদণ্ডের পরিবর্তন প্রবণতা, আদিবাসী সমূহের ভাষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক রূপান্তরের উপর গবেষণাকর্ম পরিচালনা করে তা অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

আদিবাসীদের অর্থনৈতিক কাঠামো মজবুত করা: ইচ্ছাপূরণের মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে অর্থ। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হলে সাহিত্য ও সংস্কৃতি রক্ষা করা যায় না। দুর্বল অর্থের জন্য সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংকট দেখা দেয়। আদিবাসীদের প্রায়ই বিভিন্ন সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানই ব্যয়বহুল। ফলে অর্থবল না থাকলে সেগুলো পালন করা একেবারেই অসম্ভব। তা ছাড়া বর্তমান বিশ্বে নিজেদের অস্থিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য অর্থশক্তি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। এজন্য আদিবাসীদের ভূমি সংরক্ষণ, আয়বর্ধনমূলক ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ, নিজেদের সাধ্যের মধ্যে আয় উপযোগী বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ, সরকারী-বেসরকারী, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠা ও ব্যক্তি মালিকানাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিজেকে ও অন্যকে পেশাজীবী হিসাবে নিয়োজিত করে দেশ, সমাজ ও জাতির সেবা করা, বৃত্তিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ নিয়ে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে তা পরিচালনা করা।

আদিবাসীদের শিক্ষা: আদিবাসীদের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা আনয়নের জন্য বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া খুবই জরুরী। বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে না পারলে সমাজের সচেতনতার স্তর উন্নত হবে না। সমাজ রক্ষায় নিজেদের আদিবাসী সম্প্রদায়কে উদ্ভুদ্ধ করা যাবে না।

ইতি বিশেষ: আদিবাসী তথা সকল সমাজে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে নিজেকেই জানতে হবে। সকল সম্প্রদায়ের সাথে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে দেশ, সমাজ ও জাতির গঠনে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই সকল সম্প্রদায়ের নাগরিক সমাজ সচেতন হবে ও পরিবর্তনের পথ সুগম হবে। নিজেদের বৈচিত্র্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, বস্তুগত ব্যবহার, ঐতিহ্যকে লালন-পালন করে সংরক্ষণ করতে হবে এবং অন্যদেরকেও উৎসাহ প্রদান করতে হবে। স্রষ্টা সকল সম্প্রদায়কে আশীর্বাদ করুন।

তথ্যসূত্র:

১। সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা: পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃতি ও সংস্কৃতি।

২। লাভলী চাকমা: চাকমা অংগাভরণ।

৩। খোকন কায়সার: চট্টগ্রাম জাতিতাত্ত্বিক যাদুঘর: উপজাতি/আদিবাসী উপস্থাপনা, উপস্থাপনার দৈন্য।

৪। রফিক আজাদ: যে ভাবে বাঁচাতে হবে সংস্কৃতি।

৫। জান-ই-আলম: চিরায়ত।

বড়দিন: যত্নের সংস্কৃতি বিকাশে আশা জাগায়

ড. ফাদার লিটন হিউবার্ট গমেজ সিএসসি

বড়দিন মানবজাতির প্রতি পিতা ঈশ্বরের ভালোবাসা, আশা ও সেবাযত্নের সংস্কৃতির সর্বোচ্চ প্রকাশ। বেথলেহেমের গোয়ালঘরে জন্মে যিশুখ্রিস্ট আমাদের পথ দেখান– ঈশ্বরের ভালোবাসা প্রথমেই পৌঁছে যায় সমাজ যাদের ভুলে থাকে সেইসব দরিদ্র, প্রান্তিক, নিঃস্ব ও দুর্বলজনের নিকট। যিশু খ্রিস্টের জন্ম জগতে যত্নের সংস্কৃতি বিকাশের আশা জাগায়। বড়দিনের আনন্দ উৎসব আমাদেরকে যত্নের সংস্কৃতি নবায়নের আহ্বান জানায়। বর্তমান সময়টি আমাদের দেশের ভিতরে যেমনটি, একইভাবে সারা বিশ্বের জন্যও চ্যালেঞ্জেপূর্ণ। যা আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সমাজবিজ্ঞানীদের মতো মণ্ডলীকেও গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। এই প্রেক্ষাপটে ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিসের 'যত্নের সংস্কৃতি' ধারণাকে মানবিক ও স্থায়ী সমাজ নির্মাণের মৌলিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস ২০২১ খ্রিস্টবর্ষে বিশ্ব শান্তি দিবসে ধর্মোপদেশে বলেছেন- 'শান্তির পথে হাঁটার একমাত্র কার্যকর পথ হলো 'যত্নের সংস্কৃতি।' সমাজে শান্তি চাইলে আগে আমাদের সেবাযত্ন ও সুরক্ষার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। তিনি আরো বলেছেন, আমাদের অন্তরে সমন্বিত পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গি (integral ecology) জাগ্রত করতে হবে; যেখানে পরিবেশ, অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি, দৈনন্দিন জীবনের গুণমান সকল কিছু পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সৃষ্টির সংস্কৃতি মানে মানুষ, প্রকৃতি, প্রাণিজগৎ, বন, জল, বায়ু–সবকিছুর সম্পর্ককে সম্মান করা। মাণ্ডলিক সামাজিক শিক্ষা পথ দেখায়- মানবসমাজের অশান্তি ও অবিচারের বিরুদ্ধে যত্নের সংস্কৃতিই হলো মৌলিক প্রতিষেধক। যত্নের সংস্কৃতি মানবিক সমাজ পুনর্গঠনের জন্য একটি বাস্তবসম্মত, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পথ।

ক) সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা

সমসাময়িক চ্যালেঞ্জসমূহের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ অনুশীলন, কিছু মানুষ সমাজ থেকে বহিষ্কার, একে অপরের ওপরে নির্ভরশীলতার ধারণাটি এড়িয়ে যাওয়া, সেবার অসম বন্টন ও ব্যবহার, অতিলোভ ও অতিভোগ, সহিংসতা, বিপদাপন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, মাদকাসক্তি, সমাজিক বন্ধনের বিচ্ছেদ, আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কে অসন্তোষ, বিবাহ বিচ্ছেদ, মানুষকে বাদ দিয়ে নীতিবোধহীন প্রযুক্তিনির্ভরতা, রাজনৈতিক বিভাজন, দলগত অভিসন্ধি, দারিদ্র্য ও বৈষম্য, জলবায়ু সংকট, মানবপাচার, ক্ষতিকর একাকিত্ববোধ, অভিবাসন ও শরণার্থী সংকট যত্নের সংস্কৃতির গুরুত্ব আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে সমসাময়িক সম্ভাবনাসমূহ- পারিবারিক ও বংশগত বন্ধন, যুবসমাজের মানবিক উদ্যোগ, বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক, মানবিক সংগঠন, প্রকৃতি-পরিবেশ সুরক্ষায় সচেতনতা, ধর্মীয় অনুশাসন ও নীতি অনুশীলন, স্থানীয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ -এসবই একটি আশা জাগানো ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করে।

খ) যত্নের সংস্কৃতি বিকাশে ঐতিহ্যগত শিক্ষা

১. যত্ন: যত্ন বলতে বোঝায়– অন্যের অস্তিত্বকে গুরুত্ব দেওয়া, অন্যের ক্ষত, দুঃখ বা অগ্রগতির প্রতি দায়বদ্ধ হওয়া। যত্নের সংস্কৃতির চারটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর হলো- যত্নের মনোভাব, যত্নের কাজ, যত্নের কাঠামো এবং যত্নের নীতি অন্তরে ধারণ করা। যত্নের প্রতিটি ছোট সেবাকাজ– যত্নের সংস্কৃতি গড়ার বীজ। পরিবার, সমাজ, ধর্মপল্লী, সংগঠন-ক্লাব, প্রতিষ্ঠান, ধর্মসংঘে প্রতিটি সদস্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যত্নের সেবাকাজ একদিন যত্নের সংস্কৃতি গড়ে তুলে। পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মে "যত্ন" শুধু অনুভূতি নয়; এটি কর্মের মাধ্যমে প্রকাশিত ভালোবাসা, যা ঈশ্বরের করুণা থেকে উৎসারিত। এই যত্নের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে- দয়া, সহমর্মিতা, ক্ষমা, সেবা, ন্যায় এবং পারস্পরিক দায়বদ্ধতা। যিশুর সমগ্র জীবনই ছিল যত্নের সংস্কৃতির বাস্তব প্রকাশ। পাপী, দরিদ্র ও সমাজচ্যুতদের কাছে গিয়ে সেবা করেছেন *(লুক ৪:১৮; মার্ক ১:৪১)*, তিনি দেখিয়েছেন– অন্যের কষ্ট দেখা মানে কার্যকর সহায়তা করা। দয়ালু সামারীয়ের ভ্রাতৃপ্রেম মূর্তিময় যত্নের সংস্কৃতির একটি শ্রেষ্ঠতম আদর্শ *(লুক ১০:২৫-৩৭)*। এখানে যিশু শিখিয়েছেন– প্রতিবেশি হওয়া মানে সক্রিয়ভাবে যত্ন নেওয়া, অপরকে ভালোবাসা। যিশু বলেছেন– "তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে। আমি নিজে যেমন তোমাদের ভালোবেসেছি, তোমাদেরও তেমনি পরস্পরকে ভালোবাসতে হবে" *(যোহন ১৩:৩৪-৩৫)*। এটি খ্রিস্টীয় যত্নের মৌলিক নীতি। যিশুর অনুসারীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সেবাযত্ন- "যে বড় হতে চায়, তাকে হতে হবে তোমাদের সেবক" *(মথি ২০:২৬-২৮)*। সেবা ও ভালোবাসার মানসিকতা যত্নের সংস্কৃতির কেন্দ্রীয় প্রতিপাদ্য।

২. মানব মর্যাদা: প্রতিটি মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি *(আদিপুস্তক ১:২৭)*, তাই প্রতিটি মানুষের মর্যাদা সুরক্ষা বিষয়টি প্রথম ও প্রধান। যিশুর জন্মের ঘটনায় আমরা দেখি– তাঁকে গোয়ালঘরে জন্ম নিতে হয়, প্রথম সংবাদ পায় দরিদ্র রাখালেরা, স্বয়ং ঈশ্বর মানবদেহে উপস্থিত হয়ে মানুষের দুঃখ ভাগ করে নেন। এই দৃশ্য আমাদের জানায় যে, ঈশ্বরের কাছে মানবিক মর্যাদা সবার আগে। যত্নের সংস্কৃতি এই নীতি থেকেই শুরু হয়। মাণ্ডলিক শিক্ষা মতে- Respect for human dignity refuses to see others merely as instruments (Compendium of the Social Doctrine of the Church, 2004)। মানুষকে মর্যাদাসম্পন্ন হিসেবে দেখা মানে তাকে যত্ন করা–তার নিরাপত্তা, স্বাধীনতা, এবং উন্নতি নিশ্চিত করা। পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন- "মানুষকে উপেক্ষা করার সংস্কৃতির বিপরীতে উঠে দাঁড়াতে হবে। সকলের জন্য যত্ন ও সান্নিধ্যের পথই প্রকৃত মানবিক পথ" *(ফ্রাতেল্লি তুত্তি)*। বড়দিন ভালোবাসা হৃদয় দিয়ে যত্নের দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে অনুপ্রাণিত ক'রে।

৩. গণমঙ্গল: "গণমঙ্গল হলো সেই শর্তসমূহ যা মানুষের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য প্রয়োজন" *(Gaudium et Spes, ১৯৬৫, অনু. ২৬)*। যত্নের সংস্কৃতি স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, মানবিক অধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার সেবাকাজের মধ্য দিয়ে গণমঙ্গলের পথ তৈরি করে। যেখানে যত্ন নেই, সেখানে গণমঙ্গল অর্জন অসম্ভব।

৪. সংহতি ও সহমর্মিতা: ধর্মগুরু পোপ দ্বিতীয় জন পল বলেছেন– 'Solidarity is not a vague compassion but a firm and enduring commitment to the common good' (Sollicitudo Rei Socialis)। যত্নের সংস্কৃতিতে 'অন্যের দুঃখ আমার দুঃখ' এই মনোভাব অপরিহার্য। বাংলাদেশে রোহিঙ্গা অভিবাসী সংকটে রাষ্ট্র, সমাজ, মণ্ডলী ও মানবিক সংগঠনসমূহের স্বতঃস্ফূর্ত সহায়তা সংহতির জীবন্ত উদাহরণ।

৫. দরিদ্রের আর্তনাদে সাড়াদান: যিশুর শিক্ষা স্পষ্ট–তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন দরিদ্র, অসহায় ও প্রান্তিক মানুষের পাশে। পোপ ফ্রান্সিস জোর দিয়ে বলেছেন– 'The poor are the privileged recipients of the Gospel' (Evangelii Gaudium)। যত্নের সংস্কৃতি তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যখন সমাজ দুর্বল মানুষ, দরিদ্র, অসুস্থ, বয়োজ্যেষ্ঠ, প্রতিবন্ধী ও অভিবাসীদের প্রতি অগ্রাধিকারমূলক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে।'

৬. ধরিত্রীর আর্তনাদে সাড়াদান: পোপ ফ্রান্সিস লাউদাতো সি বিশ্বজনীনপত্রে এমন একটি "সৃষ্টির সংস্কৃতি" গড়ে তোলার আহ্বান জানান, যা মানবজাতিকে পৃথিবীর সঙ্গে সুরেলা সম্পর্ক গঠনে সাহায্য করে। এই সংস্কৃতি হলো- ঈশ্বরের সৃষ্টিকে উপহার হিসেবে গ্রহণ করা, তার যত্ন নেওয়া, এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পৃথিবীকে রক্ষা করা। পৃথিবী কোনও 'বস্তু' নয়; এটি ঈশ্বরের উপহার, যার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা ও দায়িত্ববোধ থাকা উচিত। মানব-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি (anthropocentrism) নয়, বরং সৃষ্টি-কেন্দ্রিক সমন্বয় দরকার। পোপ ফ্রান্সিসের 'লাউদাতো সি' সর্বজনীনপত্রটিতে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ককে পুনর্নবায়ন করার আহ্বান করেছেন। যত্নের সংস্কৃতিতে পরিবেশকে অন্তর্ভুক্ত না করলে অসম্পূর্ণ থাকে। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, তীব্র তাপপ্রবাহ, লবণাক্ততা সবই প্রমাণ করে পরিবেশের যত্ন মানবজীবনের জন্য অপরিহার্য, যা এসময়ে আরও জরুরী হয়ে উঠেছে। পোপ ফ্রান্সিসের পত্রটি আমাদের শিক্ষা দেয়- সৃষ্টিকে যত্ন করা মানে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যত্ন করা। প্রকৃতি-পরিবেশের প্রতি যত্ন, দূষণ কমানো, সম্পদের সুষম ব্যবহার, অপচয় পরিহার, জীববৈচিত্র্য রক্ষা, পরিবেশবান্ধব নীতি অনুসরণ -এই সবই মানুষকে পৃথিবীর সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে। সৃষ্টি আমাদের মালিকানায় নয়, আমরা তত্ত্বাবধায়ক (stewards), পৃথিবী আমাদের অভিন্ন বসতবাটি।

গ) পরিবার, মণ্ডলী ও সমাজে আশাময় দিক

১. পরিবার হলো গৃহমণ্ডলী। পরিবার হলো যত্নের প্রথম শিক্ষালয়, এখানে অভিভাবকগণ প্রথম শিক্ষাদাতা। এ নীতির চর্চাই যত্নের সংস্কৃতিকে গভীর করে তুলে। এখান থেকেই যত্নের সংস্কৃতি শুরু হয়। পরিবারে অন্যের কথা শুনতে শেখা, ভালোবাসা, ক্ষমা, খেয়াল রাখা, সময় দেওয়া, সেবার মনোভাব, বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান, রাগ-অভিমান কমানো ইত্যাদি যত্নের সংস্কৃতি বিকাশের পথ সৃষ্টি করে। এসবই যত্নের সংস্কৃতিকে শক্তিশালী করে। একটি যত্নবান পরিবার একটি যত্নশীল সমাজ গড়ে তোলে। সৃষ্টির যত্নের সংস্কৃতি অনুধাবন পরিবার থেকেই পায় শিশুরা। জল ও খাদ্যের পরিমিত ভোগ, সম্পদের সঠিক ব্যবহার, প্রকৃতির প্রতি সম্মান, নির্জীব ও সজীব সবকিছুর প্রতি দায়িত্ববোধের ভাবনা পরিবার থেকেই হয়। সমাজকে এমন উন্নয়ন বেছে নিতে হবে যা মানুষ ও পরিবেশ–উভয়ের সুরক্ষা নিশ্চিত করে।

২. মণ্ডলী হলো আশা জাগানোর আলোকবর্তিকা, মণ্ডলী তাঁর সন্তানদের সেবা-যত্নের আদান-প্রদান শেখায়। মণ্ডলী তাঁর শিক্ষা, সাক্রামেন্তীয় এবং মানবসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে যত্নের সংস্কৃতিকে জীবন্ত করে রাখে। মাণ্ডলিক প্রতিষ্ঠান এমন পরিবেশ তৈরি ক'রে যেখানে সবাই গ্রহণযোগ্য ও নিরাপদ। মণ্ডলী তাঁর শিক্ষা, মানবসেবা কার্যক্রম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, সামাজিক আন্দোলন, আশ্রয়কেন্দ্র, শিশু ও নারীর সুরক্ষা, অভিবাসী ও শরণার্থীদের সেবাদান, যুবকার্যক্রম এবং মানবিক সহায়তা কার্যক্রমগুলো যত্নের বাস্তব-স্বরূপ। ভাটিকানের সমন্বিত মানব উন্নয়ন পুণ্য মন্ত্রণালয়ের মহামান্য মন্ত্রী কার্ডিনাল মাইকেল ফেলিক্স চেরনি, এস.জে. মহোদয় নভেম্বর ১-৫, ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ তারিখে বাংলাদেশে পালকীয় সফর করেছেন। তিনি খ্রিস্টভক্তদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেছেন, যা মানব কল্যাণে বিশ্বাস ও সেবাযত্ন কীভাবে একত্রে সক্রিয় ও সম্পর্কযুক্ত তাই প্রকাশ পেয়েছে। সফর শেষে তিনি বলেছেন- জনসংখ্যার বিবেচনায় মণ্ডলী অতি ক্ষুদ্র কিন্তু সেবাযত্নের সংস্কৃতির এক উত্তম দৃষ্টান্ত এখানকার স্থানীয় মণ্ডলী। মণ্ডলীর অন্যতম শিক্ষা হলো যত্নের সংস্কৃতির বিকাশ। আদিমণ্ডলীর জীবনে দেখা যায় কিভাবে প্রথম খ্রিস্টভক্তরা যত্নের সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল যেখানে- বিষয় সম্পদ সকলের মধ্যে প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারেই বন্টন ক'রে দিত *(শিষ্যচরিত ২:৪৪-৪৫)*। এটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক যত্নের আদর্শ। বিধবা-অসহায়দের সেবাযত্ন প্রদানে সাতজন ধর্মসেবক নিয়োগ করেন, যাতে কেউ অবহেলিত না থাকে– যা যত্নের সংস্কৃতির একটি সাংগঠনিক রূপ *(শিষ্যচরিত ৬:১-৭)*। প্রেরিতশিষ্য পলের শিক্ষায় যত্নের সংস্কৃতিকে গভীরভাবে ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন- পরস্পরের বোঝা বহন করো–এতেই খ্রিস্টীয় বিধান পূর্ণ হবে *(গালাতীয় ৬:২)*। তিনি আরো বলেছেন- দান, অতিথিসেবা, সহমর্মিতা, আন্তরিক প্রেম, নির্যাতিতদের পাশে দাঁড়ানো এবং শান্তি রক্ষা করতে হবে *(রোমীয় ১২:৯-১৮)*। তিনি আরো বলেছেন- খ্রিস্টের দেহ হিসেবে তোমাদের মধ্যে যেন অনৈক্য বা বিভেদ না থাকে, বরং পরস্পরের প্রতি সমান যত্নবান হতে হবে *(১ করিন্থীয় ১২:২৫)*।

৩. সমাজ ও রাষ্ট্রে যত্নের সংস্কৃতি শুধু নৈতিক আহ্বান নয়; এটি নীতিগত পরিবর্তনের দাবি করে। রাষ্ট্রীয় নীতিতে যত্নকেন্দ্রিক ধারণা- সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপদ শ্রম পরিবেশ, দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক সুরক্ষা কৌশল, মানবাধিকার সুরক্ষা, প্রতিবন্ধী মানুষের অন্তর্ভুক্তি যা রাষ্ট্র ও সমাজের যত্নের সংস্কৃতি স্থায়ী ক'রে। পোপ ফ্রান্সিস আজকের সমাজে "ছুঁড়ে ফেলার সংস্কৃতি" (throwaway culture) দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে ভোগবাদ ও অপচয় সংস্কৃতির পরিবর্তে যত্নের সংস্কৃতি বিকাশের ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি 'সৃষ্টির সংস্কৃতি'র আহ্বান জানান- যেখানে পরিমিত ভোগ, পুনর্ব্যবহার, পরিবেশবান্ধব জীবন, অপচয় কমানো, প্রকৃতির প্রতি গভীর সম্মান লালন করতে বলেছেন। "লাউদাতো সি" পত্রটি শুধু প্রকৃতি-পরিবেশ সুরক্ষা দলিল নয়, এটি গরিব ও প্রান্তিক মানুষের জীবন-জীবিকা সুরক্ষার অসাধারণ গণজাগরণ। কারণ পরিবেশ ধ্বংসের সবচেয়ে বড় শিকার হলো– দরিদ্র মানুষ। সৃষ্টির যত্নের সংস্কৃতি তাই মানবিক, সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্বের একটি সমন্বিত শিক্ষা।

যত্নের সংস্কৃতি কেবল মানবিক আদর্শ নয়; এটি খ্রিস্টীয় জীবনের কেন্দ্রীয় বার্তা। মাণ্ডলিক শিক্ষা দেখায়–মানব মর্যাদা, গণমঙ্গল, সংহতি, দরিদ্রের প্রতি মনোযোগ এবং সৃষ্টির যত্ন –এসব নীতির বাস্তবায়নেই জগতে যত্নের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। এ সংস্কৃতি অবিচার কমায়, ভ্রাতৃত্ব গড়ে, শান্তির ভিত্তি স্থাপন এবং মানবতার ভবিষ্যৎ রক্ষা করে। সুতরাং, যত্নের সংস্কৃতি বিকাশ একদিকে নৈতিক দায়িত্ব, অন্যদিকে এটি জগতে আশা পুনর্নির্মাণের সবচেয়ে কার্যকর পথ। বড়দিনের আলো আমাদের হৃদয়কে জাগ্রত করে বলে– "তোমার ভালোবাসা অন্যের জীবনকে আলোর মতো স্পর্শ করুক।" এই বড়দিনে নিজের মধ্যে সামান্য পরিবর্তন আনি– একটু বেশি শুনি, একটু বেশি সাহায্য করি, একটু বেশি ভাগাভাগি করি –তাহলে সত্যিকারের যত্নের সংস্কৃতি বিকশিত হতে পারে। কারণ যত্নের কাজ কখনও ছোট নয়; ছোট ছোট সবাই যত্নের সংস্কৃতি গড়ে তুলে। এটি বড় আয়োজন নয়; বরং প্রতিদিনের ছোট ছোট সেবাযত্নই সমাজে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়, শান্তি স্থাপন হয় এবং গড়ে তুলে যত্নের সংস্কৃতি। এ সময়ে খ্রিস্ট জন্মবার্তার এই শিক্ষাটি অন্তরে-হৃদয়ে অনুধাবন ও গ্রহণ করি। শুভ বড়দিন!

তথ্যসূত্র: Pope Francis, *Laudate Deum* (2023). Pope Francis, *Message for the 54th World Day of Peace (2021).* Pope Francis, *Fratelli Tutti* (2020). Francis, *Laudato Si* (2015). Pontifical Council for Justice and Peace, Compendium of the Social Doctrine of the Church (2004). *Pope John Paul II, Sollicitudo Rei Socialis* (1987). Pope Paul VI, *Gaudium et Spes* (1965).

নতুন গির্জা নির্মাণ ও পুরাতন গির্জা সংস্কার বিষয়ক নীতিমালা

ফাদার ইউজিন জে. আনজুস সিএসসি

১. ভূমিকা: বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচারিত হয়েছিল ১৬শ শতাব্দির শেষার্ধের দিকে। তখন ইউরোপের পর্তুগাল থেকে মিশনারীগণ এদেশে এসে খ্রিস্টের মঙ্গলসমাচার প্রচার করেছেন এবং যারা বিশ্বাস করেছেন তাদেরকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেছেন। তাদের খ্রিস্টধর্ম চর্চা ও উপাসনার জন্য ইউরোপ থেকে আগত মিশনারীগণ যে সকল গির্জা নির্মাণ করেছিলেন সেগুলোর নির্মাণ শৈলী ছিল পাশ্চাত্যের গির্জাগুলোর আদলে এবং তৎকালীন নির্মাণ শৈলী বা আর্কিটেকচারাল ডিজাইন ও কারিগরী পদ্ধতি অনুসারে। অপর দিকে তাঁরা যে নির্মাণ শৈলীর প্রয়োগ করেছেন তাকে কলোনিয়াল *(colonial)* ডিজাইনও বলা যায়, কারণ সেই যুগে পাশ্চাত্য থেকে ভারতবর্ষে এসে যারা ঔপনিবেশিক বা কলোনিয়াল শাসন ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করেছিলেন, তারা নিজেদের জন্য যে সকল বাসভবন ও প্রশাসনিক অবকাঠামো নির্মাণ করেছিলেন তার একটি বিশেষ স্টাইল লক্ষ্য করা যায়, যাকে বলা হয় 'কলোনিয়াল স্টাইল'। এর নির্দশন এখনও রয়ে গেছে কোর্ট-কাচারী, রেলওয়ে স্টেশন, পোস্ট অফিস ইত্যাদি দালান-কোঠায়। ঢাকার 'কার্জন হল' এরূপ নির্মাণ শৈলীর একটি অন্যতম নিদর্শন হিসেবে গণ্য।

ধর্মীয় দিক থেকে বিভিন্ন স্থানে নির্মিত গির্জা গুলোর নিদর্শন এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকার তেজগাঁও, নাগরী, হাসনাবাদ, পুরান ঢাকার আর্মেনিয়ান গির্জা, চট্টগ্রামের পাথরঘাটা ক্যাথিড্রাল, বরিশালের অক্সফোর্ড মিশন গির্জা, দিনাজপুরের সৈয়দপুর রেলওয়ে অফিসার্সদের গির্জা – মিশনারীদের নির্মিত পাশ্চাত্য ধাচের গির্জা গুলোর সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের প্রাচীন গির্জাগুলোর ইতিহাস কিংবা এগুলোর স্থাপত্য শৈলী সম্বন্ধে আলোচনা করতে যাচ্ছি না। প্রসঙ্গটি উল্লেখ করার কারণ হল প্রাচীন এই গির্জাগুলোর নির্মাণ ও স্থাপত্য শৈলী যে ঐতিহ্যবহন করে তাকে অতি সহজেই ইউরোপীয় এবং কলোনিয়াল বলা যায়। যে সময় কালে এগুলো নির্মাণ করা হয়েছিল তখন এরূপ নির্মাণ শৈলীর ব্যবহার ছাড়া [সম্ভবত] অন্য উপায়ও ছিল না। এর নমুনা হিসেবে গণ্য করা যায় সেই সময়কার বহু জমিদার বাড়ি ও অন্যান্য স্থাপনার নির্মাণ ও স্থাপত্য শৈলীর সাদৃশ্যকে।

ইতিহাসের পরিক্রমায় বৃহৎ দালান নির্মাণের স্থাপত্য ডিজাইন ও মালমসলার ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। নির্মাণ প্রক্রিয়া ও ডিজাইনে আধুনিকতা এসেছে বহুরূপে। এক কথায় ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারিং কলাকৌশল, নির্মাণ-কাজে ব্যবহৃত মালমসলা, মানুষের রুচিবোধ এবং তার সাথে মিলিয়ে ডিজাইন বা স্টাইল – ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে।

এই পরিবর্তনের স্রোতে ধর্মীয় চিন্তাচেতনায়ও পরিবর্তন এসেছে। কাথলিক মণ্ডলীর ইতিহাসে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা (১৯৬২-১৯৬৪ খ্রি.) মাণ্ডলিক কাঠামো, সেবাকাজের যুগোপযোগীকরণ, পুণ্য উপাসনায় সংস্কার ইত্যাদির প্রভাব পড়েছে খ্রিস্টমণ্ডলীর সকল দিকে। এর মধ্যে একটি অন্যতম দিক হল উপাসনায় দেশীয় ভাষার *(vernacular)* ব্যবহার, উপাসনায় ভক্তজনগণের অধিকতর অংশগ্রহণ, উপাসনায় স্থানীয় সংস্কৃতিগত বিভিন্ন উপাদান ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সমন্বয় সাধন –যাকে এক কথায় 'সংস্কৃত্যায়ন' বলে অভিহিত করা হয়।

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার পরবর্তীকালে বহু ভাবে উপাসনার সংস্কৃত্যায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে-কোন কোন দিকে এই প্রচেষ্টা সফলভাবে সম্পাদিত হয়েছে; আবার কোন কোন দিকে অন্যদের অনুকরণ করতে গিয়ে এবং যথেষ্ট নিরীক্ষার অভাবে তা নেতিবাচক দিকে চলে গেছে। সংস্কৃত্যায়নের মৌলিক এবং ঐশতাত্ত্বিক ভিত্তির দিকে মনোযোগ না দিয়ে শুধু বাহ্যিক কতগুলো বিষয়ের উপার জোর দিতে গিয়ে উপাসনা-অনুষ্ঠানকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মতো 'ভাল লাগা', কিংবা 'উপভোগ্য' *(entertainment)* বিষয় করে তোলার প্রবণতাও একটি 'উদ্বেগজনক যুগলক্ষণ'-এ পরিণত হয়ে উঠেছে।

তথাপি আমি মনে করি, দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে যে সকল নতুন গির্জা নির্মাণ করা হয়েছে এবং প্রাচীন গির্জা গুলোর সংস্কার করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার 'মনোভাব' (spirit) এবং বিশেষভাবে 'উপাসনায় ভক্তজনগণের সম্পূর্ণ, সচেতন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ' (দ্র. পুণ্য উপাসনা, নং ১১)-এর বিষয়ে শিক্ষা ও নির্দেশনা খুব বেশি একটা বিবেচনা করা হয়নি। এ বিষয়ে শুধুমাত্র গির্জা নির্মাণে ও পুরাতন গির্জার সংস্কার কাজে বাহ্যিক ভাবে দেশীয় স্টাইল অনুসরণ করার দিকটির কথা বলছি না; কিন্তু উপাসনায় ভক্তজনগণের এবং উপাসনায় যাদের বিভিন্ন সেবাকারী (*ministerial*) দায়িত্ব পালনের জন্য যে-ধরণের 'উপাসনিক স্থান' বা *liturgical spsce* প্রয়োজন, যাতে প্রতিটি উপাসনা-অনুষ্ঠান হয়ে উঠবে 'ঐশ জনগণের উৎসব-অনুষ্ঠান' (দ্র. পুণ্য উপাসনা, নং ২৬) – আমি তার কথা বলছি।

এ বিষয়টি ভালভাবে উপস্থাপন করতে হলে বেশ কয়েকটি বিষয় যেমন উপাসনা ও উপাসনালয়, উপাসনায় ভক্তজনগণের অংশগ্রহণের বিষয়ে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার শিক্ষা, উপাসনালয়ের নির্মাণ শৈলীর সাথে উপাসনিক গতিবিধি ও ক্রিয়া (*Liturgical Movements and Actions*) সমূহের সম্পর্ক, ইত্যাদি বিষয়ে সামান্য হলেও আলোকপাত করা প্রয়োজন।

২. উপাসনা ও উপাসনালয়: উপাসনালয় হল এমন একটি স্থান যা উপাসনার মত পবিত্র কার্যসমূহ সম্পাদনের জন্য যাজক ও ভক্তজনগণ একত্রে মিলিত হন। বিভিন্ন ধর্মমত অনুসারে উপাসনালয়ের বিভিন্ন সংজ্ঞা হতে পারে। কিন্তু কাথলিক ধর্মশিক্ষা অনুসারে গির্জা বা *Church* হলো 'খ্রিস্টের অতিন্দ্রিয় দেহ' এবং 'পবিত্র আত্মার জীবন্ত মন্দির' – অর্থাৎ গির্জা শুধু ইট-পাথর-সিমেন্ট-রড দিয়ে তৈরি একটি অবকাঠামো, স্থাপনা বা দালান নয়। কাথলিক মণ্ডলীর আইন সংহিতা *(Canon Law)* অনুসারে খ্রিস্টীয় উপাসনালয় বা গির্জার সংজ্ঞা এরূপ: **"The term church means a sacred building intended for divine worship, to which the faithful have right of access for the exercise, especially the public exercise, of divine worship."** (Canon 1214)। অর্থাৎ, গির্জা শব্দটি দ্বারা বোঝানো হয় এমন একটি পবিত্র দালান বা গৃহকে, যা নির্মাণ করা হয় ঐশ-উপাসনার উদ্দেশে, যেখানে জনগণের সমবেত হওয়ার এবং সম্মিলিতভাবে উপাসনা করার জন্য প্রবেশাধিকার আছে।

তাই, গির্জা হল প্রথমত এমন একটি ঘর বা দালান যা নির্মাণ করা হয় খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ যেন সেখানে সমবেত হয়ে ঐশরিক উপাসনা-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং তাদের উপাসনিক ক্রিয়াসমূহ সম্পাদন করতে পারেন। গির্জাঘর তাই অপরাপর স্থাপনা, দালান বা ঘরের মত নয় – যদিও এটি একটি ঘর বটে। বিষয়টি আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি – বিভিন্ন প্রয়োজনে মানুষ ঘর নির্মাণ করে, তার মধ্যে কোনটি বসবাস করার জন্য, কোনটি বাণিজ্যিক বা অফিস, ব্যাংক এবং এরূপ বহু প্রয়োজনে, এবং সেই সব প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন ধরণের স্থাপনা নির্মাণ করে। যে ঘর বা স্থাপনা যে উদ্দেশে নির্মাণ করা হয় তার প্রয়োজন অনুসারেই সেগুলোর নির্মাণ শৈলী বা আর্কিটেকচারাল ডিজাইন হয়ে থাকে। ঠিক একই ভাবে গির্জাঘর যেহেতু ঐশরিক

উপাসনা-অনুষ্ঠান ও উপাসনিক ক্রিয়াসমূহ সম্পাদনের জন্য, তাই এর নির্মাণ শৈলীও এই উদ্দেশ্য পূরণের উপযোগী করেই পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। এই নির্মাণ শৈলীর মধ্যে থাকে নান্দনিক সৌন্দর্য, থাকে এমন শৈল্পিক কারুকাজ যা উপাসনাকারী ঐশজনগণের মন-হৃদয় ঐশরিক বিষয়ে মনোযোগী হতে সাহায্য করে এবং পবিত্রতা ও ভক্তি-ভাব দ্বারা সম্পূর্ণ পরিবেশকে পূর্ণ করে তোলে। অপর দিকে গির্জাঘরে যেহেতু উপাসনিক ক্রিয়ানুষ্ঠান সমূহ সম্পাদিত হয়, তাই গির্জাঘরের অভ্যন্তরে উপাসকমণ্ডলী, উপাসনা পরিচলনাকারী যাজক, সেবক, পাঠক, গানের দল – সবার উপযুক্ত স্থান এবং তাদের গতিবিধি বা *liturgical movement*-এর জন্য উপযুক্ত স্থান ও তার বিন্যাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই সব কিছু নির্ভর করে গির্জার নির্মাণ শৈলী বা আর্কিটেকচারাল ডিজাইন ও 'ফ্লোর প্ল্যান'-এর উপর। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় – খ্রিস্টযজ্ঞের অনুষ্ঠানে যখন ধূপারতি করতে হয়, তখন বেদী যদি *free standing* না হয়, তা হলে যাজক বেদীর চারপাশ প্রদক্ষিণ করে ধূপারতি করতে পারবেন না, তার জন্য বেদীর চারপাশে জায়গা থাকতে হবে। উপাসনা-অনুষ্ঠানের এরূপ বিভিন্ন ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় স্থানকেই *liturgical space* বলা হয় যা খ্রিস্টীয় উপাসনা-অনুষ্ঠানের সাথে ঘনিষ্টভাবে জড়িত। এজন্য বেনেডিকটিন সংঘের উপাসনাবিদ আইদান ক্যাভেনা বলেন :

"Liturgical worship happens in space, and space is shaped into place by the meaning people discover within it. Jews and Christians have shaped space into place by discovering that the Creator abides throughout creation. Christians especially can never forget the spatial concreteness an incarnation entails. God did not become a movement, a concept, an ideal, or even a committee, but a man of flesh and bone with parentage, friends, a language, a country, a home" (Aidan Kavanagh, Elements of Rite, Pueblo Book, Minnesota,1990).

উপাসনালয় বা গির্জাঘর হল সেই স্থান যেখানে বিশ্বাসী ভক্তজনগণের সমাবেশে স্বয়ং ঈশ্বর উপস্থিত থাকেন। তিনি সর্বত্র বিরাজমান – তথাপি ভক্তজনগণ যেখানে একত্রে মিলিত হন, সেখানে তিনি উপস্থিত থাকেন। যিশুখ্রিস্ট তাই প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছেন: "যেখানে তোমরা দুই বা তিন জন আমার নামে মিলিত হবে, সেইখানে, তোমাদের মাঝখানে আমি উপস্থিত আছি" *(মথি ১৮:২০)*। এই বিষয়টি আইদান ক্যাভেনা উপরোক্ত উদ্ধৃতিটিতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন খ্রিস্টের দেহধারণের রহস্য উল্লেখ করে: ঈশ্বর মানুষের মাঝে কোন ধারণা, তত্ত্ব, কোন আন্দোলন, কিংবা কমিটি – ইত্যাদির মধ্যে নয়, বরং তিনি দেহধারণের মধ্য দিয়ে একটি জায়গায়, একটি মানব সমাজে, একটি মানব-গৃহে উপস্থিত হয়েছেন। এ কারণেই উপাসনিক স্থানরূপে গির্জা বা উপাসনালয়কে গুরুত্ব দিতে হয়, যেন আমাদের প্রতিটি উপাসনা-অনুষ্ঠানে খ্রিস্ট 'দেহধারণ' করেন।

৩. দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার শিক্ষা ও মনোভাব

দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার পূর্ববর্তী সময় কালের উপাসনা বিভিন্নভাবে ভক্তজনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। আদি মণ্ডলীতে বিশ্বাসীদের মিলন-সমাজ সমবেতভাবে এবং সহভাগিতাপূর্ণ উপাসনা-অনুষ্ঠান সম্পাদন করতেন *(দ্র. শিষ্যচরিত ২:৪২-৪৭)*। ১১শ শতাব্দী থেকে শুরু করে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা পর্যন্ত সেই মিলন-সমাজের সহভাগিতাপূর্ণ 'রুটি-ছেঁড়া' অনুষ্ঠানের স্থানে ভক্তজনগণের অংশগ্রহণহীন এবং অতিমাত্রায় 'যাজক-কেন্দ্রিক' এক দুর্বোধ্য অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। তাই দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার পিতৃগণ পুণ্য উপাসনা বিষয়ক সংবিধান (৪ ডিসেম্বর, ১৯৬২)-এর দ্বারা নির্দেশনা দান করেন উপাসনাকে "জনগণের উৎসব-অনুষ্ঠান" রূপে পুনরুজ্জীবিত করতে, যেন উপাসনায় ভক্তজনগণের অংশগ্রহণ হয় 'সম্পূর্ণ, সচেতন ও সক্রিয়'। এই সংবিধানে তাই উল্লেখ করা হয়েছে :

"উপাসনা-অনুষ্ঠানগুলো একান্ত নিজস্ব অনুষ্ঠান নয়, বরং "একতার সংস্কার" রূপ মণ্ডলীর অর্থাৎ "বিশপ কর্তৃক মিলিত ও সুবিন্যস্ত পবিত্র জনগণের" উৎসব-অনুষ্ঠান। অতএব উপাসনা-অনুষ্ঠানাদি মণ্ডলীর সম্পূর্ণ দেহের সাথে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত। এগুলো মণ্ডলীকে প্রকাশ করে এবং এদের কার্যকর প্রভাব মণ্ডলীতে এসে পড়ে। এগুলো আবার মণ্ডলীর প্রত্যেকটি সদস্যকে বিভিন্নভাবে স্পর্শ করে তাদের পদ, উপাসনা-অনুষ্ঠানে তাদের ভূমিকা ও অংশগ্রহণের উপর নির্ভর করে" (পুণ্য উপাসনা, নং ২৬)।

এরূপ অংশগ্রহণ-মূলক ও সমবেত উপাসনা-অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত 'স্থান'-এর প্রয়োজন। অপর দিকে উপাসনায় যাদের বিশেষ করণীয় রয়েছে তাদের ক্রিয়াসকল সম্পাদনের জন্য অর্থাৎ *liturgical movement*-এর জন্যও উপযুক্ত 'স্থান' বা *liturgical space* প্রয়োজন। এজন্য পরিচালকের আসন, বাণী-ঘোষণা ও বাণী-ব্যাখ্যার জন্য 'বাণী-ঘোষণা মঞ্চ' (*Ambo* বা *Lectern*), অর্ঘ্য সামগ্রী রাখার জন্য 'ক্রেডেন্স টেবিল', বেদীসেবকদের জন্য আসন, ইত্যাদি স্থানগুলো উপাসনিক ক্রিয়া এবং তার জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তির গতিবিধির জন্য জায়গা (*passage*) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ – বেদীসেবকদেরকে অর্ঘ্য প্রস্তুতির সময় বেদী ও ক্রেডেন্স টেবিলের (*credence table*) মধ্যবর্তী জায়গায় আসা-যাওয়া করতে হয়। ক্রেডেন্স টেবিল থেকে পানপাত্র, দ্রাক্ষারস ও জল, কম্যুনিয়নের পাত্র, ইত্যাদি বেদীতে নিয়ে আসা এবং যথাসময়ে এগুলো আবার ক্রেডেন্স টেবিলে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার মাঝখানে যদি কোন প্রতিবন্ধকতা থাকে তাহলে বেদীসেবকদের কাজগুলো উপাসনিক 'ভক্তি ও মাধুর্য সহ সম্পাদন করা' সম্ভব হবে না (*দ্র. পুণ্য উপাসনা*, নং ২৮, ২৯)। তাই লক্ষ্য রাখতে হবে এই স্থানটিতে যেন সহার্পণকারী যাজকের চেয়ার বা অনুরূপ কিছু রাখা না হয়। এজন্য আইদান ক্যাভেনা বলেন:

"What the church building shelters and gives setting for is the faithful assembly, the Church, in all its rich diversity of orders from catechumen to penitent, from youngest server to oldest bishop…The assembly uses its place to do something in. This is liturgy, by which the assembly celebrates the nuptials of all things with their Creator. The assembly, as a rule, has kept its place opens for movement on the part of all" (Aidan Kavanagh, Elements of Rite, 1990).

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা সঙ্গতভাবেই প্রত্যাশা করেছে এবং তার জন্য নির্দেশনাও প্রদান করেছে যেন প্রতিটি উপাসনা-অনুষ্ঠান ভক্তজনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়। এজন্য *পুণ্য উপাসনা বিষয়ক সংবিধান* 'সমবেত অনুষ্ঠানের উৎকৃষ্টতা'-এর উপর জোর দিয়ে বলে :

"যে সমস্ত অনুষ্ঠান সমবেতভাবে তথা জনগণের উপস্থিতিতে ও তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণসহ হবার কথা, সেগুলো এককভাবে বা প্রায় ব্যক্তিগতভাবে না করে যতদূর সম্ভব সমবেত ভাবে যেন করা হয় সেদিকে জোর দিতে হবে। একথা খাটে বিশেষভাবে খ্রিস্টযাগের ক্ষেত্রে (যদিও প্রতিটি খ্রিস্টযাগ এমনিতেই সর্বসাধারণগত ও সমাজগত স্বভাবের অধিকারী) এবং অন্যান্য সংস্কারানুষ্ঠানের বেলায়" *(পুণ্য উপাসনা, নং ২৭)*।

মহাসভার এই নির্দেশনা যেন বাস্তবায়িত হয় তার জন্য এই সংবিধানটি পরবর্তী অংশে আরো স্পষ্ট করে নির্দেশনা দান করে :

"উপাসনা-অনুষ্ঠানে প্রত্যেকটি ব্যক্তি অর্থাৎ যাজক ও ভক্তজনগণ, উপাসনায় যাদের

বিশেষ করণীয় আছে, তাদের কর্তব্যের সবটুকু এবং শুধু সেইটুকু সম্পাদন করবেন যা উপাসনার নিয়মনীতি ও অনুষ্ঠানের প্রকৃতি অনুযায়ী তাদের দেওয়া হয়েছে।....সেবক, পাঠক, ভাষ্যকার এবং গানের দলের সদস্যরাও সত্যিকার উপাসনা-কার্য সম্পাদন করেন। তাই তাদের উচিত তাদের কর্তব্য অকপট ভক্তি ও মাধুর্যসহ সম্পাদন করা, যে ভক্তি ও মাধুর্য ঈশ্বরের জনগণ সঙ্গতভাবে আশা করেন এবং এরূপ মহতী অনুষ্ঠানে যা থাকারই কথা।" *(পুণ্য উপাসনা, নং ২৮, ২৯)*।

এই নির্দেশিকাটির প্রতি একটু মনোযোগ দিলেই আমরা বুঝতে পারি যাজক এবং ভক্তজনগণ, যে 'জনগণ'-এর মধ্যে আছেন সেবক, পাঠক, ভাষ্যকার ও গানের দলের সদস্যরা – উপাসনালয়ে বা গির্জায় যদি তাদের জন্য এবং তাদের সুনির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত জায়গা না থাকে, তাহলে প্রথমত তারা উপাসনা-অনুষ্ঠানে কখন কি হচ্ছে তা অনুসরণ করতে পারবেন না, দ্বিতীয়ত উপযুক্ত জায়গার অভাবে তাদের করণীয় কাজ সম্পাদনে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। তাই প্রতিটি গির্জাঘর নির্মাণের পূর্বে 'উপাসনিক স্থান' বা *liturgical space* সম্বন্ধে সঠিক ধারণা, এবং তা সুবিন্যস্তভাবে তৈরি করার জন্য প্রকৌশলী ছাড়াও যাদের খ্রিস্টীয় উপাসনা ও তার সাথে জড়িত বিষয়াদি সম্পর্কে ধারণা আছে, তাদের সাথে নিয়ে অথবা তাদের কাছ থেকে ধারণা নিয়ে পরিকল্পনা করা অত্যন্ত জরুরী বিষয় রূপে বিবেচনা করা উচিত। কতজন লোকের জন্য স্থান সংকুলান হবে, গির্জার সম্মুখভাগ কোনদিকে হবে – এরূপ কয়েকটি বিষয়ে পরিকল্পনা না করেই একটি গির্জা 'ঘর' নির্মাণ করা হয়, এবং তা করার পর যদি চিন্তা করা হয় : সেবকরা কোথায় বসবে, পাঠক-পাঠিকা কোথায় থাকবে, গানের দল কোথায় থাকবে – তাহলে *liturgical space* সঠিকভাবে বিন্যাস করা সম্ভব হবে না। এজন্য প্রকৌশলীকে এসব বিষয় বিবেচনায় রেখেই গির্জার *floor plan*-এর নকশা তৈরী করতে হয়। এরূপ পূর্ব-পরিকল্পনার অভাব জনিত কারণে অনেক গির্জা নির্মাণের কাজ শুরু করার পর 'নানা জনের নানা মতের' ভিত্তিতে মূল নক্স কিংবা বিশেষ বিশেষ অংশের নক্সা বার বার পরিবর্তন করতে হয়। আর এর ফলে নির্মাণ-কাজ হয় ত্রুটিপূর্ণ ও দূর্বল।

৪. উপাসনিক স্থান ও উপাসনায় 'সম্পূর্ণ, সচেতন ও সক্রিয়' অংশগ্রহণ

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা খ্রিস্টমণ্ডলী সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে গিয়ে সকল খ্রিস্টবিশ্বাসীদের নিয়ে গঠিত "ঈশ্বরের জনগণ"-কে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছে। পুণ্য উপাসনা বিষয়ক সংবিধান তাই উপাসনা-অনুষ্ঠানে ভক্তজনগণের অংশগ্রহণ সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করে বলে :

"সক্রিয় অংশগ্রহণ উন্নত করার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করতে হবে জয়ধ্বনি, প্রত্যুত্তর, সামসঙ্গীত, ধূয়ো, গীতি এবং ক্রিয়া, অঙ্গভঙ্গী ও আসনাদির মাধ্যমে অংশগ্রহণ করতে। উপযুক্ত সময়ে ভক্তিপূর্ণ নীরবতা পালন করা উচিত" *(পুণ্য উপাসনা, নং ৩০)*।

এখানে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যার সাথে 'উপাসনিক স্থান'-এর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। বিষয় তিনটি হল: ক্রিয়া, অঙ্গভঙ্গি ও আসনাদি। ক্রিয়াগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে প্রবেশ শোভাযাত্রা, মঙ্গলসমাচার গ্রন্থ নিয়ে পাঠের পূর্বে শোভাযাত্রা, অর্ঘ্য আনয়ন শোভাযাত্রা, খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসার শোভাযাত্রা *(Communion Procession)*, এবং উপাসনা শেষে প্রবেশদ্বার অথবা সাক্রিস্টি ঘরে ফিরে যাওয়ার শোভাযাত্রা *(Recession)* – এই কয়েকটি অত্যন্ত স্পষ্ট, এবং এরূপ শোভাযাত্রার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত যায়গা বা *liturgical space*। অপর দিকে উপাসনা-অনুষ্ঠানে পৌরহিত্যকারী যাজকের আসন এমন স্থানে হওয়া প্রয়োজন, প্রথমত তাঁকে যেন উপাসকমণ্ডলী দেখতে পান, এবং দ্বিতীয়ত তিনিও যেন তাঁর আসন থেকে বাণী-ঘোষণা মঞ্চ *(ambo or lectern)*, যজ্ঞবেদী, খ্রিস্টপ্রসাদ-মঞ্জুষা, কম্যুনিয়ন বিতরণের জন্য ভক্তমণ্ডলীর সম্মুখে – এই সব স্থানে স্বাচ্ছন্দে যাওয়া-আসা করতে পারেন তার জন্য, অর্থাৎ *liturgical movement* -এর জন্য যায়গা প্রয়োজন, যেন তাঁর এরূপ গমনাগমনের পথে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে। একইভাবে বেদীসেবক, বাণী ঘোষক ও অন্যান্য সেবাকারী *(ministers)*-দের জন্যও উপযুক্ত স্থানের প্রয়োজন রয়েছে, যেন তাঁর সেবাকাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারেন এবং উপাসকমণ্ডলী তাঁদের উপাসনিক ক্রিয়াসমূহ দেখতে পান।

রোমীয় যজ্ঞরীতির সাধারণ নির্দেশিকা *(General Instructions of the Roman Missal)*-এর পঞ্চম অধ্যায়ে গির্জাঘরের (অভ্যন্তরে) খ্রিস্টযজ্ঞের উপাসনা-অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত স্থান ও আসবাবের বিন্যাস ও সাজসজ্জা (**The Arrangement and Furnishing** *of Churches for the Celebration of the Eucharist*)-এর বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের শুরুতে 'সাধারণ নীতি' *(General Principle)* রূপে উল্লেখ করা হয়েছে :

"For the celebration of the Eucharist, the people of God normally gather in a church or if it is too small, then in another respectable place that is nonetheless worthy of so great a mystery. Churches, therefore, and other places should be suitable for carrying out the sacred action and for ensuring the active participation of the faithful. Sacred buildings and requisites for divine worship should, moreover, be truly worthy and beautiful and be signs and symbols of heavenly realities" (*GIRM*, no.288).

রোমীয় যজ্ঞরীতির সাধারণ নির্দেশিকার এই অনুচ্ছেদটিতে দু'টি বিষয় উল্লেখযোগ্য: প্রথমত, উপাসনার সকল ক্রিয়ানুষ্ঠান সমূহকে 'পবিত্র ক্রিয়া' *(sacred action)*, এবং 'ঐশরিক উপাসনা' *(divine worship)*-এর বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, উপাসনালয় বা গির্জাকে *sacred building* রূপে উল্লেখ করা হয়েছে, আর তাই এই স্থানটি যেন সৌন্দর্য মণ্ডিত ও স্বর্গীয় বিষয়াদির চিহ্ন ও প্রতীক হয়ে ওঠে সে বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করছে। এ থেকে আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি উপাসনালয় বা গির্জা কিংবা চ্যাপেল এমন 'পূণ্য স্থান' রূপে গড়ে তোলা প্রয়োজন যেন উপাসনায় অংশগ্রহণকারী ছাড়াও যে বা যারাই এরূপ স্থানে প্রবেশ করবেন, তারা যেন উপলব্ধি করতে পারেন যে স্থানটি 'পবিত্র' *(sacred)*, এবং 'জাগতিক' কিংবা 'অপবিত্র' *(profane)* ক্রিয়াদি সম্পাদিত হয় এরূপ স্থান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

কাথলিক মণ্ডলীর উপাসনা-রীতি অনুসারে উপাসনা-অনুষ্ঠান সম্পাদন করার জন্য তাই রোমীয় যজ্ঞরীতির সাধারণ নির্দেশিকা উপাসনা অনুষ্ঠানের জন্য যথাযথ স্থান ও 'আসবাব' সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রাদান করেছে, যেমন : যজ্ঞবেদী, বাণী-ঘোষণা মঞ্চ *(ambo or lectern)*, পৌরহিত্যকারী যাজকের আসন, উপাসকমণ্ডলীর স্থান ইত্যাদি।

১) যজ্ঞবেদী: পুণ্য যজ্ঞবেদী সম্পর্কে রোমীয় যজ্ঞরীতির সাধারণ নির্দেশিকা বলে :

"The altar is on which the Sacrifice of the Cross is made present under sacramental signs is also the table of the Lord to which the People of God is called together to participate in the Mass, as well as the center of the thanksgiving that is accomplished through the Eucharist… It is appropriate to have a fixed altar in every church, since it more

clearly and permanently signifies Christ Jesus, the living stone (1 Pt 2:4, Eph 2:20). In other places set aside for sacred celebrations, the altar may be movable" (*GIRM,* nos. 296, 298).

'যজ্ঞবেদী' শব্দটি থেকে 'যজ্ঞ' বাদ দিলে শুধু 'বেদী' শব্দটি খ্রিস্টীয় উপাসনার যজ্ঞোৎসর্গের জন্য যে বেদী ব্যবহার করা হয় তা ব্যতীত আরও বহু ধরণের বেদীর সাথে একাকার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যেমন, বাংলাদেশে শহীদ মিনারের পাদদেশ বা চত্বরকেও 'শহীদ বেদী' বলে আখ্যায়িত করা হয়। গির্জার যজ্ঞবেদী শুধু খ্রিস্টযজ্ঞোৎসর্গের জন্যই। এজন্য এক সময়ে যেমন যজ্ঞবেদী থেকেই খ্রিস্টযজ্ঞের প্রবেশ রীতি এবং সমাপন রীতি সম্পাদন করা হত, এখন ধীরে ধীরে তা বন্ধ করে বা কমিয়ে যাজকের আসন বা এর নিকটবর্তী উপযুক্ত স্থান থেকে প্রবেশ ও সমাপন রীতি সম্পাদন করা হচ্ছে, যা হবারই কথা। অপর দিকে অন্য কোন কাজে ব্যবহৃত হয়, এমন একটি টেবিল এনে খ্রিস্টযজ্ঞের অনুষ্ঠান পরিহার করা উচিত।

এ প্রসঙ্গে রোমীয় যজ্ঞরীতির সাধারণ নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে :

"In building new churches, it is preferable to erect a single altar which in the gathering of the faithful will signify the one Christ and the one Eucharist of the Church. In already existing churches, however, when the old altar is positioned to that it makes the people's participation difficult but cannot be moved without damage to its artistic value, another fixed altar, of artistic merit and duly dedicated, should be erected and sacred rites celebrated on it alone. In order not to distract the attention of the faithful from the new altar, the old altar should be decorated in a special way" (*GIRM,* no. 303).

এখানে দুটি প্রধান বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, আর তা হল : প্রথমত, নতুন গির্জার যজ্ঞবেদী যেন স্থায়ী এবং এমন ভাবে তা নির্মাণ করা হয় যেন যাজক ভক্তজনগণের দিকে মুখ করে উপাসনা পরিচালিত করতে পারেন, এবং এই যজ্ঞবেদী হবে স্থায়ী এবং একমাত্র যজ্ঞবেদী, কারণ একটি গির্জায় একই খ্রিস্ট একাধিক যজ্ঞবেদীতে বলিকৃত হতে পারেন না। দ্বিতীয়ত, পুরাতন কিন্তু ব্যবহৃত হচ্ছে এমন গির্জার যজ্ঞবেদী যদি পিছনের দেয়াল বা *apse*-এর সাথে সংযুক্ত থাকে যা সরানো সম্ভব নয় কিংবা সরাতে গেলে এর শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তা হলে তা না সরিয়ে ভিন্নভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন খ্রিস্টপ্রসাদ-মঞ্জুষা বা *tabernacle* রাখা যেতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে নতুন অন্য একটি যজ্ঞবেদী তৈরী করতে হবে যেন যাজক উপাসকমণ্ডলীর দিকে মুখ করে যজ্ঞোৎসর্গ করতে পারেন। নতুন যজ্ঞবেদটিও স্থায়ী হতে হবে।

২) পৌরহিত্যকারী যাজকের আসন: আমরা হয়তো বা পৌরহিত্যকারী যাজকের আসনটির *(presider's chair)*-এর প্রতীকী অর্থ, এর যথার্থ স্থান ও ব্যবহার সম্পর্কে সজাগ থাকি না। রোমীয় যজ্ঞরীতির সাধারণ নির্দেশিকা এই যাজকের আসন সম্পর্কে বলে :

"The chair of the priest celebrant must signify his office of presiding over the gathering and of directing the prayer. Thus, the best place for the chair is in a position facing the people at the head of the sanctuary, unless the design of the building or other circumstances impedes this: for example, if the great distance would interfere with communication between the priest and the gathered assembly, or if the tabernacle is in the center behind the altar. Any appearance of a throne, however, is to be avoided. It is appropriate that, before being put into liturgical use, the chair be blessed according to the rite described in the Roman Ritual" (*GIRM,* no. 310).

পৌরহিত্যকারী যাজকের আসন (চেয়ার) প্রকাশ করে উপাসনা-অনুষ্ঠানে তাঁর 'সভাপতিত্বকারী ভূমিকা' যা তিনি অনুশীলন করেন উপাসকমণ্ডলীর প্রতি এবং প্রার্থনার জন্য নির্দেশ প্রদানে। তাই, তাঁর আসনটি উপাসকমণ্ডলীর দিকে মুখ করে, যাজক ও উপাসকমণ্ডলী যেন পরস্পরকে দেখতে পান, এবং তাঁদের মধ্যে আদান-প্রদানে যেন কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা না থাকে এমন স্থানে। এটা হতে পারে 'পুণ্য স্থান' *(sanctuary)*-এর সম্মুখভাগে যদি না গির্জার নির্মাণ শৈলী বা ডিজাইন অনুসারে পুণ্যস্থানের পশ্চাৎ ভাগে রক্ষিত খ্রিস্টপ্রসাদ-মঞ্জুষাকে আড়াল না করে।

একই ভাবে খ্রিস্টযাগে সহার্পণকারী যাজকদের জন্য এবং যে সকল যাজক সহার্পণ না করলেও উপাসনার সঙ্গীত পরিচালনার জন্য অথবা অন্য কোন কারণে উপস্থিত থাকেন, তাদের জন্যও পুণ্যস্থানে উপযুক্ত আসন সম্পর্কে বলা হয়েছে :

"Seats should be arranged in the sanctuary for concelebrating priests as well as for priests who are present for the celebration in choir dress but who are not concelebrating" (ibid).

ডিকন ও অন্যান্য সেবাকারীদের জন্যও উপাসনায় তাদের ভূমিকা অনুযায়ী আসন বিন্যাস করার নির্দেশনায় বলা হয়েছে :

"The seats for the deacon should be placed near that of the celebrant. Seats for the other ministers are to be arranged so that they are clearly distinguishable from those for the clergy and so that the ministers are easily able to fulfill the functions entrusted to them" (ibid).

খ্রিস্টযজ্ঞের অনুষ্ঠানে ডিকনের আসন বা স্থান ঠিক কোথায় হবে এ নিয়ে অনেকের দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকে। রোমীয় যজ্ঞরীতির সাধারণ নির্দেশিকা এখানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে, তাঁর [তাঁদের] স্থান হল পৌরহিত্যকারী যাজকের পাশেই; কারণ তিনি [তাঁরা] অভিষিক্ত রূপে 'যাজকীয় সোপান' *(Holy Order)*-এর অন্তর্ভূক্ত। অন্যান্য সেবাকারীগণ *(ministers)* পুণ্যস্থানের এমন জায়গায় থাকবেন যেন তাঁরা তাঁদের সেবাকাজ সহজতর ভাবে সম্পাদন করতে পারেন এবং একই সাথে তাঁরা যে যাজক নন সেই পার্থক্যও যেন প্রকাশ পায়।

৩) উপাসকমণ্ডলীর স্থান: উপাসনায় ভক্তজনগণের মধ্যে সকল অংশগ্রহণকারীকে *assembly*, অথবা *congregation* বলা হয়। গ্রীক ভাষায় *Synaxis* হলো ভক্তজনদের 'সমাবেশ', যা উপাসনিক পরিভাষায় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিষয়। মূলত গির্জাঘরের বিভিন্ন স্থান বা *space*-এর নাম গুলো এসেছে গ্রীক ভাষা থেকে এবং গ্রীক শব্দগুলোই ব্যবহৃত হয়ে থাকে কারণ শব্দগুলো বিশেষ অর্থ বহন করে। এগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ উপাসনিক স্থানগুলো হলো :

ক. সমাবেশ স্থান *(Narthex)* : প্রবেশদ্বার সংলগ্ন জায়গা বা অলিন্দ *(gathering area)*, যেখানে ভক্তজনগণ উপাসনার জন্য সমবেত হন এবং যেখান থেকে যাজক, সেবক ও অন্যান্য সেবাকারীগণ শোভাযাত্রা করে এগিয়ে যান। প্রধানত এই 'সমাবেশ স্থান' থেকে উপাসকমণ্ডলীকে গির্জার প্রবেশদ্বার থেকে উপাসনা-অনুষ্ঠানে 'উপাসকমণ্ডলীর স্থান' বা Nave-এর দিকে পরিচালিত করে। এই সমাবেশ স্থান থেকে উপাসকমণ্ডলীর স্থানের মাঝখান দিয়ে শোভাযাত্রা করে 'পুণ্যস্থান'

বা *sanctuary*-এর দিকে এগিয়ে যাওয়া স্মরণ করিয়ে দেয় পুরাতন নিয়মে মনোনীত জাতির মিশর দেশের বন্দীদশা থেকে মুক্তি লাভ করে মোশীর নেতৃত্বে চল্লিশ বছর ধরে প্রতিশ্রুত দেশের অভিমুখে দীর্ঘ যাত্রার কথা, এবং নতুন নিয়মে খ্রিস্টের নেতৃত্বে 'স্বর্গীয় প্রতিশ্রুত দেশ'-এর অভিমুখে খ্রিস্টের রক্তে বিমুক্ত মানবজাতির অভিযাত্রার কথা। গোটা খ্রিস্টমণ্ডলী হল 'তীর্থযাত্রী মণ্ডলী' কারণ মণ্ডলী নিজে এবং তার সাথে মানবজাতি ও বিশ্বকে সাথে নিয়ে সেই 'স্বর্গীয় প্রতিশ্রুত দেশ'-এর অভিমুখে নিরন্তর যাত্রা করে চলেছে (দ্র. খ্রীষ্টমণ্ডলী বিষয়ক সংবিধান, দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা, সপ্তম অধ্যায়)।

আমাদের দেশে কোন গির্জায় Narthex নেই বললেই চলে। যা আছে তা হল বারান্দা বিশেষ, যে কারণে অধিকাংশ খ্রিস্টভক্তগণ উপাসনা-অনুষ্ঠানে পূর্বে ও পরে গির্জাঘরের বাইরের উন্মুক্ত জায়গা গুলোতেই অবস্থান করেন। এতে উপাসনায় "ঈশ্বরের পবিত্র জনগণ ও রাজকীয় যাজক সমাজ" রূপে "সমবেত হওয়ার" (gathering of the people of God) অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি হয় না।

খ. উপাসকমণ্ডলীর স্থান (Nave): গির্জাঘরের অভ্যন্তরে উপাসকমণ্ডলীর জন্য স্থান হলো যেখানে অবস্থান করে তারা পুরো উপাসনা-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন, যেখানে তাদের উপবেশনের জন্য 'বেঞ্চ' বা pews (অথবা কার্পেট) থাকে। এই স্থানটি এই অর্থ প্রকাশ করে যে, খ্রিস্ট প্রভু নিজেই আমাদেরকে 'মেষ-শাবকের বিবাহ ভোজ'-এ আমন্ত্রণ জানিয়েছেন *(দ্র. লুক ১৪: ৭-১৪; প্রত্যাদেশ ১৯:৬-৯)*, যেন উপাসকমণ্ডলী প্রতিটি উপাসনা-অনুষ্ঠানে সেই ভাবী-কালের মহোৎসবেই (Eschatological Banquet) যোগদান করেন। তাই ঐশজনমণ্ডলীর উপাসনা-অনুষ্ঠানে 'সম্পূর্ণ, সচেতন ও সক্রিয়' অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে যদি nave এমনভাবে নির্মাণ করা হয়, যাতে উপাসকমণ্ডলীকে যজ্ঞবেদী ও sanctuary থেকে অনেক দূরে সরে থাকতে বা অবস্থান করতে না হয়; বরং তাদের স্থান যেন হয় sanctuary-এর তিন দিকে অর্ধবৃত্তাকারে, অথবা মধ্যভাগ (center) থেকে দু'পাশে প্রশস্ত, তাহলে তারা স্পষ্টভাবে দেখতে পাবেন পরিচালকের আসন, বাণী-ঘোষণা মঞ্চ এবং যজ্ঞবেদীর সকল ক্রিয়ানুষ্ঠানসমূহ, আর তাতে উপাসকমণ্ডলীর পক্ষে সম্পূর্ণ, সচেতন ও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ সম্ভব হয়ে উঠবে। কিন্তু nave যদি হয় লম্বা বা দীর্ঘ এবং পার্শ্বে তুলনামূলকভাবে সরু, তাহলে শুধু সামনের দিকে যারা থাকবেন তারাই ভাল মত উপাসনার প্রধান ক্রিয়াসমূহ দেখতে পারবেন আর যারা থাকবেন মধ্যবর্তী অংশ থেকে শেষ প্রান্তে তাদের পক্ষে পুণ্যস্থানে অনুষ্ঠিত উপাসনিক ক্রিয়াসমূহ দেখা এবং তাতে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হবে না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ – হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর পর্তুগীজ মিশনারী আমলে (১৭৭৭ খ্রি.) নির্মিত গির্জা এবং নাগরী ধর্মপল্লীর বর্তমান নতুন গির্জার ভক্তমণ্ডলীর স্থান অর্থাৎ nave-এর মধ্যে তুলনা করলেই বিষয়টি বুঝতে কারো কষ্ট হবে না। হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর গির্জার নির্মাণ শৈলী অনুসারে সরু এবং দীর্ঘ; আর নাগরী ধর্মপল্লীর নতুন গির্জা sanctuary-কে কেন্দ্রে রেখে অর্ধবৃত্তাকার এবং দু'পাশে প্রশস্ত, যার জন্য উপাসকমণ্ডলী যেদিকেই বসুন না কেন, কেই-ই sanctuary থেকে অনেক বেশী দূরে থাকতে হয় না। বাংলাদেশের কাথলিক গির্জা গুলোর মধ্যে আরও কয়েকটি গির্জার এরূপ নির্মাণ শৈলী লক্ষ্য করা যায়, যেমন: বরিশাল ধর্মপ্রদেশের নারিকেলবাড়ী ধর্মপল্লীর ও গৌরনদী ধর্মপল্লীর গির্জা, এবং চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের নোয়াখালী ধর্মপল্লীর গির্জা। এক সময় ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের জলছত্র ও পীরগাছা ধর্মপল্লীতে পরলোকগত ফাদার ইউজিন হোমরিক সিএসসি-এর নির্মিত মাটির গির্জাঘর গুলোর floor plan ও ছিল বেদী বা পুণ্যস্থানের সম্মুখে এবং দু-পাশ ঘিরে অর্ধবৃত্তাকার যাতে ভক্তজনদের উপাসনা-অনুষ্ঠানের মূল জায়গা থেকে অনেক দূরে থাকতে না হয়; বরং উভয়ের মধ্যে আদান-প্রদান সহজতর হয়। এ দিক থেকে ঢাকার বনানীতে অবস্থিত পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর 'পবিত্র আত্মা' চ্যাপেলটির nave বা 'উপাসকমণ্ডলীর স্থান' একটি 'আদর্শ' নির্দশন হিসেবে গণ্য করা যায়, যদিও এর অন্য কিছু ত্রুটি রয়েছে।

গ. গির্জার সম্মুখভাগ (Apse) : গির্জার 'পূর্ব' প্রান্তের অংশ, যা ষড়ভুজ, অর্ধবৃত্তাকার বা সমান (flat) হয়ে থাকে, উপর দিকটি উঁচু হয়, এবং যার উপরিভাগে dome থাকে, যে অংশটিকে আমরা সচরাচর 'পিছনের দেওয়াল' কিংবা 'ব্যাকগ্রাউন্ড' বলে থাকি। উপাসনিক দিক থেকে গির্জার এই স্থানটির রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এই স্থানটিই হল 'পুণ্যস্থান' বা sanctuary যেখানে উপাসনা-অনুষ্ঠান প্রধান ক্রিয়াগুলো সম্পাদিত হয়, এখানেই থাকে যজ্ঞবেদী, বাণী ঘোষণার ambo বা lectern, পরিচালকের আসন, সেবকদল ও অন্যান্য সেবাকারীদের আসন। এখানে Apse -এর দেয়ালে বড় আকারের ক্রুশমূর্তিও থাকে, যাতে করে যাজক ও উপাসকমণ্ডলী স্মরণ করেন যে ক্রুশের উপর খ্রিস্ট প্রভুর আত্মবলি নিবেদনই বেদীর উপর রুটি ও দ্রাক্ষারসের সাক্রামেন্তীয় চিহ্নের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। সাধারণত এই স্থানটির উপরের অংশ (ছাদ) হয়ে থাকে উঁচু এবং বহু গির্জায় এর উপরে dome থাকে। আলো, অর্থাৎ বাতির ব্যবস্থাপনার জন্যও এই অংশের ছাদটি উঁচু রাখতে হয়। এর ভিতরের অংশে 'স্বর্গীয়' দৃশ্য অঙ্কিত থাকে ও অনুরূপ কারুকার্য দ্বারা সুসজ্জিত রাখা হয় – কারণ Apse হল আমাদের 'প্রতিশ্রুত দেশ' অর্থাৎ স্বর্গলোকের প্রতীক।

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার পরবর্তী সময়ে উপাসনার যে সংস্কার ও পুনরুজ্জীবিতকরণের কাজ সম্পাদিত হয়েছে, পাশ্চাত্যে তা যতটা না উপাসনার ভাষাগত দিক থেকে হয়েছে, তার থেকে অধিক প্রাধান্য পেয়েছে প্রাচীন গির্জাগুলোর সংস্কার কাজ এবং নতুন গির্জা নির্মাণের ক্ষেত্রে নতুন নির্মাণ শৈলী ব্যবহারে, যেন যাজক, ভক্তজনগণ এবং উপাসনায় যাদের বিশেষ করণীয় রয়েছে তারা সবাই 'ঐশ জনগণ' রূপে সমবেত হয়ে উপাসনা-অনুষ্ঠান সম্পাদন করতে পারেন–তার উপযুক্ত করে গির্জা নির্মাণের বিষয়টি। উপাসনাবিদ জেমস এফ. হোয়াইট বিষয়টি সম্বন্ধে বলেছেন:

"The most dramatic changes in Roman Catholic worship in the post-Vatican II era may well have been spatial rather than linguistic. The church buildings of this period came to reflect a whole new concept of what it was to be the church. The built environment may be the best index of this shift. It is as if the church building shifted from being a theater with stage and house clearly distinguished to a structure in which everyone found himself or herself on stage. No spectator space was left over" (James F. White, Roman Catholic Worship, Trent to Today, St. Paul's Publications, Philippines, 1998).

এখানে জেমস এফ, হোয়াইট যে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি এখানে উল্লেখ করেছেন, তা হলো দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার পরবর্তী সময়ে যে নতুন মনোভাব ও চেতনা নিয়ে গির্জাঘরগুলো নির্মাণ করা হয়েছে, সেইসব গির্জার আর্কিটেকচারাল ডিজাইনের কারণে পূর্বেকার 'থিয়েটার'-এর মত যাজকগণ (ও নির্দিষ্ট ব্যক্তিগণ) 'স্টেইজের উপরে' আর ভক্তজনগণ 'দর্শক-শ্রোতার' সারিতে–এরূপ বিভাজন বর্জন করে এমন একটি কাঠামোগত পরিবেশ তৈরী করা হয়েছে যেখানে সবাই যেন 'স্টেইজের উপরে', সবাই একসাথে উপাসনা-অনুষ্ঠান সম্পাদন করতে পারেন (দ্র. পুণ্য উপাসনা, নং ২৮, ২৯, ৩০)। ***(চলবে...)***

ইতিবাচক চিন্তা সাফল্যের সোপান

চয়ন হিউবার্ট রিবেরু

আমরা ছোট বেলায় স্কুলে শিক্ষক, বড়দের কাছ থেকে শুনতাম যে, Life is not a bed of roses, অর্থাৎ জীবনটা ফুলের শয্যা নয়। তার মানে মানুষের জীবন চ্যালেঞ্জ, সম্ভাবনা এবং পরিবর্তন আছে এবং থাকবে। প্রতিদিন আমাদের সামনে নতুন নতুন সুযোগ ও সমস্যা নিয়ে আসে।

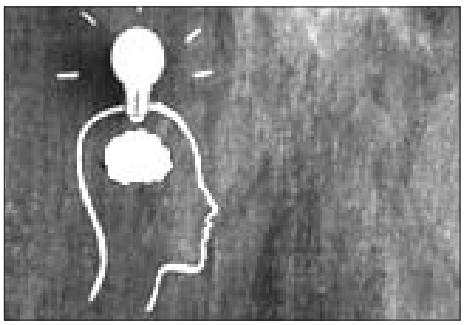

কেউ সমস্যাগুলো মোকাবিলা করতে পিছুপা হয়, আর কেউ সেগুলোর মধ্যেই সাফল্যের পথ খুঁজে পায়। এই পার্থক্যের মূল কারণ হলো মানুষের চিন্তাভাবনা। ইতিবাচক চিন্তা (Positive Thinking) এমন একটি শক্তি যা মানুষকে আত্মবিশ্বাসী, দৃঢ় এবং সফল হতে সহায়তা করে। ইতিবাচক চিন্তা (Positive Thinking) হলো এমন একটি মানসিক মনোভাব যেখানে আমরা সমস্যার চেয়ে সম্ভাবনার দিকে বেশি মনোযোগী করতে সাহায্য করে। জীবনের যেকোনো কঠিন অবস্থাকে আমরা সুযোগ হিসেবে দেখি। এই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিই আমাদের সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

ইতিবাচক চিন্তা কী?

ইতিবাচক চিন্তা হলো এমন একটি মানসিক প্রক্রিয়া যেখানে মানুষ সমস্যা নয়, বরং সমাধান খোঁজার চেষ্টা করে। হতাশার মুহূর্তেও আশা ধরে রাখা এবং প্রতিটি পরিস্থিতিতে ভালো কিছু খুঁজে পাওয়ার অভ্যাসই ইতিবাচকতা। এটি বাস্তবতাকে অস্বীকার করা নয়; বরং বাস্তবতাকে বুঝে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কাজ করার একটি উত্তম উপায়।

আমরা পৃথিবীর ৯০ শতাংশ মানুষ মনে করি সফলতা ভাগ্যের বিষয়, যা মোটেই ঠিক না। সফলতা তাদেরই হয়, যারা ইতিবাচক চিন্তা নিয়ে এবং তা একটি নিয়মের মাধ্যমে অধ্যবসায়ের মাধ্যমে এগিয়ে যায়। আপনারা হয়তো ভারতের আন্না হাজারের কথা শুনেছেন। তিনি ৭৪ বছর বয়সে দিল্লীর রামলীলা ময়দানে ১২ দিন পর্যন্ত লাগাতার অনশন করে কেন্দ্রীয় সরকারকে হার মানিয়ে জন লোকপাল বিল পাশ করাতে বাধ্য করেন। আন্না হাজারের সফলতা ইতিহাসে এক নতুন কাহিনী লিখে দিয়েছিলেন আর সমস্ত দুনিয়াকে এটা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, ইতিবাচক চিন্তাধারা বিকশিত করতে হলে যে বিষয়গুলো আমাদের চর্চা করা দরকার তা হল:

১) সফলতার জন্য মনের ভিতরে আগ্রহ তৈরি করা;

২) যা বলবেন বা করবেন তা ভালো করে চিন্তা করে বলুন বা করুন;

৩) সবসময় নিয়মানুবর্তীতা ও সততার সঙ্গে এগিয়ে চলুন;

৪) রাগকে নিয়ন্ত্রণ করুন; ও

৫) ঈশ্বরের প্রতি আস্থা বা বিশ্বাস রাখুন।

যেভাবে হারার পর জিততে পারা যায়: আমরা যখন কোন কাজ করি বা কোন খেলায় হেরে যাই অথবা কোন ব্যবসায় লস করি, তখন আমরা রাগে বা হতাশায় বলি,

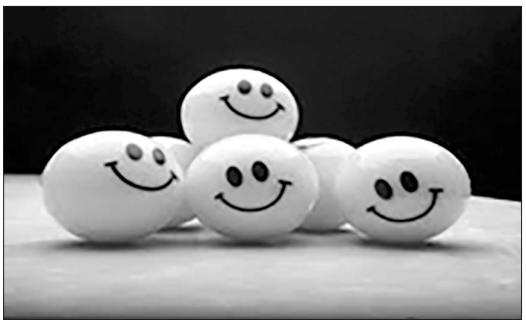

কেন আমার সাথেই সব সময় এমনটা হয়? আমরা অনেক সময় সে হার থেকে শিক্ষা নেই না। আপনি দেখেন, আজ যাদের আমরা অনেক সফল মানুষ হিসাবে মডেল মানি, তাদের প্রত্যেকের জীবনে সফল হওয়ার আগে অনেকবার ব্যর্থ হয়েছিলেন। উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে; যেমন:

১) টমাস আলভা এডিসন: বৈদ্যুতিক বাল্বের আবিষ্কারক। এ বাল্ব আবিষ্কার করার পূর্বে তিনি ৯৯৯ বার ব্যর্থ হয়েছিলেন। যখন ১০০০তম বার বাল্ব আবিষ্কার করেন, তখন তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনিতো ৯৯৯বার ব্যর্থ হয়েছেন, তখন আপনার মনোভাব কেমন ছিল? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে, ৯৯৯ বার আমি শিখতে পেরেছি কিভাবে বাল্ব তৈরি করতে হবে। তিনি যদি নিরাশ হয়ে প্রচেষ্টা বন্ধ করে দিতেন, তাহলে আমরা আলো কিভাবে দেখতে পারতাম।

২) হ্যারি পটার: এ পাণ্ডুলিপি নিয়ে লেখক ১২ জন প্রকাশকের কাছে গিয়েছিলেন এবং তিনি তাদের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। ১৩ নম্বর প্রকাশক সেই পুস্তক ছাপান। তারপর তো ইতিহাস। তিনি নিরাশ হননি, আশাবাদী ছিলেন আর শেষে সফল হয়েছিলেন।

তাই আশাবাদী/ ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে আর যদি ব্যর্থ হয়ে থাকেন, তবে নিচের বিষয়গুলোর উপর মনোনিবেশ করতে পারেন:

১) ব্যর্থ হলে এটা মনে করবেন না যে, এটাই শেষ সুযোগ, জীবনে আরো সুযোগ আসবে। নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে তুলুন তা জয় করার জন্য;

২) নিজের ভুলের পুনরাবৃত্তি না করার জন্য সংকল্প করুন;

৩) যারা জয়ী হয়েছেন, তাদের কাছে জানতে চেষ্টা করেন, তারা কিভাবে ভালো করেছেন;

৪) নিজের হারের জন্য নিজের উপর

দায়িত্ব নিন ও নিজেকে আরো সরব করুন;

৫) জেতার জন্য পরিকল্পিতভাবে কাজ করুন।

উল্লিখিত বিষয়গুলো হলো, সেই নিয়ম যেগুলো আপনাকে সফলতার শিখরে পৌঁছে দিতে পারে। বিশ্বের যত সফল মানুষ আছে তারা সর্বদা সম্ভাবনার উপর চিন্তাভাবনা করেছেন এবং ঝুঁকি মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

ইতিবাচক চিন্তা কেন সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়?

১) আত্মবিশ্বাস বাড়ায়: ইতিবাচকভাবে চিন্তা নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে দৃঢ় ধারণা পাওয়া যায়। আর এটাই মানুষকে আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলে যা মানুষকে বড় কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে।

২) সমস্যা নয়, সমাধানে মনোনিবেশ করা: নেতিবাচক মনোভাবে মানুষকে সমস্যার সমাধানের চেয়ে সমস্যার আকার বড় করে দেখায়। কিন্তু ইতিবাচক মানসিকতা মানুষকে সমাধান খুঁজতে শেখায়। যার ফলে কাজ দ্রুত ও কার্যকরভাবে সম্পন্ন হয়।

৩) মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করে: ইতিবাচক চিন্তা মানসিক চাপ কমায়, মনকে স্থির করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকে সহজ করে তোলে। যিনি মানসিকভাবে শক্তিশালী, তিনি সহজেই কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারেন।

৪) নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে: আশাবাদী মন মানুষকে নতুন সুযোগ দেখার ক্ষমতা দেয়। অনেক সময় আমরা সুযোগ দেখতেই পাই না, কারণ আমাদের চিন্তা নেতিবাচক থাকে। ইতিবাচক চিন্তা এই দরজাগুলো খুলে দেয়।

৫) সামাজিক সম্পর্ক উন্নত করে: ইতিবাচক মানুষ সাধারণত হাসিখুশি ও বিনয়ী হয়, যা অন্যদের আকর্ষণ করে। ভালো সম্পর্ক, সহযোগিতা এবং নেটওয়ার্কিং- এ সবই সাফল্যের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

৬) ব্যর্থতাকে শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করা: সফল ব্যক্তিদের জীবনে ব্যর্থতা ছিল, আছে, থাকবে। কিন্তু তারা ব্যর্থতাকে ভয় পায় না। বরং ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনে এগিয়ে যায়। ইতিবাচক চিন্তা মানুষকে এই শক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

ইতিবাচক চিন্তা গড়ার উপায়:

১) প্রতিদিন নিজের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

২) ছোট ছোট লক্ষ্য নির্ধারণ করে তা পূরণ করা।

৩) সঠিক মানুষের সাথে মিশে থাকা।

৪) নেতিবাচক কথাবার্তা বা পরিবেশ এড়ানো।

৫) ব্যর্থতাকে স্বীকার করে নতুনভাবে শুরু করা।

৬) প্রার্থনা, ধ্যান বা নীরব চর্চা করা।

"মানুষ যতক্ষণ ঘোড়ার লাগাম না টানে, ততক্ষণ ঘোড়া ছোটে না। আবার যতক্ষণ পর্যন্ত বাষ্প তৈরী না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ইঞ্জিন চালু হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত সুড়ঙ্গের ভিতরে প্রবেশ করা না হচ্ছে, ততক্ষণ আলোর ব্যাপারে জানা যায় না। অতএব কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মহান হতে পারেন না, যতক্ষণ না তার মধ্যে একাগ্রতা, সমর্পণ আর নিষ্ঠা জাগে"- *তরুণ ইঞ্জিনিয়ার*।

ইতিবাচক চিন্তা জীবনের দর্শন বদলে দেয়। এটি শুধু একজন মানুষকে আশাবাদী করে তোলে না, বরং তাকে আত্মবিশ্বাসী, দৃঢ় ও কর্মক্ষম করে তোলে। সাফল্য একদিনে আসে না; এটা হল একটি ধারাবাহিক চেষ্টা, সাহস, ধৈর্য এবং ইতিবাচক চিন্তার ফসল। তাই বলা যায়, "ইতিবাচক চিন্তাই সাফল্যের মূল সোপান।"

তথ্যসূত্র:

- পাওয়ার অফ্ পজিটিভ থিঙ্কিং - তরুণ ইঞ্জিনিয়ার

- পাওয়ার থিঙ্কিং - ডা. উজ্জ্বল পাটনী

- The Power of Positive Thinking – Norman Vincent Peale

- Internet

অনিন্দ্যময় এলেন ধরায়

সপ্তর্ষি

গভীর অন্ধকারে ঢেকে ছিল এ ধরণীর বুক
বেদনার কালো ধোঁয়ায় মলিন ছিল যত সুখ
তখনই আকাশ হেসে উঠল দীপ্তিময় মুখে
অনিন্দ্যময় এলেন ধরায় প্রেম ভরা সুখে।

উঠল জেগে ফুলেরা আপন মনে ছড়াল সুবাস
নদীর স্রোতে বাজলো তান পাখিরা গাইছে গান
বাতাসে ছড়াল মধুর পরশ আশার নরম ছোঁয়া
নতুন প্রাণে উঠল জেগে ধরণীর প্রতিটি কুয়া।

মানবের চোখে জ্বলে উঠেছে আজ নতুন আশা
ভালোবাসার ভাষায় মিশেছে এক নতুন ভাষা
ছিল যে নিঃস্ব-নগণ্য পেলে সে হৃদয়ের দান
অনিন্দ্যময় এলেন ধরায় নিয়ে শান্তির গান।

ধূলির পৃথিবী আজি পেয়েছে দেবতার পরশ,
তাঁর হাসিতে মিশে আছে নির্মল আদর্শ
মানব হৃদয় জানে এ সৌন্দর্য চির অমর
যার নাই কোন তুলনা সেই অনিন্দ্যময়।

তাঁর আগমনে ভেঙ্গেছে সমস্ত দুঃখ-গ্লানি
সব হৃদয়ে মিশে যায় অনন্ত প্রাণধ্বনি
ধরিত্রী মাতা আনন্দে দেয় আপন পরিচয়
আজ এসেছে আমার কোলে অনিন্দ্যময়।

ত্রাণকর্তা শিশু যিশু

নোয়েল গমেজ

শিশুটিকে উপহার দেওয়ার জন্য,
তিন পণ্ডিতের আগমন
এবং অসংখ্য দেবদূত।
সেই সঙ্গে হাজার হাজার স্বর্গদূত,
সবার মাঝে ঐক্যতানে গেয়ে চলেছে,
শান্তির গান।
শ্রী যিশুর জন্মদিন,
সকলের বড়দিন।
স্বর্গদূতের সুমিষ্ট গান,
পাখিদের কলকাকলি,
ভ্রমরের ও মৌমাছির গুঞ্জন।
স্থানটিকে অপূর্ব
স্বর্গীয় মহিমায় মণ্ডিত,
করে তুলেছিল।
কনকনে শীতে এক গোশালায়,
পশুদের সেই মাঝখানে,
জন্মগ্রহণ করেন,
আমাদের প্রিয় ত্রাণকর্তা শিশু যিশু ॥

বঙ্গে খ্রীষ্টের জন্ম উৎসব: নাতাল থেকে খ্রীষ্টমাস এবং বড়দিন

ড. ফাদার তপন ডি' রোজারিও

সারসংক্ষেপ: বঙ্গের বড়দিন ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক বিবর্তনের এক সমৃদ্ধ চিত্র বহন করে, যা প্রথমে পর্তুগিজ ঔপনিবেশিক মিশনের মাধ্যমে, পরে ব্রিটিশ প্রাতিষ্ঠানিক প্রভাবের মাধ্যমে এবং শেষ পর্যন্ত ভারত-পাকিস্তান পেড়িয়ে আজকের বাংলাদেশের গতিশীল খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের মাধ্যমে গঠিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে বড়দিনের যাত্রা পথকে বর্ণনা করা হয়েছে- "দিয়া দ্য নাতাল" ও "ফেস্‌তা দ্য নাতাল" (Dia de Natal or Festa de Natal) থেকে শুরু করে ইংরেজদের "খ্রীষ্টমাস" এবং বঙ্গের বাঙ্গালীর আধুনিক "বড়দিন পর্যন্ত"। এখানে লূসো তথা পর্তুগিজদের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি "এগ্রিজা" তথা গির্জার খ্রীষ্ট জন্মদিন বা জন্মোৎসবের কিছু সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। দিয়াঙ্গা (দিয়াং), সাতগাঁ (চট্টগ্রাম), ঈশ্বরীপুর (সাতক্ষীরা), তেজগাঁও, নাগরী, হুসাইনাবাদ (হাসনাবাদ) এবং পাদ্রীশিবপুর (শিবপুর)-এর মত প্রাথমিক পর্তুগিজ গির্জাগুলোর ঐতিহ্য আর অবদানকে তুলে ধরা হয়েছে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, উৎসবের রীতিনীতি, সাহিত্যিক প্রতিফলন এবং সামাজিক সংহতির মাধ্যমে এই গবেষণায় প্রমাণ হয় যে, কীভাবে আধুনিক বড়দিন বঙ্গীয় খ্রীষ্টান পরিচয়ের একটি চিহ্ন এবং আন্তধর্মীয় সাংস্কৃতিক গ্রহণযোগ্যতার সেতুবন্ধন হয়ে উঠেছে। বাইবেলের উদ্ধৃতি এবং বাংলা সাহিত্যিক উদাহরণ বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমৃদ্ধ করেছে। এখানে উৎসবের ধর্মতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব উদ্ঘাটন প্রচেষ্টাও রয়েছে।

ভূমিকা: বিশ্বব্যাপী প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্মদিন হিসেবে উদযাপিত বড়দিন ধর্মীয় ভক্তির সীমা অতিক্রম করে। এটি আশা, শান্তি এবং মানব মর্যাদার স্বীকৃতির প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। বাংলায় বড়দিন- অর্থাৎ 'বড় যে দিন'- একটি অনন্য পথচলা রচনা করেছে। যা পর্তুগিজ মিশনারি কর্মকাণ্ড থেকে উদ্ভূত। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রভাবে বিবর্তিত এবং আধুনিক বাংলাদেশে ও পশ্চিম বঙ্গে একটি প্রাণবন্ত জাতীয় উৎসব হয়ে উঠেছে। সাধু যোহন তাঁর রচিত মঙ্গলসমাচারে খ্রীষ্ট অবতারের এই আধ্যাত্মিক ভিত্তি ব্যক্ত করেন: "বাক্য দেহধারণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করলেন।" *(যোহন ১:১৪)*। বাংলায় এই "বাক্য বা শব্দ" শুধু উপাসনা বা উৎসবে প্রার্থনা ঘর গীর্জায় প্রবেশ করেনি, বরং খ্রীষ্টীয় চেতনার গ্রাম, বিদ্যালয়, সাহিত্য ও জনমনে ছড়িয়ে পড়ে। অত্র অঞ্চলে প্রভু যীশুর জন্মদিন একটি শংকর সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় পরিচয় গঠন ও বহন করেছে।

ইতিহাসবিদগণ (Buss, 1989; D'Costa, 1997; Eaton, 1996) বঙ্গের পুরাতন খ্রীষ্টান মিশন বা ধর্মপল্লীগুলো নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছেন বটে, তবে বড়দিনকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঘটনাবলী হিসেবে খুব কমই বিশ্লেষণ করেছেন। এই প্রবন্ধ সেই শূন্যতা কিঞ্চিৎ পূরণ করবে। হালের মহতী ও আধুনিক বড়দিন উৎসবের ঐতিহাসিক বিবর্তনের একটি বর্ণনামূলক চিত্র উপস্থাপন করবে। পর্তুগিজ ও ব্রিটিশ সময়কাল এবং স্থানীয় মণ্ডলীর প্রধান প্রাচীন কেন্দ্রগুলোর গুরুত্ব ও অবদান তুলে ধরবে।

১। পর্তুগিজ বঙ্গ: বড়দিনের জন্ম

পর্তুগিজরা বাংলায় প্রথম ইউরোপীয় বসতি স্থাপনকারী এবং ক্যাথলিসিজম, ইউরোপীয় লিটার্জি এবং বড়দিন উদ্‌যাপন রীতি-কৃত্য নিয়ে আসে। তারা ১৬শ শতকের প্রারম্ভে চট্টগ্রাম, হুগলি, ব্যাণ্ডেল এবং অন্যান্য উপকূলীয় এলাকায় মিশন কেন্দ্র ও বাণিজ্যিক পোস্ট প্রতিষ্ঠা করে (Ross,1984; Malik, 2003)।

বঙ্গদেশে খ্রীষ্টের জন্মোৎসবকে বর্ণনা করার জন্য ব্যবহৃত শব্দভাণ্ডারটি বহুস্তরীয় ভাষিক, সাংস্কৃতিক ও চার্চীক (মাণ্ডলিক) মিথস্ক্রিয়ার ইতিহাসকে প্রতিফলিত করে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে পূর্ববঙ্গে পর্তুগিজদের আগমন ও স্থায়ী উপস্থিতির সময়। এই উৎসবকে মূলত পর্তুগিজ ক্যাথলিক ঐতিহ্যের ভাষায় "দিয়া দ্য নাতাল" (Dia de Natal) অর্থাৎ "জন্মোৎসবের দিন" অথবা "ফেস্তা দ্য নাতাল" (Festa de Natal) অর্থাৎ "জন্মদিনের উৎসব" বলা হতো। প্রাচীন নথিপত্রে দেখা যায় যে, পর্তুগিজ ভাষার এই শব্দগুলো "এসতাদো দা ইন্ডিয়া" (Estado da Índia / State of India)-র বিস্তৃত সাম্রাজ্যজুড়ে প্রচলিত খ্রীষ্ট ধর্মীয় পরিভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ (Boxer, 1969; Subrahmanyam, 2012)। এই পরিভাষা প্রথম দিকের খ্রীষ্টান বসতিগুলোর- বিশেষত দিয়াং, চট্টগ্রাম, ঈশ্বরীপুর, তেজগাঁও, নাগরী, হাসনাবাদ এবং পাদ্রীশিবপুর- এর মধ্যে প্রচারিত হয়, যেখানে পর্তুগিজ ধর্মযাজক, সৈনিক, ব্যবসায়ী এবং অগাস্টিনীয় মিশনারিরা বাংলার প্রথম দিকের খ্রীষ্টীয় প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (Campos, 1919; Eaton, 1996)।

পরবর্তীতে অষ্টাদশ শতক থেকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবে ইংরেজি শব্দ "খ্রীষ্টমাস্" (Christmas)- যা "খ্রীষ্টের মীসা" বা "খ্রীষ্টের স্মরণ উৎসব" (Christes mæsse) থেকে উদ্ভূত- ক্রমশ বঙ্গের খ্রীষ্টান সমাজে প্রবেশ করতে শুরু করে। মিশনারি সম্প্রদায়সমূহ, অ্যাংলো-ভার্নাকুলার স্কুল এবং উদীয়মান ছাপাখানা সংস্কৃতি এই ইংরেজি শব্দটিকে জনপ্রিয় করে তোলে। আবার স্থানীয় খ্রীষ্ট ধর্মীয় শব্দভাণ্ডারে এর ব্যবহার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতে থাকে (Trevelyan, 2013; Frykenberg, 2008)।

এদিকে ভারতীয় খ্রীষ্টান বুদ্ধিজীবী এবং বাংলা সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্বকে শাস্ত্রীয় ও ভারতীয় ভাষাভাণ্ডারে উপস্থাপন করার নিরলস প্রচেষ্টায় সংস্কৃতনির্ভর শব্দরীতিও গড়ে ওঠে। বিদেশী শব্দের অর্থ কী, ইংরেজী শব্দের বিকল্প কী, ও ভিনদেশীয় বিষয়কে দেশীয়করণের প্রয়াস অব্যাহত থাকে। এর ফলস্বরূপ উনিশ ও বিংশ শতকের কিছু খ্রীষ্টীয় গ্রন্থে "নাতাল" বা "খ্রীষ্টমাস" এর স্থলে সংস্কৃত শব্দ "মহাদিনম", "মহাদিবসঃ", অথবা উৎসবঘন "মহোৎসবদিনম্" ধরনের পরিভাষা ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এটি খ্রীষ্টীয় আধ্যাত্মিক তাৎপর্যকে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সৌকর্য্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার এক সচেতন চেষ্টার অংশ ছিল (Sarkar, 2014; Stewart, 2018)। এভাবে সংস্কৃত ভাষা যীশু খ্রীষ্টের জন্মদিন বা জন্মোৎসবকে "দা গ্রেইট ডে" বা "দা গ্রেইট ফিস্ট" থেকে ভাষাগত সংস্কৃত্যায়ন করে নেয়। এমনকি এখনও পর্যন্ত প্রাচীন পর্তুগিজ শব্দের পাশাপাশি ইংরেজী এবং বাংলায় রয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ:

Portuguese	English	Bangla
Jesus Cristo (জেজুস ক্রিস্তো)	Jesus Christ	যীশু খ্রিস্ট
Maria (মারিয়া)	Mary	মরিয়ম / মারিয়া
José (জোজে)	Joseph	যোসেফ
Anjos (আনজোস)	Angels	স্বর্গদূতগণ
Magos (মাগোস)	Magi / Wise Men	পণ্ডিত / জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ
Estrela (এস্‌ত্রেলা)	Star	তারা / নক্ষত্র / ধুমকেতু
Jumento / Burro (জুমেন্ত / বুর্রো)	Donkey / Ass	গাধা
Vaca (ভাকা)	Cow	গরু
Manjedoura (মানজেদৌরা)	Manger	খোঁয়াড়/ যাব পাত্র

সময়ের প্রবাহে বাংলা ভাষাভাষী খ্রীষ্টান সমাজ ধীরে ধীরে গ্রহণ করে বঙ্গীয় "বড়দিন" (The

Great Day or The Great Feast), যার অর্থ "বড় দিন" (The Big Day)। বড়দিন একটি গভীর বঙ্গীয় ও সাংস্কৃতিক অনুভূতি জড়ানো শব্দ, যা শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা ও আনন্দের উৎসবময় ভাবকে একসঙ্গে ধারণ করে (Datta, 2002)। এর সহজ, স্বাভাবিক ও আপন দেশীয় রূপ বঙ্গের খ্রীষ্টানদের দৈনন্দিন ভাষা, সাহিত্য, উপাসনা (লিটার্জি) এবং উৎসবচেতনায় ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সময়ের আবর্তে বাংলা গান ও কীর্তন থেকে "নাতাল" বা "খ্রীষ্টমাস" শব্দগুলা নির্বাসিত হয়ে যেতে থাকে। বড়দিন শুভেচ্ছা বিনিময় ভাষা "বন নাতাল" বা "শুভ জন্মতিথি" হয়ে যায় শাসক ইংল্যাণ্ডারদের "মেরী খ্রীষ্টমাস" (সুখের খ্রীষ্টোৎসব) বা "শুভ বড়দিন" (শুভ মহান দিবস) বা সুখের বড়দিন। বাঙ্গালীর ঘরের দৃশ্যমান বেড়া আর পিড়াতে লেখা হতে থাকে: "শ্রী যীশুর জন্মদিন, সকলের বড়দিন।" সনাতন ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত খেরেস্তানেরা শ্রী কৃষ্ণের কুঞ্জের মত করে কলাগাছ, গেন্ধাফুল, নিশান আর মুছী বাতি দিয়ে সাজাতে শুরু করে নিজ নিজ বসত ঘরের প্রবেশ দ্বার। তৈরী হতে থাকে যীশু জন্মের পাথুরে গুহার স্থলে দেশীয় গোয়াল ঘর। এ সময় থেকে রচিত হতে থাকে সমৃদ্ধ বড়দিনের কীর্তন। পাশ্চাত্যেও ক্যারল ধরে রাখে এ্যাংলো খ্রীষ্টীয় সমাজ। বলা যায়, সনাতন ধর্ম থেকে খ্রীষ্ট ধর্মে বিশ্বাস গ্রহণ করলেও উৎসব আর অনুষ্ঠানে রয়ে যায় উপমহাদেশীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতির অনেক উপাদান: উপাসনা, আচার-অনুষ্ঠান, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাবার-দাবার, শুভেচ্ছা বিনিময়, মেলা ইত্যাদি। আধুনিক বড়দিন ইউরোপ আর ভারত-উপমহাদেশীয় রীতি-কৃত্যের এক অবমিশ্রিত পরিণতি। জেজুস থেকে জেজু, যীজাস থেকে যীশু নাম প্রচলিত হয়ে যায়।

২। পর্তুগিজ মিশন কেন্দ্র ও বড়দিনের ঐতিহ্য

প্রারম্ভিক পর্তুগিজ মিশনারি বসতিগুলো বাংলায় বড়দিন উদযাপনের ধরনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। এদের মধ্যে বেশ কয়েকটি গির্জা বা মিশন কেন্দ্র আজও টিকে আছে, অথবা ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজের মাধ্যমে স্মৃতিতে রয়ে গেছে। অফিসিয়াল উপাসনার ভাষা লাতিন হলেও তার বাইরে অনেক কিছুই পর্তুগিজ ভাষা, সংস্কৃত ও বাংলায় চর্চা হতো।

২.১ দিয়াঙ্গা (দিয়াং প্রায় ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দ)

চট্টগ্রামের নিকটে অবস্থিত দিয়াঙ্গা বর্তমান দিয়াং একটি পর্তুগিজ আউটপোস্ট এবং এখানে বাংলায় প্রথম বড়দিন উদযাপনের কিছু নথিপত্র পাওয়া যায় (Ross, 1984)। দিয়াংগা প্রায় ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রারম্ভিক পর্তুগিজ উপনিবেশ। পরে ক্রমেক্রমে বাংলার প্রথম দিকের খ্রীষ্টীয় মিশন কেন্দ্রগুলোর একটিতে পরিণত হয়, যেখানে জেজুইট যাজক সংঘের (Jesuits) এবং অগাস্টিনীয় (Augustinians) ধর্মযাজকেরা নিয়মিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, বাপ্তিস্ম ও ধর্মশিক্ষা পরিচালনা করতেন (Ross, 1984; Subrahmanyam, 1997)। এসব পর্তুগিজ বসতিতে বড়দিনকে ডাকা হতো লুসোফোন (পর্তুগিজভাষী) পরিভাষায় 'দিয়া দ্য নাতাল' (Dia de Natal / ডে অব দ্য নেটিভিটি / খ্রিস্টজন্মের দিন) অথবা 'ফেস্তা দ্য নাতাল' (Festa de Natal / ফিস্ট অব দ্য নেটিভিটি / খ্রিস্টজন্মের উৎসব) নামে। স্থানীয় বড়দিনের অনুশীলন ছিল আইবেরীয় লিটার্জি ও বাংলা সাংস্কৃতিক উপাদানের এক অনন্য সমন্বয়: ধর্মযাজকেরা উৎসর্গ করতেন 'মীসা দ্য গালো' (Missa do Galo / আক্ষরিক অর্থে মোড়গ ডাকার মীসা / মিডনাইট মাস / মধ্যরাতের মীসা) এবং আয়োজন করতেন ছোটখাটো 'প্রোসিশোঁস' (procissões / শোভাযাত্রা), আর গির্জা ও ঘরবাড়িতে স্থাপন করা হতো ছোট 'প্রেসেপিওস' (presépios / যীশুর জন্মগৃহের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি), (Ross, 1984)।

প্যারিশ জীবনও বড়দিনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সাজানো হতো। উপাসনাকাল অনুযায়ী বাপ্তিস্ম, ধর্মশিক্ষা (catechesis) এবং সামাজিক মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হতো। গ্রামবাসীরা অংশ নিত নাট্যরূপে উপস্থাপিত জন্মনাট্যে, যার সঙ্গে সংযুক্ত থাকত স্থানীয় বাদ্যযন্ত্র ও লোকসঙ্গীত। জেজুইটরা ইউরোপীয় লিটার্জির সঙ্গে স্থানীয় বাংলা ছন্দ মেলাতে চেষ্টা করেছিল এবং ছোট ছোট নাটিকা পরিচয় করিয়েছিল। ঘরোয়া সাজসজ্জায় ব্যবহৃত হতো 'ভেলাস' (velas / মোমবাতি), তেলের প্রদীপ এবং নারিকেল পাতার তৈরি খিলান; আর প্রতিটি পরিবার মিলিত হতো এক অনন্য নাতালের উৎসবভোজে, যেখানে পর্তুগিজ মিষ্টান্ন, কেইক, স্থানীয় পিঠা, ভাতজাতীয় খাবারের সঙ্গে একত্রে পরিবেশন করা হতো (Subrahmanyam, 1997; De Costa, 1997)।

এই আন্তঃসংস্কৃতিক অনুশীলনগুলো দিয়াঙ্গাকে বাংলায় বড়দিনের স্বদেশীকরণ (indigenization)-এর এক গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক ভিত্তিকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

২.২ সাতগাঁ (চট্টগ্রাম "Porto Grande", ১৬শ শতকের গোড়ার দিকে)

চট্টগ্রাম, যাকে পর্তুগিজরা 'পোর্তো গ্রান্দে' (Porto Grande / গ্রেট পোর্ট / বড় বা মহান বন্দর) নামে অভিহিত করত। সাতগাঁও ষোড়শ শতকের গোড়ায় প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলার সর্ববৃহৎ পর্তুগিজ বসতিতে পরিণত হয় (Eaton, 1996)। সেখানে বড়দিন- যাকে তারা বলত 'দিয়া দ্য নাতাল' বা 'ফেস্তা দ্য নাতাল'। এখানে জেজু জন্মোৎসব একটি অত্যন্ত দৃশ্যমান ও ব্যাপক সাম্প্রদায়িক উৎসবে রূপ নেয়। প্যারিশ গির্জা ও নদী তীরবর্তী চ্যাপেলগুলোতে সাজানো হতো শৈল্পিক 'প্রেসেপিওস' এবং আয়োজন করা হতো জনসমক্ষে 'প্রোসিশোঁস' (শোভাযাত্রা), যেখানে অংশ নিত পর্তুগিজ বসতি স্থাপনকারীরা ও স্থানীয় খ্রীষ্টান স্থানীয় ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টানরা (Ross, 1984)।

পোর্ত গ্রান্দে-এর বড়দিনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল বিশাল 'ফেস্তা কমুনিতারিয়া' (festa comunitária / সাম্প্রদায়িক ভোজ, মিলন ভোজ), যেখানে পরিবেশন করা হতো পর্তুগিজ 'প্যাস্টেইস ও পাও দোসে' (pasteis / pão doce / পেস্ট্রি ও মিষ্টি রুটি), পাশাপাশি পরিবেশিত হতো বাঙালি মিষ্টি (sweets) এবং চাল-ভাত-ভিত্তিক নানা পদ- যা উভয় খাদ্যসংস্কৃতির এক ধরণের আন্তঃসংযোগকে প্রকাশ করত (Subrahmanyam, 1997)। বড়দিনের নাট্যরূপ উপস্থাপনাগুলো সাজানো হতো ইউরোপীয় স্তোত্র ও স্থানীয় লোকসুরের সংমিশ্রণে, আর নদী তীর জ্বলজ্বল করত হাজারো 'ভেলাস' (velas / মোমবাতি) ও রঙিন লণ্ঠনের আলোয়। ঐ সময় চট্টগ্রামকে প্রায়শই "পূর্বের রোম" (Rome of the East) বলা হতো। এটি পর্তুগিজ বসতি ও বঙ্গের ধর্মান্তরিতদের একটি প্রাণবন্ত কেন্দ্র ছিল, যেখানে বড়দিন উদযাপনে সম্প্রদায়িক ভোজ এবং স্থানীয় রান্না প্রথার সংমিশ্রণ দেখা যেত (Eaton, 1996)।

এই প্রাণবন্ত খ্রীষ্টান জনজীবন সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে টিকে ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে মুঘল শাসনের অধীনে পর্তুগিজ আধিপত্য সীমিত করার প্রচেষ্টায় ১৬৬০-এর দশকে পর্তুগিজদের আংশিক বহিষ্কার সম্পন্ন হয়, যার ফলে সাতগাঁ তথা 'পোর্ত গ্রান্দে'-এর বড়দিন উদযাপনের দৃশ্যমান পরিসর উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসে (Eaton, 1996)।

২.৩ ঈশ্বরীপুর (সাতক্ষীরা, ১৬শ শতকের অন্তিমভাগ-১৭শ শতকের প্রারম্ভ)

ঈশ্বরীপুর, সুন্দরবনের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত-যা জোয়ার-ভাটার নদীনালা, ম্যানগ্রোভ বন এবং ক্ষয়িষ্ণু পলিমাটির দ্বীপের একটি ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ভূ-প্রকৃতি। রাজা প্রতাপাদিত্যের শাসনামলে (১৬শ শতকের অন্তিমভাগ - ১৭শ শতকের প্রারম্ভ) একটি গুরুত্বপূর্ণ খ্রীষ্টীয় মিশনকেন্দ্র হিসেবে

বিকশিত হয়েছিল (Eaton, 1996)। ইছামতি ও খোলপেটুয়া নদীর মতো নৌপথের কাছাকাছি হওয়ায় পর্তুগিজ মিশনারিরা বঙ্গোপসাগরের উপকূল থেকে সহজে ভেতরে ভ্রমণ করতে পারতেন এবং ছোট ছোট 'কাপেলাস্' (capelas / চ্যাপেল) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যেখানে স্থানীয় দীক্ষার্থী এবং নদী, সাগর ও বনে পরিভ্রমণরত কর্মজীবি খ্রীষ্টান সম্প্রদায়কে ধর্মোপদেশ ও সেবামূলক কার্যক্রম প্রদান করা হতো (Mojumdar, 2004)।

এই দখিনি সীমান্ত পরিবেশে 'দিয়া দ্য নাতাল' বা 'ফেস্তা দ্য নাতাল' উদযাপনটি অনন্য কোমল ও সাম্প্রদায়িক স্বরূপ ধারণ করেছিল। মিশনারিগণ 'প্রেসেপিওস' (presépios / যেজু জন্মগুহার মডেল) তৈরি করতেন মাটি, কাঠ, গোলপাতা ও খেজুরপাতা দিয়ে; গ্রামবাসীরা 'মীসা দো গালো' (Missa do Galo/মধ্যরাতের মিসা)-এ অংশ নিত; এবং শিশুরা সবার আগে 'প্রোসিশোঁস' (procissões /শোভাযাত্রা)-তে যোগ দিত, আর নারকেলপাতার তৈরী বিশেষ ধরণের প্রদীপে আলো বহন করা হতো (Ross, 1984)। নাতালের মীসায় ধর্ম দীক্ষাপ্রার্থীদের দীক্ষা দেওয়া হতো। এদিনে নেওয়া দীক্ষার নাম ছিল 'বাতিস্মস দ্য নাতাল' (batismos de Natal / বাপ্তিস্ম)। একটি পুরো পরিবারকে বাতিস্ম দিয়ে চার্চের ধর্মীয় জীবনে আনার সুযোগ দেওয়া হতো এ নাতালে। আবার 'কাটেকুইসে' (catequese / ধর্মশিক্ষা) চলমান থাকতো নতুন দীক্ষিতদের জন্য যেন তারা খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসে আরও দৃঢ় হয় এবং খ্রীষ্ট সাম্প্রদায়ের সবার সাথে একতায় থাকতে পারে (Subrahmanyam, 1997)। মিশনারিগণ সেই সময়ের বড়দিনের সঙ্গীতও রচনা করেছিলেন। ঈশ্বরীপুরে গাওয়া একটি প্রাচীন পর্তুগিজ 'কান্তিগা দ্য নাতালে' (Cantiga de Natal / নাতালের গান) সাংঘাতিকভাবে নস্টালজিক আবেগকে প্রকাশ করে:

Luz que nasce no mundo,
Noite santa de amor e paz;
Entre rios e florestas chamamos,
Vem, Menino Jesus, ficar entre nós.

নাতালের এ কান্তিগার অনুচ্ছেদটি বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপ:

ওহে আলোক, যে জগতে জন্মেছ,
প্রেম ও শান্তির পবিত্র রাত;
নদী ও বনের মাঝে আমরা ডাকি,
এসো, শিশু যিশু, আমাদের মাঝে থাকো।

তবে ঈশ্বরীপুরের প্রাণবন্ততা অনেক বেশী ভঙ্গুর ছিল। সুন্দরবনের ঘূর্ণিঝড়, নদী ভাঙন এবং জলপ্রবাহের পরিবর্তনের কারণে খ্রীষ্টান বসতি ক্রমশ অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে, আর রাজা প্রতাপাদিত্যের পতনের পর পর্তুগিজ উপস্থিতি হ্রাস পায় (Eaton, 1996)। একাধিকবার শাসকদের দ্বারা আক্রান্ত, নির্যাতিত, বিতারিত অথবা পলাতক হয় এই প্রাচীন ফিরিঙ্গী লোকালয়। ১৭শ শতকের মধ্যভাগে, আশে পাশের নদী তীরের অনেক চ্যাপেল ধ্বংস করা হয় বা ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হয়ে যায়। আর ম্যানগ্রোভ সুন্দরবন অসুন্দরভাবে তাদের বসত স্থাপনা পুনরায় আচ্ছাদিত করে সবুজ আঁচল তলে লুকিয়ে ফেলে। ঈশ্বরীপুরের এক সময়ের কোমল ও শান্তিপূর্ণ বড়দিনের উদ্‌যাপনের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে প্রায় প্রতিটি প্রাচীন খ্রীষ্টীয় জনপদ। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে একসময়ের প্রাণবন্ত ঈশ্বরীপুর মিশন প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়, শুধু কিছু ছিন্নমূল দলিল ও প্রত্নচিহ্নই তার প্রাচীন 'দিয়া দ্য নাতাল' ঐতিহ্য ও আন্তঃসাংস্কৃতিক ধর্মীয় জীবনের সাক্ষ্য বহন করে।

তবে আজ কালের নির্মম, নীরব আঘাত অন্তে যা বেঁচে আছে, তা হলো সাহিত্য বা ইতিহাসের লেখ্য নাম হিসেবে, প্রত্নতাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক স্মৃতি-বিস্মৃতির স্থান হিসেবে। বঙ্গোপসাগর আর সুন্দর বনের দখিনা বাতাস-মেঘ-বৃষ্টি অন্তঃঅভিবাসী সব ফিরিঙ্গীদের জনপদ ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভেসে ভেসে উত্তরে হিমালয়ের বুকে অভিঘাত করে অবিরামভাবে। অভিমান আকুতিতে বলে, "ওহে হিমালয়-তুমি তো বরফের সর্ব্বোচ্চ প্রস্তর ডিবি। আমি এসেছি ঈশ্বরের নগর সুন্দরবনের ঈশ্বরীপুর থেকে। আমি বিলীন হলেও আমার অন্তজ, অনুজ ভাইবোনেরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এ বঙ্গে, তব পাদবাহিকায়। একটু দেখবে, ওরা যেন আমার মত বিলীন বা বিতারিত না হয়, কোনদিন কোনকালে। সমুদ্রের নোনা জল বাষ্প মেঘে ছুটে আসে তোমার কাছে আর তুমি তা ফিরিয়ে দাও মৃদু মিষ্ট সুপেয় বৃষ্টি জল করে। আমারও আছে সমুদ্র তুল্য দুটি চোখ। জলে টইটুম্বুর। কিন্তু দুটোর জলই নোনা। চিবুক গড়িয়ে মিশে যায় সোনা বঙ্গের মায়াধারী মাটিতে। তুমি কী আমার প্রার্থনা শুনবে না? তুমি তো সর্ব্বোচ্চ শিখর। তোমা থেকে ঈশ্বরের আবাস স্বর্গ তো অনেক কাছে। দুঃখের, কষ্টের, হতাশার শত অজানা কাহিনী মিশে আছে এ শো শো শব্দের বঙ্গ বাতাসে। কেউ শোনার নেই তাই, ওহে কালোজয়ী হিমালয়, তোমার কাছে নালিশটুকু রেখে দিলাম। হিম দিয়ে ঢেকে রেখ যেন পঁচে না যায়, যেন অনাগত প্রজন্ম ওর পূর্বপুরুষদের ইতিহাস প্রমান এতটুকু হলেও খুঁজে শান্তি পায়।" (De Rozario, 1988)

২.৪ তেজগাঁও (ঢাকা, ১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দ)

ঢাকার তেজগাঁওয়ে প্রতিষ্ঠিত হোলি রোজারি চার্চ, ১৬৭৭ সালে নির্মিত, পর্তুগিজ 'এগ্রিজা' বা চার্চীয় উপস্থিতির স্থায়ী সাক্ষ্য হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে (D'Costa, 1997)। অগাস্টিনিয়ান ও জেসুইট রেকর্ড অনুসারে বড়দিন- 'দিয়া দ্য নাতাল' বা 'ফেস্তা দ্য নাতাল'- একটি ঝলমলে উৎসব হিসেবে উদযাপিত হতো, যা আধ্যাত্মিক ভক্তি এবং সামাজিক দান-দক্ষিণা কর্মকাণ্ডকে সমান গুরুত্ব দিত। জেজু জন্মোৎসব উদযাপনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল 'ভিজিলিয়াস আ লুজ দ্য ভেলাস' (vigílias à luz de velas, candlelit vigils, মোমবাতি সমারোহে প্রাহরিক প্রার্থনা) 'পাঁও দচে" (pão doce / মিষ্টি রুটি) বিতরণ, যা প্যারিশের সদস্য এবং দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করা হতো। ধর্মযাজক এবং স্থানীয় খ্রীষ্টান পরিবারগুলো অসুস্থ, কারাবন্দি এবং প্রান্তিক মানুষদের দর্শন করত, নাতালকে শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান নয় বরং দয়া এবং সামাজিক ঐক্যের একটি কর্ম হিসেবে রূপান্তরিত করত (Ross, 1984)।

তেজগাঁও চার্চে 'প্রোসিশোঁস' এবং ছোট 'প্রেসেপিওস' স্থাপন করা হতো, যা শিশুরা এবং বড়রাও পরিদর্শন করত,। পর্তুগিজ আচারবিধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্থানীয় বাংলার সঙ্গীত ও নাট্যরূপের সঙ্গে মিশ্রিত আবহে এক অনন্য নাতালীয় অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করত। চার্চটি ঢাকার খ্রীষ্টান পরিচয়ের একটি কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়, যা ধর্মীয় শিক্ষা এবং সামাজিক সংহতিকে সমৃদ্ধ করত (Subrahmanyam, 1997)।

যদিও কিছু গবেষক দাবি করেন যে তেজগাঁও পূর্ববঙ্গের প্রধান পর্তুগিজ ধর্মীয় সদরদপ্তর হিসেবে কার্যকর ছিল, অন্যরা চট্টগ্রামের স্থায়ী প্রভাবকে পর্তুগিজ চার্চীয় নেটওয়ার্কে বেশি গুরুত্ব দেন (Eaton, 1996)। তবু তেজগাঁওয়ের বড়দিনের বা নাতালের প্রথা একটি হাইব্রিড সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় উদযাপনকে প্রকাশ করে- যা আচার-অনুষ্ঠান, দাতব্য এবং স্থানীয় প্রথার মিশ্রণ, যা ঔপনিবেশিক যুগ জুড়ে বাংলার খ্রীষ্টীয় জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

২.৫ নাগরী (বর্তমানে গাজীপুর পূর্বে ঢাকা, ১৬৬৩ / ১৬৯৫?)

নাগরী, প্রাচীন কালে ঢাকায় আর বর্তমান গাজীপুরে অবস্থিত, পূর্ববঙ্গের একটি প্রখ্যাত ক্যাথলিক বসতি, যা পর্তুগিজ মিশনারি কার্যক্রম এবং তাদের বংশধরদের সঙ্গে যুক্ত ছিল (De Costa, 1997)। ১৬শ শতকের শেষভাগ বা ১৭শ শতকের প্রারম্ভে প্রতিষ্ঠিত নাগরী সম্প্রদায় এমন বিশেষ ধরণের লোকজ-খ্রীষ্টীয় প্রথা বিকাশ করেছিল, যা পর্তুগিজ আচারবিধি এবং স্থানীয় বাংলার সাংস্কৃতিক

রূপকে একত্রিত করেছিল। বড়দিন-যা উদযাপিত হতো 'দিয়া দ্য নাতাল' বা 'দিয়া দ্য ফেস্তা' নামে। নাতাল এখানেও একটি সম্প্রদায়কেন্দ্রিক উৎসব হিসেবে বিকশিত হয়েছিল, যা আধ্যাত্মিক ভক্তি, নাট্যাভিনয় এবং ভোজকে একত্রিত করেছিল (Ross, 1984)।

নাগরীর বড়দিন উদ্‌যাপনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ক্যারল গান। স্থানীয় বাংলা সুরে পর্তুগিজ ভজনগুলোর রূপান্তর করা হতো, যাতে গ্রামবাসী এবং দীক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারে। আরেকটি বিশেষ দিক ছিল জেজু জন্মগল্পের নাট্যাভিনয়, যা বঙ্গেও প্রথাগত বাংলা যাত্রা অভিনয় থেকে অনুপ্রাণিত ছিল। শিশু, যুবক এবং বড়রাও এই নাটকে অংশ নিত, যেখানে যীশুর জন্মের ঘটনাগুলো সঙ্গীত, নৃত্য এবং সংলাপের মাধ্যমে প্রদর্শিত হতো, যা একটি জীবন্ত এবং মর্মস্পর্শী আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করত (Subrahmanyam, 1997)। এই নাটক বা পালাগুলো প্রায়শই খোলা গ্রামাঞ্চলে অনুষ্ঠিত হতো, ফলে উৎসবটি খ্রীষ্টান ও অখ্রীষ্টান প্রতিবেশীদের জন্যও সহজলভ্য হতো। পাঞ্জোরার বা আশে পাশের 'অকাল্ট' বা গুপ্ত খিরিস্তানেরা রাতে অনুষ্ঠিত হওয়া প্রায় সব ধরণের খ্রীষ্টীয় কর্মকাণ্ডে অংশ নিত এবং ধর্ম শিক্ষা গ্রহণ করতো। ওরা ভোর রাতে ঘরে ফিরে যেত।

নাগরীর বড়দিন উদ্‌যাপনে সাম্প্রদায়িক ভোজ একটি অপরিহার্য অংশ ছিল, যেখানে পর্তুগিজ এবং স্থানীয় বাংলা খাদ্যের মিশ্রণ পরিবেশিত হতো 'পাঁও দচে'। পেস্ট্রি সরবরাহের পাশাপাশি স্থানীয় ভাত, মাছ এবং ঐতিহ্যবাহী বাংলা মিষ্টি পরিবেশিত হতো, যা খাদ্যসংস্কৃতির শংকর রূপকে প্রতিফলিত করত (Eaton, 1996)। পাশ্চাত্য খ্রীষ্টমাস কেকের বিকল্প স্থানীয় রেসিপিতে বিশেষ কায়দায় তৈরী বিক্কা অর্থাৎ বিবিকে পিঠার প্রচলন নাগরী জমিদারী এলাকায় প্রথম শুরু হয় বলে মনে করার অনেক যুক্তি আছে। বড়দিনের বেথলেহেম তাঁরা শুধু গির্জায় নয়, গ্রামে, পাড়ায়, বাড়িতে শোভা পেত। তবে বিদ্যুতের ছোঁয়ায় আলোকসজ্জার প্রতিযোগিতা সেকালে ছিল না।

১৮শ শতকের মধ্যে নাগরীর বড়দিন একটি সিনক্রেটিক বা সমন্বিত উদ্‌যাপন হিসেবে বিকশিত হয়েছিল: পর্তুগিজ আচারবিধি, বাংলা লোকসঙ্গীত, ভাওয়ালের কৃষিনির্ভর জীবনের ছন্দ এবং গ্রামীণ সামাজিকতা একত্রিত হয়ে পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ খ্রিস্টান পরিচয়ের একটি অনন্য রূপ গঠন করেছিল। এই শংকর প্রথা কেবল ধর্মীয় ভক্তি সংরক্ষণ করেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং সাংস্কৃতিক সংহতি বৃদ্ধিতেও অবদান রেখেছিল, যা পরিবর্তনশীল ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের স্থায়িত্ব ও অভিযোজন ক্ষমতাকে প্রতিফলিত করে। দোম আন্তনিও প্রচার করতেন 'সিদ্ধির কুরুশের চিহ্নি' করে।

২.৬ হুসাইনাবাদ (হাসনাবাদ, ঢাকা, ১৭৭৭)

হাসনাবাদ, ঢাকার কলাকুপা বান্দুরা অঞ্চলে অবস্থিত, একটি সমৃদ্ধ ক্যাথলিক গ্রামীণ বসতি হিসেবে বিকশিত হয়েছিল। প্রাথমিক পর্তুগিজ নথি এবং স্থানীয় ইতিহাস অনুযায়ী বড়দিন- 'দিয়া দ্য নাতাল' বা 'দিয়া দ্য ফেস্তা' শুধু আধ্যাত্মিক উদযাপন নয়, বরং একটি সামাজিক মিলনের অনুষ্ঠান হিসেবেও পালন করা হতো (D'Costa, 1997)। এই সময়ে স্থানীয় পরিবারগুলো বৃদ্ধ ও আত্মীয়দের বাড়ি ভ্রমণ করত, মধুর শুভেচ্ছা বিনিময় করত এবং পরস্পরের সঙ্গে সমবায় এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক বন্ধুত্ব দৃঢ় করত।

গ্রামীণ আভিজাত্য ও স্থানীয় সংস্কৃতির ছোঁয়া নিয়ে বড়দিন উদযাপনে বাঁশের লণ্ঠন (bamboo lanterns) বাড়ি-ঘরে প্রজ্বলিত হতো, যা রাতের আকাশকে উজ্জ্বল করত এবং উৎসবকে দৃশ্যমানভাবে উদ্‌যাপিত করত। এছাড়াও ছোট ছোট 'প্রোসিশোঁস' হতো ও 'প্রেসেপিওস' বসানো হতো, যা স্থানীয় শিশু ও বৃদ্ধদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু ছিল (Ross, 1984)।

পর্তুগিজ আচারবিধি ও লাতিন ভজনের সঙ্গে গ্রামীণ বাংলার সঙ্গীত, নাচ এবং খাদ্যসংস্কৃতির সংমিশ্রণ হাসনাবাদের বড়দিন উদযাপনকে অনন্য রূপ দিত। স্থানীয় মিষ্টি, ভাত, মাছ এবং 'পাঁও দচে' একত্রিত করে সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা ও সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করা হতো। এই ধরনের উদযাপন পর্তুগিজ ঐতিহ্যকে গ্রামীণ বাংলার জীবনযাত্রার সঙ্গে সংহত করে, যা ধর্মীয় ভক্তি এবং সামাজিক সংহতির অনন্য উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে (Subrahmanyam, 1997; Eaton, 1996)। এখনো অত্র এলাকার বেশ কিছু নাতাল নাইতের খাবার, রীতিকৃত্য অনন্য এবং ক্যারল প্রশংসিত হয়।

২.৭ শিবপুর (পাদ্রিশিবপুর বরিশাল, বাকেরগঞ্জ, ১৭৬৪)

বরিশালের পাদ্রিশিবপুর প্রায়শই "বাঙালি বেথলেহেম" নামে পরিচিত, কারণ এটি পর্তুগিজ আধ্যাত্মিক সঙ্গীত এবং প্রাথমিক বাংলা খ্রিস্টান ভজন সংরক্ষণ করে রেখেছে (D'Costa,1997)। ১৬শ-১৭শ শতকের পর্তুগিজ মিশন কেন্দ্র হিসেবে এটি খ্রিস্টান আধ্যাত্মিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। এখানেও বড়দিন- উদ্‌যাপিত হতো 'দিয়া দা নাতাল' বা 'ফেস্তা দ্য নাতাল' নামে। নাতাল একটি ধর্মীয় ও সামাজিক মিলনমেলা হিসেবে পালন করা হতো।

পাদ্রিশিবপুরে বড়দিন উদ্‌যাপনের মধ্যে ছিল 'প্রোসিশোঁস', তালপাতা ও কলাপাতা দিয়ে সাজানো হতো গির্জা আর বসত ঘর। এই শোভাযাত্রায় গ্রামের সকল সদস্য অংশগ্রহণ করত, এবং স্থানীয় জনগণ আংশিকভাবে নাট্যাভিনয় ও গান দ্বারা উৎসবকে সমৃদ্ধ করত (Ross,1984)। মিলন ভোজ গ্রামজুড়ে অনুষ্ঠিত হতো, যেখানে মিষ্টি, ভাত, মাছ এবং স্থানীয় খাবার পরিবেশিত হতো, যা সম্প্রদায়ের ঐক্য এবং সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করত।

বড়দিন উদ্‌যাপনের সবচেয়ে অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল ক্যারল গান, যা একটি পর্তুগিজ-বাংলা ক্রেওল মিশ্রণে পরিবেশিত হতো। স্থানীয় শিশু ও প্রাপ্তবয়স্করা একত্রে গান গাইত, ভজনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক আনন্দ এবং ধর্মীয় শিক্ষাকে সম্প্রসারিত করত। পাদ্রিশিবপুরের এই ঐতিহ্যবাহী বড়দিন প্রথা স্থানীয় খ্রীষ্টান সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখে এবং বাংলা-পর্তুগিজ আঞ্চলিক মিলনের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে পরিচিত (Subrahmanyam, 1997)।

বরিশালের পাদ্রীশিবপুরে প্রাথমিক পর্তুগিজ-বাংলা কীর্তন ও গান সংরক্ষিত আছে, যা আচার, গান এবং সম্প্রদায়িক পরিচয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে (Tirtha, 1990)।

৩। ব্রিটিশ বাংলা: প্রতিষ্ঠানিকীকরণ এবং সাহিত্যিক প্রসার

১৭৫৭ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগমনের সঙ্গে বড়দিন উদযাপনে গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর ঘটে। ব্রিটিশ প্রোটেস্ট্যান্ট প্রতিষ্ঠানগুলি লিটার্জি নিয়মিত করে, ইংরেজি ক্যারল পরিচিত করে এবং বড়দিনকে সামাজিক ও জনসাধারণের মধ্যে প্রসারিত করে। কলকাতার এ্যাঙ্গলিকান চার্চগুলো, বিশেষত সেন্ট জনস (১৭৮৭) এবং সেন্ট পল ক্যাথেড্রাল (১৮৪৭), ক্যারল সেবা, ইউক্যারিস্টিক উদ্‌যাপন এবং দাতব্য কার্যক্রম পরিচালনা করত (Smith, 1925)। খ্রীষ্টমাস উৎসবটি মিশনারি বিদ্যালয়গুলিতেও প্রবেশ করেছিল, যেখানে শিক্ষার্থীরা ন্যাটিভিটি নাটক উপস্থাপন করত এবং স্তোত্র গাইত, যা ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অংশগ্রহণকেও জোরদার করত।

এ সময়কার সাহিত্যি পরিমণ্ডলে এই আন্তসাংস্কৃতিক সম্পৃক্ততার প্রতিফলন ঘটিয়েছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) তার কবিতায় খ্রীষ্টীয় মুক্তি ও প্রায়শ্চিত্তের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন (Buss,1989)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বড়দিনের সঙ্গে সম্পর্কিত শান্তি ও

মানব মর্যাদার সার্বজনীন মূল্যবোধ প্রকাশ করেছিলেন, যা লূক ২:১৪-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ: "ঈশ্বর মহিমা উচ্চে হোক, এবং যাঁদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ, তাঁদের মধ্যে পৃথিবীতে শান্তি হোক"। কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) খ্রীষ্টকে প্রেম ও ন্যায়ের বিপ্লবী চরিত্র হিসেবে উদ্‌যাপন করেছেন। ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত 'বড়দিন' শব্দটি তার রচনায় বহুল ব্যবহার পাঠক সমাজে ছড়িয়ে দেন। এই সাহিত্যিক প্রচেষ্টা বড়দিনকে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের বাইরে বাংলা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক চেতনায় সমন্বিত করেছিল।

৪। আধুনিক বাংলাদেশ: বড়দিন জাতীয় উৎসব হিসাবে

১৯৭১ সালের বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর বড়দিন একটি জাতীয় ছুটি এবং আন্তধর্মীয় সাংস্কৃতিক উৎসব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চট্টগ্রাম, তেজগাঁও, নাগরী, হাসনাবাদ এবং পাদ্রীশিবপুরের চার্চগুলো মধ্যরাতের মিসা এবং সম্প্রদায়িক ভোজ আয়োজন করে। পর্তুগিজ-প্রেরিত আচার-অনুষ্ঠান কিছু সংরক্ষণ করে এবং আধুনিক প্রথার সঙ্গে যেমন পাবলিক সাজসজ্জা এবং দাতব্য কার্যক্রম সংযুক্ত অনেক ঘটা করেই করে। বিদ্যালয়, নাগরিক সংগঠন এবং এনজিওগুলো বড়দিনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে, উপহার বিতরণ, কনসার্ট আয়োজন এবং সমাজসেবা প্রচেষ্টা চালায় (Malik, 2003)।

আধুনিক বড়দিন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক উৎসবে রূপান্তরিত হয়েছে, যেখানে মুসলিম, হিন্দু এবং বৌদ্ধরাও খ্রিষ্টানদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে। এই আন্তঃধর্মীয় অংশগ্রহণ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সফল সংমিশ্রণ প্রদর্শন করে এবং যীশুর জন্মের আলো ও আশার বার্তা প্রতিফলিত করে। আধুনিক বাংলাদেশী খ্রীষ্টান সাহিত্যিকগণ গ্রামীণ সরলতা, সামাজিক ন্যায় এবং মানব মর্যাদার সঙ্গে খ্রিস্ট জন্মকে সংযুক্ত করে কবিতা ও সাহিত্য তৈরি করে যাচ্ছেন, বড়দিনকে আধ্যাত্মিক ও সামাজিকভাবে অর্থবহ রাখছেন। প্রবাসী বাংলাদেশী খ্রীষ্টানগণ দেশের বড়দিনের স্মৃতি রোমন্থন করে। হাজার হোক, "বছরের একটা দিন- বড়দিন।"

৫। সাংস্কৃতিক এবং সাহিত্যিক প্রতিফলন

বাংলায় বড়দিন সাংস্কৃতিক আলোচনার স্থান হিসেবে বিবেচিত। পর্তুগিজ মিশনারিরা ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, লাতিন ও পর্তুগিজ লিটার্জি, ক্যারল এবং বড়দিন শব্দটি পরিচিত করেছিলেন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠানগুলি এই প্রথাগুলোকে আরও প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বাংলা সাহিত্যিকরা এই উৎসবকে কবিতা, প্রবন্ধ ও উপন্যাসে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। দত্ত, ঠাকুর, নজরুল এবং পরবর্তী বাংলাদেশী খ্রীষ্টান লেখকদের সাহিত্যিক অংশগ্রহণ বড়দিনের আলো, মুক্তি, ন্যায় এবং সামাজিক সংহতির সার্বজনীন আকর্ষণ প্রদর্শন করে।

নাতাল, খ্রীষ্টমাস আর বড়দিনে স্থানীয় অভিযোজনের উদাহরণ সুস্পষ্ট। গ্রামীণ যীশু জন্ম কাহিনী অনুপ্রাণিত করে কীর্তন, নাটক, পালাগান, বৈঠকী, জারি, যাত্রা, গীতিনাট্য রচনা ও পরিবেশন করতে। খ্রীষ্টমাস ক্যারল ও লিতানীতে পর্তুগিজ ও বাংলা সুরের সংমিশ্রণ ঘটে। বড়দিনের ভোজে বাংলা রন্ধন শিল্পের ঐতিহ্য অন্তর্ভুক্তি ঘটে। বড়দিনকে দানদক্ষিণা ও সামাজিক একতা ও মিলনের একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। প্রতিবেশীদের সাথে পালাক্রমে বৈঠক (বৈড্ডগ) রীতির প্রচলন হয়। আত্মীয় দর্শন, বেড়ানো, আমন্ত্রন-নিমন্ত্রন প্রথায় রূপলাভ করে। নতুন পোষাক, উপহার, কার্ড বিনিময় শুরু হয়। এই সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ দেখায় কিভাবে একটি বৈশ্বিক ধর্মীয় উৎসব স্থানীয় প্রেক্ষাপটে অঙ্কুরিত হতে পারে, বিস্তৃত হতে পারে এবং ধর্মতাত্ত্বিক অর্থ বজায় রেখে টিকেও থাকতে পারে। হালের দিজিতেল জগৎ বঙ্গের বড়দিনকে বৈশ্বিক উঠোনে ফাটাফাটি ককটেল করে দিয়েছে।

উপসংহার: বঙ্গে বড়দিনের বিবর্তন, পর্তুগিজ নাতাল থেকে খ্রীষ্টমাস ও আধুনিক বড়দিন পর্যন্ত, ধর্ম, সংস্কৃতি এবং পরিচয়ের মধ্যে গতিশীল মিথস্ক্রিয়ার একটি চিত্র। পর্তুগিজ মিশন কেন্দ্র-দিয়াঙ্গ, চট্টগ্রাম, ঈশ্বরপুর, তেজগাঁও, নাগরী, হাসনাবাদ এবং পাদ্রীশিবপুর- বাংলার খ্রীষ্টীয় আচার এবং সম্প্রদায়িক জীবন প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করেছিল। ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানিকীকরণ কাঠামো, সাহিত্যিক অংশগ্রহণ এবং জনস্বীকৃতি প্রদান করেছিল। আজ বড়দিন একটি জাতীয় উৎসব, যা ধর্মীয় সীমানা অতিক্রম করে, খ্রীষ্টান এবং অখ্রীষ্টান উভয়ের দ্বারা উদযাপিত হয়। এটি আধ্যাত্মিক আদর্শ, সামাজিক মূল্যবোধ এবং সাংস্কৃতিক সৃজনশীলতা প্রতিফলিত করে, খ্রীষ্টের বার্তা এবং বাংলার জীবন্ত অভিজ্ঞতা উভয়ই ধারণ করে। বাংলাদেশে বড়দিন বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও সহমর্মিতাকে একত্রিত করে- প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে হৃদয়ে জ্বালায় আশার আলো।

Bibliography

Corraya, T. A. (1995). *Christianity in Bangladesh: Early roots and missionary expansion. Notre Dame Publications.*

D'Costa, A. (1997). *The Catholic heritage of Bangladesh. St. Placid's Press.*

D'Rozario, T. (1988) Roy to Rozario, Pratibeshi.

Eaton, R. M. (1996). *The rise of Islam and the Bengal frontier, 1204–1760. University of California Press.*

Hunter, W. W. (1876). *A statistical account of Bengal (Vols. 1–2).* Trübner & Co.

Majumdar, R. C. (2004). *History of Bengal (Vol. 2).* Tulika Books.

Mojumdar, A. (2004). *Sundarbans and early Christian settlements. Dhaka Historical Review.*

Neill, S. (1984). *A history of Christianity in India: The beginnings to 1707.* Cambridge University Press.

Ross, L. (1984). *The Portuguese in Bengal.* Firma KLM.

Subrahmanyam, S. (1997). *The Portuguese Empire in Asia, 1500–1700: A political and economic history.* Longman.

Tavernier, J.-B. (1925). *Travels in India (V. Ball, Trans.).* Oxford University Press. (Original work published 1676)

Trindade, M. (2008). Bengali Christians and Lusophone heritage. *Asian Journal of Christian Studies,* 11(2), 65–88.

Zaman, H. R. (2015). Syncretic traditions in rural Bengali Christianity. *Journal of South Asian Cultural History,* 17(3), 201–225.

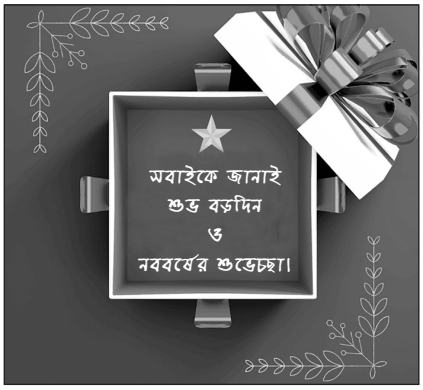

রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষক ও খ্রিস্টীয় সঙ্গীতসাধক শ্রী বিজয় কুমার সিংহ

প্রদীপ পেরেজ এসজে

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-লিঙ্গ-অঞ্চল নির্বিশেষে সব মানুষকেই নিজের এবং এই বিশ্বজগতের অস্তিত্বের অংশ বলে স্বীকার ও গ্রহণ করেছেন। তাই তিনি তাঁর বিশ্বভারতীতে সব মানুষকেই আমন্ত্রণ ও স্বাগত জানিয়েছেন। শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্য ছিল 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে'। মানুষের পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে দিয়ে পরস্পরের উৎকর্ষ সাধন করাটাই ছিল রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য। শান্তিনিকেতনের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিয়ে কোনো মানুষ যাতে নিজের ব্যক্তিসত্তা ও পরিচয়কে কখনও ভুলে না যান, বরং তাঁর ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য এক মহার্ঘ্য সম্পদ রেখে যান। এমনই এক মননশীল এবং সৃজনশীল ব্যক্তি শান্তিনিকেতনের সঙ্গীত-বিভাগের প্রথমে আশ্রমিক ছাত্র এবং পরে শিক্ষক শ্রী বিজয় কুমার সিংহ (জন্ম: ৭ মে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ, মৃত্যু: ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ)। সর্বান্তঃকরণে খ্রিস্টের অনুসারী ও অনুরাগী বিরল প্রতিভার এই মানুষটি নিজের কর্ম ও সাধনা দিয়ে যেন নিজেকেই ছাড়িয়ে গিয়েছেন। একাধারে স্বনামধন্য গায়ক, নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক ও নিভৃতচারী গবেষক এবং অন্যদিকে খ্রিস্টীয় সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞ শ্রী বিজয় কুমার সিংহ আমার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত রবীন্দ্র-সঙ্গীত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। তিনি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মাহাত্ম্যে ঈশ্বরকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। অন্যদিকে যিশুর অনুকরণকারী হিসাবে মানুষের সেবার মধ্যে দিয়ে অন্তঃকরণে শান্তি ও স্বস্তি পেতেন। তারই সঙ্গে গান ছিল তাঁর প্রাণের বীণায়। সেই সুরের মধ্যে তিনি যুগপৎ ঈশ্বর ও মানুষের সন্ধান করেছেন।

বিজয় কুমার সিংহ ৭ মে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা জেলার সুন্দরবন অধ্যুষিত বাসন্তী নামক এক প্রত্যন্ত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবার ছিল বনেদি, শিক্ষিত ও সংস্কৃতিমনা। তাঁর পিতা নিকোলাস সিংহ ছিলেন একই সঙ্গে খ্রিস্টধর্মের একনিষ্ঠ প্রচারক, সিদ্ধহস্ত নাট্যকার, চৌকষ অভিনেতা, সুরেলা সঙ্গীতশিল্পী, গানের রচয়িতা ও সুর সংযোজক এবং স্কুলের স্বনামধন্য শিক্ষক। নিকোলাস সিংহকে বলা যায়, খ্রিস্টীয় সঙ্গীত জগতের অন্যতম পথিকৃৎ। তিনি বেশকিছু জনপ্রিয় উপাসনা-সঙ্গীত রচনা করেছেন। তাঁর লিখিত ও সুরারোপিত অনেক গান দুই বাংলার খ্রিস্টীয় উপাসনা সংগীতকোষ গ্রন্থসমূহে স্থান পেয়েছে। খ্রিস্টীয় ভাব, তত্ত্ব ও তথ্যে সমৃদ্ধ সেসব গীতিমালা বাণী ও সুরের যথাযথ মেলবন্ধনে উপাসক মণ্ডলীর অন্তরে ভক্তি-ভাবের উদ্রেক করে। সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন বাসন্তী তথা দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা এলাকায় খ্রিস্টধর্মের এক নিবেদিতপ্রাণ প্রচারক। ছোটবেলা থেকেই বিজয় কুমার সিংহ তাঁর পিতৃদেবের সৃষ্টিশীলতার ধারক ও বাহক। তাঁর জীবনের প্রায় সবক্ষেত্রেই গুনবান পিতা প্রত্যক্ষ ও জোরালো প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। সেই সুবাদে বিজয়কুমার সিংহ পারিবারিক প্রতিবেশ থেকে ছোটবেলায়ই সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। বাসন্তীর স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা শেষ করে

শ্রী বিজয় কুমার সিংহ (৭ মে ১৯৪২ – ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

তিনি সেখানেই যিশুসঙ্গীদের পরিচালিত সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং পরে কলকাতার বালিগঞ্জে অবস্থিত সেন্ট লরেন্স স্কুল থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক পাশ করেন। তারপর তিনি ভর্তি হন কলকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। সেখান থেকে বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তারপর তিনি আর সাধারণ শাখায় পড়াশুনা করেননি। পিতার সাঙ্গীতিক প্রতিভার প্রতি সম্মান রেখে এবং নিজের আগ্রহকে গুরুত্ব দিয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে সঙ্গীত বিভাগে ভর্তি হন। তখন শান্তিনিকেতনই হয়ে ওঠে তাঁর সাঙ্গীতিক স্বপ্নের তীর্থভূমি। শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক বিজয় কুমার সিংহ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাক্ষাৎ-শিষ্য শ্রী শান্তিদেব ঘোষের কাছে সরাসরি সঙ্গীত শিখেছেন। সঙ্গীতে ভালো ফলাফলের জন্য তিনি সেখানকার অধ্যক্ষ শান্তিদেব ঘোষের স্নেহভাজন হয়ে ওঠেন। এই দিকপাল সংগীতজ্ঞ বিজয়কে অনেক যত্নে নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসা ও প্রশ্রয়ে সরস্বতীর একান্ত অনুগত শিষ্য করে তোলেন। শান্তিদেব ঘোষের শিক্ষকতায় সংগীত, নৃত্য ও অভিনয়ে তিনি বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠেন। তাঁর সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় এবং বিদেশেও সঙ্গীত ও নৃত্যকলার জন্য ভ্রমণ করেন। শান্তিদেবের সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র এবং খুব সম্ভাবনাময় ছিলেন বলে সেখানকার ছাত্রাবাসে থেকে স্বচ্ছন্দে পড়াশোনা চালিয়ে যাবার জন্য পান সরকারি বৃত্তি। অবশেষে সঙ্গীতে তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করেন। তার কিছুদিন পর বিজয় কুমার সিংহ নিযুক্ত হন বিশ্বভারতীর সঙ্গীত বিভাগে রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষক হিসেবে। শেষে তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের দায়িত্বও পালন করেন। এভাবেই আস্তে আস্তে তিনি ছাত্র থেকে কণ্ঠশিল্পী, অভিনেতা, নৃত্যশিল্পী ও রবীন্দ্রসংগীত-বিশারদ হিসাবেও প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন।

বিজয় কুমার সিংহের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসের মাঝামাঝি। আমি তখন কলকাতার ধ্যানাশ্রমে। যিশুসংঘের নব্যালয়ে। সেই বছর আমরা গ্রীষ্মের ছুটিতে শান্তিনিকেতন যাই। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্নসাধনতীর্থ বিশ্বভারতীতে আমাদের নিয়ে যান নব্যালয়ের সহ-পরিচালক ফাদার জোসেফ সুকালে এসজে। সেখানে আমাদের থাকা-খাওয়া ও ঘোরাঘুরির সব ব্যবস্থা করেছিলেন বিজয় কুমার সিংহ। সেদিন বিকালে আমরা সদলবলে গুরুপল্লীতে তাঁর বাড়িতে যাই। সুন্দর ছিমছাম এবং গোছানো বাড়ি। বসার ঘরে টাঙানো শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা যিশু-খ্রিস্টের ছবি। পরিচয়-পর্বের শুরুতেই অস্বস্তির সব আগল খুলে গেল। বিজয় কুমার সিংহ আমাদের যিশুসঙ্গী ফাদার তিমির বরণ সিংহ এস. জে.-র বড়দাদা। তাই তিনি আমাদের সেইদিনই তাঁকে 'দাদা' বলে ডাকার অনুমতি দিলেন। শান্তিনিকেতন রীতিতে শিক্ষকদের 'দাদা' বলে ডাকার রীতি রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কটা কাছের মানুষ বা বন্ধুর মতো হোক– এমনটিই চেয়েছিলেন। আমাদের চা-পর্ব ও আলোচনার মধ্যে হঠাৎই এসে হাজির হন বিজয়দার সঙ্গীত-গুরু শ্রী শান্তিদেব ঘোষ। সঙ্গে সঙ্গে বিজয়দার চোখে-মুখে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মোহনের অনুভূতি জেগে উঠল। তখন কিন্তু শান্তিদেব বাবু অধ্যাপনা থেকে অবসর নিয়েছেন। তবুও তিনিই যেহেতু রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য ও সান্নিধ্যলাভকারীদের মধ্যে জীবিত ছিলেন, তাই তাঁর সর্বজনগ্রাহ্য একটা

সম্মানের আসন ছিল। এমন মহান ও মহৎ মানুষের উপস্থিতিতে আমরা চুপ হয়ে গেলাম। বিজয়দা আমাদের বললেন, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিষয়ে আপনাদের যা-কিছু জানার আছে, আপনারা শান্তিদাকে জিজ্ঞাসা করুন। শান্তিদা কবির স্নেহ-সান্নিধ্য লাভকারী খুব কম জীবিত মানুষের মধ্যে একজন।" আমরা সেই সুযোগ হাতছাড়া করিনি। আমাদের নানা প্রশ্নের উত্তরে তিনি অনেক কথাই বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে। তবে মনে আছে মৃত্যুর পর কলকাতায় কবিকে দাহ করার সময় তিনি কাছাকাছিই ছিলেন। দাহকৃত ভস্মের মধ্যে তিনি কবির হাতের একটা অস্থি পেয়েছিলেন। সবার অগোচরে সেটা তিনি পকেটে করে নিয়ে চলে আসেন। সেদিন, আমাদের সঙ্গে গল্প-গুজব করার দিন পর্যন্ত কবির সেই অস্থি তাঁর কাছে ছিল। রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে শান্তিদেব ঘোষের লেখা আত্মজীবনী 'জীবনের ধ্রুবতারা' গ্রন্থে অনেক বিষয়েই তিনি স্মৃতিচারণ করেছেন। সেই বছরই পূজার ছুটিতে বিজয়দা সপরিবারে ধ্যানাশ্রমে বেড়াতে আসেন। তিনি আমাদের সঙ্গে তিনদিন সময় কাটান। আমরা তাঁর কাছে অনেক গান শুনেছি। সেই সঙ্গে বেশকিছু গান শিখেও নিয়েছি। তাঁর কাছে গান শেখা ছিল একটা অভিজ্ঞতা। অত্যন্ত যত্ন নিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখাতেন। সময় কম ছিল বলে বেশকিছু গান আবার টেপ-রেকর্ডারে ধারণ করে নিয়েছিলাম। কোনো গানের আবদার জানালে তিনি সঙ্গে সঙ্গে শুরু করতেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর।

গলা ছেড়ে রবীন্দ্রনাথের গান করা বিজয়কুমার সিংহের কাছে কর্তব্য মনে হতো। তিনি কোনোকালেই মেকি সুরে বা মিনমিন করে গান গাইবার পক্ষে ছিলেন না। গলার তেজ দৃপ্ত। অপরিসীম। গানের নাটকীয়তা যেন তাঁর গায়কীর সম্পদ। তাঁর এই অনবদ্য ও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত গায়ন-রীতির জন্য গানগুলো প্রাণবন্ত হয়ে উঠতো। সুরের ঐশ্বর্য ছাপিয়ে যেন কবিত্বকেই প্রতিষ্ঠিত করতো। তাঁর কণ্ঠ অদ্ভুত সুরেলা। ভারী আওয়াজে তিনি স্বকীয়। সেইসঙ্গে অভিনব উচ্চারণে তিনি গান করতেন। একবার শুনলে মনে গেঁথে যায়। তার রেশ থাকে দীর্ঘ সময় ধরে। সচরাচর এই ধরনের উচ্চারণে ও ভঙ্গিতে কাউকে রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে দেখিনি ও শুনিনি কখনও। তিনি মুক্ত-ছন্দে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে বেজায় পছন্দ করতেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতকে তিনি তাঁর প্রাত্যহিক জীবনে যাপন করেছেন। রবীন্দ্রনাথকে তিনি কথায় ও সুরে উপলব্ধি করেছেন। কবিতার আদল ধরতে পেরেছেন। তাই মনে হয় তাঁর সমগ্র জীবনটাই যেন মহাকালের অনন্তের রাগিণীতে বাঁধা। তাঁর অস্তিত্ব যেন একটি সঙ্গীত ছাড়া কিছুই নয়। তাঁর অনুভব যেন সুরের নিরিখে টানা। তাঁর উপলব্ধি ছিল তাল-লয়ের সূত্রে গাঁথা।

বিজয় কুমার সিংহ রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করেছিলেন। সেই সঙ্গীতের মধ্যে যে এক গভীর আধ্যাত্মিকতা ও পবিত্রতা নিহিত আছে, তিনি তাঁর নির্যাসটুকু সম্পূর্ণভাবে ধরতে পেরেছিলেন। তার ভেতরের সারমর্ম আত্মীকরণ করতে পেরেছিলেন। তিনি কিন্তু কোনো গতানুগতিক সঙ্গীত-শিক্ষক ছিলেন না; ছিলেন একজন সত্যিকারের সঙ্গীতজ্ঞ। অন্যকথায় বলতে গেলে গানের পণ্ডিত। অতএব তাঁর অভিনিবেশ ছিল অত্যন্ত উঁচুমার্গের। বিজয় কুমার সিংহ চেয়েছেন তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে

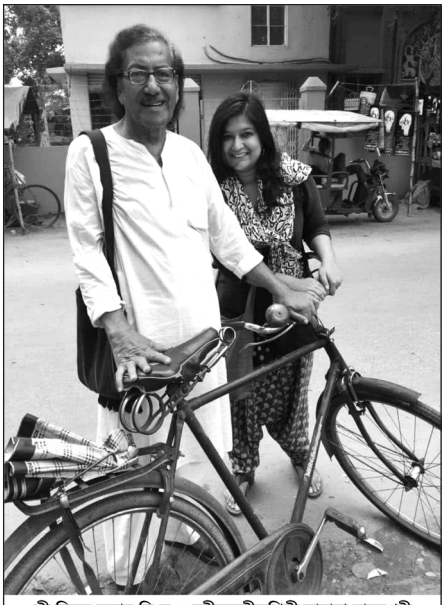
শ্রী বিজয় কুমার সিংহ ও রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী সাহানা বাজপেয়ী

রবীন্দ্রসঙ্গীত সঠিকভাবে আয়ত্ব করে। তারা যাতে এই সঙ্গীতের আসল অর্থ অনুধাবন করে যথাযথভাবে গাইতে পারে। দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে থাকা তাঁর অগণিত ছাত্র-ছাত্রীর শুদ্ধ রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা ও সাধনার মধ্যেই তিনি চিরকাল বেঁচে থাকবেন। শান্তিনিকেতনে দীর্ঘজীবনের শিক্ষকতায় বিজয়দা বহু ছাত্র-ছাত্রীকে গান শিখিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই পরে খ্যাতনামা সঙ্গীতশিল্পী হয়ে ওঠেন। তাঁর বিখ্যাত শিষ্য-শিষ্যাদের ভারতীয় গাইয়ে হচ্ছেন: শ্রাবণী সেন, ইন্দ্রানী সেন, জয়তী চক্রবর্তী, ইমন চক্রবর্তী, সাহানা বাজপেয়ি, অলোক রায় চৌধুরী, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিরূপ গুহঠাকুরতা, অগ্নিভ বন্দোপাধ্যায়, অঙ্কন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। অন্যদিকে বাংলাদেশি তাঁর স্নেহধন্য রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে আছেন কাদেরি কিবরিয়া, সাদি মোহাম্মদ, রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, মিতা হোক, অদিতি মহসিন ও সৌমি নাহা। আমার বাড়ি বাংলাদেশে জেনে এখানকার শিল্পীদের তিনি যথেষ্ট তারিফ করলেন। বলছিলেন সাদি মোহাম্মদ ভর্তি-পরীক্ষার আগের দিন এসে বলল, "বিজয়'দা আমারে একখান সোন্দর গান শিখাইয়া দেন।" তবে বন্যার প্রতি তাঁর বিশেষ পক্ষপাত ছিল। সেটা গানে তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার জন্য।

বিজয় কুমার সিংহ সব সময়ই ধুতি-পাঞ্জাবি পরতেন। দীর্ঘদেহী বিজয়দা কথা-বার্তায় খুবই মার্জিত ও ভদ্র ছিলেন। তাঁর মতো অতিথি-পরায়ণ মানুষ খুব কমই দেখেছি। কলকাতা থাকার এবং পড়াশুনা করার সুবাদে আমি বহুবার শান্তিনিকেতনে গিয়েছি। শান্তিনিকেতনের রতনপল্লীতে যিশু-সংঘের আঞ্চলিক ঐশতত্ত্ব অধ্যয়নকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার আগে তাঁর বাড়িতেই উঠেছি; থেকেছি; খেয়েছি। রবীন্দ্রনাথের নানা বিষয় নিয়ে অনেক আলোচনায় অংশ নিয়েছি। তিনি কখনও বিরক্ত হননি। তিনি অত্যন্ত সাদামাটা ও সহজ-সরল জীবন যাপন করতেন। নিজের হাতেই সব কাজ করতেন। শান্তিনিকেতনে সাইকেলই ছিল তাঁর প্রিয় বাহন। কদাচিৎ তাকে রিক্সায় উঠতে দেখেছি। কাছাকাছি হলে অধিকাংশ সময় তিনি পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতেন। তিনি বলতেন, "শান্তিনিকেতনের সব জায়গায় কবিগুরুর স্পর্শ লেগে রয়েছে। এই মাটি পবিত্র। তার অসম্মান করা উচিত নয়। তাকে অপবিত্র করাও ঠিক নয়।" যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্বে আমার বিশেষ বিষয় হিসাবে রবীন্দ্র-সাহিত্য ছিল বলে মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতন যেতাম। তাঁর বরাত দিয়ে বিশ্বভারতীর সব জায়গায় যেতে পেরেছি। গ্রন্থাগার ব্যবহারে অবাধ স্বাধীনতা পেয়েছি। যখন তখন আবদার করে তাঁর কাছে অনেক গান শুনেছি। তাঁকে কখনও বিরক্ত হতে দেখিনি। সব সময় হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। যথাসম্ভব সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন।

এক সময় বিজয় কুমার সিংহ খ্রিস্টীয় পরিমণ্ডলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার প্রয়াস করেন। সেই পথ-পরিক্রমায় তাঁর সঙ্গে তিনি পেয়েছিলেন জগদ্বিখ্যাত ভারত-তত্ত্ববিদ এবং দিকপাল লেখক-অনুবাদক যিশুসঙ্গীদের মধ্যে ফাদার রবের আঁতোয়ান এসজে, ফাদার পিয়ের ফালোঁ এসজে, ফাদার পল দ্যতিয়েন এসজে, ফাদার ম্যাথ্যু শিলিংস এসজে, ফাদার খ্রিস্তিয়াঁ মিঙয়ো এসজে প্রমুখকে। তাঁদের সহায়তায় বঙ্গদেশের খ্রিস্টীয় উপাসনায় রবীন্দ্র-সঙ্গীত সাদরে গৃহীত হয়েছে। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে শান্তিনিকেতনের রতনপল্লীতে যিশু-

সংঘের আঞ্চলিক ঐশতত্ত্ব অধ্যয়নকেন্দ্র ‘পরশমণি’ প্রতিষ্ঠায় তিনি অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। বাড়ি কেনা থেকে শুরু করে সমস্ত কাজেই তিনি ছিলেন পরম সহায়ক। আবার এই শতকের গোড়ায় ফাদার জর্জ পাটেরি এসজে-এর বিশ্বভারতীতে অধ্যাপক হিসাবে কাজ করার সুযোগ লাভেও বিজয়দার ভূমিকা অনস্বীকার্য। সমস্ত কাজকর্ম সম্পাদন করার মধ্যেও তিনি ছিলেন সর্বান্তঃকরণে গানের মানুষ। গানের শিক্ষক। সেই তাগিদ থেকেই তিনি কলকাতার এন্টালি সেন্ট মেরিস স্কুলে, এন্টালি সাধ্বী আন্নার কন্যাদের ভগ্নীগৃহে, প্রভু যিশু গির্জায়, রাঘবপুর সাধু যোসেফের গির্জায়, কেওড়াপুকুর লালপুলের সাধু আন্তনির গির্জায়, বাঁশদ্রোণী শান্তি-রাণী গির্জা, বাসন্তী ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজার গির্জা, ব্যারাকপুর মর্নিং স্টার কলেজ, ধ্যান আশ্রম, ব্যান্ডেল গির্জায় নিয়মিত উপাসনার সঙ্গীত শেখাতে যেতেন। মাদার তেরেজার মৃত্যুবরণের পর তিনি ‘আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহদহন লাগে/ তবুও শান্তি তবুও তবু অনন্ত জাগে’ শীর্ষক রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে মাদারকে সম্মান জানিয়েছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে মাদার নিজেই নাকি বিজয়কুমার সিংহকে এই গানটি গাইবার অনুরোধ করেছিলেন। খ্রিস্টীয় সঙ্গীতের বিশিষ্ট গীতিকার ও সুরকার মানিক নাথের প্রায় সমস্ত গানেরই স্বরলিপি করেছেন বিজয় সিংহ।

১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ ৪ ফেব্রুয়ারি, পুণ্যপিতা পোপ দ্বিতীয় জন পল যখন ভারত-ভ্রমণের সময় কলকাতা আগমন করেন, তখন তার প্রধান-খ্রিস্টযাগের গানের অন্যতম পরিচালক ছিলেন বিজয় কুমার সিংহ। তিনি গান শিখিয়েছিলেন। আবার পরিচালনাও করেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানের কথা মাথায় রেখে তিনি বেশকিছু সঙ্গীত রচনা ও সুর-সংযোজনা করেন। বিজয় কুমার সিংহ বিরচিত গানগুলির ধর্মীয় বক্তব্য গভীর অর্থ বহন করে। শব্দের দ্যোতনা তার সাহিত্যমূল্যকে সুনিশ্চিত করে। সেই সঙ্গে গানগুলোর কাব্যরসের মাধুর্য ভক্তদের মনপ্রাণ ঈশ্বরাভিমুখী করে তোলে। সঙ্গীতের সিদ্ধ সাধক ও দীর্ঘদিনের শিক্ষকতার সূত্রে তিনি গানের মধ্যে ধ্রুপদী সুরের কারুকাজ মিশিয়েছেন। সেই প্রচেষ্টায় গানগুলি চিত্তগ্রাহী হয়ে উঠেছে। খ্রিস্টযজ্ঞের পূজনক্রিয়ার ভাবোপযোগী গান রচনায় বিজয়কুমার সিংহ সিদ্ধহস্ত। এক কথায় এই ক্ষেত্রে তাঁকে অদ্বিতীয় বলা যায়। তাঁর সুললিত সুর-সংযোজনায় ভারতীয় রাগাশ্রয়ী গানের মর্যাদাকে আরও উঁচুস্তরে নিয়ে গেছে। এই পর্যায়ে আমরা যদি খেয়াল করি, দয়াভিক্ষার “করুণা কর প্রভু, করুণাময় প্রভু, করুণাভাজনে কর করুণা বিধান” গানটি করুণাময় ঈশ্বরের ক্ষমালাভের আকুল আর্তি গোপন থাকে না। আমাদের মুক্তিদাতা প্রভু যিশু যে, “খ্রিস্ট করুণাধন, খ্রিস্ট করুণাঘন”, শুধু তিনিই ‘করুণ কাতরে’ ‘করুণা প্রদান’ করতে পারেন। তিনিই একমাত্র ‘করুণানিধি প্রভু’, তিনিই ‘করুণানিধান’। এই গানে ‘করুণা’ শব্দটি বহুল পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও আমাদের কাছে খারাপ লাগে না। শব্দটি বারবার আবির্ভূত হয়ে মনকে ভারাক্রান্ত করে না; বরং আমরা তার বিস্তার উপলব্ধি করি। দয়াভিক্ষার অনুবর্তী ‘মহিমাস্তোত্র’ “জয় জয় জয়, ঊর্ধ্বলোকে জয়, ঊর্ধ্বলোকেশ্বর জয় হে; শান্তি ইহলোকে, শান্তি মরগণে, শান্তি অখিলধরাময় হে...” আমাদের অন্যলোকে নিয়ে যায়।

শান্তিনিকেতন উপাসনা-মন্দিরে বড়দিন উদ্‌যাপন

তৎসম শব্দবন্ধ গানটিকে সত্যিই শ্রুতিমধুর করে তুলেছে। সেই সঙ্গে শব্দানুপ্রাস যেন ঝংকার তুলে শুধু আমাদের কর্ণেন্দ্রিয়ই নয়, বরং অন্তঃকরণে স্বর্গীয় চিরসঙ্গীতের অনুরণন তৈরি করে। আমরা গানে পাই “স্তবগীতিকা ঢালি, আরতিশিখা জ্বালি, রাখি পূজার ডালি চরণে তব;/ প্রভু পরমেশ হে, স্বর্গ-অধীশ হে, কত মহিমা ধরো নিত্য নব”– এই অংশিকায় শব্দসমূহের কাব্যিকতা। একই সঙ্গে টান-টান সুরের তানে আমাদের মুগ্ধ করে রাখে। মহিমাগীতের শেষাংশে এসে যখন গাই “ঈশ-মহিমা-দূত, ঈশ-পরমসুত, পিতৃমহিমাপূত পুণ্যতম;/ পরম আত্মা সে, তোমাতে উদ্ভাসে, পরাৎপর তুমি, তোমার জয়।”- তখন বুঝতে পারি যে সংস্কৃত স্তোত্রগানের আদলে রচিত ও সুরারোপিত এই ভক্তিগান উপাসনায় ভক্তদের মনপ্রাণ শ্রদ্ধা-ভক্তিতে বিগলিত করে দেয়। এ ছাড়াও খ্রিস্টীয় ‘বিশ্বাসমন্ত্র’ বা ‘বিশ্বাসোক্তি’ যাকে আমরা বলি ‘প্রেরিতগণের শ্রদ্ধামন্ত্র’ বলে অভিহিত করি, তার অসামান্য গীতিকাব্যের রূপ দিয়েছেন বিজয় কুমার সিংহ। তৎসম শব্দ-চয়নে সেই ভক্তি-ভাবার্থক প্রচলিত ভারতীয় তথা সংস্কৃত শব্দ-সম্ভার গানটিকে অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছে। গানের শুরুতেই তিনি বলেছেন, “যিনি নিত্য চিরশরণ্য অপারশক্তি পরাৎপর;/ স্বর্গ-মর্ত্য যাঁহার রচনা পরমেশ্বর পরমপিতায়–” তার পরেই ধুয়োর সুরে সমস্ত ভক্তেরা গায় “বিশ্বাস করি, বিশ্বাস করি, বিশ্বাস করি শাশ্বত।” এখানে বিজয় কুমার সিংহ যেন নিজেই একটা কাব্যভাষা প্রণয়ন করেছেন। সেটা খ্রিস্টীয় পরিমণ্ডলে একেবারে নতুন। তার আগে হয়তো শ্রী অমলকান্তি ভট্টাচার্য এমন শব্দের প্রয়োগ প্রচেষ্টা করেছেন। পিতা পরমেশ্বর ও প্রভু-যিশু খ্রিস্টের সঙ্গে পবিত্র আত্মার অর্ন্তযোগ বুঝাতে তিনি বলেছেন, “পিতা ও পুত্র হতে সম্ভূত, সপ্রণম্য, সমান পূজ্য;/ ঋষিগণের অনুপ্রেরণা– জীবনবিধাতা পরমাত্মায়–” মুখ্য-গায়কের গাইবার সঙ্গে সঙ্গে “বিশ্বাস করি, বিশ্বাস করি, বিশ্বাস করি শাশ্বত” ধুয়ো যেন বৃন্দগানের আবহ নিয়ে আসে। -আবার ‘বন্দনা গীতিকা’ (পুণ্য পুণ্য পুণ্য) গাইতে গেলে তার রচনাশৈলী ও সুর-মাধুর্যে আমাদের মনের বন্দনাগান যেন শাব্দিক প্রার্থনায় শতোৎসারিত হয়ে দেবলোকে পৌঁছে যায়। গানের শুরুতেই “পুণ্যপরম পুণ্যপরম পুণ্যপরম তুমি যে, বিশ্বভুবন স্বর্গ-মর্ত্য শ্রীচরণতলে নমিছে” একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরমেশ্বরের মহিমাকে মন্দ্রিত করে তোলে। আর শেষে প্রভু-যিশুর আরাধনায় “প্রভুর নামে যার আগমন, ধন্য সে তিনি নিখিলশরণ, বন্দনাগান গম্ভীরতান দেবলোকে অনুরণিছে” গাইবার সঙ্গে সঙ্গে সাধুভাষার আলঙ্কারিক শব্দনিনাদ আমাদের মোহাবিষ্ট করে। একইভাবে ‘মহিমা-স্মরণিকা গীতি’– “মরণ-বরণ করে তুমি প্রভু, মরণে হরণ করেছ;/ সে মহামরণ স্মরণে প্রণাম করি” গানটি আমাদের বিশ্বাসের সত্যকে শিল্পসুষমাময় করে উপস্থাপন করে। বিজয় কুমার সিংহ ‘প্রভুর প্রার্থনা’ গানের আদল আনতে গিয়ে শব্দের কিঞ্চিৎ হেরফের করেছেন বটে, কিন্তু সেই প্রচেষ্টা কোনোভাবেই আমাদের ভক্তিভাবে ব্যাঘাত ঘটায় না। তাই আমরা “পিতা আমাদের, পিতা আমাদের, স্বর্গেতে যিনি বিরাজমান;/ পুণ্য আলোকে ভাস্বর হউক, ভাস্বর হউক তোমারি নাম” প্রার্থনায় গানের মাধ্যমে নিজেদের ঈশ্বরের চরণে নিবেদন করি। তারপর আমরা যখন রুটি-খণ্ডনের সময় ‘শান্তি-সম্ভাষিকা গীতি’ “ওগো পাপহর, বিশ্বপাবক, মেষশাবক ঈশ্বরের;/ করুণা কর, করুণা কর, করুণা কিরণে প্রকাশো” গাই, তখন অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত যথাযথ কবিতা ও সুরের মেলবন্ধনে বিশ্বপাবক ঈশ্বরের মেষশাবককে প্রাণবন্ত করে তুলি প্রথমে অন্তঃকরণে অতপর সমস্ত বিশ্বচরাচরে। বিজয় কুমার সিংহের নিজস্ব গানের মধ্যেও একটি অনুবাদ-সঙ্গীত সবচেয়ে বেশি গীত হয় সেটা হলো, “মুক্তি আমার, ইচ্ছা আমার, মানস আমার, স্মরণ আমার;/ লহ হে প্রভু, লহ আমার লহ।” যিশুসংঘের প্রতিষ্ঠাতা সাধু

ইগ্নাসিউস লয়োলা'র বহুপঠিত, চর্চিত ও উচ্চারিত প্রার্থনাকে তিনি এমন মনোগ্রাহী সুর দিয়েছেন যে, এই গানটি ছাড়া যিশুসঙ্গীদের ব্রত-গ্রহণ কিংবা যাজকীয় অভিষেক অনুষ্ঠান প্রায় অসম্ভব।

২০০১ খ্রিস্টাব্দে শান্তিনিকেতন থেকে ডাক এলো বড়দিনের উপাসনায় যিশু-খ্রিস্টকে নিয়ে ২০ মিনিটের একটা বক্তব্য দিতে। বিজয়দা-ই আমার নাম প্রস্তাব করেছিলেন। শান্তিনিকেতনে বড়দিন বা যিশুর জন্মোৎসবকে বলা হয় 'খ্রিস্টোৎসব', 'খ্রিস্ট উৎসব' বা খ্রিস্ট জন্মোৎসব'। প্রতি বছর ২৫ ডিসেম্বর সেখানকার উপাসনা মন্দিরে যিশুর জন্মতিথি সাড়ম্বরে পালিত হয়। শান্তিনিকেতনে বড়দিন পালনের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্তর্ভূক্তিমূলক চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কবি সেখানে বিশ্বের সব দেশে, ধর্মের, বিশ্বাসের, সংস্কৃতির ও জীবন-দর্শনের মানুষের মধ্যে একতা, মৈত্রী ও মিলন সাধনের এক সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি বিদ্যমান। সেখানে সাম্প্রদায়িক আচার-ধর্মের সীমানা অতিক্রম করে বিশ্বজনীন ক্ষমা, ভালোবাসা, সেবা, সহানুভূতি ও মিলনের আকাঙ্ক্ষা– যা যিশু-খ্রিস্টের বাণী ও কাজের মধ্যে প্রেরণা হিসাবে প্রতিভাত। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথ প্রথমবারের মতো শান্তিনিকেতনে যিশুর জন্মোৎসব পালন করেন। তিনি যিশুর মানবতাবাদী আদর্শকে অন্যান্য ধর্মের কেন্দ্রীয় চেতনা হিসাবে উপস্থাপন করার প্রয়াসী হন। বিশ্বভারতীতে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ধর্ম, দর্শন ও চিন্তার মেলবন্ধন ঘটানোর ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন। যারাই সেখানে আসবে, সবাই যাতে পারস্পরিক চেনাজানা ও সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে সামনে এগিয়ে যায়। তাই বড়দিন উদ্‌যাপন সচরাচর রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত বিখ্যাত পৌষ মেলার শেষদিনের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করেই নির্ধারিত হয়ে থাকে। তার ফলে উৎসবের পরিবেশটা আরও ব্যাপকতা ও বিশ্বজনীনতা লাভ করে। যিশুর জন্মোৎসব সাধারণত সকালে বৈতালিক বা প্রভাতফেরির মাধ্যমে শুরু হয়। দেখলাম বিভিন্ন 'পল্লী' বা এলাকা থেকে আশ্রমের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-কর্মচারী ও সেখানকার বাসিন্দারা বাঙালি ঐতিহ্যের পোষাক পরে সারিবদ্ধভাবে রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে গাইতে বড়দিনের জন্য সুন্দর করে সাজানো উপাসনা-মন্দিরের দিকে আসতে লাগলেন। কাছেই গুরুপল্লীর আশ্রমিকেরা কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে মুক্তকণ্ঠে গাইছেন, "ওই মহামানব আসে দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে, মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে।" একটু দূরে শোনা যাচ্ছে ইন্দিরাপল্লীর অধিবাসীরা পৌষমেলায় আগত অতিথিদের কণ্ঠে একাত্ম হয়ে গাইছেন "তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি, ওই যে আসে আসে, যুগে যুগে পলে পলে দিনরজনী।" অন্যদিকে কান যেতেই শুনতে পাচ্ছি রতনপল্লীর সমন্বিত আশ্রমবাসীদের বৃন্দগান রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত সৃষ্টি, "একদিন যারা মেরেছিল তারে গিয়ে রাজার দোহাই দিয়ে।" একইভাবে সীমান্তপল্লী, শ্রীপল্লী, পিয়ারসনপল্লী, পূর্বপল্লী, অবনপল্লী, এবং আরও অনেক দল নিজেদের পছন্দমতো গান গাইতে গাইতে কাঁচ-মন্দিরে এসে গেলেন। মন্দিরে তিল ধারণের ঠাঁই নেই। বাইরে মুক্ত প্রান্তরে হাজার হাজার মানুষের ভীড়। যিশু-খ্রিস্টের জন্মোৎসবে শান্তিনিকেতনে এসে এমন এক স্বর্গীয় আবহের সাক্ষী হতে পারব ভাবতেই পারিনি। কিছুক্ষণের মধ্যে আমাকে ডেকে মন্দিরের ভেতরে নেওয়া হল। সহসা দেখতে পেলাম সেখানে গানের দলের প্রধান বিজয় কুমার সিংহ তাঁর ভরাট গলায় শুরু করলেন, "তাই তোমার আনন্দ আমার পর;/তুমি তাই এসেছ নীচে।" তারপর রবীন্দ্রনাথের রচিত 'খৃষ্ট' গ্রন্থ থেকে পাঠ করা হলো সেই বিখ্যাত অংশিকা– "যাঁকে আমরা পরম মানব বলে স্বীকার করি তাঁর জন্ম ঐতিহাসিক নয়, আধ্যাত্মিক। ... আজ তাঁর জন্মদিন এ কথা বলব কি পঞ্জিকার তিথি মিলিয়ে? অন্তরে যে দিন ধরা পড়ে না সে দিনের উপলব্ধি কি কালগণনায়? যেদিন সত্যের নামে ত্যাগ করেছি, যেদিন অকৃত্রিম প্রেমে মানুষকে ভাই বলতে পেরেছি, সেইদিনই পিতার পুত্র আমাদের জীবনে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেইদিনই বড়োদিন– যে তারিখেই আসুক।" পাঠের পর বিজয়'দা আবার গান ধরলেন, "যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন, সেইখানেতে চরণ তোমার রাজে।" এ যেন যিশুর উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের পারমার্থিক সত্য স্বগতোক্তি। আমার প্রবচনের পর পুনরায় সমবেত সঙ্গীত "ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়, তোমারি হউক জয়।" পরিশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর সবার সম্মিলিত কণ্ঠে "একদিন যারা মেরেছিল তারে গিয়ে রাজার দোহাই দিয়ে" গানটির মধ্য দিয়ে উপাসনা অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটলো।

শান্তিনিকেতনে একটি খ্রিস্টীয় মণ্ডলী গঠনে বিজয় কুমার সিংহ ছিলেন বদ্ধপরিকর। তাঁর স্বপ্ন ছিল যে রবীন্দ্রনাথ যেহেতু শান্তিনিকেতনে সব ধর্মের মানুষকে স্বাগত জানিয়েছেন, সেহেতু সেখানে যাতে একটা গির্জা নির্মিত হয়। তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল যে ঈশ্বর তাঁকে সেই লক্ষ্যেই শান্তিনিকেতনে নিয়ে গেছেন। অতএব বলা যায় সেখানে খ্রিস্টীয় উপাসনাগৃহ নির্মাণের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং প্রধান কাণ্ডারী ছিলেন বিজয় কুমার সিংহ। তারই ফলশ্রুতিতে এবং তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আজ সেখানে মকরমপুর শিশু-যিশু গির্জা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তার সামান্য দূরেই ভাগলপুরে প্রতিষ্ঠিত সিটিসি সিস্টারদের সাধ্বী তেরেজার স্কুল গড়ে উঠেছে। বোলপুর বিশ্বভারতীর কাছেই মাদার তেরেজাকে বলে সেখানে শান্তিদান নামক এক আশ্রম প্রতিষ্ঠার কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বিজয় কুমার সিংহের সঙ্গে তাঁর সুযোগ্যা স্ত্রী কাজল গমেজও শান্তিনিকেতনে বিভিন্নরকম সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। তাঁর আন্তরিকতা ও আতিথেয়তা কোনোদিন ভোলবার নয়। তাঁদের কন্যা সুনৃতা সিংহ দত্ত খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী। তিনি নৃত্য পরিবেশনা, পরিচালনা ও শিক্ষকতা নিয়ে বেশ ব্যস্ত। সুনৃতার চিন্তা-ভাবনাতেই ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পিতার সঙ্গে মিলে শুরু করেন 'ভৈরবী' নামের নাচ, গান ও অঙ্কনের প্রতিষ্ঠান। এখন ভৈরবীর কর্ণধার হিসাবে সুনৃতা তাঁর পিতার স্বপ্নকে সার্থক করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অন্যদিকে বিজয় কুমার সিংহের পুত্র সৈকত কুমার সিংহ প্রধানত রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলেও লোকগানে, বিশেষ করে বাউল গানে সিদ্ধি অর্জন করেছেন। তিনি খ্রিস্টীয় সঙ্গীতেও অনন্য। সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনৃত্যে তাঁর রয়েছে অনায়াস দক্ষতা। একই সঙ্গে তিনি সঙ্গীত পরিচালক এবং আবহ সঙ্গীতকার হিসাবে ভারতের বিভিন্ন ভাষার চলচ্চিত্র ও বিজ্ঞাপনের কাজে জড়িত আছেন।

বিজয় কুমার সিংহ ছিলেন বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসঙ্গীত বিভাগের অধ্যাপক, নাট্যকার, অভিনেতা, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও খ্রিস্টীয় গানের একনিষ্ঠ শিল্পী ও নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক। তিনি বিগত ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে পরপারে পাড়ি জমালেন। কিন্তু আমরা জানি মহৎ-প্রাণের মৃত্যু হয় না। আবার খ্রিস্টীয় বিশ্বাস মতে, মানুষ রূপান্তরিত হয় মাত্র। বিজয়'দার ক্ষেত্রেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। বিজয়'দা রবীন্দ্রনাথে, স্পষ্ট করে বললে; আজীবন রবীন্দ্রসঙ্গীতে নিমগ্ন থেকেও আমাদের দেখিয়েছিলেন যে তাঁর 'প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে'। সেই প্রাণ-পুরুষ ছিলেন মুক্তিদাতা প্রভু যিশু খ্রিস্ট। দৈনন্দিন জীবনের আনন্দ-বেদনায় তাঁকে যিশুর চরণে প্রণত হতে দেখেছি। তাঁর মতো সেই ভক্তিমার্গে আমরা পৌঁছাতে পারব কি-না জানি না। তবে আমাদের প্রাণের শেষ প্রণতি রইল তাঁর চরণে। পরিশেষে কবিগুরুর কথা দিয়েই তাঁকে শ্রদ্ধা-ভালোবাসা নিবেদন করে বলতে চাই:

"তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে,
এ আগুন ছড়িয়ে গেল সব খানে।"

ডা. নেভেল ডি'রোজারিও-কে যেমনটা দেখেছি, যতটুকু জেনেছি

ড. আলো ডি'রোজারিও

আমি ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে শেষার্ধে কলেজে পড়তে ঢাকায় আসি। ঢাকায় এসে প্রথমে থেকেছি লক্ষীবাজারে। ঢাকায় আসার আগেই জেনেছিলাম, তুমিলিয়া মিশনের বান্দাখোলা গ্রামের একজন খ্রিস্টান ডাক্তার আছেন এবং দড়িপাড়া গ্রামের ভূষির বাড়ির একজন ডাক্তারি পড়ছেন ঢাকা মেডিকাল কলেজে। দড়িপাড়ায় আমাদের বাড়িটা পূর্বপাড়ায় হলেও আমি হাইস্কুলে পড়াকালীন সময়ে থাকতাম দক্ষিণপাড়ায় মামাবাড়িতে। আমার মায়ের জ্যেঠিমা দড়িপাড়ার পশ্চিমপাড়ার ভূষির বাড়ির মেয়ে, সম্পর্কে ডা. নেভেলের পিসিমা। পিসিমা'র মুখে ভাইপোদের, বিশেষ করে ডা. নেভেলের ছাত্রাবস্থায় লেখাপড়ায় অর্জন ও সফলতার কথা মামাবাড়িতে শুনলেও আমি কখনো তাকে পিসিমা'র বাড়িতে বা দড়িপাড়া গ্রামে যেতে দেখিনি। বছর খানেক আগে আমি জানতে পারি, দড়িপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে তিনি আমাদের দড়িপাড়া গ্রামের শিশুদের শিক্ষায় আগ্রহ ও উৎসাহ বাড়াতে পঞ্চম শ্রেণীতে বার্ষিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত একজন ছেলে ও একজন মেয়েকে এককালীন অনুদান দেবার স্থায়ী ব্যবস্থা করেছেন।

ঢাকায় আসার পর আমি খুব একটা বন্ধু-বান্ধব জোটাতে পারিনি, তা নানা কারণে। পড়াশুনা ও তিন তিনটা টিউশনির চাপে কীভাবে যে একেকটা দিন পার করতাম তা বুঝে উঠতে পারতাম না। বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সময় কাটানোর সময় ও সুযোগ কোনোটাই আমার ছিল না। সেইসময় সবচেয়ে কাছের বন্ধু ছিল, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের উইলিয়াম অতুল কুলেন্তুনু, যিনি কয়েক বছর আগে অতিরিক্ত সচিব হিসেবে অবসর নিয়েছে। উইলিয়াম অতুল তখন একাধারে ছাত্র ও প্রতিবেশীতে কর্মরত ছিল। তো উইলিয়াম অতুলের সাথে পরিচয় হবার আগে আমার পরিচয় হয় প্রতিবেশীর 'ছোটদের আসর'-এর পরিচালক 'নির্মল দা' খ্যাত শ্রদ্ধেয় মার্ক ডি'কস্তার সাথে। একদিন এই মার্ক ডি'কস্তাই তখনকার মেডিকেল পড়ুয়া ছাত্র নেভেল দা'র সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। সেই প্রথম দেখাটি ছিল প্রতিবেশী অফিসে। প্রথম দেখার দিনে আরো অনেক কিছুর সাথে নেভেল'দা জানতে চেয়েছিলেন, বিজ্ঞান বিভাগে নটরডেম কলেজে পড়ছো, এরপর কী পড়বে? "এরপর বিজ্ঞান বিভাগে ডিগ্রীতে পড়বো", আমি উত্তরে বলেছিলাম। আমার ভবিষ্যৎ ভাবনার দৌড় তখন ঐ পর্যন্তই ছিল। এই বিষয়ে ঐদিন আর কোনো কথা কেউ না বলায় আমি ধরে নিয়েছিলাম আমার উত্তরটা তাদের কারো মনোপুত হয়নি।

নটরডেম কলেজে পড়তে পড়তে আমার ভবিষ্যৎ ভাবনা কিছুটা পাল্টায়। তাই, এইচএসসি পাশের পর আমি ডাক্তারী পড়ার লক্ষ্যে ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছিলাম ঢাকা মেডিকেল কলেজে। ভর্তির জন্যে

ডা. নেভেল ডি'রোজারিও

অপেক্ষমান তালিকায় আমার নাম ছিল। সেই বছর নটরডেম কলেজের আমার দুই খ্রিস্টান ক্লাশমেট (খুলনার অপু লরেন্স বিশ্বাস ও ঢাকার হ্যারি বার্থোলিও গমেজ) ডাক্তারী পড়ার সুযোগ পেয়েছিল। অপু পড়েছে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে এবং হ্যারি ময়মনসিংহে। অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে আমার নাম ভর্তির তালিকায় এসে যাবে এই আশায় সপ্তাহে কমপক্ষে দুইবার তখন ঢাকা মেডিকেল কলেজে যেতাম। মেডিকেল কলেজে গেলে নেভেল দা'র সাথে খুব একটা দেখা হতো না। তিনি প্রচণ্ড ব্যস্ত মানুষ ছিলেন। ছাত্র সংসদের জনপ্রিয় ও পরিশ্রমী ছাত্রনেতা। সকলের চেনাজানা। তার এত ব্যস্ততার মাঝেও মেডিকেল কলেজে ঘুরাঘুরির সময় একদিন আমাকে ডেকে নেভেল'দা জানতে চাইলেন, "তোমার ভর্তির বিষয়টা কতদূর? তুমি কী জানো তোমার পরের সিরিয়ালের কেউ কেউ এরই মধ্যে ভর্তি হয়ে গেছে? এক কাজ করো, ভর্তি কমিটির প্রধানের সাথে দেখা করো, তার নাম-ঠিকানা আমি দিয়ে দিচ্ছি। আর দেখা করার আগে ভর্তি অফিসে গিয়ে ... ভাইয়ের সাথে কথা বললে সে-ই বলে দিবে কী কী করতে হবে।" আমি সেদিন মেডিকেল কলেজে ভর্তির অনেক বড় আশা নিয়ে পুরান ঢাকার রোকনপুরে ফিরেছিলাম।

সন্ধেবেলায় দাদু (আমার মায়ের পিতা) বাসায় ফিরলে আমার ভর্তি বিষয়ে সর্বশেষ সবকিছু তাকে বুঝিয়ে বললাম। সাথে ডাক্তারের নামটাও দিলাম, যার কাছে যেতে হবে। আমার দাদু তখন সেন্ট গ্রেগরী স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। তিনি আমার ভর্তির করণীয় বিষয়াদি শুনে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলেন। তারপর বললেন, "চল্ এখনই যাবো। আমি ডাক্তারের চেম্বার চিনি।" আমরা দু'জন পায়ে হেঁটে রোকনপুর হতে চলে গেলাম সূত্রাপুরের কাঠেরপুলের অপর পাশটাতে। ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকে দাদু সেদিন যা যা বলেছিলেন তা'র সারসংক্ষেপ এইরকম: "আমরা আপনার দুই ছেলেকে সেন্ট গ্রেগরীতে ভর্তি নিয়েছি, আপনি আমাদের কত টাকা দিয়েছেন? আমার নাতির ভর্তির জন্যে আপনার অফিসে বাড়তি টাকা দিতে হবে কেন? আপনার অফিস থেকে বাড়তি টাকার কথা বলা হয়েছে।

ডাক্তার মহোদয় অত্যন্ত বিনয়ীভাবে যে জবাব দিয়েছিলেন তার সংক্ষিপ্তরূপ দেয়া যায় এই ভাবে: "আপনি চিন্তা করবেন না। আপনার নাতির ভর্তি ঢাকা মেডিকেলেই হবে। সে তো সেই অপসনই দিয়েছে। তবে একটু দেরি হবে। আমি তার এই ভর্তির বিষয়টা দেখবো। অপেক্ষমান তালিকা থেকে যারা ইতোমধ্যে ভর্তি হয়েছে তারা কেউই ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি হয় নি।"

আমরা ফিরে এলাম আশা-নিরাশার মাঝ বরাবর একটা অবস্থা নিয়ে। সেদিন ফিরতে ফিরতে দাদু কী ভেবেছিলেন আমি তা জানি না। আমি ভেবেছিলাম, দাদু এইসব কথা সরাসরি না বলে অন্য কোনোভাবে কী বলতে পারতেন। এরপর আমি আর নেভেল দা'র সাথে অনেকদিন দেখা করিনি। আমার নাম অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ভর্তির তালিকায়ও

কখনো আর উঠেনি। তাতে আমার গভীর দুঃখবোধ ছিল। আমার দাদুর ছিল না। ভর্তির জন্যে বাড়তি টাকা না দেবার নীতিতে তিনি ছিলেন অটল।

এরপর আমি একবার নেভেল দা'র কাছাকাছি হই ঢাকা ক্রেডিট ইউনিয়ন হতে পয়লা ঋণের দরখাস্ত করার পর। সেটা ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের কথা। ঢাকা ক্রেডিটের অফিস তখন লক্ষ্মীবাজারে ছিল। বিএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ করার সময় কিছু কম পড়ায় আমি দুইশত টাকা ঋণ পেতে দরখাস্ত করলে আমাকে মৌখিকভাবে বলা হয়- তোমাকে ঋণ দেয়া হবে না। কারণ তুমি ছাত্র, তোমার নিয়মিত আয় নেই, নিয়মিত আয় না থাকলে ঋণ দেবার নিয়ম নেই, ইত্যাদি। ঋণ না পাবার আমার এই বিষয়টা কারো কাছ থেকে জানার পর আমাকে নিয়ে তখনকার ম্যানেজারের কক্ষে গিয়ে নেভেল'দা বললেন, "আলোকে ঋণ দিতে হবে। সে টিউশনি করে। তার নিয়মিত আয় আছে।" ম্যানেজার আমতা আমতা করে বললেন, "নিয়ম মাফিক এই ঋণ দেয়া যায় না। টিউশনি থেকে আয় অনিয়মিত আয়।" নেভেল'দা বললেন, "আরো ছাত্র ঋণ পেয়েছে। আমি জানি। তাই, আলোও ঋণ পাবে।" পরে আমাকে একটা শর্তাধীনে ঋণ দেয়া হয়েছিল। সেই ঋণটা আমার খুব প্রয়োজন ছিল। তাই, আমি দেয়া শর্তটি পূরণ করে ঋণ নিয়েছিলাম।

নেভেল দা'র সাথে ভালোভাবে পরিচয় হয় ঢাকা খ্রিস্টান ছাত্র কল্যাণের সাথে যুক্ত থাকাকালে। আমি গ্রামে থেকে নবম-দশম শ্রেণীতে পড়াকালে 'প্রতিবেশী' পত্রিকায় কয়েকটি লেখা পাঠিয়েছিলাম, সেসব ছাপা হয়েছিল। কলেজে পড়াকালীন সময়েও 'প্রতিবেশী'-তে আমার কিছু লেখা ছাপা হয়। সেজন্যে বোধহয় তখনকার ছাত্র কল্যাণ সংঘের নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে উইলিয়াম অতুল, পিউস দিলীপ কস্তা, জেরোম পবিত্র রোজারিও, স্বপন গিলবার্ট গমেজ ও আলবার্ট গমেজ আমাকে প্রস্তাব ও চাপ দেয়া শুরু করেছিল ছাত্র কল্যাণের গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদকের দায়িত্ব নিতে। আমি প্রথমে রাজি হচ্ছিলাম না দেখে নেভেল'দা ছাত্র কল্যাণ সংঘের এক সাধারণ সভার আগের দিন আমাকে বলেছিলেন, "আলো তুমি ভয় পাচ্ছো কেনো? রাজি হয়ে যাও। তোমার তো সবকিছু একা করতে হবে না। অতুল আছে, আমি আছি, তোমাকে সহায়তা করবো, আরো অনেকে সহায়তা করবে।" বলতে গেলে নেভেল দা'র অনুপ্রেরণা ও সাহসদান আমাকে সেই সময় এত বেশি উদ্বুদ্ধ করেছিল যে আমি রাজি হয়ে গেলাম ঐ পদে থেকে কাজ করতে।

তো ছাত্র কল্যাণ সংঘের গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক হবার পর কয়েক মাসের মধ্যে বুঝেছিলাম এই পদের কাজ কত প্রকার ও কি কি- আমি তখন টাইপ জানতাম না, সাইক্লোস্টাইল মেশিন ব্যবহার তো দূরের কথা কখনো তা ছুঁয়েও দেখিনি, কাগজের সাইজ ও মাপ সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিল না, ছাপাখানায় কখনো যাই নি, প্রুফ রিডিং করা শিখিনি, জানতাম না- ফরমা, ফন্ট, ডামি, ব্লক তৈরি, মেশিন প্রুফসহ আরো সব শব্দ বা শব্দমালা যা কী না প্রিন্টিং জগতে বহুল ব্যবহৃত। নেভের'দা এইসব শুধু যে জানতেন, তা না, তিনি এইসব বিষয়ে অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও দক্ষ ছিলেন। প্রুফ রিডিং বাদে বাকি সবকিছু আমি শিখেছিলাম নেভেল দা'র কাছ থেকে। নেভেল'দা আমাকে সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন পুরান ঢাকার বাবুবাজারস্থ নূরপুর আর্ট প্রেসে। প্রথম দিনে সেই প্রেসে যাবার সময় নেভেল'দা ও আমার সাথে পিউস দিলীপ কস্তাও ছিল। প্রুফ রিডিং করাটা আমি শিখেছিলাম পিউস দিলীপ কস্তার কাছ থেকে। নূরপুর আর্ট প্রেসের জসিম ভাইয়ের কথা আজও মনে পড়ে। তিনিও আমাকে প্রেস-সংক্রান্ত অনেক কিছু শিখিয়েছিলেন।

এইবার একটা পারিবারিক বিষয় লিখি। নেভেল'দা তখন পান্থপথের শমরিতা হাসপাতালে বসতেন। একবার আমাদের ছোট মেয়ে শ্রেয়ার গলায় আটকে যাওয়া মাছের কাঁটা খুলতে ডা. প্রাণ গোপালের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি তখন বসতেন শমরিতা হাসপাতালের অনতিদূরে। আমাদের সিরিয়াল ছয়/সাত জনের পরে হওয়াতে অপেক্ষা করছিলাম। চার বছরের শ্রেয়া ব্যথায় জোরে জোরে কাঁদছিল। তার কান্না দেখে সামনের সিরিয়ালের অপেক্ষমাণ সকলে আমাকে বললেন, আপনি আপনার মেয়েকে আমাদের আগেই দেখাতে নিয়ে যান। তাদের এই সহানুভূতি ও আন্তরিকতার জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি শ্রেয়াকে নিয়ে সিরিয়াল ভেঙ্গে ডাক্তারের কক্ষে ঢুকে নমস্কার দিতেই ডাক্তার মহোদয় জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি ঢুকেছেন কেনো? আপনার সিরিয়াল তো আরো পরে, তাই না?" আমি বিনয়ের সাথে বললাম, "মেয়ে ব্যথায় কাঁদছে, তাছাড়া আমার আগে যারা সিরিয়ালে ছিলেন তারা সকলে আমাকে আগে আসতে বলেছেন...।" আমার কথা শেষ করতে না দিয়ে ডাক্তার মহোদয় বললেন, "আপনি আপনার মেয়েকে নিয়ে রুম হতে বের হয়ে যান, সিরিয়াল ধরে আসবেন, কিছুক্ষণ কাঁদলে আপনার মেয়ে মারা যাবে না।"

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে ছিলাম। তারপর সেখান হতে বের হয়ে সোজা চলে এসেছিলাম শমরিতা হাসপাতালে। সেখানে আউটডোরের ডাক্তার তৎক্ষণাৎ শ্রেয়াকে নিয়ে গেলেন অপারেশন থিয়েটারে। অপারেশন থিয়েটারে কর্তব্যরত ডাক্তার কালবিলম্ব না করে শ্রেয়াকে যত্নসহকারে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে অনেকগুলো লাইটের সুইচ একসাথে অন্ করে দিল। একসাথে এতবেশী আলো ঝলে উঠার আকস্মিকতায় শ্রেয়ার কান্না থেমে গেলে ডাক্তার মহোদয় বললেন, "বড় হা করো তো, মামনি।" কাঁটাটা গলার বেশ ভেতরের দিকে থাকায় বের করতে বেশ কয়েক মিনিট সময় লেগেছিল। কাঁটা বের করা শেষে অর্ধেক গ্লাস পানি খেয়ে শ্রেয়া বললো, "আমার গলায় আর কাঁটা নাই। আমি বাসায় যাবো।" তবে ডাক্তার মহোদয় বললেন, "আর একটু থাকতে হবে, একটা ঔষধ খেতে হবে।"

অপারেশন থিয়েটার থেকে বের হবার আগেই নেভেল'দা এসে হাজির। আমি এখানে লিখিনি যে, হাসপাতালের আউটডোরে আমি জানতে চেয়েছিলাম ডা. নেভেল আছেন কী না। তারা বলেছিলেন-আছেন। আমি খবর দিতে বলিনি। তাদের কেউ নিজে থেকে খবর দিয়েছিলেন। নেভেল'দা বললেন, "আমি খবর পেয়েছি তুমি মেয়েকে নিয়ে এসেছো। সভাকক্ষে সভাতে থাকায় আসতে কিছুটা দেরি হলো। তবে ফোনে আমি ডাক্তারকে বলে দিয়েছিলাম তাড়াতাড়ি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে।" নেভেল দা'কে ধন্যবাদ দিয়ে হাসপাতালের বিল পরিশোধ করতে আমার অগ্রসর হওয়া দেখে নেভেল'দা বললেন, "আলো তোমাকে কিচ্ছু দিতে হবে না, আমি সেটা দেখবো, আমি ইতোমধ্যে হিসাব বিভাগে বলে দিয়েছি, তুমি এখন মেয়েকে নিয়ে বাসায় যাও।" কী আর করা, নেভেল দা'র কথা তো মানতেই হয়, সবসময় মেনেছি। এইভাবে আরো অনেকের হাসপাতালের বিল নেভেল'দা দিয়ে দিয়েছেন, আমার তা জানা আছে।

লেখাটি শেষ করার আগে আরো কয়েকটি বাক্য না'হয় লিখি। নেভেল'দা যখন বিভিন্ন সভা-সমাবেশে কথা বলতেন তখন অবাক হয়ে তাকিয়ে ভাবতাম, কী তাঁর সাহস- স্পষ্ট উচ্চারণে সত্য বলার; কী কঠোর তাঁর আদর্শ-নিরপেক্ষ ও নিঃস্বার্থভাবে ন্যায়ের পক্ষে থাকার; ও কী বলীয়ান তাঁর প্রতিবাদ- অন্যায়, অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে। তার মতো কঠোর সমালোচনাকারী, ব্যতিক্রমী চিন্তাধারী, দূরদর্শী, আত্মপ্রত্যয়ী, স্বাধীনচেতা, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, গভীর পর্যবেক্ষণকারী, ও প্রগতিশীল সমাজ রূপান্তরকারী মানুষ আমি আমার আশেপাশে আর দেখিনি। তিনি ছিলেন অনবদ্য ও অনন্য। তার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

আত্মবিশ্বাসে আলোকিত জীবন

দোলন যোসেফ গমেজ

জীবনকে সরল রেখায় দেখা কখনোই সহজ নয়। কারণ মানুষের জীবন নানা রঙে রঙিন–দুঃখ, কষ্ট, হাসি, আনন্দ, কান্না–সব মিলিয়ে এক অপূর্ব মিশ্রণ। এই মিশ্রণের মধ্যে আছে ঝাল, টক, তেতো, মিষ্টি সব স্বাদ। আর এই বৈচিত্র্যই জীবনকে সুন্দর করে তোলে। কিন্তু আমরা অনেক সময় এই সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারি না। মনে করি, জীবন উদযাপন করতে বড় কিছু দরকার। অথচ সত্য হলো ছোট ছোট অর্জন, ছোট ছোট মুহূর্তই জীবনের আসল আনন্দের উৎস। এগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে উদ্‌যাপন করলেই জীবনকে সহজভাবে উপভোগ করা সম্ভব।

মানুষের জীবনে আত্মবিশ্বাস একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। আত্মবিশ্বাস মানুষকে এগিয়ে যেতে পথ দেখায়, অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু অনেকেই "পাছে লোকে কিছু বলে বা পাশে লোকে কিছু বলে" এই ভেবে থেমে যান। এই ভয় তাদের সফলতার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে। সফল মানুষ সবসময় নিজেকে প্রশ্ন করে, নিজের যোগ্যতা ও দুর্বলতা খুঁজে বের করে। আত্মসমালোচনার মাধ্যমে উন্নতির পথ খুঁজে নেয়। তার মধ্যে থাকে ইতিবাচক মনোভাব। কারণ সফলতা বা ব্যর্থতার কোনো নির্দিষ্ট মাপকাঠি নেই। কে কতটুকু সফল বা ব্যর্থ তা নির্ভর করে নিজের সন্তুষ্টি ও মানসিক অবস্থার ওপর। যদিও মানুষ বিভিন্ন পরিমাপক দিয়ে মানুষের সফলতা ব্যর্থতা মাপার চেষ্টা করে। ইতিবাচক জীবন যাপনের মাধ্যমে আত্মতুষ্টি হওয়া উচিত জীবনের সফলতার পরিমাপক। তাই অন্যের কথায় নিজের পথ পরিবর্তন করা কখনোই উচিত নয়। জীবনে সফলতা বা ব্যর্থতার কোনো নির্দিষ্ট মাপকাঠি নেই। নিজের বিবেক ও মূল্যবোধ আমাদের শেখায় কীভাবে সন্তুষ্ট থাকতে হয় এবং ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যেতে হয়।

জীবনে নানা পরিস্থিতি আসে যেখানে বাইরের চাপ, সামাজিক মতামত বা অন্যের প্রভাব আমাদের বিভ্রান্ত করতে পারে। বিবেক ও বোধশক্তি জাগ্রত থাকলে আমরা সঠিক-ভুলের পার্থক্য বুঝে নিজের সিদ্ধান্ত নিতে পারি। মূল্যবোধ মানুষকে নৈতিক পথে চলতে শেখায়। এটি আমাদের চরিত্র গঠন করে এবং অন্যদের সঙ্গে বিশ্বাসযোগ্য সম্পর্ক তৈরি করতে সাহায্য করে।

যখন আমরা নিজের বিবেক ও মূল্যবোধের ওপর ভরসা করি, তখন বাইরের সমালোচনা বা নেতিবাচক প্রভাব আমাদের পথ পরিবর্তন করতে পারে না। এটি আত্মবিশ্বাসকে দৃঢ় করে। একজন সচেতন মানুষ তার পরিবার ও সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। বিবেক ও বোধশক্তি জাগ্রত থাকলে আমরা সবসময় অন্যদের প্রতি সম্মান, সহমর্মিতা ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারি। নিজের বিবেক, মূল্যবোধ ও বোধশক্তিকে জাগ্রত রাখা সবচেয়ে জরুরী কারণ এগুলোই মানুষের জীবনের মূল দিকনির্দেশক শক্তি। বিবেক, মূল্যবোধ ও বোধশক্তি হলো সেই অভ্যন্তরীণ কম্পাস যা আমাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সঠিক পথে পরিচালিত করে। এগুলো হারিয়ে গেলে মানুষ সহজেই অন্যের প্রভাব, লোভ বা ভয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে ভুল পথে চলে যেতে পারে।

সফলতা অর্জনের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। ভয়, সংকোচ, দ্বিধা–এসব বিষয় বিবেচনায় রাখা দরকার, কারণ এগুলো সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। তবে সমাজে একটি বড় সমস্যা হলো–যারা নিজের জীবনে সফল হতে পারেনি, তারা অন্যকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করে। পেছন থেকে টেনে ধরে রাখতে চায়। এই নেতিবাচক মনোভাবের উৎপত্তি অনেক সময় পরিবার থেকেই হয়। পরিবারে যদি নেতিবাচক চিন্তাধারার মানুষদের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তারা পরবর্তীতে সমাজে ও রাষ্ট্রে নেতিবাচক পরিবেশ তৈরি করে। তাই পেছনের টানাটানি যেন আমাদের এগিয়ে যাওয়ার গতি থামিয়ে না দেয়। বরং কিছুক্ষণ থেমে দ্বিগুণ উৎসাহে সামনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে সর্বদাই।

আমাদের উচিত আশেপাশের সফল মানুষদের জীবন বিশ্লেষণ করা। তাদের শক্তির উৎস কী, তা জানা। নেতিবাচক মানুষদের থেকে দূরে থাকা একটি কৌশল হতে পারে, তবে একমাত্র কৌশল নয়। নিজের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলা এবং তা অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া আরেকটি কার্যকর কৌশল। কারণ সফলতা ও ব্যর্থতার হিসাব সহজে মেলানো যায় না। ইতিবাচক চেষ্টা থাকলে মানুষ কখনো পুরোপুরি ব্যর্থ হয় না। আবার কেউ চাইলেই টানা সফলতা ধরে রাখতে পারে না। কারণ পারিপার্শ্বিক অনেক বিষয় সফলতা ও ব্যর্থতার পেছনে ভূমিকা রাখে।

ছোট ছোট সফলতা উদ্‌যাপন করুন। নিজের আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলুন। মনে রাখুন, কাছের মানুষরা যেমন আপনার সফলতায় ভূমিকা রাখে, তেমনি ব্যর্থতার কারণও হতে পারে। তারা নিরুৎসাহিত করবে, ভয় দেখাবে। তাই একমাত্র আপনার আত্মবিশ্বাসই আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে।

প্রতিটি পিতা-মাতার উচিত সন্তানদের ইতিবাচক পরিবেশে গড়ে তোলা। তাদের সামনে নেতিবাচক আলোচনা বা সমালোচনা না করা। সবসময় উপদেশ বা শাসন করার চেষ্টা না করে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিন। এতে তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। নিজের ব্যর্থতার দায় অন্যের ওপর চাপানো শুধু বোকামি নয়, এটি অপরাধ। পরিবারে আনন্দ উপভোগ করুন, ছোট ছোট সফলতা একসাথে উদযাপন করুন। এতে পরিবারের সব সদস্যের সম্মিলিত আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠবে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো পরিবারের কনিষ্ঠতম সদস্যকে সম্মান দেওয়া। এতে তার আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং সে বড়দের সম্মান করার সংস্কৃতিতে বেড়ে উঠবে। অনেকের ধারণা, পরিবারে শুধু বড়রাই সম্মান পাওয়ার যোগ্য। ছোটরা সবসময় বকাবকি ও চাপের মধ্যে থাকবে। এটি সম্পূর্ণ ভুল চিন্তা। ছোটদের শিক্ষা দেওয়া ও শাসনের পাশাপাশি তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিলে পরিবার ও সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। যখন শিশুদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, তারা বুঝতে পারে যে তাদের চিন্তা ও ধারণার মূল্য আছে। এটি তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায়, যা ভবিষ্যতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। পরিবারের ছোট সদস্যদের মতামত শোনা মানে তাদের সম্মান করা। এতে তারা শিখে যে সম্মান পারস্পরিক বিষয়। এই সংস্কৃতি সমাজে ছড়িয়ে পড়লে সহমর্মিতা ও সহযোগিতা বাড়ে। শিশুদের মতামত গ্রহণ করলে তারা নতুন ধারণা দিতে উৎসাহিত হয়। এতে তাদের সৃজনশীলতা বাড়ে এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা গড়ে ওঠে, যা সমাজে উদ্ভাবনী চিন্তার প্রসার ঘটায়। মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া মানে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সুযোগ দেওয়া। এটি শিশুদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ গড়ে তোলে, যা সমাজে ন্যায়বিচার ও সমতার ভিত্তি শক্ত করে। সন্তানকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলার দায়িত্ব পিতা-মাতার। তাকে জীবনের বাস্তবতা দেখতে দিন। নিজেকে সন্তানের সামনে ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করুন। নিজের জন্য সময় দিন, নিজেকে সম্মান করুন। তবে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ভালো নয়। এটি মানুষকে অহংকারী করে তোলে। তবে সামান্য অহংকার আত্মবিশ্বাসের ভিত্তিকে মজবুত করে।

জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে ইতিবাচক চিন্তা ও আত্মবিশ্বাসের চর্চা করা জরুরী। কারণ এই দু'টি শক্তি মানুষকে শুধু সফলতার পথে নিয়ে যায় না, বরং তাকে ব্যর্থতার ভয় থেকে মুক্ত করে। মনে রাখবেন, জীবন উদ্‌যাপনের জন্য বড় কোনো আয়োজনের দরকার নেই। ছোট ছোট আনন্দ, ছোট ছোট অর্জনই জীবনের আসল সৌন্দর্য। তাই আজ থেকেই শুরু করুন - নিজেকে ভালোবাসুন, নিজের যত্ন নিন, নিজের পরিবারকে আগলে রাখুন। জীবনের প্রতিটি ছোট সফলতা উদ্‌যাপন করুন। দেখবেন, জীবন অনেক সহজ হয়ে গেছে। নিজেকে ক্ষুদ্রতার সীমায় আবদ্ধ না রেখে বৃহত্তর সম্ভাবনার স্রোতে নিজেকে নিমজ্জিত করুন। মনে রাখবেন মানুষের সামর্থ্যর তুলনায় তার স্বপ্ন কিন্তু অনেক বড় হয়। আর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজন আত্মবিশ্বাস। আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ জীবন সব সময় সফলতায় আলোকিত ও গৌরবান্বিত হয়।

বৃদ্ধি-উন্মুখ মানসিকতা জীবনে নিয়ে আসবে সুখ ও শান্তি

উইলিয়াম জেরিয়েল

আবার একটি বছর ঘুরে ফিরে এলো বড়দিন। আমরা প্রতিবছর আনন্দের সাথে অপেক্ষা করি এই দিনটির জন্য। কেননা আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্ট এইদিনে আমাদের পাপ থেকে মুক্তি দিতে পাপময় পৃথিবীতে এসেছেন। ক্রিসমাস আমাদের জীবনে আসে আলো, শান্তি, ভালোবাসা ও নতুন আশার বার্তা নিয়ে। গির্জার ঘন্টাধ্বনি, মোমবাতির আলো, পরিবার-পরিজনের হাসিমুখ–সব মিলিয়ে ক্রিসমাস যেন আত্মার বিশ্রাম ও হৃদয়ের উন্মুক্তির সময়। কিন্তু এই আনন্দকে সত্যিকার অর্থে অনুভব করতে হলে শুধু বাহ্যিক উদ্‌যাপন নয়, প্রয়োজন একটি ইতিবাচক মানসিকতা–যাকে আজকের ভাষায় বলা হয় গ্রোথ মাইন্ডসেট।

আমাদের জীবনে সুখ অনেকটাই নির্ভর করে আমরা কিভাবে ভাবি, কিভাবে দেখি, এবং চ্যালেঞ্জের সামনে কেমন প্রতিক্রিয়া করি তার উপর। তাই ক্রিসমাসের সময়টিকে আমরা চাইলে নিজের ভেতর নতুন মানসিকতার আলো জ্বালানোর সুযোগ হিসেবে নিতে পারি।

স্থির মানসিকতা বনাম বৃদ্ধি-উন্মুখ মানসিকতা: মানুষ সাধারণত দুই ধরনের মানসিকতার মধ্যে বাস করে–স্থির মানসিকতা (Fixed Mindset) এবং বৃদ্ধি-উন্মুখ মানসিকতা (Growth Mindset)

১. স্থির মানসিকতা: এই মানসিকতায় মানুষ বিশ্বাস করে– আমি যেমন আছি তেমনই থাকবো। ক্ষমতা জন্মগত। আমার ভুল মানেই আমি ব্যর্থ। এই মানসিকতা ভয়, আত্ম-বিশ্বাস ও হতাশা তৈরি করে।

২. বৃদ্ধি-উন্মুখ মানসিকতা: এই মানসিকতা বলে– আমি শিখতে পারি। চেষ্টা ও পরিশ্রমেই উন্নতি আসে। ভুলই শেখার দরজা খুলে দেয়।

এভাবেই মানুষ বেড়ে ওঠে, আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলে এবং সত্যিকার সুখকে ধারণ করে। ক্রিসমাস আমাদের শেখায়–যিশু যেভাবে বিনম্রতা, ধৈর্য ও ভালোবাসার পথ দেখিয়েছেন, সেভাবে আমরাও নিজের সীমাবদ্ধতার গণ্ডি ভেঙে উঠতে পারি। জন্মগত গুণ নয়, অর্জিত গুণই আমাদের এগিয়ে নেয়। অনেকেই মনে করেন কারো সাফল্য শুধু প্রতিভার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু বাস্তবে নেতৃত্ব, যোগাযোগ, ধৈর্য, সহমর্মিতা–এসবই শেখা যায়। এই উপলব্ধি আমাদের মনকে মুক্ত করে। ক্রিসমাস আমাদের স্মরণ করায়, ঈশ্বরের ভালোবাসা সকলের জন্য উন্মুক্ত, ঠিক তেমনই উন্নতির পথও সকলের জন্য খোলা। শুধু প্রয়োজন সঠিক মানসিকতা। পরিচয় নয়, মনোভাব বদলান। আমরা নিজেদের সম্পর্কে এমন অনেক কথা বিশ্বাস করি যা আমাদের থামিয়ে রাখে– আমি আত্মবিশ্বাসী নই, আমি কখনো পারবো না, এটা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। এগুলো আসলে পরিচয় নয়, শুধুই একটা দৃষ্টিভঙ্গি। গ্রোথ মাইন্ডসেট আমাদের শেখায়–পরিচয় বদলে দিতে হয় না, বরং সেই পরিচয়ের প্রতি বিশ্বাসটাই বদলাতে হয়। ক্রিসমাসের আলোয় নিজের কাছে

প্রতিজ্ঞা করা যেতে পারে– আমি শেখার পথে আছি, আমি প্রতিদিন আরও ভালো হচ্ছি। ক্ষমতা বাড়ে চর্চা ও প্রতিক্রিয়ায়। মানুষের মস্তিষ্ক নতুন দক্ষতা শেখার সঙ্গে সঙ্গে নতুন সংযোগ তৈরি করে। অর্থাৎ চর্চা, ধৈর্য ও সঠিক প্রতিক্রিয়া আমাদের ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে।

ইমোশনাল বনাম কগনিটিভ ফিডব্যাক: ইমোশনাল ফিডব্যাক: তুমি ব্যর্থ... তুমি পারবে না। ভয় তৈরি করে, মন সংকুচিত করে।

কগনিটিভ ফিডব্যাক: এই পদ্ধতিটা বদলালে আরও ভালো হবে। শেখার সুযোগ তৈরি করে।

এই কগনিটিভ বা বাস্তবভিত্তিক প্রতিক্রিয়াই সুখী মানসিকতা গড়ে দেয়। সুখ মানে মানসিকতার রূপান্তর। সুখ আসে তখনই, যখন আমরা বিশ্বাস করি–ভুল থেকে শিখতে পারি, চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারি, আর প্রতিদিন একটু একটু করে উন্নতি করতে পারি। ক্রিসমাস তাই শুধু উৎসব নয়, বরং মনকে নতুনভাবে সাজিয়ে নেওয়ার সুযোগ। নিজেকে বোঝা ও নিজের প্রতি দয়া করা। গ্রোথ মাইন্ডসেট আমাদের শেখায় নিজের দুর্বলতা বিশ্লেষণ করতে, কিন্তু নিজেকে দোষারোপ করতে নয়। ক্রিসমাসের সময় আমরা যেমন অন্যের প্রতি ভালোবাসা দেখাই, তেমন নিজের প্রতিও ভালোবাসা দেখানো জরুরি। নিজেকে বলুন– আমি সময় নিয়ে শিখি, আমি উন্নতি করছি, ঈশ্বর আমার সঙ্গে আছেন। আজীবন শেখার যাত্রা, ক্রিসমাস যিশুর শিক্ষার মূল বার্তা দেয়–জীবন হলো করুণা, শিক্ষণ ও পরিবর্তনের পথ। গ্রোথ মাইন্ডসেট ঠিক এই পথের সঙ্গী। যে মানুষ শেখা থামায় না, সে কখনো জীবনে থেমে যায় না। প্রশংসার ভাষা বদলান, আমরা অনেক সময় শিশু বা সহকর্মীকে বলি–তুমি খুব ভালো, তুমি খুব বুদ্ধিমান। কিন্তু এভাবে নয়, বরং বলতে হবে– তুমি খুব চেষ্টা করেছো। তোমার পরিশ্রম ফল দিচ্ছে। তুমি হাল ছাড়োনি, এজন্য গর্বিত।

এইভাবে প্রশংসা করলে সবার ভেতর গড়ে ওঠে আত্মবিশ্বাস, তৃপ্তি ও দীর্ঘস্থায়ী সুখ।

ভিন্ন মানসিকতা: আলান ডোনাল্ড ও মেহেদি মিরাজের মানসিকতার দুই রূপ ক্রীড়া জগতে আমরা দেখি। অ্যালান ডোনাল্ড ছিলেন প্রতিভাবান, কিন্তু চাপের মুখে মন ভেঙে যেত। অন্যদিকে মেহেদি হাসান মিরাজ ধৈর্য, শেখার আগ্রহ, ব্যর্থতা থেকে উঠে দাঁড়ানোর শক্তি, ইতিবাচক মানসিকতা। তিনি দেখিয়েছেন মানসিকতাই একজনকে বড় করে তোলে। ক্রিসমাস আমাদের ভেতরের আলো জ্বালানোর উৎসব ক্রিসমাসের আনন্দ শুধু ঘর সাজানো, কেক কাটায় নয়। আসল আনন্দ তখনই আসে, যখন আমরা নিজের মানসিকতা বদলাই– স্থির থেকে বৃদ্ধি-উন্মুখ, ভয় থেকে ভালোবাসায়, হতাশা থেকে আশায়। চলুন এই ক্রিসমাসে নিজের ভেতরে নতুন আলো জ্বালাই– শেখার আলো, ধৈর্যের আলো, ভালোবাসার আলো। আর প্রতিজ্ঞা করি আমি আজ ভালো, আগামীকাল আরও ভালো হবো।

তথ্যসূত্র:

1. International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)

2. Growth Mindset: Change Now for Future Success — Phranakhon Rajabhat University

3. IJRAR (International Journal of Research and Analytical Reviews)

4. "মনের শক্তি উন্মোচন: আত্মবিশ্বাস, সাফল্য ও সুখ" – LK INNOVATE

5. বিডিনিউজ-২৪ ("কর্মক্ষেত্রে 'গ্রোথ মাইন্ডসেট'")

শুভ বড়দিন ও নববর্ষ

সবার জীবনে বয়ে আনুক
আনন্দধারা
শান্তিময় হোক
সারা বিশ্ব

নির্মল গমেজ
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি-১৯৮৪
USA
প্রবাসী বেঙ্গলী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন ইন্‌ক

তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম, তুমি রবে নীরবে ...

প্রয়াত রবার্ট গমেজ (আদি)
জন্ম: ১৬ জানুয়ারি, ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ
গোল্লা ধর্মপল্লী, ঢাকা
মৃত্যু: ২৯ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
নিউজার্সি, ইউএসএ

প্রয়াত এলিজাবেথ শেফালী গমেজ
জন্ম: ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ
গোল্লা ধর্মপল্লী, ঢাকা
মৃত্যু: ২৯ অক্টোবর, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ
নিউজার্সি, ইউএসএ

মা তুমি জন্মেছিলে অতৃপ্তি নিয়ে, চলেও গেলে অতৃপ্তি নিয়ে। তোমাকে হারিয়েছি বেশ বেলা হলো। **২৯টি** বছর পার হয়ে গেলেও, মা তুমি আমাদের সকলের হৃদয় মাঝে গেঁথে আছো। মা তুমি চলে যাবার পর আমাদের একমাত্র **ভরসা** বাবাই আমাদের পরিবারের সবাইকে অতি যত্নে আগলে রেখেছিলেন। সেই **ভরসাও;** আমাদের প্রাণপ্রিয় **বাবা** সবাইকে একা রেখে চলে গেলেন ২৯ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে।

বাবা ও মা তোমাদের মৃত্যুকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়ে তোমাদের অনুপস্থিতি আমাদের সকলের জীবনে প্রতি মুহূর্তে হৃদয়ে কড়া নাড়ে। তোমরা দু'জনেই আমাদের চোখের সামনেই ছিলে, আছো আর থাকবে।

ব্যক্তি জীবনে আমাদের বাবা ও মা অত্যন্ত সৎ, ধর্মভীরু, সদালাপী, বন্ধুবৎসল এবং পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। স্বর্গ থেকেও তোমরা তোমাদের রেখে যাওয়া পরিবার এবং সবাইকে আশীর্বাদ করো যেন তোমাদের আদর্শে আমরা সামনের পথে এগিয়ে চলতে পারি। প্রার্থনা করি পরম পিতার কাছে, তোমরা শান্তিতে বিশ্রাম করো।

সবাইকে শুভ বড়দিন ও নববর্ষের শুভেচ্ছা।।

ফাদার স্ট্যানলী, জেমস-সুইটি, জেভিয়ার-তুলি, অলড্রিন-ন্যান্সি, জুয়েল-লতা, মাইকেল-মনি, নোয়েল-চৈতী।
নাতী ও নাতীন : মোহনা, সৌরভ, খ্রীষ্টফার, এ্যান্ড্রিয়া, জোয়ানা, যোনাথন, এইডেন, এ্যান্টনী ও ব্র্যান্ডন গমেজ (আদি)।
New Jersey, USA

১১তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত পারুল ডরোথি গমেজ

স্বামী : প্রয়াত খ্রীষ্টফার গমেজ
জন্ম : ১৬ মার্চ, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
পারুল ভিলা, ৩০/১ পূর্ব রাজাবাজার
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

প্রিয় মা, তুমি আমাদের মাঝে নেই এ কথা যেন বিশ্বাস করতে আজও কষ্ট হয়। তোমার প্রতিটা কাজ, তোমার স্পর্শ আমাদের আজও ঘিরে রেখেছে। আমাদের মা ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ, স্নেহশীল, কর্তব্যনিষ্ঠ, সাহায্যকারিণী, ঈশ্বর নির্ভরশীলা নারী। মানুষের দুঃখ-কষ্ট অনুভব করে, নীরবে-নিভৃতে থেকে তিনি অন্যকে সাধ্যমত সহযোগীতা করেছেন। তার শুভানুধ্যায়ীরা এখনো আমাদের মাকে স্মরণ করেন।

আমাদের মা মিসেস পারুল ডরোথি গমেজ ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রভুর কোলে আশ্রয় নেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর।

মা, দেখতে দেখতে তোমাকে ছাড়া পার হয়ে গেল ১১টি বছর। সর্বদা মনে হয় আমাদের কাছেই আছো। আমাদের বিশ্বাস, তুমি স্বর্গীয় পিতার আশ্রয়ে পরম শান্তিতে আছো এবং আমাদের আশীর্বাদ করছো।

তোমার আত্মার শান্তি কামনায়

ছেলে ও ছেলে-বৌ : বাবু মার্কুজ গমেজ-মার্সিয়া মিলি গমেজ
মেয়ে ও মেয়ে-জামাই : আলো, জ্যোৎস্না-অজিত, উজ্জলা-তপন
নাতি : অভিষেক ইম্মানুয়েল সি. গমেজ
নাতনী ও নাত-জামাই : ডায়না-মার্টিন, বৃষ্টি-ডেভিড, রাত্রি, স্বপ্ন, সৃষ্টি, বিস্ময়, স্পর্শ
পুতি : কাব্য, অনিক, আনন্দ ও টাইগো

প্রতিবেশী'র সকল পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি রইল
শুভ বড়দিন ও আসন্ন নব-বর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

খ্রীষ্টফার নিকোলাস গমেজ (আদি)

আমাদের সন্তান খ্রীষ্টফার নিকোলাস গমেজ (আদি) গত ১৮ মে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে Rutgers University, New Jersey হতে Public Health - এর উপর Undergraduate Degree লাভ করেছে। বর্তমানে খ্রীষ্টফার একই University হতে Public Policy-র উপর Masters এ অধ্যয়নরত আছে।

আমরা খ্রীষ্টফারের সকল শিক্ষক-মণ্ডলীর প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই এবং সেই সাথে ঈশ্বরের কাছে তার সকল কৃপার জন্য অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

শুভেচ্ছান্তে –
জেমস্ ও জ্যাকুলীন সুইটি গমেজ (আদি)
এবং সন্তানগণ
এলিজাবেথ মনিকা ও খ্রীষ্টফার নিকোলাস গমেজ (আদি)
Bayonne, New Jersey, USA

Merry Christmas 2025 and Happy New Year 2026 to all my family & friends! We also celebrated golden jubilee of Matrimony in January, 2025! What a blessing of Jubilee Year!

Col. Joseph Anil Rozario (Ret)
& Mary Monica Palma!

'ওরা মহা ঘুমে ঘুমিয়েছে
ডাকিস নে রে আর।
কান্না রেখে মহা যাত্রার
পথ করে দে সবার।'

মনে পড়ে তোমাদের অবিচ্ছেদ্য ভালোবাসা। তোমরা আমাদের ছেড়ে চলে গেছো না ফেরার দেশে। পৃথিবীর সকল স্নেহ, মায়া ও বন্ধন ছিন্ন করে পিতার চরণে ঠাই নিয়েছো। তোমাদের আমরা ভুলি নাই, তোমাদের সরলতা, হাসিমাখা মুখ আমরা ভুলতে পারিনা।

আমরা পরিবারের সবাই তোমাদেরকে প্রার্থনায় স্মরণ করি। আমরা বিশ্বাস করি তোমরা স্বর্গেই আছো।

আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করো আমরা যেন তোমাদের শেখানো পথেই চলতে পারি। তোমরা ওপারে ভালো থাকো। শান্তিতে বিশ্রাম করো। প্রার্থনা করি পরম করুণাময় ঈশ্বর যেন তোমাদের চির শান্তি দান করেন।

তোমাদের প্রিয়জনেরা
পরিবারবর্গ

প্রয়াত যোয়াকিম গমেজ
ছোট গোল্লা
ভূরার বাড়ী

প্রয়াত ফিলোমিনা গমেজ
ছোট গোল্লা
ভূরার বাড়ী

প্রয়াত টমাস মজুমদার
গ্রাম: হাসনাবাদ
মজুমদার বাড়ী

হৃদয়ে তোমরা অমর

প্রয়াত যোসেফ রোজারিও
জন্ম : ৪ মার্চ, ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ
স্থান : দরীর বাড়ি, মোলাশীকান্দা, ঢাকা

প্রয়াত শিশিলিয়া রোজারিও
জন্ম : ৫ মার্চ, ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৭ মার্চ, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
স্থান : দরীর বাড়ি, মোলাশীকান্দা, ঢাকা

প্রয়াত বেনজামিন রোজারিও
জন্ম : ১৯ জুলাই, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ
স্থান : দরীর বাড়ি, মোলাশীকান্দা, ঢাকা
মৃত্যু : ২০ ডিসেম্বর, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
স্থান : বেওন, নিউ জার্সি, ইউএসএ

প্রয়াত ইউফ্রেজী রেনু রোজারিও
জন্ম : ২৯ আগস্ট, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৪ আগস্ট, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
স্থান : দরীর বাড়ি, মোলাশীকান্দা, ঢাকা

কালের আবর্তে দেখতে দেখতে **১০টি বছর** পেরিয়ে গেল তোমরা আমাদের ছেড়ে হারিয়ে গেলে সেই অনন্তের অসীম নীলিমায়। কিন্তু তোমাদের অনিন্দ সুন্দর সদাহাস্য মুখগুলো অফুরন্ত ভালোবাসা, কতশত সুখময় স্মৃতি, তোমাদের জীবন আদর্শ আমাদের হৃদয়ে চির অম্লান থেকে তোমাদের শূন্যতা ও অভাবকে একটি পুরোপুরি সম্পূর্ণতা দিয়ে ভরে রেখেছে এবং অনুপ্রাণিত করছে অকুতোভয়ে জীবন পথে চলতে। এ এক অবর্ণনীয় সুখময় বেদনার অনুভূতি।

তোমরা তো আমাদের হৃদয়াকাশে তারা হয়ে নিত্য দীপ্যমান। তোমাদের কি ভোলা যায়?

আমরা বিশ্বাস ও প্রার্থনা করি যে তোমরা ঈশ্বরের বাগানে সেরা ফুল হয়ে তার একান্ত সান্নিধ্যে পরম আনন্দে আছ। আমাদের জন্য প্রার্থনা ও আশীর্বাদ কর যেন আমরা তোমাদের আদর্শে সর্বদা মিলে-মিশে আগামী দিনগুলো অতিবাহিত করে জীবন শেষে তোমাদের সাথে ঈশ্বরের রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

তোমাদের আত্মার চির শান্তি কামনা করি।

শোকার্ত পরিবারবর্গ

শান্তিভবন

বেওন, নিউ জার্সি, আমেরিকা।

প্রয়াত পিটার গমেজ
জন্ম : ২ ডিসেম্বর, ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ
স্থান : কাজীর বাড়ি, বক্সনগর, ঢাকা
মৃত্যু : ৬ এপ্রিল, ২০০২ খ্রিস্টাব্দ
স্থান : জার্সি সিটি, নিউ জার্সি, ইউএসএ

প্রয়াত আইরিন গমেজ
জন্ম : ৭ জুলাই, ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৩ মে, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

Until We Meet Again, Irene and Peter Gomes

Those special memories of you
will always bring a smile
If only we could have you back
for just a little while
Then we could sit and talk again
just like we used to do do
you always meant so very much
and always will do too
The fact that you're no longer here
will always cause us pain
but you're forever in our hearts
until we meet again

With love,
Veronica, Manuel, Elizabeth, Teresa
and Christopher

যখন আবার হবে দেখা

তোমাদের সেই বিশেষ স্মৃতিগুলো
সর্বদা নিয়ে আসবে আনন্দ বয়ে
যদি পেতাম তোমাদেরকে কাছে
শুধু ক্ষণিকের তরে
তখন বসে আবারও গল্পগুজব করতাম
যেমন করতাম ঠিক আগের মত।
তোমরা যে সর্বদা ছিলে আমাদের কাছে
অনেক প্রিয় এবং থাকবেও তাই
প্রকৃতপক্ষে তোমরা যে আমাদের কাছে আর নেই
এটা ভেবে আমাদেরকে অনেক কষ্ট দেয়
কিন্তু তোমরা তো আছ সর্বদা আমাদের সাথে
যে পর্যন্ত না আবার দেখা হবে।

তোমাদেরই সন্তানেরা
ভেরোনিকা (শোভা), ম্যানুয়েল (বাবুল), এলিজাবেথ (সন্ধ্যা)
তেরেজা (জ্যোৎস্না) ও খ্রীষ্টফার (টিলু)

স্মৃতিতে তুমি অমর

আন্তনী জীবন গমেজ
জন্ম : ২৮ মার্চ, ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৬ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিগত ১৬ জানুয়ারি রোজ শনিবার ২০২১ খ্রিস্টাব্দে, আন্তনী জীবন গমেজ, এক স্নেহাশীষ পিতা, দাদু এবং এক প্রিয় মামা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর।
আন্তনী গমেজের জন্ম হয় ২৮ মার্চ, ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের পাবনা জেলায়। তিনি ছিলেন লাজারেস ও লুসি গমেজের পাঁচ সন্তানদের মধ্যে চতুর্থ। তিনি এলিজাবেথ লিওনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন ৫ জানুয়ারি, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে। ঈশ্বর তাদেরকে দুইজন মেয়ে-জেইন লুসি এবং জুন আইরিন এবং একজন ছেলে-কেনেথ লাজারেস দিয়ে আশীর্বাদ করেন।
আন্তনী সৌদি আরবে কয়েক বছর কাজ করেন। পরে ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের ৮ অক্টোবর অভিবাসন নিয়ে সপরিবারে আমেরিকায় চলে আসেন এবং অঙ্গরাজ্য নিউ জার্সির, জার্সি সিটিতে আজীবন বসবাস করেন। তিনি আরামাক কোম্পানীতে অবসর গ্রহণ পর্যন্ত কাজ করেন।
বড়দিনের সময় তিনি তার বিশিষ্ট কেক বানাতে এবং সেগুলো পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে বিলাতে খুব ভালবাসতেন। বাংলাদেশের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের দেখতে যেতে খুব পছন্দ করতেন এবং তাতে প্রচুর আনন্দ পেতেন।
আন্তনী ছিলেন একজন কর্মঠ, স্নেহশীল, সৎ, সাধারণ ও স্বল্পভাষী মানুষ কিন্তু স্বপ্ন ও প্রেমে ভরপুর। তিনি ছিলেন একজন স্নেহশীল পিতা ও আদর্শ স্বামী। তিনি এমন একটি শূন্যতা সৃষ্টি করে গেছেন যা কোনদিন পূরণীয় নয়।
আন্তনী গমেজ রেখে গেছেন তার স্ত্রী, তিন সন্তান, জামাতা, নাতি, ভাগ্নে-ভাগ্নি। আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যেন তাকে অনন্ত শান্তি দান করেন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
স্ত্রী : এলিজাবেথ গমেজ, মেয়ে : জেইন লুসি গমেজ, মেয়ে ও জামাতা : জুন আইরিন ও মহম্মদ আহমেদ
ছেলে : কেনেথ লাজারাস, নাতি : মার্চ

In Loving Memory of Anthony Jibon Gomes

প্রয়াত রোজবানার্ড গমেজ
জন্ম : ১ জানুয়ারি, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৩ জুলাই, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

Anthony Jibon Gomes, a loving father, grandfather and a beloved uncle, passed away on Saturday, January 16, 2021, at the age of 69.
Anthony was born on March 28, 1951, in the district of Pabna, Bangladesh. He was the fourth of late Lazarus and Lucy Gomes' five children. He married Elizabeth Leona on January 5, 1979. They raised two daughters- Jane Lucy and June Irene and a son - Kenneth Lazarus.
He worked in Saudi Arabia for several years. He then immigrated to the United States of America on October 8, 1988 and settled in Jersey City, New Jersey. He worked at Aramark till his retirement.
Anthony loved baking his signature cakes during Christmas and share them with the family, relatives and friends. He enjoyed visiting family and friends in Bangladesh and it filled him with great joy.
Anthony was very hardworking, loving, honest, simple and a man of few words but filled with dreams and love. He was a loving father and an ideal husband. He cared for the less fortunate and often donated. He has left a void that can never be filled.
Anthony is survived by his wife, three children, son-in-law, grandson, in-laws, nieces and nephews, his sister and hosts of friends.
May God grant Anthony eternal peace and happiness.

With love,
Elizabeth, Jane, June, Kenneth, Ahmed and Mars

চিরপ্রার্থনায়-চিরস্মরণে

প্রিয় বাবা বেঞ্জামিন গমেজ

জন্ম: ০১ জানুয়ারি ১৯৪০
মৃত্যু: ২১ ডিসেম্বর ২০২৪

বড়দিনের নীরব আকাশে
যখন তারা জ্বলে ওঠে,
আমরা খুঁজি তোমার মুখ–
আলোর ভেতর আলো,
শান্তির ভেতর শান্তি।

তুমি ছিলে ঘরের প্রার্থনা,
দুঃখের রাতে দীপশিখা,
অভাবের দিনে ছায়া।
নীরবে শিখিয়েছ ভালোবাসা–
প্রভুকে, মানুষকে, জীবনকে।

আজ তুমি নেই–
তবু তোমার আশির্বাদ
আমাদের বুকের ভিতর
ভরসা হয়ে থাকে।

প্রভুর জন্মোৎসবের এই পবিত্র
সময়ে
তোমার আত্মার চিরবিশ্রাম কামনায়–

"অনন্ত বিশ্রাম দাও, হে প্রভু,
চির আলোতে তাঁকে রাখো।"

শোকাহত পরিবার

স্ত্রী: শেফালী গমেজ

সন্তান ও নাতি-নাতনিগণ:

বুলবুল-কাঞ্চন, হ্যারি ও হৈমন্তী।
লিপি-রবার্ট ও বৃষ্টি।
রিচু-টুম্পা, অবন্তিকা, রিদিকা ও মনিকা।
মুক্তা-মিঠু ও ধ্রুব।
পান্না-মিল্টন ও অর্পিতা।

ঠিকানা: মুক্তাঙ্গন, ২৩১ পূর্ব কাফরুল, কাফরুল, ঢাকা ১২০৬, বাংলাদেশ।

শিক্ষাক্ষেত্রে বুলিং এর প্রভাব ও করণীয়

খ্রিষ্টফার কস্তা

শিক্ষালয় আমাদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। মূলত শিক্ষালয় থেকেই আমরা আমাদের জীবনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করি। তাই শিক্ষালয়ের পরিবেশ সুস্থ, সুন্দর ও নিরাপদ হবে এটাই আমাদের কাম্য। তবে আমরা আমাদের আশেপাশের ঘটনা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো নিরাপদ স্থান থেকেও ছাত্রছাত্রীরা হয়রানির শিকার হচ্ছে, যা আমাদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক।

The Perception of Students about School Bullying and How it Effects Academic Performance in Classroom – এই বিষয়কে কেন্দ্র করে অধ্যাপক রেমি এমবাহ, "Memorial University of Newfoundland", ২০২০ খ্রিস্টাব্দের, মে মাসে একটি জরিপে উদ্‌ঘাটন করেন, ৭৯.২ শতাংশ শিক্ষার্থী ইঙ্গিত করেছেন যে বুলিং তাদের শিক্ষাক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এছাড়া ৮.৩ শতাংশ শিক্ষার্থী ইঙ্গিত দিয়েছেন যে বুলিং তাদের শিক্ষাক্ষেত্রকে প্রভাবিত করেনি। যেখানে ১২.৫ শতাংশ শিক্ষার্থী নিশ্চিত নন যে বুলিং তাদের শিক্ষাক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে কিনা। উল্লেখিত গবেষণার আলোকে আমরা বলতে পারি যে, আমাদের মধ্যে বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর জীবন বাধাগ্রস্ত হতে পারে বুলিং এর নেতিবাচক প্রভাবে।

বুলিং কি?

ইংরেজি ভাষায় Bullying যার বাংলা প্রতিশব্দ হয়রানি করা। ইচ্ছাকৃত এবং তাৎক্ষণিক বিনোদনের উদ্দেশে একজন বা একদল শিক্ষার্থীর দ্বারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিক্ষার্থী প্রতিপক্ষের ওপর হিংসাত্মক বা আক্রমণাত্মক আচরণ করা এক ধরনের বুলিং। ক্লাসে বা শিক্ষালয়ে উৎপীড়নকারী বাকিদের সামনে ভুক্তভোগীকে হেনস্তা করে নিজেকে বড় করে হাজির করা বা শক্তি প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ভিকটিমকে হাসির পাত্র হিসেবে উপস্থাপন করাও এক ধরনের মানসিক ও সামাজিক উৎপীড়ন।

বুলিং নানা ভাবে হতে পারে। এর মধ্যে শারীরিক, মৌখিক, মানসিক, সাইবার, জাতিগত, যৌন হয়রানিমূলক– নানারকম বুলিং এর সাথে আমরা পরিচিত।

শিক্ষালয়ে বুলিং এর ধরন: অনেক ধরনের বুলিং রয়েছে, যা কখনো একজন শিক্ষার্থীর দ্বারা অপর শিক্ষার্থীর ওপর হয়, আবার কখনো শিক্ষক দ্বারা শিক্ষার্থীর ওপরও হতে দেখা যায়। এর ধরনগুলো হলো–

শারীরিক বুলিং : দৈহিক উৎপীড়নের মধ্যে রয়েছে আঘাত করা, থুতু ছিটানো, লাথি মারা, চিমটি দেওয়া এবং ধাক্কা দেওয়া। তাছাড়া একই ক্লাসে বা উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের দ্বারা অপ্রত্যাশিতভাবে শারীরিক বিভিন্ন স্পর্শ করা বা করার চেষ্টা করা, খারাপ ইঙ্গিত করা, বিভিন্ন আপত্তিকর স্থানে পানি ঢেলে দেওয়া ইত্যাদিও দেখা যায়।

বুলিংয়ের মানসিক প্রভাব: বুলিং এর শিকার শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। তারা নিজেদের অপরাধী ভাবতে শুরু করে এবং সমাজ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে থাকে। এছাড়া অমনোযোগিতা এবং ব্যক্তিত্বের উপর নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অনেক সময় বিষণ্নতা, খাওয়া-দাওয়ার অনিহা, আতঙ্ক এবং চরম অবস্থায় আত্মহত্যার চিন্তাও জন্ম নিতে পারে। এ ধরনের মানসিক অবস্থায় একজন শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক বিকাশে মারাত্মক বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভাব: শিক্ষার্থীরা যদি স্কুলে বা কলেজে প্রতিনিয়ত অপমানের শিকার হয় তবে তাদের পড়াশোনায় মনোযোগ নষ্ট হয়। তারা শিক্ষালয়ে যেতে অনীহা বোধ করে এবং ফলাফল খারাপ হতে শুরু করে। অনেক সময় লজ্জার কারণে তারা পড়াশোনা বাদ দিয়ে দেয়, যার ফলে তারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতে পারে।

সামাজিক এবং আচরণগত প্রভাব: বুলিং এর শিকার শিক্ষার্থীরা অনেক সময় সহপাঠীদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করতে ভয় পায়। যার ফলে তারা সমাজে সহজভাবে মেলামেশা করতে পারে না। পরবর্তীতে একাকিত্বে ভোগে এবং হীনমন্য হয়ে পড়ে যা তাদের আত্মহত্যাপ্রবণ করে তোলে। অন্যদিকে যারা বুলি করে তারা নিজেরাও ক্ষমতাশালী ভাবতে শুরু করে এবং ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

সাইবার বুলিং এর প্রভাব: সাইবার বুলিং সেন্টারের মতে, কম্পিউটার এবং অন্যান্য ইলেকট্রিক ডিভাইসের মাধ্যমে ক্ষতি করা হয়। নারী এবং শিক্ষার্থীরা এতে বেশি হয়রানির শিকার হচ্ছে বলে জরিপে জানা যায়। ক্লাসের ফেসবুক গ্রুপ বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভিকটিমের ব্যক্তিগত ছবি নিয়ে মজা করা, ছবি বা ভিডিও এডিট করে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি, সুপারইমপোজ ছবি, পর্নোগ্রাফি ছবি দিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করা বা ফেক আইডি তৈরি করা, ফোন নম্বর ছড়িয়ে দেওয়া, আপত্তিকর বার্তা, কিংবা ক্লাসের মেসেঞ্জার/হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে বের করে দেওয়া, নিয়মিত বাজে কমেন্ট করাও সাইবার বুলিং এর অন্তর্ভুক্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট রাউকুন নাহার বলেন, কিশোর-কিশোরীর ভার্চুয়াল বুলিং নিয়ে সোচ্চার হওয়া দরকার, কারণ সেখানে এক্সপোজ হওয়ার শঙ্কা বেশি।

বুলিং করার কারণ: অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য বা নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করার জন্য মূলত বুলিং করা হয়। সাধারণত তাৎক্ষণিক মানসিক সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীরা বুলিং এর আশ্রয় নেয়। যে ছাত্রছাত্রীরা বুলিংয়ের শিকার হয়েছে তারা অনেক সময় প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে অন্যকে বুলিং করার হার বেশি দেখা যায়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, শারীরিক গঠন যেমন লম্বা, খাটো, চশমা পরিহিত ব্যক্তি, স্থূলকায় ব্যক্তি বা ওজন কম, শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বুলিং এর শিকার বেশি হয়।

সমাধানে করণীয়: বুলিং প্রতিরোধে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটা কোন রোগ নয় যে চিকিৎসা করলে সমাধান হয়ে যাবে। স্কুলের শিক্ষক, কর্তৃপক্ষ, অভিভাবক এবং সমাজ মিলে সমন্বিতভাবে এই বুলিং সমস্যার সমাধান করতে হবে। ড. হেলাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, বুলিং প্রতিরোধে দায়িত্ব নিতে হবে বাবা-মা ও শিক্ষকদের। শুধু বুলিং এর শিকার হলেই শিশুর পাশে দাঁড়াবেন তা নয়, বরং নিজেদের শিশু যেন অপর শিশুকে বুলিং না করে সে ব্যাপারেও সতর্ক পদক্ষেপ নিতে হবে।

১) প্রথমেই করণীয় হচ্ছে, সন্তান স্কুলে পড়াশোনার পাশাপাশি সবার সঙ্গে মিশছে কি না, সেটা অভিভাবকদের নিয়মিত খোঁজ নিতে হবে। ক্লাসে মিশতে না পারলে কেন বা কোথায় সমস্যা হচ্ছে, জানার চেষ্টা করতে হবে এবং শ্রেণি শিক্ষকদের জানাতে হবে।

২) সন্তান যদি বন্ধু না বানাতে পারে তবে অন্তত যাতে মা-বাবার সঙ্গে সহজে কথা শেয়ার করতে পারে, সে রকম সম্পর্ক তৈরি করা উচিত।

(বাকি অংশ ৭৫ নং পৃষ্ঠায় পড়ুন...)

জেনারেশন

সাম্য টলেন্টিনু

"জেনারেশন" (Generation) বলতে সাধারণভাবে বোঝায় একটি নির্দিষ্ট সময়কালে জন্ম নেওয়া মানুষদের একটি দল বা প্রজন্ম। প্রকৃতপক্ষে জেনারেশন বলতে একেক সময়ের মধ্যে জন্ম নেওয়া এবং অভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় বেড়ে ওঠা মানুষের একটি দলকে বোঝায়। জেনারেশন তার সময়ের প্রযুক্তি রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জীবনধারার প্রভাব বহন করে। এর ফলে এক একটি প্রজন্মের চিন্তাধারা, আচরণ ও মূল্যবোধে স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। সমাজের ধারাবাহিক পরিবর্তনের পেছনে এই জেনারেশনভিত্তিক পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যেমন, পূর্বের প্রজন্ম বেশি রক্ষণশীল ও ঐতিহ্যনির্ভর হলেও বর্তমান প্রজন্ম প্রযুক্তি নির্ভর, উদ্ভাবনী ও বৈশ্বিক চিন্তাধারার প্রতি ঝুঁকছে। এই পার্থক্য অনেক সময় প্রজন্মের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি করলেও, এটি সামাজিক অগ্রগতির একটি স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় দিক। তাই জেনারেশন শুধু বয়সের পার্থক্য নয়, বরং একটি প্রজন্মের চিন্তা, সংস্কৃতি ও সমাজবোধের প্রতিফলন।

"অগাস্ট কোঁৎ" (Auguste Comte) একজন বিখ্যাত ফরাসি দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানী ছিলেন। তিনিই সবার আগে জেনারেশন (Generation) ধারণাটি সমাজবিজ্ঞানের (sociology) আলোচনায় নিয়ে আসেন August Comte (অগাস্ট কোঁৎ) এবং পরবর্তীতে একে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন, Karl Mannheim (কার্ল মানহাইম)। তবে "জেনারেশন" ধারণার সমাজবৈজ্ঞানিক ভিত্তি গড়ে তোলার প্রধান কৃতিত্ব দেওয়া হয় Karl Mannheim-কে। তিনি ছিলেন একজন জার্মান-হাঙ্গেরিয়ান সমাজবিজ্ঞানী। তার বিখ্যাত প্রবন্ধ "The Problem of Generations" যেটি প্রকাশিত হয় ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে। এই প্রবন্ধ জেনারেশনের তাত্ত্বিক ভিত্তি গড়ে তোলে। তিনি বলেন, শুধুমাত্র বয়সের ভিত্তিতে নয়, বরং একই সময়ে জন্ম নেওয়া এবং একই ধরনের ঐতিহাসিক ও সামাজিক অভিজ্ঞতায় বেড়ে ওঠা মানুষদের একটি গোষ্ঠীই হলো "জেনারেশন"। কার্ল মানহাইম এর মূল ধারণাগুলো ছিল এইরকম যে, "একই সময়কালে জন্ম নেওয়া মানুষদের একটি নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থা বিদ্যমান থাকে। তিনি আরও বলেন যে, একই প্রজন্মের মধ্যেও বিভিন্ন চিন্তাধারার দল বা ইউনিট থাকতে পারে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা, প্রযুক্তির পরিবর্তন, রাজনৈতিক বিপ্লব ইত্যাদি এসব অভিজ্ঞতা এসব মানুষকে প্রভাবিত করে। এসব কারণে একটি জেনারেশন থেকে আরেকটি জেনারেশনকে আলাদা করেছে।

প্রজন্ম বা জেনারেশনের বিভাজন কোনো একক ব্যক্তি দ্বারা হয়নি। তবে William Straus (উইলিয়াম স্ট্রাউস) ও Neil Howe (নীল হাউ) নামক দুই গবেষক এই বিভাজনের ভিত্তি ও জনপ্রিয়তা পেতে মূল অবদান রেখেছেন বলে বিবেচিত হন। তারা এসব জেনারেশনের বিভিন্ন নাম দেন। সাইলেন্ট বা নীরব জেনারেশন, বেবি বুমার্স, জেনারেশন এক্স, জেনারেশন ওয়াই, জেনারেশন জেড ও জেনারেশন আলফা।

বেবি বুমার্স: বেবি বুমার্স প্রজন্ম হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, ১৯৪৬ থেকে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জন্ম নেওয়া মানুষের প্রজন্ম। যুদ্ধশেষে শান্তি ফিরে আসার সঙ্গে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই প্রজন্মের মানুষরা শিশু অবস্থায়ই সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সাক্ষী হয়েছে। তারা কঠোর পরিশ্রমী, নৈতিক মূল্যবোধে দৃঢ় এবং পরিবারকে গুরুত্ব দিয়ে জীবনযাপন করে। শিক্ষা, ক্যারিয়ার ও সমাজে অবদান এই প্রজন্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বেবি বুমার্সরা উচ্চ শিক্ষা অর্জনে উৎসাহী এবং ব্যবসা, শিল্প, শিক্ষা ও সরকারি খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তারা সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবাধিকার আন্দোলন এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে। প্রযুক্তি ও গণমাধ্যম ব্যবহারে তাদের ভূমিকা সমাজে নতুন দিশা দেখিয়েছে। প্রভাব ও উত্তরাধিকার বেবি বুমার্স প্রজন্ম অর্থনীতি, সমাজ এবং সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে। তারা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, নেতৃত্ব এবং দায়িত্বে দক্ষ। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য তারা শিক্ষা, মূল্যবোধ এবং উদ্যমের অনুপ্রেরণা। তাদের অবদান সমাজকে আধুনিক ও প্রগতিশীল পথে পরিচালিত করেছে এবং আজও আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

জেনারেশন এক্স: জেনারেশন এক্স এই নামটি জনপ্রিয় করতে সবচেয়ে বড় অবদান রাখেন Douglas Coupland। তার লেখা বিখ্যাত উপন্যাস, "Generation X: Tales for an Accelerated Culture" প্রকাশিত হওয়ার পর জেনারেশর এক্স শব্দটি জনপ্রিয়তা লাভ করে। জেনারেশন এক্স হলো বেবি বুমার্স প্রজন্মের পরে জন্ম নেওয়া প্রজন্ম। এই প্রজন্মের মানুষরা সাধারণত ১৯৬৫ থেকে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে। তারা শিশু অবস্থায়ই আধুনিক প্রযুক্তি, গণমাধ্যম এবং পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। জেনারেশন এক্সকে বলা হয় স্বতন্ত্র, স্বাধীনচেতা এবং অভিযোজন ক্ষমতাসম্পন্ন। জেনারেশন এক্সের মানুষেরা সাধারণত কর্মজীবনে দক্ষ এবং যেকোনো প্রযুক্তি খুব দ্রুত আয়ত্ব করে নিতে পারত। তারা পরিবার এবং কাজের মধ্যে সমন্বয় রাখতে সচেষ্ট। তবে প্রযুক্তির বিকাশ ও শিল্পের বিকাশের ফলে এসময় দ্রুত শহরায়ন হতে থাকে এবং গ্রাম ছেড়ে মানুষ শহরমুখী হতে থাকে। শহরায়ন বাড়ার ফলে এসময় একান্নবর্তী পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবার গড়ে উঠে। এছাড়া এই প্রজন্মের মানুষরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারদর্শী। জেনারেশন এক্স এমন একটি সময়ে বড় হয়েছে, যখন বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তি বিপ্লব ঘটছিল। তারা কম্পিউটার, ইন্টারনেট এবং মোবাইল প্রযুক্তির প্রাথমিক ব্যবহারকারী। এছাড়া বিশ্বায়ন, ব্যবসায়িক পরিবর্তন, সাংস্কৃতিক উদ্ভাবন এবং সমাজিক আন্দোলনের প্রভাবও তারা প্রত্যক্ষ করেছে। এই প্রজন্ম সমাজের দ্রুত পরিবর্তন ও আধুনিকীকরণের সাক্ষী হয়েছে।

মিলেনিয়ালস প্রজন্ম: মিলেনিয়ালস প্রজন্ম, যাকে জেনারেশন 'ওয়াই'ও বলা হয়, হলো জেনারেশন এক্সের পরে জন্ম নেওয়া মানুষ। সাধারণত তারা ১৯৮১ থেকে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে। এই প্রজন্মের মানুষরা শিশু অবস্থায়ই ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির সঙ্গে খুব ভালোভাবে পরিচিত হয়েছে। তারা প্রযুক্তি এবং বৈশ্বিক যোগাযোগে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। মিলেনিয়ালস প্রজন্ম সাধারণত শিক্ষিত, উদ্ভাবনী এবং প্রযুক্তি সচেতন। তারা স্বতন্ত্র চিন্তাভাবনা, স্বাধীনতা এবং নতুন ধারণা গ্রহণে সক্রিয়। কর্মজীবনে তারা উদ্যমী এবং নতুন ধরণের চাকরি, স্টার্টআপ বা উদ্যোক্তা উদ্যোগে আগ্রহী। সামাজিক সচেতনতা, বৈশ্বিক চেতনা এবং পরিবেশগত সমস্যার প্রতি দৃষ্টি রাখা এদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মিলেনিয়ালস প্রজন্ম প্রযুক্তি, গণমাধ্যম, ব্যবসা এবং সামাজিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তারা বিশ্বায়ন, তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লব এবং সামাজিক পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। এরা সামাজিক ন্যায়বিচার,

সমতা এবং নতুন জীবনধারার প্রচার করে সমাজে প্রভাব ফেলছে। তাদের কর্মকাণ্ড এবং জীবনধারা আধুনিক সমাজকে গঠন করছে। জেনারেশন ওয়াই প্রজন্মের সময় ও বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেট ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে থাকে। সে সঙ্গে কম্পিউটার ব্যবহার জ্ঞান এই প্রজন্মের মানুষেরা খুব ভালোভাবে রপ্ত করে নেয়।

জেনারেশন জেড(জুমার): জেনারেশন জেড হলো মিলেনিয়ালস প্রজন্মের পরে জন্ম নেওয়া প্রজন্ম। সাধারণত ১৯৯৭ থেকে ২০১২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জন্ম নেওয়া মানুষদের এই প্রজন্মের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তারা শিশু অবস্থায়ই স্মার্টফোন, সোশ্যাল মিডিয়া এবং ইন্টারনেটের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। প্রযুক্তি তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, এবং তারা ডিজিটাল পরিবেশে সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। জেনারেশন জেড সাধারণত উদ্ভাবনী, প্রযুক্তি সচেতন এবং স্বতন্ত্র চিন্তাভাবনায় বিশ্বাসী। তারা স্বায়ত্তশাসিত, বহুমুখী দক্ষ এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। এই প্রজন্মের মানুষরা শিক্ষার ক্ষেত্রে সৃজনশীল পদ্ধতি ব্যবহার করে এবং সামাজিক যোগাযোগে দক্ষ। জেনারেশন জেড প্রায়শই ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়া, ভিডিও কনটেন্ট এবং অনলাইন শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত। এই জেনারেশন জেড এর সময় ফেসবুক, মেসেঞ্জার, ইনস্ট্রাগ্রাম এর মত সোশাল মিডিয়া দ্রুত বিস্তার লাভ করে। তারা তথ্য আহরণে দ্রুত এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। প্রযুক্তি তাদের শিক্ষা, বিনোদন এবং সামাজিক জীবনকে একত্রিত করে। জেনারেশন জেড সমাজের ন্যায়বিচার, পরিবেশ, সমতা এবং মানবাধিকার বিষয়ে বেশি সচেতন। তারা বৈশ্বিক সমস্যা, জলবায়ু পরিবর্তন, লিঙ্গ সমতা এবং সামাজিক অসাম্য কমানোর উদ্যোগে সক্রিয়। সামাজিক আন্দোলন এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তারা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে। জেনারেশন জেডের প্রভাব ভবিষ্যতের সমাজ এবং অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হবে। তারা নতুন প্রযুক্তি, উদ্ভাবনী উদ্যোগ এবং বৈশ্বিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে পারে। এই প্রজন্ম আধুনিক সমাজকে আরও সমানতামূলক, সচেতন এবং সৃজনশীল করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে। তারা যেকোনো তথ্যের সত্যতা জানতে ইন্টারনেটের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। এছাড়াও তারা যেকোনো সামাজিক রাজনৈতিক অসংগতির বিরুদ্ধে কথা বলতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে।

জেনারেশন আলফা: জেনারেশন আলফা হলো জেনারেশন জেডের পরে জন্ম নেওয়া প্রজন্ম। সাধারণত ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত জন্ম নেওয়া শিশুদের এই প্রজন্মের মধ্যে গণ্য করা হয়। তারা পুরোপুরি ডিজিটাল যুগে বড় হচ্ছে। তাদের শৈশব স্মার্টফোন, ট্যাবলেট, কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। প্রযুক্তি এবং অনলাইন মাধ্যম তাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ফলে জেনারেশন আলফা অন্যান্য প্রজন্মের তুলনায় প্রযুক্তিতে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে এবং দ্রুত নতুন ডিজিটাল চ্যালেঞ্জের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। জেনারেশন আলফা প্রযুক্তি সচেতন, উদ্ভাবনী এবং সৃজনশীল। তারা অনলাইন লার্নিং, ইন্টারঅ্যাকটিভ শিক্ষা এবং ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহার করতে স্বাভাবিক। শিখতে তারা উৎসাহী এবং সমস্যা সমাধানে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারে। পাশাপাশি তারা সামাজিক যোগাযোগে দক্ষ, দ্রুত অভিযোজিত এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে সক্ষম। তাদের জীবনধারা ও চিন্তাধারা আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রযুক্তি-ভিত্তিক সমাজের সঙ্গে খাপ খায়। জেনারেশন আলফা সামাজিকভাবে সচেতন ও সংযোগপূর্ণ। তারা পরিবেশ, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের বিষয়ে সচেতন হতে পারে। ভবিষ্যতে এই প্রজন্ম সমাজ, শিক্ষা এবং অর্থনীতির নতুন দিক নির্দেশ করবে। তাদের প্রযুক্তি ব্যবহার, উদ্ভাবনী মানসিকতা এবং সামাজিক সচেতনতা বিশ্বকে আরও সমৃদ্ধ, সমতায়ন ও আধুনিকভাবে গড়ে তুলবে। জেনারেশন আলফা হলো আগামী দিনের সমাজ ও প্রযুক্তির মূল চালক।

মানব সমাজে বিভিন্ন প্রজন্মের ভূমিকা একে অপরের পরিপূরক। বেবি বুমার্স প্রজন্ম কঠোর পরিশ্রমী, নৈতিক মূল্যবোধে দৃঢ় এবং পরিবারকে গুরুত্ব দেয়। জেনারেশন এক্স স্বাধীনচেতা ও অভিযোজনক্ষম, প্রযুক্তি ও সামাজিক পরিবর্তনের সাক্ষী। মিলেনিয়ালস প্রজন্ম শিক্ষিত, উদ্ভাবনী ও বৈশ্বিক চেতনা সম্পন্ন। জেনারেশন জেড প্রযুক্তি সচেতন, সৃজনশীল এবং সামাজিক ন্যায়বিচার ও পরিবেশ সচেতন। সর্বশেষে জেনারেশন আলফা সম্পূর্ণ ডিজিটাল যুগে বড় হচ্ছে, উদ্ভাবনী, প্রযুক্তি-নিপুণ এবং ভবিষ্যতের সমাজ ও শিক্ষার নেতৃত্ব দেবে। প্রতিটি প্রজন্মের জীবনধারা, অভিজ্ঞতা ও মূল্যবোধ পরবর্তী প্রজন্মকে প্রভাবিত করেছে। তাদের অবদান, শিক্ষা ও উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা সমাজকে আধুনিক, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল করার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সমাজ ও প্রযুক্তির এই ধারাবাহিক পরিবর্তন মানবজাতিকে নতুন দিগন্তে পৌঁছে দেবে বলে বিশ্বাস করি।

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট

(৭৩ নং পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

৩) শিক্ষালয় কিছু নিয়ম-নীতি ও কাঠামো পরিমার্জন করে একটি এ্যান্টি-বুলিং পরিবেশ গড়ে তোলা দরকার। যেখানে নিয়মিত বুলিং বিরোধী কর্মসূচি শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সমন্বয়ে আয়োজন করতে হবে।

৪) শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকদের সহানুভূতিশীল মনোভাব দেখানো।

৫) যে বুলিং করে তার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া এবং যাকে বুলিং করা হয় তাকে প্রয়োজনে কাউন্সেলিং এর আওতায় আনা।

৬) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় বুলিং এর কুফল সম্পর্কিত সিনেমা, কার্টুন, টিভি সিরিজ প্রদর্শন, অনলাইনে দায়িত্বশীল আচরণ সম্পর্কিত কর্মশালা ইত্যাদি সহপাঠ ক্রমিক কার্যক্রম আয়োজনের ব্যবস্থা করতে হবে। কর্তৃপক্ষকে বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধে শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে হবে।

অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও এ্যান্টি-বুলিং এবং র‍্যাগিং নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। সেখানে বলা আছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন শিক্ষক, কর্মচারী, শিক্ষার্থী, এমনকি প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বোর্ডের কোন সদস্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে র‍্যাগিং ও বুলিং এ জড়িত থাকলে প্রচলিত আইন অনুযায়ী তাদের শাস্তি হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফৌজদারি আইন অনুযায়ীও ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

বুলিং শুধু নিপীড়নের ঘটনা নয়, এটি একটি ব্যক্তির ধ্বংসকারী অভিজ্ঞতা। একটি নিরাপদ, মানবিক, এবং সহানুভূতিশীল শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য আমাদের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব হলো বুলিং এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া। একজন শিক্ষার্থীর সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে হলে তাকে একটি সহনশীল, বন্ধুত্বপূর্ণ ও নিরাপদ পরিবেশ প্রদান করতে হবে। তবেই শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

তথ্যসূত্র ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

** প্রথম আলো সংবাদপত্র (কিশোর বয়সের ইন টাইম), ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ৩ বৈশাখ ১৪৩২।*

** ডা. রোজওয়ানা হাবীব, সহকারী অধ্যক্ষ, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, সিলেট এম এ জি ওসমানী।*

** সানজিদা সুলতানা রূপা (মনোবিজ্ঞান বিভাগ, বি.এসসি., ঢাকা সেন্ট্রাল হেলথ এসএসসি বিশ্ববিদ্যালয় এসোসিয়েট)।*

** কনিতা আক্তার (কাউন্সেলিং শিক্ষক, সেন্ট গ্রেগরী হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ)।*

** ব্রাদার চয়ন ভিক্টর কোড়াইয়া সিএসসি (কাউন্সেলিং শিক্ষক)।"শিক্ষাক্ষেত্রে বুলিং এর প্রভাব ও করণীয়"*

মাতৃত্ব

মালা রিবেরু

শোন, বউ আমার ছেলের সাথে বিয়ে হয়েছে তিন বৎসর হয়ে গেলো। এখনও তো নাতি-নাতনির মুখ দেখলাম না। আমাদেরও তো দাদা-দাদি হওয়ার ইচ্ছে করে, কত শখ করে ছেলেকে বিয়ে করিয়েছি, এখনও কোন সুসংবাদ পেলাম না, এইভাবে আর কতদিন? প্রতিদিন শাশুড়ি মুখে একই কথা শুনতে শুনতে শিখার কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে খুবই ইচ্ছে করে শাশুড়ি মুখে উপর দুই-চার কথা শুনিয়ে দিতে, আসল সত্যি কথাটা বলে দিতে। শিখার কি মা হতে ইচ্ছে করেনা, কিন্তু বাবা-মার মুখের দিকে তাকিয়ে, স্বামী রঞ্জনের কথা ভেবে কিছুই বলে না।

শিখা এবং রঞ্জন ভালোবেসে আগে থেকেই পরিচয়ের মধ্য দিয়ে বিয়ে হয়েছে, চার বৎসর চলছে। বিয়ের আগে শিখাকে শাশুড়ি অনেক ভালোবাসতো ও খুব আদর করতো। কিন্তু বিয়ের পরেই তার আসল রূপ প্রকাশ পায়। একমাত্র ছেলে রঞ্জনের মা হতে পেরে তার মা ভালোবেসে যেন নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করতো। কিন্তু মা আর বউের ভালোবাসা যে এক নয় তা রঞ্জনের মার মাথায় ছিল না। শিখাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বি ভাবতে লাগলো। প্রায় সময় শিখাকে বলতো, তুমি বাসায় থাকলে আমার ছেলে আমার কাছে কম আসে, সারাক্ষণ তোমার সাথে ঘুর ঘুর করে।

শাশুড়ি মায়ের কথা প্রায়ই সময় শিখা হেসে উত্তর দিয়ে বলতো, মা এমন কথা ভাবেন কেন? রঞ্জন আপনার ছেলে, আপনার ছেলে আপনাকে অনেক ভালোবাসে, মা আর বউয়ে ভালোবাসা তো এক নয় মা। প্রথম প্রথম শিখা এসব নিয়ে কষ্ট পেত না, কিন্তু প্রতিনিয়ত শুনতে শুনতে আস্তে আস্তে সে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে যেতে লাগলো। বিয়ের ছয়মাস পর তারা সিদ্ধান্ত নেয় সন্তান নিবে।

কিন্তু দেখা যায় রঞ্জন অফিস থেকে আসলে শাশুড়ি প্রায় সময় ছেলেকে তার কাছে কারণে অকারণে বসিয়ে রেখে গল্প করতে ব্যস্ত রাখতো। তারা দুইজন একটু মিশবে, গল্প করবে সে সুযোগ দিতো না। রঞ্জন অফিস থেকে আসলে এমন একটা ব্যাপারে ছেলেকে উস্কিয়ে দিতো যাতে তারা তর্ক করে খাওয়া- দাওয়া বন্ধ করে দেয়। কিন্তু অন্যদিকে শাশুড়ি তার খাওয়া, টিভি দেখা ও অন্যদের সাথে ফোনে আলাপচারিতা সব ঠিক ছিল।

শিখা বাবা মায়ের অনেক আদরের সন্তান, বিয়ের আগের জীবনটা সে খুবই সুন্দর একটা পরিবেশে কাটিয়েছে, সে অন্যের মনের প্যাঁচ একটু কম বুঝতো। তাই প্রথম প্রথম শাশুড়ি চালাকি বুঝতোনা। কিন্তু সংসার করতে করতে বুঝে গেছে যে তার শাশুড়ির আসলে কী চায়। তাই সেও রঞ্জন অফিস থেকে আসার আগে তার কাজ সব শেষ করে ফেলতো। সে চাই রঞ্জন সাথে একান্তে সময় কাটাতে। তাই একদিন অফিস থেকে রঞ্জন আসার পরে নাস্তা খেয়ে দরজা

হাল্কা বন্ধ করে দুইজন বিছানায় শুয়ে গল্প করতে থাকে। গল্পের মাঝে হঠাৎ করে শাশুড়ি দরজা খুলে এসে তাদের দুইজনকে দেখে জোরে দরজা বন্ধ করে চলে যায়। এর ফল শিখা আর রঞ্জন বুঝতে পেরেও চুপ করে থাকে। রাতে খাবার খেতে গেলে রঞ্জন আর শিখার সাথে কোন কথা না বলে চুপচাপ খেতে থাকে , কোন কথা বলে না। বিয়ের পর থেকে এসব দেখে তার অভ্যাস হয়ে গেছে। শিখা সব সময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়, পরিবারের অন্য যেমনেই হোক তার স্বামী তো তাকে ভালোবাসে।

শিখা ভাবে যদি তাদের একটা সন্তান হয়, তাহলে শ্বাশুড়ি নাতী/নাতনীকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে ও আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। এর মধ্য শিখা রঞ্জনকে বলে আমাদের তো প্রায় দুই বছর হয়েছে বাচ্চা নেওয়ার চেষ্টা করছি, ঈশ্বর তো এখনো কোন সন্তান দিলো না, চলো সামনের সপ্তাহে ডাক্তারের কাছে যাই, দুইজনেই পরীক্ষা করে দেখি কারো কোন সমস্যা আছে কিনা?

তাই একদিন বাইরে যাওয়ার কথা বলে তারা দুইজন ডাক্তারের কাছে তাদের সমস্যা নিয়ে যায়। ডাক্তার তাদের সকল স্বাস্থ্যগত বিস্তারিত জেনে নেয় আর দুইজনকে কিছু পরীক্ষা করতে দেয়। কয়েকদিন পর রিপোর্টসহ দেখা করতে বলে। শিখা ও রঞ্জন দুইজন দুইজনকে অনেক ভালোবাসে

তাই তারা সকল টেস্ট করিয়ে বাসায় আসার সময় দুইজন দুইজনকে জড়িয়ে অনেক কান্না করতে থাকে। আর বলে, রিপোর্ট আমাদের যার সমস্যাই আসুক না কেন আমরা আমাদের সমস্যার কথা কারো সাথেই আলোচনা করবো না, ডাক্তারের চিকিৎসা নিয়ে যাবো, বাচ্চা যদি নাও হয় দুইজন দুইজনকে কোনদিন ছেড়ে যাবো না।

পনেরো দিন পরে দুইজন দুরদুর বুকে নিয়ে যখন ডাক্তারের কাছে যায়, তখন ডাক্তার দুইজনকে বসতে বলে, আর দুইজনের সাথে অনেক গল্প করে এবং আস্তে আস্তে আসলে প্রসঙ্গে আসে। ডাক্তার বলেন, ঈশ্বর বা আল্লাহ যাই বলি না কেন তিনি আমাদের এই পৃথিবীতে কিছু উদ্দেশ্য দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিতে আমাদের কোন হাত নেই। মা, শিখা তোমার তেমন কোন বড় সমস্যা নেই, কিছুদিন ঔষুধ খেলে ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু বাবা রঞ্জন তোমার যে সমস্যা তা ঈশ্বর ছাড়া সমাধানের কোন উপায় নেই। সব শুনে তারা নিঃশব্দে ডাক্তারখানা থেকে প্রস্থান করে।

দুইজন ভারাক্রান্ত মন নিয়ে চুপচাপ রিক্সা চড়ে। শিখার দু'চোখ বয়ে পানি পড়তে থাকে, রঞ্জন ও চুপচাপ থাকে, অনেকক্ষণ পরে নীরবতা ভেঙ্গে শিখার হাতটা ধরে বলে আমাকে কি তোমার প্রচন্ড ঘৃণা হচ্ছে! আমি তোমাকে মাতৃত্বের সুখ দিতে পারিনি। আমি তোমাকে কোন জোর করবোনা শিখা, তুমি চাইলে আমাকে ডির্ভোস দিয়ে, আবার বিয়ে করতে পারো। কারণ সব মেয়েরা চায় মা হতে, মাতৃত্বের স্বাদ নিতে, তুমি আমার জন্য তোমার সখ আহ্লাদ নষ্ট করো না। আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি শিখা, তুমি সুখী থাকলেই আমি খুশি।

রঞ্জনের কথা শুনে বিস্ময় চোখে শিখা রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে থাকে আর বলে, রঞ্জন তুমি কি কথা বলছো? আমার সমস্ত

পৃথিবী এক দিকে আর তুমি একদিকে, আমাকে তুমি যে সম্মান ও ভালোবাসা দিয়েছো তা আমি কিছুতেই হারাতে চাইনা। চাইনা আমার কোন সন্তান, আমি শুধু তোমাকেই চাই, শুধু এই জন্মেই নয় পরের জন্মেও আমি তোমাকে হারাতে চাইনা।

বাসায় এসে দুইজনেই স্বাভাবিক হয়ে যায়। তারা দুইজন শাশুড়ি সামনে স্বাভাবিক আচরণ করে, তাকে বুঝতে দেয় না যে তাদের মনে কি যে কষ্টের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। রাতে শোয়ার সময় শিখা রঞ্জনকে বলে, দেখ আমরা যে ডাক্তার দেখিয়ে রিপোর্ট পেয়েছি তা কারো সাথে বলার দরকার নেই। আমরা প্রার্থনা করবো সবসময় যদি ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শুনে সন্তান দান করেন তাহলে তো ভালোই আর তা না হলে বুড়ো বয়সে তুমি আমাকে দেখবে আর আমি তোমাকে দেখবো। আর আমাদের সমস্ত ধন সম্পদ বুড়ো বয়সে এতিমখানায় দান করে দিবো আর এতিম সন্তানদের জন্য খরচ করবো।

আর তখন রঞ্জন শিখাকে জড়িয়ে ধরে বলে, ঈশ্বরের কাছে একটাই চাওয়া, যেন আমার মৃত্যু যেন তোমার কোলেতেই হয়। তোমার মতো এত বড় মনের মানুষকে আমি আমার জীবনসঙ্গী হিসেবে পেয়েছি যা আমার ভালো কাজের ফল।

এরপর সবকিছু যথারীতি চলছিলো। শিখা তার সাধ্য মতোই সবকিছু স্বামীর সংসারে মানিয়ে নিতে চেষ্টা চালিয়ে যেতো। কিন্তু আসল কথা হলো যে মেয়েরাই মেয়েদের প্রধান ও প্রথম প্রতিবন্ধকতা। মা ভাবে আমার ছেলে আমি তাকে আদর-ভালোবাসা ও যত্ন করে বড় করেছি। তাই সমস্ত অধিকার শুধুই তার, আবার এই দিকে বৌ ভাবে আমি আমার বাবা মাকে ছেড়ে বিয়ে হয়ে এসেছি যার ফলে সে শুধুই আমার অধিকার। মা আর বৌয়ের টানাটানিতে স্বামী বেচারার অবস্থা নাজেহাল। সুতরাং, ছেলের সুখের দিকে তাকিয়ে যেমন মাকেও ছাড় দিতে হবে তেমনি বৌকে ছাড় দিতে হবে মায়ের অধিকার। কিন্তু মনে হয় স্বামীর পরিবার থেকেই বেশি দেওয়া উচিৎ, কারণ একটি মেয়ে তার জন্মলগ্ন থেকে একটা পরিবেশে বড় হয়ে পরবর্তীতে বিয়ের পর আরেকটা পরিবারের নিয়ম-কানুনের সাথে মানিয়ে নিতে প্রথম প্রথম খুবই কষ্ট হয়। সেজন্য স্বামীর পরিবারের সহযোগিতা খুবই প্রয়োজন।

কিন্তু সে স্বামীর পরিবারে তা পায়নি বরং পেয়েছে তিক্ত কথা, কোন কাজে শাশুড়ির মনঃপূত না হলে, 'মা-বাবা কিছুই শিখিয়ে দেয়নি' বলে তাকে কটুকথা শুনতে হয়েছে। কিন্তু তারপাশে ছায়ার মতো সঙ্গী হয়ে তার সাথে ঘটে যাওয়া প্রতিটি অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে। ঠিক তেমনি আজকে দুপুরে শিখা স্বামী ও শাশুড়ির সাথে যখন রাতে খাবার টেবিলে খেতে বসলো তখন কোন কারণ ছাড়াই বলা শুরু করলো, আগের দিনে দেখতাম স্বামী, শ্বশুর ও শ্বাশুড়ি খাওয়ার পরে পাতিলে যে অবশিষ্ট খাবার থাকতো তা বাড়ির বৌরা রান্না ঘরে এককোনায় বসে খেতো। এখন কি দিন আসলো যে, এখনকার দিনের বৌরা নির্লজ্জের মতো একসাথে প্লেট ভরে ভরে খাবার খাচ্ছে। এত খাবার খেয়ে খেয়ে শুধু মোটাই হচ্ছে। বাচ্চা নেওয়ার কোন ইচ্ছেই নেই, শুধু ঘুরে বেড়াতে পারলেই খুশি। মা হওয়ার কোন ইচ্ছেই যেন নেই।

প্রতিদিন উঠতে-বসতে, প্রতিটি কাজের খুত ধরা, সবসময় খোঁচা মারা কথা শুনতে শুনতে শিখা মনে মনে খুবই ভেঙ্গে পড়ে। প্রতিটি মেয়েই মা হতে চায়, মাতৃত্বের আস্বাদন নিতে চায়। হোক স্বামী বা স্ত্রী যেকোন সমস্যার কারণে অথবা কোন সমস্যা ছাড়াও অনেক দম্পতি সন্তান ধারণ করতে পারেনা। কিন্তু দেখা যায়, আমাদের সমাজের মানুষের ধারণা যে, বাচ্চা না হওয়ার পেছনে বউয়ের সব দোষ। মন যত ভেঙ্গে যাক না কেন আজ যেন শিখা দৈবশক্তি পেয়েছে, তাই সে শ্বাশুড়ীর এই কথাগুলো বলার সাথে সাথে বলতে শুরু করে, "দেখুন মা প্রতিটি মেয়ের বিয়ের পরে স্বপ্ন থাকে মা হবার, এই পৃথিবীতে কাউকে আনার ক্ষমতা মানুষের নেই। পাশাপাশি সন্তান ধারণের জন্য শুধু নারীরাই কেন! এখানে পুরুষেরও সমস্যা রয়েছে। তাহলে কেন সন্তান না হলে আমরা শুধু সেই নারীকে দোষ দেই? আসলে আমরা আমাদের নারীদের শত্রু।

শিখা সবসময়ই চুপচাপ, শান্ত স্বভাবের, কিন্তু আজ সে কিভাবে এতগুলো চরম-নির্মম সত্য কথা বলতে পেরেছে তা ভাবতেই আশ্চর্য লাগছে। সেই কথাগুলো বলে নিজের রুমে চলে আসে আর ভাবে রঞ্জন চলে এলে হয়তো তার মার সাথে এইভাবে কথা বলেছে বলে রাগ করবে। কিন্তু একটু পরে রঞ্জন রুমে এসে শিখাকে জড়িয়ে ধরে বলে, জানো আমি বুঝতে পেরেছি মার কথায় তুমি অনেক কষ্ট পেয়েছো। আর আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় সবকিছুর জন্য শুধু নারীদের দায় করা হয় যা অন্যায়। আমরা দুইজন যখন আমাদের সমস্যা জানি পাশাপাশি মেনে নিয়েছি, তৃতীয় পক্ষ হোক তোমার বা আমার পক্ষ তাতে কিছু যায় আসে না। আর হ্যাঁ, আমি খুবই খুশি হয়েছি তুমি প্রতিবাদ করতে শিখেছ। অন্যায়ের সাথে কখনই আপোষ করবেনা, সবসময় প্রতিবাদ করবে।

টাকা

অসীম বেনেডিক্ট পামার

মধুর মত মিষ্টি তুমি টাকা
টাকা না থাকলে সম্মান হয়ে যায় ঢাকা,
টাকাই বিধান, টাকাই ক্ষমতা,
টাকাই জোট
টাকা তুমি যে আমার কাকা,
তবুও মানুষ কেন বলে টাকাকে
সকল মন্দের মূল নায়ক তুমি?
তুমি জীবনকে কর বাঁকা।
টাকা উপার্জন তোমার অর্জন
টাকা হারানো জীবনকে বর্জন,
টাকা পাঠায় জেলে তোমাকে অতিথি করে
কালো টাকা আসে তোমার ডাকে যখন
চুপিসারে,
টাকা সমাজকে করে বিভক্ত
টাকার অসততায় উচ্চ ও নিম্ন বর্ণের
সম্পর্কের মধ্যে আনে তিক্ত।
যখন অনেক টাকা থাকে তোমার কব্জায়
ভয় লজ্জা যায় উড়ে
ভর করে অসীম সাহস তোমার মজ্জায়,
টাকাই তোমাকে করবে রক্ষা
যদি সেটা হয় সত্য আগমন,
টাকা টাকা টাকা করে জীবন যদি না কর
নির্গমন।
এসেছ পৃথিবীতে যেতে হবে একদিন,
নেবেনা কিছুই সঙ্গে তুমি সেদিন
রাখো বিশ্বাস স্রষ্টায় যাবে তুমি সেথায়,
যেখানে স্রষ্টা রাখবেন
তোমায় তারই জিম্মায়
টাকা টাকা কর না ভাইয়া
অপ্রয়োজনীয় আশায়
থাকবে না টাকা থাকবে তোমার সঠিক
কর্মফল জীবদশায়।

নারীর সততা ও নারীর ক্ষমতা

মিনু গরেট্টী কোড়াইয়া

একটি সুযোগ; নারীকে অনেক উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে, সম্মুখ সারিতে দাঁড় করাতে পারে, শক্তিশালী-বীরবল পুরুষকে হারিয়ে, প্রবল প্রতাপে ছিনিয়ে আনতে পারে বিজয়ের মুকুট। নারীর শিক্ষা, নেতৃত্ব, ক্ষমতা, অধিকার ভোগ ও নিজের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সুযোগ দিলে কেবল পরিবার নয়, তার পরিবেশ, সমাজ ও দেশের সভ্যতাকে বদলে দিতে পারে, উন্নয়ন ঘটাতে পারে চারপাশের অবস্থার, সমাজের অশিক্ষা-কুশিক্ষা ও অরাজকতা দূর করে আলোর পথ দেখাতে পারে। নারীর শিক্ষা তাকে যোগ্য করে তোলে পারিপার্শিক অবস্থার সাথে খাপ খেয়ে চলার, ভালো-মন্দ যাচাই করার, মৌলিক অধিকার রক্ষা ও স্বাধীনভাবে নিজের জীবন পরিচালনার। গুণগত ও পরিমিত শিক্ষার পাশাপাশি প্রতিটি স্তরে নারীর নেতৃত্বের সুযোগ সমাজের সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিতে পারে, কিন্তু সেই সুযোগের বড্ড অভাব আমাদের পরিবার ও সমাজে। সামাজিক কর্মকান্ডে নারীর সক্রিয় ও সরাসরি অংশগ্রহণ পরিবার ও সমাজের অনেকেই সায় দিতে পারে না; তাদের ধারণা নারীর কাজ শুধু ঘরদোর, সন্তান আর সংসারের মধ্যে গৃহস্থিত থাকা। সুযোগ দিলে নারী কেবল পরিবারেই নয়, সমাজ উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে অংশগ্রহণ করে তার মতামত প্রকাশ এবং সততার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কারণ নারী তার শরীরে ও মননে একই প্রকার শক্তি, সামর্থ ও যোগ্যতা বহন করে, কেবল মাত্র অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ও তার গুণের পরিচর্চার অভাবে স্থিত হয়ে পড়ে থাকে। এ যাবতকালে পরিবার তথা সমাজের সমস্ত বাধা অতিক্রম করে যে সকল নারী নিজ উদ্যোগে সাহসের সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারা তাদের সাফল্য ও উন্নয়নের সাক্ষ্য রেখেছে এবং তার বহু উদাহারণ আমরা দেখতে পাই।

নারীর চরিত্র জন্ম থেকেই মায়া-মমতায় ভরা, তাদের হাতের স্পর্শ পেলে, পরম যত্নে পোড়া মাটিতেও সোনা ফলে। সততা, সহমর্মিতা, ধৈর্যশীল ও সহনশীলতার গুণেও নারী অন্যদের চেয়ে এগিয়ে থাকে। একজন নারী পরিবারের অন্যান্য সদস্যের চেয়েও বেশি ধার্মিক এবং নিজের আত্মার পরিচর্যাও করে থাকেন বেশি। বাইরের জগতের সাথে তার পরিচিতি না থাকার কারণে অনেক নারীই সংসারে কাজের অবসরগুলোতে প্রার্থনা-উপবাস (নামাজ-রোজা) ও বিভিন্ন প্রার্থনাপূর্ণ সংঘ-সমিতিতে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখে। আর এই সকল অভ্যাস নারীর চরিত্রকে উন্নত করে, তাদের চিন্তা-চেতনাকে সমৃদ্ধ করে। নারীর আত্মবিশ্বাস প্রগাঢ়; তাকে মর্যাদাপূর্ণ সুযোগ দিলে সে তার বিশ্বাস ও সততা দ্বারা সামাজিক অন্যায়, অন্যায্যতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পারে, প্রতিষ্ঠিত করতে পারে একটি দ্বিধাহীন, সার্থক সমাজ। একটি উন্নত, মানবিক ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য প্রতিটি পরিবার ও সমাজের অবস্থান থেকে নারীকে উত্তরণের সুযোগ দেওয়ার মানসিকতা গড়ে তোলা আবশ্যক। নারীর এই সুযোগ ও অনুপ্রেরণাই সকল ক্ষেত্রে সততার সাথে ক্ষমতার ইতিবাচক ব্যবহার করতে পারবে, সমাজের কল্যাণ সাধন করতে পারবে।

শিক্ষিত নারী পরিবার ও সমাজে অনন্ত প্রদীপ শিখার মতো; সে নিজেও জ্বলে, অন্যকেও জ্বালিয়ে রাখে। সে পরিবারে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম-আয়েশ সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি সদস্যদের মানসিক উন্নতির চেষ্টা করে থাকে। জন্মের পর একটি শিশু মায়ের সান্নিধ্যে পেয়ে বড় হয় এবং একই সাথে সে তার মায়ের আচরণ অনুসরণ ও অনুকরণ করতে থাকে। পরিবারের প্রতিটি নারী সদস্য শিশুকে প্রথম মুখের বুলি যেমন পরম যত্নে শিখিয়ে থাকে তেমনি তাদের ধর্ম, ন্যায় ও সত্যের পথে চলতেও অনুপ্রাণিত করে। পুরো পরিবার পুরুষের অর্থের উপর নির্ভর করলেও একটি সন্তানের মানবিক চাহিদা পূরণ করে থাকে তার মা। সেই অর্থে পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ মানবিক ও মানসিক চাহিদার যোগান দেন সেই পরিবারের নারী। তার পরিচালনায় পুরো পরিবারের সদস্যদের দিন নিশ্চিন্তভাবে অতিবাহিত হয় আর এই সব কার্য সাধিত হয় পরম যত্ন, মমতা আর সততার সাথে। তারা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে। সুযোগ দিলে নারীরা তাদের এই সহজাত আচরণ, শিক্ষা ও সততা তার পারিবারিক জীবনের পাশাপাশি পেশাগত জীবনেও ব্যবহার করতে পারে। অনেক সময়ই নারীর এই সকল গুণের কদর অনেকটাই অন্তরালে রয়ে যায়, থাকে প্রচার বিমুখ। পুরুষ শাসিত এই সমাজের অনেকেই নারী-পুরুষের বৈষম্যকে অতি গুরুত্বের সাথে প্রাধান্য দিলেও বর্তমানে দেশের অনেক আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে পুরুষের পাশাপাশি নারীর নেতৃত্ব দানের ও ক্ষমতার উত্তরণ আমাদের মনে আশার সঞ্চার করে। নারীর যোগ্যতার অনেক উদাহারণ ও প্রমাণ আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনে নারী নেতৃত্বের প্রখর অবস্থান দেখে যেখানে তারা মমতা, সমতা, সততা ও উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে তারা মানবিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান তৈরি ও পরিচালনা করছে দক্ষতার সাথে। এই সকল সুযোগের সদ্ব্যবহার করে সকল ক্ষেত্রে নারীবান্ধব পরিবেশ তৈরি করে নারীদের আত্মমর্যাদা রক্ষায়ও তারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

সহজাত গুণের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হলে নারী দুর্বল হয়ে পড়ে। পরিবার ও সমাজের বেঁধে দেওয়া নিয়ম-নীতি উপেক্ষা করার ক্ষমতা অনেক নারীই অর্জন করতে পারে না, ভয় ও হীনমন্যতায় সে নিজেকে গুটিয়ে রাখে। কন্যা সন্তান জন্মের পর এখনও কোনো কোনো পরিবারের আকাশে কালো মেঘ জমে ওঠে, এখনও কন্যা সন্তানকে পুত্র সন্তানের মতো সমান মর্যাদায় ও গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা হয়না। "নারীর গর্ভে নতুন মানুষের জন্ম হয়" নারীর এই মহৎ নারীত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সমাজের এই হীনতা, ব্যবধান ও বৈষম্য দূর হোক, চেতনার উন্নয়ন হোক। জগত সংসারে নারী-পুরুষের অবস্থান থাকুক সূর্য-চন্দ্রের মতোই, সমগ্র জগতকে অবিরত আলো দানে মহত্ব প্রকাশ করা। জীবন সমৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের লক্ষ্য থাকুক এক ও অবিচল।

নারী সৎ ও সহজ-সরল; নারী রাণী, স্বপ্নময়ী; নারী কেবল স্বপ্ন দেখেই স্থির থাকে না, জীবনের প্রতিটি ভঙ্গুর পথে সে হয় সংগ্রামী, সকল বাঁধা উপেক্ষা করে সে আপ্রাণ চেষ্টা করে তার স্বপ্নের শিখরে পৌঁছতে। শৈল্পিক কারুকাজেই কেবল নয়, সুযোগ দিলে নারী সংসারের মতো করে নিপুণ হাতে আগলে রাখতে পারে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের ভূখণ্ড, গঠনমূলক, সৎ ও সাহসী কর্ম সম্পাদন করতে পারে বীরদর্পে। বিশ্বব্যাপী সততা, ন্যায্যতা, নেতৃত্ব, সাহসিকতা, দক্ষতা ও আত্মত্যাগের সাক্ষ্য রেখেছেন অনেক সাহসী নারী। ভয় বা বিপদ থাকা সত্ত্বেও সেই সকল নারীর দুর্গম গিরি পাড় হয়ে সততার সাথে অবিচল থাকার ক্ষমতা ও আপ্রাণ চেষ্টাকে কুর্নিশ জানাই। তাদের এই মানসিক শক্তি যেনো হাজার নারীর প্রেরণা, পিছিয়ে পড়া নারীর হাতে তারা সঞ্চিত আশার প্রদীপ। তাদের কর্মোদ্যম ও নিরন্তর প্রচেষ্টা আমাদের বন্ধ ঘরে কড়া নাড়ে বন্দিত্ব থেকে জেগে ওঠার। তাদের সাহসী উত্তরণ, ক্ষমতায়ন, মহৎ ও সৎ নেতৃত্ব দেখে আমাদের মনের কোণে লুকিয়ে রাখা স্বপ্নগুলো যেনো জ্যোৎস্নার দিকে পাখা মেলে; যেই স্বপ্ন মুক্তির স্বাদ ও অনুভূতি নিয়ে আকাশ ছুঁয়ে আলোয় উদ্ভাসিত হবে।

ভ্রমণকাহিনী

মন্ট্রিয়ল সৌন্দর্য

জেমস্ গমেজ (আদি)

গত জুলাই মাসে সপ্তাহখানেক সময় মিনি ভেকেশনে গিয়েছিলাম কানাডায় মন্ট্রিয়ল শহরে। মন্ট্রিয়লের সৌন্দর্য সত্যিই আমাকে অভিভূত করেছে। শেষবার মন্ট্রিয়ল গিয়েছিলাম ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে ঝর্ণা ও এনটোনিও'র বিয়েতে। বিশ বৎসর পর মন্ট্রিয়ল এখনো বেশ সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন আছে, শহর কর্তৃপক্ষ সেই মাপের পরিচ্ছন্ন রেখেছে। মন্ট্রিয়ল সৌন্দর্য ও রূপের বাহার আমার মন হৃদয় সত্যিই কেড়ে নিয়েছে।

আমি ও আমার স্ত্রী সুইটি, দু'জনে গাড়ি চালিয়ে মন্ট্রিয়লে যাবার পরিকল্পনা করলাম। ছ'ঘন্টা লেগেছে নিউ জার্সি থেকে মন্ট্রিয়ল শহরে পৌঁছাতে। মাঝপথে দু'বার থেমেছিলাম। গাড়িতে গ্যাস নিয়ে এবং কিছু খাবার খেয়ে সোজা রাস্তায় চললাম। দুপুর থাকতে রওনা দিয়েছিলাম তাতে আপ-স্টেট নিউইয়র্কে রাস্তার দু'পাশের সবুজে ঘেরা বিশাল গাছগুলো দেখে মনে হচ্ছিল কেউ যেন এ প্রকৃতিকে চিত্রাকারে আর্ট করে রেখেছে।

কানাডার সীমানাতে পৌঁছালে, বর্ডার পোস্টে পাসপোর্টের কাজ সেরে আবারো ৪৫ মিনিট গাড়িতে অতিক্রম করলাম। বেশ হাল্কা-পাতলা রাস্তা, তেমন ট্রাফিক ছিল না। সোজা গিয়ে উঠলাম মন্ট্রিয়ল শহরের এক স্থানীয় মোটেলে। মোটেল'টা বেশ ভালই ছিল। আমরা পরিকল্পনা করেছি বেশ কয়েকটা শহরে পরির্দশন করব। সেই সাথে কিছু আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতেও পরিদর্শন করব। আমাদের থাকার জন্য মোটেল'টা সব শহরের মাঝপথেই নিয়েছিলাম যাতে আমাদের বেশি ড্রাইভিং করতে না হয়। সেই সাথে সময়ও বেঁচে যায়।

প্রথমদিন মোটেলে উঠে, সব কিছু রেখে রাত্রে গিয়েছিলাম ডাউন-টাউন। ডাউন-টাউন বেশ জমজমাট, দোকানপাট পর্যটকদের জন্য বেশ রাত পর্যন্ত খোলা রাখে। আবহাওয়া বেশ ভালো, বেশ বার ও নাইট ক্লাব আছে চারপাশে। কাজেই যুবক-যুবতীদের আনা-গোনা চতুর্দিকে যথেষ্ট। বার ও নাইট ক্লাব থেকে মিউজিকের আওয়াজ এলাকাটাকে মাতিয়ে রেখেছে। ধারের কাছে এক রেস্টুরেন্টে বসে মন্ট্রিয়লের স্থানীয় খাবার পুটিন (POUTINE) খেলাম, বেশ সুস্বাদু ছিলো বটে। এরপর একটু হাঁটাহাটি করে মোটেলে চলে এলাম।

দ্বিতীয় দিনে আমরা গিয়েছিলাম The Montreal Botanical Garden- এ। এই গার্ডেনটি যেখানে অবস্থিত তার নাম হচ্ছে The Borough Of Rosemeont-La-Pette-Patrie, এর পার্শ্বে রয়েছে Olympic Stadium, মন্ট্রিয়ল বোটানিক্যাল গার্ডেনের সৌন্দর্য সত্যিই আমাকে অভিভূত করেছে। এর মধ্যে আছে চাইনিজ গার্ডেন, জাপানিজ গার্ডেন ও রোজ গার্ডেন। বিশাল একর জুড়ে এ বোটানিক্যাল গার্ডেন, যেখানে পুরো গার্ডেনটা ঘুড়ে-বেড়াতে ও দেখতে প্রায় তিন ঘন্টা লাগে। চাইনিজ গার্ডেনে ঢুকতেই দেখা যায় চাইনিজ স্টাইলে বাড়ি যার আশেপাশে শতশত চাইনিজ দেশের ফুলের সমাহার। মাঝে মাঝে পুকুর সেই সাথে ফোয়ারাও রয়েছে বেশ। মনে হলো পুরো পৃথিবীটাই রঙ্গিন ফুলের সৃষ্টি। পাশের গার্ডেনটি হচ্ছে

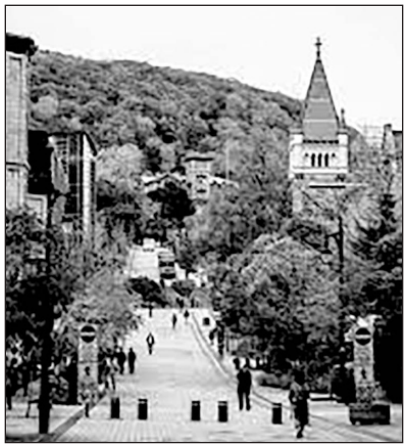

জাপানিজ গার্ডেন যেখানে সব ফুল গাছগুলো জাপান দেশ থেকে আনা হয়েছে। বিশাল এ জাপানিজ গার্ডেন হাজার হাজার ফুল গাছের সমাহার। এমন ফুল আমি জীবনে কখনোই দেখিনি।

এরপর গার্ডেনটি হচ্ছে Rose Garden. গোলাপ গাছ ও ফুলের সমাহার দেখে আমি হতবাক এমন গোলাপ ফুল আমি এর আগে কখনোই দেখিনি আর ফুলের যেমন সৌন্দর্য তেমন তার সুগন্ধি। মন জুড়ানোর এক স্বপ্নপুরি। আমরা প্রায় তিন ঘন্টা হেঁটে হেঁটে ঘুরে দেখলাম চাইনিজ ও জাপানিজ দেশের ফুলের সমাহার। রঙ-বেরঙের ফুলের বাহার আবার ফুলের সুগন্ধিতে প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

তৃতীয় দিনে গিয়েছিলাম মন্ট্রিয়লের St. Joseph Oratory তে যেখানে সাধু ব্রাদার আন্দ্রে বেসসেট চির নিদ্রায় শায়িত আছেন। ব্রাদার আন্দ্রে নির্মাণ করেছিলেন এ বিশাল St. Joseph Oratory প্রতি বৎসর প্রায় দুই মিলিয়ন তীর্থযাত্রী এ অরাটরিতে পরিদর্শন করতে আসে। বিশেষ করে যাদের পায়ের সমস্যা আছে কিংবা পায়ে ব্যথা আছে। তারাই আসে এখানে। অনেক বিশ্বাসী তীর্থযাত্রীগণ যারা ব্রাদার আন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করে ভালো হয়েছেন আরোগ্য লাভ করেছেন তারা তাদের লাঠি কিংবা হুইলচেয়ার গুলো এ অরাটরিতে রেখে গেছেন। উপরে বিশাল বড় গির্জা রয়েছে যেখানে প্রতিদিন খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। ছোট্ট শহরটি দেখা যায়। কি অপূর্ব এ মন্ট্রিয়ল শহর। ব্রাদার আন্দ্রে এক হলিক্রস সম্প্রদায়ের ব্রাদার ছিলেন। বর্তমানে St. Joseph Oratory তে বাংলাদেশী পাঁচজন ব্রাদার ও ফাদার বিভিন্ন দায়িত্বে কর্মরত আছেন। এ অরাটরির সম্মুখে বিশাল নটরডেম কলেজ অবস্থিত।

সময় করে আমরা কিছু আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। তন্মধ্যে মন্ট্রিয়লের পুরাতন বাসিন্দা মি. সুনীল গমেজ মানুর বাড়িতে গিয়েছিলাম। এর আগেও স্ত্রী রেণু গমেজ বেশ অসুস্থতার কারণে তাদের দেখতে আসা। সম্পর্কে উনারা আমার মামা-মামী। তাদের বাড়িতে আসার পর সাদরে আমাদের গ্রহণ করেন। মি. সুনীল গমেজ কর্মজীবনে একজন বড় শেফ্ ছিলেন। মন্ট্রিয়লের স্থানীয় ও জনপ্রিয় এক ইহুদী মালিকানা Moishes রেস্টুরেন্টে তিন দশকের বেশি চাকুরি করেন। তার বানানো Steak বেশ নামকরা। আমি তার রেস্টুরেন্টে Steak খেয়েছি এবং তার বাড়িতেও খেয়েছি। এক কথায় বলব অসাধারণ এবং খুবই সুস্বাদু। তাদের দু'জনকে দেখে বেশ ভালো লাগল।

একই দিনে এন্ড্রু ও রিক্তা নিমন্ত্রণ দিয়েছিলো ওদের বাড়িতে নৈশভোজের। এন্ড্রু আমার মামাতো ভাই ও রিক্তা তার বৌ। ঐ বিকেলে ওরা আমাদের নিয়ে গিয়েছিল বাড়ির কাছে একটি বিশাল পার্কে। সেই পার্কের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে Canal Lachine, তা দেখে মনে পড়ে গেল আমার বাংলাদেশে ফেলে আসা ইছামতি নদীকে। এরপর এন্ড্রু ও রিক্তাদের বাড়িতে নৈশভোজ করলাম হরেক রকম হাতে বানানো সুস্বাদু রান্না দিয়ে।

দেখতে দেখতে একটি সপ্তাহ পার হয়ে গেল এ মন্ট্রিয়লে। এ শহরটি অনেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। রাস্তাঘাটে কোনো ময়লা আবর্জনা নেই। কোনো কোনো জায়গায় সমতল আবার কোনো কোনো জায়গায় ছোট পাহাড়। মন্ট্রিয়লের সৌন্দর্য, পরিবেশ, জনগণের ব্যবহার সত্যিই আমাকে অভিভূত করেছে যা আমি আজো হৃদয়ে রেখে দিয়েছি।

আশার তীর্থযাত্রা-২০২৫ খ্রিস্টাব্দ : তীর্থস্থানে অনন্য অভিজ্ঞতা

ফাদার যোহন মিন্টু রায়

খ্রিস্টজন্ম জয়ন্তী বর্ষ-২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

এই পৃথিবীতে মানব মুক্তিদাতা যিশুখ্রিস্টের জন্ম হয়েছিল ২০২৫ বছর পূর্বে। তার জন্মবর্ষ অনুযায়ী রোমান ক্যালেন্ডারে খ্রিস্টাব্দ গণনা যেমন শুরু হয়েছিল; তেমনি স্বর্গদুয়ার খুলে গিয়েছিল, পৃথিবীতে শুরু হয়েছিল পাপমুক্তি ও ভালোবাসার পৃথিবী গড়ার এক ভালোবাসার তীর্থযাত্রা। ইতিহাস থেকে জানা যায় প্রাচীনকালে ইহুদীরা মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্তির জুবিলী উৎসব পালন করতো। তবে খ্রিস্টমণ্ডলীতে জুবিলী পালনের প্রচলন করেন পোপ অষ্টম বনিফাস; ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে আশীর্বাদের শতবর্ষ, পূণ্যবর্ষ পালনের মাধ্যমে। আর এখন খ্রিস্টমণ্ডলীতে জুবিলী পালিত হয় ২৫ বছর পর পর। তাই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ হলো খ্রিস্টজন্মজয়ন্তী বর্ষ।

১. তীর্থযাত্রার প্রেক্ষাপট

আমি যাজক হিসেবে অভিষিক্ত হয়েছি ৩১ ডিসেম্বর ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে গুল্টা ধর্মপল্লীতে। যাজক হবার পর থেকেই মনে সুপ্ত বাসনা ছিল খ্রিস্টধর্মের তীর্থভূমি ইতালির রোম, ভাটিকান, ফ্রান্সে মারীয়ার দর্শনদানের স্থান লুর্দ এবং কোনদিন সুযোগ হলে পর্তুগালে কুমারী মারীয়া যেখানে দেখা দিয়েছিলেন সেই ফাতিমা দেখতে যাব। মনে মনে ভেবেছিলাম ইউরোপের কোন দেশে পড়াশোনার সুযোগ হলে ঐসব দেশ এবং জায়গাগুলো তো দেখা যাবেই। কিন্তু আমাকে পড়াশোনা করতে পাঠানো হয়েছিল ফিলিপাইনে। সেটিও দারুণ এক অভিজ্ঞতা ও ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদ। তবে যাজক হবার ১৭ বছর পর এবার জুবিলীবর্ষে পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ জের্ভাস রোজারিও-এর অনুমতি ও উদারতায় এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদে সুযোগ হয়েছিল তীর্থে যাবার। জুবিলী বর্ষে "আশার তীর্থযাত্রা"-এর সেই অভিজ্ঞতাই আমি ধাপে ধাপে আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

২. যাত্রা হলো শুরু

১৭ জুন ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, রোজ মঙ্গলবার যাত্রা হলো শুরু। ইমিগ্রেশনে সকল কার্যক্রম শেষ করে সকাল ১০:৩০ এর মধ্যে কাতার এয়ারওয়েজ-এর নির্দিষ্ট প্লেনে উঠে আসন গ্রহণ করলাম। সকাল ১০:৫৫ মিনিটে প্লেন রানওয়েতে যাত্রা শুরু করল এবং সুন্দরভাবে প্লেন টেক অফ করে ১১ হাজার ফিট উচ্চতা দিয়ে প্রায় ১০৫০ কিলোমিটার বেগে চলতে লাগলো। আমরা প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘন্টা আকাশে উড়ার পর কাতারের রাজধানী দোহা হামদ্ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে পৌঁছলাম। সেখানে দুই ঘন্টা ট্রানজিট বিরতির পর আবারও রোমের উদ্দেশে যাত্রা এবং ইতালীর স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৯:৩০ এ রোমের লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি এয়ারপোর্টে পৌঁছলাম। ইমিগ্রেশনের কার্যক্রম শেষ করে একটি বাংলাদেশী টেক্সিতে গাব্রিয়েলে ব্রাদারদের হাউসে পৌঁছলাম প্রায় রাত ১১টায়। সামান্য কিছু খেয়ে বিশ্রাম নিলাম ঐ রাতে। রোমে প্রথম তিন দিন ১৮-২০ জুন এর অভিজ্ঞতা ছিল দারুণ।

৩. ভাটিকান চত্বর ও পোপের সাথে সাক্ষাৎ

তীর্থযাত্রার প্রথম দিন-১৮ জুন ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, রোজ বুধবার। বুধবার হওয়ায় আমাদের জন্য ছিল আশীর্বাদের কেননা ঐদিন ছিল পোপ মহোদয়ের জনগণের সঙ্গে সাক্ষাতের দিন। রাজাশাহী ধর্মপ্রদেশের সেমিনারীয়ান পলাশ সরেন আমাদের জন্য দু'টি প্রবেশ-টিকিটের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। আমরা ছিলাম ভাটিকানের নিকটস্থ সান পিয়েত্র স্টেশন থেকে প্রায় ৭ স্টেশন দূরে গাব্রিয়েলে ব্রাদারগণের হাউসে। তাই পোপকে দেখার জন্য খুব ভোরে ৫:১৫ মিনিটে ঘুম থেকে উঠে রওনা দিয়ে সকাল ৮:০০ এর পূর্বে ভাটিকান চত্বরে পৌঁছে যাই এবং সিকিউরিটি চেক শেষে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকি নবনির্বাচিত পোপ চতুর্দশ লিও-কে দেখার জন্য। শুধু আমরা নই, শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতী, পিতা-মাতা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা তথা সকল বয়সী হাজার হাজার খ্রিস্টভক্ত সেখানে উপস্থিত ছিল। উপস্থিত ছিল আফ্রিকা, এশিয়া, আমেরিকা, ইউরোপসহ সকল মহাদেশের নানান দেশের নানান ভাষা ও জাতিগোষ্ঠীর মানুষ। আমাদের ভাষা-কৃষ্টি-সংস্কৃতি আলাদা হলেও আমার মনে হয়েছে, আমরা বিশ্বাসে এক, একই যিশুর শিষ্য, একই সার্বজনীন মণ্ডলীর সদস্য। আর যার জন্য অপেক্ষা করছি তিনি হলেন অপর-খ্রিস্ট, খ্রিস্টের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি পোপ চতুর্দশ লিও। সকাল ৯টা বাজার পূর্বেই সিকিউরিটিসহ পোপের খোলা সাদা গাড়িটি ভাটিকান সেন্ট পিটারস্ স্কয়ারে প্রবেশ করলে চারিদিকে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল। আমরা যে রাস্তার ধারে ছিলাম তার খুব কাছ থেকে আমরা পোপ মহোদয়কে দেখলাম। স্বপ্নের মতো মনে হলো-হৃদয় পূর্ণ হলো আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায়। এরপর ইতালিয়ান, ইংরেজী, স্পেনিস, আরবীসহ বিভিন্ন ভাষায় মঙ্গলসমাচার পাঠ করা হয়, পোপ মহোদয় ক্ষুদ্র উপদেশ ও আশীর্বাদ প্রদান করেন।

৪. চারটি পবিত্র দরজা

জুবিলী বর্ষ ২০২৫-এর শুরুতেই ইতালির রোম নগরের ৪টি বাসিলিকার চারটি মূল দরজাকে 'পবিত্র দরজা' হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এই চারটি বাসিলিকা হলো, ১) সাধু পিতরের বাসিলিকা ২) সাধু জন লাতেরান বাসিলিকা ৩) সেন্ট মেরী মেজর বাসিলিকা এবং ৪) সাধু পল-এর বাসিলিকা। এই চারটি বাসিলিকার দরজা স্পর্শ করে প্রার্থনা করলে এবং এসব দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে পাপের ক্ষমা ও জীবনে আধ্যাত্মিক নবায়ন আসবে এবং ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদ লাভের সুযোগ ঘটবে। তাই এই চারটি বাসিলিকা ও পবিত্র দরজা হয়ে উঠেছে এ জুবিলী বর্ষে বিশেষ আশীর্বাদ ও আশার প্রতীক। পিতা ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই কেননা এ চারটি বাসিলিকার 'পবিত্র দরজা' দিয়ে প্রবেশ, প্রার্থনা ও ঘুরে ঘুরে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আমার।

৫.১ সাধু পিতরের বাসিলিকা

পোপ মহোদয়কে দেখার পর আমরা দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম সাধু পিতরের বাসিলিকা দেখবো বলে। প্রভু যিশুর মনোনীত দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রথম পোপ সাধু পিতরের কবরের উপর তৈরি ধর্মীয় কার্যাকার্যখচিত সাধু পিতরের বাসিলিকা বিশ্বব্যাপী খ্রিস্টান তীর্থযাত্রীদের প্রথম ও প্রধান আকর্ষণ। গত বড়দিনের (২০২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর) সান্ধ্য খ্রিস্টযাগে এই বাসিলিকার মূল দরজা 'পবিত্র দরজা' হিসেবে সকল তীর্থযাত্রীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। বাসিলিকার ভেতরে প্রবেশ করে মাইকেল আঞ্জেলোসহ জগৎ বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা চিত্রকর্ম ও বিভিন্ন কারুকার্য দেখে সত্যিই মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে ছিলাম। পবিত্র দরজা স্পর্শ করে প্রার্থনা করেছি, ভেতরে প্রবেশ করেও প্রার্থনা করেছি এবং ঘুরে ঘুরে দেখেছি -যেন সৌন্দর্য ও পবিত্রতার, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের এক চরম সাক্ষী এই বাসিলিকা যা দেখে মনে পড়েছে প্রভু যিশুর সেই কথা, "পিতর তুমি পাথর, তোমার উপরই আমি আমার মণ্ডলী গড়ে তুলবো" *(মথি ১৬:১৮)*।

৫.২ সাধু জন লাতেরান বাসিলিকা

এরপর দেখতে গিয়েছিলাম সাধু জন লাতেরান বাসিলিকা। এটিকে আর্চ-বাসিলিকাও বলা হয় যা 'পশ্চিমা খ্রিস্টিয়ানিটির মাদার চার্চ' বলেও পরিচিত। এটি আসলে রোমে পোপের ক্যাথেড্রাল গির্জা। এই আর্চ-বাসিলিকা কাথলিক বিশ্বাসের সূতিকাগার

কেননা এখান থেকে বিশ্বাসের অনেক বিষয় ঘোষণা করা হয়েছে এবং অনেক জন পোপ এখান থেকে মুকুট পড়া বা দায়িত্ব পালন শুরু করেছিলেন। এখানে এক্স-ক্যাথেড্রাল বা পোপের চেয়ার রয়েছে যেখান থেকে পোপ মহোদয় বিশ্বাসের ব্যাপারে ঘোষণা দেন যা অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করা হয়। এছাড়াও এখানে সাধু পিতর ও পলের স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে, পোপ ত্রয়োদশ লিওসহ ছয়জন পোপের কবর রয়েছে। ১৪২৩ খ্রিস্টাব্দে যখন জুবিলী ঐতিহ্য ও জুবিলী পালনের

শুরু হয় এই বাসিলিকায় প্রথম পবিত্র দরজা ঘোষণা করা ও খ্রিস্টভক্তদের জন্য খুলে দেওয়া হয়। জানা যায়, এর পবিত্র দরজা এবছর ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খোলা থাকবে। এখানে বার শিষ্যের মূর্তিসহ কারুকার্য দেখে মুগ্ধ হয়েছি, প্রার্থনা করে অন্তরে শান্তি ও শক্তি লাভ করেছি।

৫.৩ সেন্ট মেরী মেজর বাসিলিকা

রোমে তীর্থের দ্বিতীয় দিনে বাংলাদেশের দুই দিদি যথা মিলন গনসালভেস ও লিনা জাম্বিল আমাদের সেন্ট মেরী মেজর বাসিলিকায় নিয়ে যান। এটি পবিত্রা কুমারী মারীয়ার কাছে উৎসর্গীকৃত রোমে সবচেয়ে বড় গির্জা বা বাসিলিকা। ৪৩১ খ্রিস্টাব্দে এফেসাস মহাসভার পর এটি নির্মাণ করা হয়েছিল যা হয়ে উঠেছে রোম নগরীতে মারীয়ার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের কেন্দ্রীয় স্থান। রোমের এই পুরাতন গির্জার মোজাইক ও কারুকার্য অবাক চোখে দেখেছি যেখানে কুমারী মারীয়ার জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও দিক ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সেন্ট মেরী মেজর বাসিলিকার বেল টাওয়ার সব বাসিলিকার চেয়ে উঁচু যার উচ্চতা ২৪০ ফিট। তীর্থযাত্রীগণ এখানে মা মারীয়ার রক্ষাকারী শক্তি ভিক্ষা এবং জীবনের নানান অভাব বা প্রয়োজন পূরণে, ঐশকৃপা লাভে মায়ের মধ্যস্থতা কামনা করে। আমি রক্ষাকারী মা মারীয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের জন্য, বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর জন্য, যারা প্রার্থনা চেয়েছিলেন তাদের জন্য এবং সকলের সার্বিক মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা করেছি।

৫.৪ সাধু পল-এর বাসিলিকা

সেন্ট মেরী মেজর বাসিলিকা দেখা শেষ হলে লিনা জাম্বিল দিদি আমাদের নিয়ে গেলেন সাধু পলের বাসিলিকা দেখতে। মেট্রোতে বাসিলিকা সান পাউলো স্টেশনে নেমে হাঁটতে হাঁটতে আমরা পৌঁছে গেলাম বাসিলিকার গেটে। বাসিলিকার সামনে রয়েছে সাধু পলের এক বিশাল প্রতিকৃতি। অন্যদের মতো আমিও সেখানে ছবি তুললাম। এরপর পবিত্র দরজা স্পর্শ ও প্রার্থনা করে ভেতরে প্রবেশ করলাম। বাসিলিকার সামনের দিকে মোজাইক পাথরে তৈরি সাধু পলের প্রতিকৃতির পাশেই সাধু পলের মূল কবর। সিঁড়ি দিয়ে একটু নিচে নেমে সাধু পলের কবরের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করলাম। এরপর লক্ষ্য করলাম সাধু পলের এই বাসিলিকায় উপরের দিকে ধারাবাহিকভাবে প্রথম পোপ পিতর থেকে শুরু করে পোপ ফ্রান্সিস পর্যন্ত সকল পোপের ছবি ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখা আছে। সাধু পলের কবর ও স্মৃতি বিজরিত এ বাসিলিকা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে খ্রিস্টবাণী প্রচারে সাধু পলের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচার যাত্রা এবং তার সেই বিখ্যাত উক্তি: 'হায়রে আমি! মঙ্গলবাণী যদি না প্রচার করি! *(১ করিন্থীয় ৯:১৬)*।

৬. জল-নগরী ভেনিস ও যাদুঘর

বই-এ পড়েছিলাম মার্চেন্ট অব ভেনিস-এর গল্প। মনে মনে ভেবেছিলাম যদি একদিন যেতে পারি ভেনিস নগরীতে! আর সেই স্বপ্ন-কল্পনা সত্যি হলো। দিনটি ছিল ২৩ জুন, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ। ইতালির ভিসেঞ্জা শহর থেকে ট্রেনে এক ঘন্টা ত্রিশ মিনিটের পথ। ট্রেন থেকে নেমে একটু সামনে এগিয়ে গেলেই শুরু নদী, নদীর উপর ব্রিজ আর শুরু সেই ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সৌন্দর্যের নগরী ভেনিস। হেঁটে হেঁটে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত ঘুরে দেখলাম। সাধু মার্কের বাসিলিকা দেখে মুগ্ধ হলাম। ডোজের প্রাসাদের যাদুঘরে প্রবেশ টিকিটের মূল্য ৩০ ইউরো। টিকিট কিনে প্রবেশ করলাম। কারুকার্য, শিল্পকর্ম, চিত্রকর্ম নানান জিনিস দেখলাম প্রায় ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট। যাদুঘরের টাওয়ার থেকে সাগর, জাহাজ, সমুদ্রের পাখি এলবাটরস্ ও জল-নগরীর সৌন্দর্য দেখলাম। এরপর যাদুঘরের কাছ থেকে স্টেশনের নদী পর্যন্ত বোর্ডে উঠে জল-নগরীর সৌন্দর্য দেখতে দেখতে ফিরে এলাম ভেনিজিয়া স্টেশনে। সেখান থেকে ফিরলাম ভিসেঞ্জাতে।

৭) পাদুয়ার সাধু আন্তনীর তীর্থ-মন্দির

২৪ জুন, রবিবার সকালে আমরা ইতালির ছোট্ট শহর ভিসেঞ্জা থেকে ট্রেনে বলনিয়ার উদ্দেশে রওনা হই। ট্রেন ইতালিয়ার একটি আঞ্চলিক ট্রেনে চেপে আমরা প্রায় দুই ঘন্টার মধ্যে আরেকটি শহর বলনিয়া পৌঁছাই। সেখান ভাস্কর পালমা দাদা আমাদের তার পরিবারের কাছে নিয়ে যায়। দুপুরের আহারের পর তাদের গাড়িতে করে আমাদের নিয়ে যায় ১২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত পাদুয়ার সাধু আন্তনীর তীর্থমন্দিরে। বিকাল ৪টার দিকে সেখানে পৌঁছে দেখতে পাই রবিবাসরীয় বৈকালীন খ্রিস্টযাগ চলছে। আমরা খ্রিস্টযাগে যোগদান করি। খ্রিস্টযাগের পর ঘুরে ঘুরে আমরা দেখি সাধু আন্তনীর সংরক্ষিত জিহ্বা, দাঁত এবং অন্যান্য ব্যবহার্য সামগ্রী। বিখ্যাত প্রচারক সাধু আন্তনীর স্মৃতিচিহ্ন দেখে ও তার মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করে, সেখানে খ্রিস্টযাগে যোগদান করে মনে লাভ করেছি শান্তি, আনন্দ ও প্রেরণা। জয় সাধু আন্তনী!

৮. মন্সা পিমে সেমিনারী-মিশনারী যাজক গঠনের বীজভূমি

পরিবারকে বলা হয় 'আহ্বান জীবনের বীজতলা'। আর প্রতিটি সেমিনারী হলো: যাজকীয় গঠন জীবনের বীজভূমি বা মাতৃ-ভূমি। বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ কথা বৃহত্তর দিনাজপুর ও বর্তমান রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের অধিকাংশ মিশন, স্কুল, চিকিৎসাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন সুদূর ইতালি থেকে আসা পিমে মিশনারী যাজকগণ। ছোটবেলা থেকেই পিমে মিশনারী যাজকগণকে দেখেছি এবং পরবর্তীতে মন্সা সেমিনারীর নামও শুনেছি। পিমে মিশনারী যাজকগণের অনেকেই মন্সা সেমিনারীতে পড়াশোনা ও গঠন লাভ করেছেন। আর ইতালির মিলান শহর থেকে আমি ও ফাদার প্রদীপ কস্তা প্রথমে গিয়েছিলাম লেক্কো-তে যেখানে আমাদের বাংলাদেশ থেকে ৩ জন শান্তিরাণী সিস্টার মিশনারী হিসেবে কাজ করেন সেখানে। আমাদের পথ প্রদর্শক দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের ভূমিকা পালন করে প্রাক্তন পিমে সেমিনারীয়ান বোর্ণী ধর্মপল্লীর সন্তান শাওন রোজারিও। লেক্কো সিস্টার বাড়িতে

দুপুরের আহার ও গল্প শেষে আমরা বাসে যাই ফৈলজানা ধর্মপল্লীর সন্তান ডেভিট রোজারিও-এর বাসায়। সেখানে অনেকের সাথেই সাক্ষাৎ হয়। চা-পর্ব ও গল্প-আলাপ শেষে তারা গাড়ী দিয়ে সন্ধ্যায় আমাদের মন্সা সেমিনারীতে পৌঁছে দেয়। সেমিনারীর রেক্টর এবং বাংলাদেশ থেকে পিমে সেমিনারীয়ান রকি রয় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। রেক্টর আমাদের স্বাগত জানান এবং রাতের আহারের পরে আমরা বিশ্রাম নিই। পরের দিন রকি আমাকে নিয়ে যায় মন্সা থেকে ৪০মিনিট হাঁটা দূরত্ব পিমে সিস্টারগণের হাউসে। সেখানে বাংলাদেশের পিমে সম্প্রদায়ের প্রাক্তন সুপিরিয়র সিস্টার বন্দনা ক্রুশ আমাদের স্বাগত জানান। আরেকজন ফাদারের সাথে সহার্পিত খ্রিস্টযাগ ও নাস্তার পর দীর্ঘদিন মুলাডুলি ধর্মপল্লীতে কর্মরত এখন অসুস্থ সিস্টার ফিলোমিনা'সহ আরও দু'জন বৃদ্ধা সিস্টারদের সাথে সাক্ষাতের পর মন্সা ফিরে আসি।

৯. সতো এল মন্তে দর্শন

বাংলাদেশে দীর্ঘদিন মিশনারী হিসেবে যাজকীয় সেবাকাজ করেছেন শ্রদ্ধেয় ফাদার কার্লো দত্তি পিমে। তিনি তার নিজ দেশ ইতালিতে ফিরে গিয়ে এখন আছেন মন্সা পিমে সেমিনারী থেকে গাড়িতে ১ ঘন্টার একটু বেশি দূরত্ব একটি পাহাড়ী জায়গাতে যার নাম - সতো এল মন্তে। এটি মূলত পোপ এয়োবিংশ যোহনের পিতা-মাতার বাড়ি যেখানে তিনি বেড়ে উঠেছিলেন। এটি এখন একটি তীর্থস্থান যেখানে অনেক মানুষ দেখতে ও প্রার্থনা করতে যান। আমি ও ফাদার প্রদীপ মন্সা সেমিনারী থেকে সকালে রওনা হয়ে সকাল ১১টার দিকে 'সতো এল মন্তে' পৌঁছি। ফাদার কার্লো দত্তি আমাদের স্বাগত জানান। কফি ও জলযোগের পর তিনি তীর্থস্থানটি আমাদের ঘুরিয়ে দেখান। পোপ এয়োবিংশ যোহনের কৃষক পিতামাতার কৃষিকাজের সামগ্রী, আঙ্গুর চাষ ও আঙ্গুর পেষাই-এর ঐ যুগের যন্ত্রপাতি, প্রতীক আঙ্গুরলতা, ভূট্টা, বাধাকপি-গাজরসহ বিভিন্ন সবজি যাদুঘরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। অন্য ঘরে পোপ এর জীবনী ও পোপ হিসেবে তার কার্যসকল চিত্রে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দুপুরে খাবারের পর ফাদার কর্লো দত্তি তাঁর পুরাতন অ্যালবাম নিয়ে আসেন আমাদের দেখাতে। পরিবারে তার মা বাবা, ভাই-বোনসহ আত্মীয় বন্ধুদের ছবির সাথে সেই ৫০ বছর বা তারও আগে বাংলাদেশে আসা মিশনারী যুবক ফাদার কান্তন, ফাদার মারিয়ানো, ফাদার স্কুকাতো, ফাদার মিলি, ফাদার স্পিনেল্লীর ছবি দেখান। এ যেন তীর্থের মাঝে আরেক তীর্থ, বুঝলাম-'জীবন ছবি কথা বলে'। বিকেল পর্যন্ত সেখানে থেকে ট্রেনে আমরা আবার মন্সা সেমিনারীতে ফিরে এলাম।

১০. সুইজারল্যান্ডে একদিন

পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরতম দেশগুলির একটি হলো: সুইজারল্যান্ড; কিন্তু সুইজারল্যান্ডে থাকা ও বেড়ানো অনেক অনেক ব্যয়বহুল। তাই পরিকল্পনা করলাম সুইজারল্যান্ডে যাব ঠিকই কিন্তু সারাদিন ঘুরে আবার মিলান ফিরে আসবো। পরিকল্পমতো শাওন রোজারিও আমাদের জন্য ট্রেনের টিকেট কেটে রেখেছিল। আমরা ২৩ জুন, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে মিলান সেন্ট্রাল স্ট্রেশন থেকে ট্রেনে রওনা হলাম সকাল সাতটায়। তিন ঘন্টার মধ্যে সকাল দশটায় জুখ পেরিয়ে সুইজারল্যান্ডের রাজধানী জুরিখ পৌঁছে গেলাম। সকালে ট্রেনের জানালা দিয়ে দেখছিলাম উঁচু-নিচু পাহাড়ের সমতলে ছবির মতো এক একটি বাড়ি-ঘর। জুরিখে একটি পার্কে বসে বসে সঙ্গে নেওয়া নাস্তা খেলাম। এরপর জুরিখ ঘুরে ঘুরে দেখলাম। সবচেয়ে মুগ্ধ হয়েছি লেক অব জুরিখ-এর দৃশ্যে। অপরূপ, মনোরম দৃশ্য। এভাবে সারাদিন ঘুরে ফিরে সন্ধ্যার ট্রেনে ফিরে এলাম মিলানে।

১১. পর্তুগালের ফাতিমা

২০২৫ খ্রিস্টাব্দে জুবিলী বর্ষে পর্তুগালের ফাতিমা তীর্থের অভিজ্ঞতা বর্ণনার শুরুতে এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলে নেওয়া অতি আবশ্যক। ঘটনাটি ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের। জানা যায়, ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে, ১৩ মে ভেড়া চড়াতে পাহাড়ে যায় রাখাল বালিকা লুচিয়া সানতোষ, তার কাকাতো ভাইবোন ফ্রান্সিসকো ও যাচিন্তা মারতো। তারা প্রথমে একটি শব্দ শোনে এবং উজ্জ্বল বসনা এক নারীকে দেখতে পায় যিনি নিজেকে জপমালার রাণী বলে পরিচয় দেন। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের, ১৩ অক্টোবর প্রায় সত্তর হাজার মানুষ ফাতিমাতে সমবেত হয় এবং এক আশ্চর্য সূর্যগ্রহণের ঘটনা দেখতে পায় এবং এর পরপরই সেই তিন কিশোর-কিশোরীর কাছে জপমারার রাণী মারীয়া দর্শন দেন। এভাবে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত অসংখ্যবার লুচিয়া, ফ্রান্সিসকো ও যাচিন্তাকে দেখা দিয়েছিলেন জপমালার রাণী মা মারীয়া। পর্তুগালের লেইরিয়ার বিশপ ১৩ অক্টোবরে এ ঘটনাকে 'জপমালার রাণী মারীয়ার দর্শন' হিসেবে গ্রহণ করেন এবং একই বছরে পোপ পঞ্চদশ বেনেডিক্ট ফাতিমার ঘটনা সত্য এবং এটিকে তীর্থস্থান হিসেবে ঘোষণা দেন।

গত ০৫ জুলাই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে সকালে আমরা ভিলা রিয়েল থেকে বিদায় নিয়ে বাসে ফাতিমার উদ্দেশে রওনা দিই। আমাদের সেন্ট লুইসের প্রাক্তন শিক্ষার্থী সোহাগ আমাদের বাসে তুলে দিয়ে বিদায় নেয়। বেলা ১১:৩০ এর দিকে বাস আমাদের ফাতিমার কাছাকাছি টার্মিনালে নামিয়ে দেয়। আমরা বাস টার্মিনালের লকারে ১০ ইউরো দিয়ে লাগেজ ও বড় ব্যাগ রেখে হেঁটে ফাতিমার উদ্দেশে রওনা হই। তীর্থস্থান ছিল কাছেই, ২০ মিনিট হাঁটার পরে আমরা মূল তীর্থস্থানে উপস্থিত হই। যেখানে জপমালার রাণী দেখা দিয়েছিলেন সেই গ্রটোর সামনে খ্রিস্টযাগ চলছিল পর্তুগীজ ভাষায়। কিছুক্ষণ সেখানে বসে প্রার্থনা করার পর আমরা ফাতিমার ছোট্ট ব্যাসিলিকা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। সেখানে দেখলাম বেদীর দুপাশে লুচিয়া, ফ্রান্সিকো ও যাচিন্তার কবর। প্রার্থনা করলাম তাদের কবরের সামনে, ছবি নিলাম। এরপর ফিরে এলাম মূল গ্রটোর সামনে যেখানে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ হয় এবং জানতে পারলাম পরের খ্রিস্টযাগ বিকাল ২:৩০ মিনিটে ইংরেজীতে। আমরা অপেক্ষা করলাম এবং সহার্পিত খ্রিস্টযাগে যোগ দিলাম। শেষে বিকাল ৫টার দিকে সেখান থেকে লিসবনের উদ্দেশে রওনা হলাম। ফাতিমা তীর্থস্থান, লুচিয়া-ফ্রান্সিকো-যাচিন্তার কবর, জপমালা রাণীর কাছে প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগ আমার মনে এনে দিল শান্তি-আনন্দ-কৃতজ্ঞতার পরশ। তীর্থে আমরা পর্তুগালের ফাতিমা যেতে পারি আর না পারি, জপমালা রাণী মারীয়ার কাছে প্রার্থনা করতে যেন না ভুলে যাই আর সর্বদাই যেন মনে রাখি : "জপ রে ভাই দিবানিশি / মেরী নামে জপমালা / জপলে মালা দু'টি বেলা/ রবে না ভাই মনের ময়লা"।

১২. ফ্রান্সের লূর্দ-অভিজ্ঞতা

আমরা ছোটবেলা থেকে গান শুনে ও গেয়ে আসছি-'জপিয়ে ঐ নামের মালা, লূর্দে দর্শন পায় কৃষকবালা/ ঐনামের গুণে, নামের বলে ভাল হয় কত অন্ধ-নুলা।' ঘটনাটি ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের। সেই কৃষক বালা বার্ণাডেট তার প্রতিদিনের কাজের অংশ হিসেবে পাহাড়ের পাদদেশে কাঠ কুড়াতে গিয়েছিল। হঠাৎ বাতাস বয়ে যাওয়ার একটি শব্দ পেল সে। আর সেই শব্দ আসছিল কাছের একটি গ্রটো থেকে। সামনে তাকিয়ে বার্ণাডেট দেখতে পেল স্বর্ণালী আলোতে ভরা এক দারুন সুন্দরী নারীকে যার হাতে একটি রোজারিমালা। এখানেই কুমারী মারীয়া ১৮ বার বার্ণাডেট সুবেরুকে দেখা দিয়েছিলেন। মা মারীয়ার সামনে তার কাছে তিনি রোজারিমালা প্রার্থনা করেছিলেন। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ দূত সংবাদের পর্ব দিবসে বার্ণাডেটকে দেখা দিয়ে তিনি "অমলোদ্ভবা" বলে নিজের পরিচয় দেন। এরপর বার্ণাডেট সন্ন্যাসব্রতীর জীবন যাপন করেন এবং মাত্র ৩৪ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। এখন লুর্দ বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় তীর্থস্থানগুলির একটি যেখানে প্রতি বছর লাখ লাখ তীর্থযাত্রী সুস্থতার জন্য ও মনের নানা প্রার্থনা তুলে ধরেন মা মারীয়ার চরণতলে, প্রার্থনা করেন এবং প্রদীপ প্রজ্বলন করেন।

আমারও বহুদিনের মনোবাসনা লূর্দে যাব। আর মা মারীয়ার স্নেহ-আশীর্বাদে তা পূর্ণ হয়েছিল। আমি এবং ফাদার প্রদীপ কস্তা

ফাতিমা তীর্থ শেষে লিসবনে একটি সাধারণ হোটেলে রাত্রিযাপন করি এবং পরের দিন লিসবন এয়ারপোর্ট থেকে পর্তুগিজ এয়ার-এর একটি বিমানে ফ্রান্সের তুলুসের উদ্দেশে রওনা দেই। তুলুসে অবতরণ করি বিকাল ৫:৩০-এ। বোর্ণী ধর্মপল্লীর বোর্ণী গ্রামের মায়া গমেজ-এর মেয়ে হ্যাপি গমেজ ও সদ্য ফ্রান্সে পাড়ি জমানো সসীম দেশাই এসে আগে থেকেই তুলুস এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছিল। লাগেজ সংগ্রহ এলাকায় দেখা হয়ে গেল পোল্যান্ড থেকে আসা ৪ জন ফাদারসহ এক তীর্থ যাত্রী দলের সাথে তারাও লুর্দে যাবে। তাদের সাথে কুশল বিনিময় শেষে এয়ারপোর্ট এক্সিট দিয়ে বেরিয়ে পেলাম হ্যাপি ও সসীম দেশাইকে। দেশের তথা বোর্ণীর দু'জন ফাদার পেয়ে তারা বেজায় খুশী। তাদের সাথে চললাম হ্যাপিদের বাসায়, সেখানে অপেক্ষা করছিল , হ্যাপীর হাসবেন্ট রিপন। সে আমাদের স্বাগত জানাল। সেটি ছিল ০৮ জুলাই। পরের দিন খুব ভোরে উঠে প্রস্তুত হয়ে নিলাম। হ্যাপী আগেই আমাদের জন্য ট্রেন টিকেট কেটে রেখেছিল। পরের দিন ০৯ জুলাই হ্যাপী-রিপন, আমি, ফাদার প্রদীপ ও সসীম দেশাই রওনা হলাম বহু প্রতিক্ষিত লূর্দের উদ্দেশে। প্রায় ২ ঘন্টা ট্রেন যাত্রা শেষে লূর্দ স্টেশনে পৌঁছালাম। হ্যাপী বলেছিল সকাল সকাল যেতে পারলে হয়তো মিশা পাওয়া যাবে। আমরা হেঁটে হেঁটে যখন মূল তীর্থস্থানে পৌঁছলাম তখন দেখলাম একটি মিশার প্রস্তুতি চলছে। আমি এবং ফাদার প্রদীপ কস্তা গিয়ে বাংলাদেশী কাথলিক যাজক পরিচয় দিয়ে অনুরোধ করায় তারা তাদের সাথে খ্রিস্টযাগে যোগদান করতে বললেন এবং সেইদল এসেছিল আয়ারল্যান্ড-এর লীডস্ ধর্মপ্রদেশ থেকে। সেখানকার বিশপ মার্কুস, ২৭ জন ফাদার ও যুবক-যুবতী, বয়স্ক মিলিয়ে মোট ৮০০ জনের বিশাল তীর্থযাত্রী দল। সেই ইংরেজী মিশায় আমরা সহার্পিত খ্রিস্টযাগে যোগদানের সৌভাগ্য লাভ করি। খ্রিস্টযাগের পর লুর্দের পবিত্র জল সংগ্রহ করি, বিভিন্ন স্থান ঘুরে ঘুরে মোমবাতি উৎসর্গের জায়গায় গিয়ে দেখি ৫/১০ ইউরো থেকে শুরু করে ৫০০ ইউরো পর্যন্ত বড় বড় মোমবাতি রয়েছে এবং বিভিন্ন মানত পূর্ণ হওয়াতে অনেকে ছোট-বড় সব রকম মোমবাতি উৎসর্গ করছে। জীবনে প্রথম দেখলাম লূর্দে ৫০০ইউরো অর্থাৎ বাংলাদেশী টাকায় প্রায় সত্তর হাজার (৭০,০০০) টাকার একটি মোমবাতি এবং ঐ মোমবাতির গায়ে ওজন লেখা রয়েছে ৭০ কেজি। আমরা ছোট একাধিক মোমবাতি উৎসর্গ করলাম। তখন সকাল প্রায় ১০টা, তখনও কিছুই খাইনি। মূল তীর্থস্থান থেকে একটু দূরে গিয়ে কিছু নাস্তা খেয়ে নিলাম। এবার শুরু দ্বিতীয় পর্ব-পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে যিশুর ক্রুশের পথের বড় বড় মূর্তি তথা বিভিন্ন স্থান দেখা। কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না কি করবো। কিন্তু প্রথম স্থান থেকে বাংলায় প্রার্থনা ও ক্রুশের পথের গান করতে করতে চতুর্দশ স্থান পর্যন্ত শেষ করলাম, প্রায় ১ ঘন্টা ৩০ মিনিটে। অনুভব করলাম-ক্লান্তির চেয়ে শান্তি বেশি। পাহাড়ী পথে চলতে চলতে ক্লান্ত কিন্তু এক অন্যরকম ভাললাগা ছিল। মা মারীয়া ও কষ্টভোগী যিশুর আশীর্বাদ ছিল আমাদের সাথে। ক্রুশের পথের পাহাড় থেকে দেখলাম পাহাড়ের সমতলে অনেক গাড়ী পার্কিং করা, অনেক মানুষ বন্ধু-বান্ধব বা সপরিবারে তাবু খাটিয়ে থাকছে এ তীর্থস্থানে। এরপর লুর্দের কিছু স্মৃতিচিহ্ন কিনে আবার ট্রেন স্টেশনে এসে ট্রেনে কর তুলুসে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। এ ছিল এক আশীর্বাদিত দিন-মায়ের আশীর্বাদ সবার জন্য। লুর্দের রাণী মা মারীয়ার নিকট ইংরেজিতে একটি প্রার্থনা পেলাম এবং বাংলায় অনুবাদ করলাম যা উচ্চারণে বা প্রার্থনায় আপনারাও লুর্দের রাণী মারীয়ার আশীর্বাদ লাভ করতে পারেন-

"হে লূর্দের রাণী, মা মারীয়া/ তুমি কিশোরী বার্ণাডেটের কাছে / নিজেকে নিষ্কলঙ্কা গর্ভধারিণী বলে নিজের পরিচয় দিয়েছিলে / হে নিষ্কলঙ্কা গর্ভধারিণী মা মারীয়া / তোমার নিষ্কলঙ্কা গর্ভধারণকে আমরা / হাজার বার অভিনন্দন জানাই / এবং এখন / হে চিরকুমারী নিষ্কলঙ্কা মা মারীয়া / তুমি পাপীদের আশ্রয়, দয়ার মাতা / তুমিই দুঃখীদের সান্ত্বনাদায়িনী /তুমিই রোগীদের স্বাস্থ্য / হে মাতঃ তুমি জান- / আমাদের দুঃখ-যাতনাভোগ ও অভাবের কথা / তোমার স্নেহ দৃষ্টিতে / আমাদের দিকে ফিরে তাকাও তুমি এবং আমাদের দয়া দেখাও / হে লূর্দের রাণী মা মারীয়া। আমেন। (তিন প্রণাম মারীয়া প্রার্থনা) / পরিচালক : হে লূর্দের রাণী মা মারীয়া / সকলে ; আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর।

১৩. ত্রি-ফন্তেনে

রোমের পুরাতন গির্জাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো: সাধু পলের ত্রি-ফন্তেনে চার্চ। ত্রি-ফন্তেনে অর্থ হলো তিনটি ঝর্ণা। ঐতিহ্য থেকে জানা যায়, যেখানে সাধু পল- কে শিরচ্ছেদ করা হয়েছিল, তখন তার কাটা মাথাটি তিনবার লাফ দিয়েছিল এবং সেই তিন স্থান থেকে জলের ফোয়ারা তথা ঝর্ণা প্রবাহিত হতে শুরু করে। মিলনদি মেট্রো বি দিয়ে আমাদের নিয়ে গেলেন লাউরিনটিনা স্টেশনে, সেখান থেকে হেঁটে হেঁটে ত্রি-ফন্তেনে। ঐ চত্বরে প্রবেশ করতেই ডানদিকে একটি ছোট্ট গির্জা চোখে পড়ল। মিলনদি বললেন, ফাদার ঐখানেই সাধু পলকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। একটু উপরে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গির্জায় প্রবেশ করে একটু সময় প্রার্থনা করলাম। তারপর প্রায় অন্ধকার একটি সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে দেখলাম সেই কারাগার যেখানে সাধু পলকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। দুইটি পাথরের কুঠুরি, খুবই ছোট। এখানেই বহুদিন তাকে বন্দী থাকতে হয়েছিল। এই কারাগার থেকেই তিনি 'তিমথির কাছে, ফিলিমনের কাছে পত্র'সহ অনেক লেখাই লিখেছিলেন। এখান থেকে হাতে শিকল পড়িয়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় কয়েকশত গজ সামনে এবং একটি পাথরের উপর মাথা রেখে জল্লাদ তাকে শিরচ্ছেদ করে। তখন তার মাথা তিনবার লাফ দেয় এবং সেই তিন স্থান থেকে ঝর্ণার জল প্রবাহিত হতে থাকে যা এখনও রয়েছে আর স্বচোক্ষে তা দেখেছি। যে পাথরের উপর তাকে শিরচ্ছেদ করা হয়েছিল তা এখনও আছে এবং তা স্পর্শ করে দেখলাম ও প্রার্থনা করলাম। লোমহর্ষক সেই সব দৃশ্য দেখে সাধু পলের প্রচার যাত্রা, তার ত্যাগস্বীকার, তার লেখা ও জীবনদানের দৃশ্য যেন হৃদয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠল। হে মহান ত্যাগী প্রচারক সাধু পল, তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর যেন বাংলাদেশেও আমরা যিশুর সাক্ষী হতে ও জীবনদান করতে পারি।

১৪. কলোসিয়াম

কলোসিয়াম হলো রোমের দর্শনীয় স্থানগুলোর একটি। কলোসিয়াম ছিল মূলত: সম্রাট নিরোর আমলে জনগণের চিত্তবিনোদনের স্থান বা স্টেডিয়াম যেখানে বন্য জন্তুদের সাথে পালোয়ানদের লড়াইসহ বিভিন্ন ধরণের খেলা ও প্রতিযোগিতা রোমের নাগরিকগণ উপভোগ করতো। এই কলোসিয়ামে প্রায় ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) লোকের ধারণক্ষমতা ছিল। সম্রাট নিরোর সময়ে রোমান সম্রাজ্যে খ্রিস্টানদের সংখ্যা যখন দিন দিন বাড়ছিল তখন প্রকাশ্যে খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও পালন নিষিদ্ধ করা হয় এবং খ্রিস্টানদের উপর চরম নির্যাতন শুরু হয়। এই কলোসিয়াম হলো সেই স্থান যেখানে পুড়িয়ে, ক্রুশবিদ্ধ করে, সিংহ ও হিংস্র পশুদের সামনে ফেলে দিয়ে খ্রিস্টানদের ওপর এই নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ চালানো হতো এবং সম্রাট নিরো, তার সভাসদ ও রোমান নাগরিকেরা তা উপভোগ করতো। একটি জনপ্রিয় লোককাহিনী আছে, যখন কলোসিয়ামে এভাবে খ্রিস্টানদের উপর নির্যাতন করে মেরে ফেলা হচ্ছিল সেই সময় সাধু পিতর, যিশুর অন্যতম শিষ্য ভয়ে পালিয়ে রোম থেকে গ্রামাঞ্চলের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে যিশুর সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। পিতর প্রায় চিৎকার করে যিশুকে প্রশ্ন করেছিলেন: "কোভ ভাদেস দমিনি? অর্থ-কোথায় যাচ্ছেন প্রভু? যিশু উত্তর দিয়েছিলেন, "আমি রোমে যাচ্ছি দ্বিতীয়বার ক্রুশবিদ্ধ হতে"। যিশুর এ কথা শুনে পিতর তাঁর ভুল বুঝতে পেরে আবার রোমে ফিরে গিয়েছিলেন এবং ক্রুশবিদ্ধ করে তাকে মেরে ফেলা হয়েছিল। সেই কলোসিয়ামের সামনে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার তীর্থযাত্রীর সাথে আমিও স্মরণ করেছি সেই যুগের কথা, খ্রিস্টানদের ওপর সেই নির্যাতনের কথা এবং বিশ্বাসের সাক্ষ্য ও জীবন দেবার কথা।

আশার তীর্থযাত্রী: জুবিলী বর্ষে ঘুরে এলাম পুণ্য তীর্থস্থান

ফাদার নরেন জে. বৈদ্য

পুণ্য দ্বার পার হওয়ার অভিজ্ঞতা এবং এর আধ্যাত্মিকতার তাৎপর্য

পবিত্র দরজা হল ক্ষমা, অনুগ্রহ ও নব জীবনের প্রতীক। পবিত্র দরজা পার হওয়া মানে হৃদয়ের যাত্রা। ঈশ্বরের দয়া গ্রহণ করার নতুন সুযোগ। 'আমি সেই দরজা! যে কেউ আমার মধ্য দিয়েই ভেতরে যায়, সে তো রক্ষা পাবেই' *(যোহন ১০:৯)*। পবিত্র দরজা পার হওয়া মানে খ্রিস্টের প্রতি নিজের জীবন পুনরায় উৎসর্গ করা- তার প্রেম, শান্তি ও আনন্দের পথে চলার নতুন অঙ্গীকার।

অন্তরে চেতনা উৎসাহ জেগে উঠে। পাপের মার্জনা, দেহের সুস্থতা ও আত্মার পবিত্রতা লাভ করব। প্রভুর দয়ার স্পর্শ লাভ করব। খ্রিস্টবিশ্বাস গভীর হয়ে উঠবে। ভক্তি ভালবাসা পোষণ করে জীবনের পথে এগিয়ে চলতে পারব। পাপ শক্তির হাত থেকে রক্ষা পাব। অশুভ শক্তি জয় করতে পারি। শুভ্রতর হয়ে উঠবে অন্তরের পবিত্রতা। অম্লান ভক্তি নিয়ে প্রভুর সেবা করতে পারব। আমি দিনে দিনে প্রভুর অনুগ্রহের বদান্যতা উপলব্ধি করতে পারব। জীবনের দিনগুলি প্রভুর দেওয়া শান্তিতে অতিবাহিত করতে পারব। ভক্তি ও বিশ্বাস পালনে নিষ্ঠাবান থেকে একদিন স্বর্গ মহিমায় ভূষিত হতে, পরলোকে শাশ্বত আনন্দ লাভ করতে পারব।

জুবিলী বর্ষের মূলসুর 'আশার তীর্থযাত্রী' আপনার ব্যক্তিগত জীবনে কী আবেদন সৃষ্টি করেছে :-

আমার অন্তর জগৎকে যিশুর আদর্শে আলোকে আলোকিত করতে ও গোট জীবনটাকে খ্রিস্টীয়করণ করতে আমি তীর্থে যাই। পাপময় জীবন পরিত্যাগের ভাবনায় হোক আমার তীর্থযাত্রা। 'মনের কালি দূর করে তুই করিস তারে ডাকাডাকি;/মনটা তোর তীর্থ হবে তারে পাবি জীবন ব্যাপী'। জুবিলী শুদ্ধ করবে আমাদের চিন্তা চেতনা ও কর্ম। ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ জুবিলী বছরটি আমার জন্য হয়ে উঠেছে চেতনার বছর।

জুবিলী হলো জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ যেন হয়ে ওঠে ঈশ্বরের দয়া, শান্তি ও আশার পথে এক নতুন যাত্রা। আমার অন্তরে এক নতুন সাড়া জাগিয়েছে। এই যাত্রায় আমি ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করেছি। পুরোহিত হিসেবে আশার আলো ছড়িয়ে দেওয়া আমার পালকীয় ও মিশনকর্মের অংশ।

জুবিলী বছর হলো আশাতে আমাদের জীবন নবায়িত করা। যেহেতু প্রতিদিন আমার অনুধ্যানমূলক প্রশ্ন ছিল: আশার যাত্রাপথে আমি কোথায়? কিভাবে আমি অন্যের কাছে আশার আলোকবর্তিকা হতে পারি? কিভাবে আমি agent of Hope, Ray of Hope হতে পারি? অসুস্থ, দুঃখিত মানুষের মাঝে যখন আমি ঈশ্বরের সান্ত্বনা পৌঁছে দিতে পারব, যখন আমি কারও মখে হাসি ফিরিয়ে আনতে পারব, তখন আমি হই আশার তীর্থযাত্রী বা আশার বার্তাবহক।

'যারা প্রভুতে আশা রাখে, তারা পথ চলায় ক্লান্ত হবে না' *(ইসাইয়া ৪০:৩১)*। শাস্ত্রের এই বাণী আমার অন্তরে অনুরণিত হয়েছে। জুবিলী বছরটি আহ্বান জানায় খ্রিস্টবিশ্বাসকে গভীর করা ও বিশ্বাসের যত্ন করা। পবিত্রতা বোধ ধারণ করে প্রতিটি সংস্কার প্রদানে তৎপর ছিলাম। সংস্কার প্রদান কালে আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি নিতে চেষ্টা করেছি। প্রাহরিক

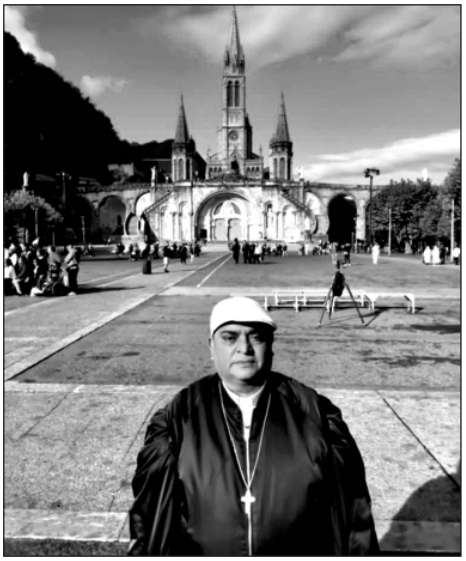

প্রার্থনা করে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। উপদেশে ধর্মপল্লীর ঐশজনগণকে উৎসাহিত অনুপ্রাণিত করেছি যেন খ্রিস্টভক্তগণ তীর্থযাত্রা ও ভাল কাজের মধ্য দিয়ে সারা বছর নিজেদের আত্মশুদ্ধিতে ব্যস্ত থাকে এবং পবিত্রতা লাভ করে। স্থানীয় ধর্মপল্লী ও ধর্মপ্রদেশে ভক্তজনগণ যেন বেশি করে অংশগ্রহণকারী মণ্ডলী হতে পারে। খ্রিস্টযাগ, সাক্রামেন্ত বা ধর্মসংস্কারগুলোতে, ধর্মপল্লী ও ধর্মপ্রদেশে ভক্তজনগণের অংশগ্রহণ যেন বাড়ে। সামসঙ্গীতের কথা মনে রেখেছি: "ওগো ভগবান আমরা তোমাতে রেখেছি আশা" *(সাম ৩৩:২২)*। ভক্তজনগণের মধ্যে হতাশার আর্তনাদ যখন দেখেছি, চেষ্টা করেছি যেন ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখে। আশার মশাল জ্বালাতে চেষ্টা করেছি। খ্রিস্টীয় আশা আমার চিন্তা-চেতনা, হৃদয়, আচার-আচরণে বয়ে একটা পরিবর্তন ও রুপান্তর।

জুবিলী বর্ষের অভিজ্ঞতা আমার ভবিষ্যৎ জীবন বা বিশ্বাসের জন্য কী ধরনের প্রত্যাশা তৈরী করেছে?

'Pilgrims of Hope' this theme reminded me that it is a Journey of trust and surrender with Christ every day. I want my ministry to be channel of God's compassion, especially to the poor, the sick and lonely.' জুবিলী বর্ষ আমার জীবনে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এনে দিয়েছে। আমার প্রার্থনা ও সেবার জীবন আরও জীবন্ত ও আন্তরিক হবে। আমার মাধ্যমে ঐশজনগণ ঈশ্বরের করুণা আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাবে। খ্রিস্ট জন্মজয়ন্তী আমাকে শিখিয়েছে- ঈশ্বরের অনুগ্রহ সব সময় নতুনভাবে আমাদের জীবনে প্রবাহিত হচ্ছে।

খ্রিস্ট জন্ম জয়ন্তীকে কেন্দ্র করে জুবিলী বর্ষে, খ্রিস্টীয় জীবন নবায়নে আশার ও বিশ্বাসের তীর্থযাত্রা করতে গিয়েছি ইতালি (মিলান, আসিসি, ভেনিস, পাদুয়া) প্যারিস, ফ্রান্সের লুর্দ নগরী, পর্তুগাল লিসবনে। আমার কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে ধন্যবাদের স্তুতিগান।

রোম নগরীর, সাধু পিতর ও পলের মহামন্দির, Sant Maria Maggiore, St. John Latheran Basilica, Basilica of St. Francis and St. Clara of Assisi, Basilica of St. Mark of Venice, Basilica of St. Anthony of Padua, Domine Quo Vadis Church of Rome, রোমের টর পিনজাত্তারায় সেন্ট হেলেনার সমাধিসৌধ, Basilica Di Santa Croce in Gerusalemme. Relics . Milan lecco Bislica of San Nicolo, Parish Notre-Dame de Parish Cathedral, Sacred heart Basilica ফ্রান্সের তুলস শহরের Basilica of st Sernin, Basilique sainte-Germaine De pibrac, কাথলিক মণ্ডলীর প্রাণকেন্দ্র রোমে সাধু পিতরের মহামন্দির প্রায় ৪০ হাজার খ্রিস্টভক্ত অগণিত বিশপ আর্চবিশপ ও কার্ডিনাল, পোপ চতুদর্শ লিওর সহার্পিত পবিত্র খ্রিস্টযাগে যোগদান করেছি গত ১২ অক্টোবর।

এই সমস্ত তীর্থস্থান ভ্রমন করে খ্রিস্টশহীদদের অমর কীর্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে

(বাকি অংশ ৮৮ নং পৃষ্ঠায় পড়ুন...)

Re-Employment Circular

Caritas Development Institute (CDI) invites applications from eligible candidates (men and women) for the position of **Faculty Member (Training)**.

Details of the Position and Required Qualifications	Key Responsibilities
Job Title: Faculty Member (Training) **Post**: One **Age:** Maximum 32 years as on 01 December, 2025 **Educational Qualification:** At least a Master's in Statistics, Social Science Development Studies, Economics, and Sociology. **Job Requirements:** – Minimum three years of professional experience in a similar position in any reputed organizations. – The position requires candidates who have received training in the area of Training of Trainers (ToT), Advocacy, Value Chain, Climate Change, Research Methodology, Kobo Toolbox, RBM, Effective Monitoring Process, Development Management, Strategic Planning & Management, and other contemporary issues. – Strong facilitation and presentation skills in training. – Computer operations, particularly in MS Word, Excel, PowerPoint Point and multimedia. – Excellent interpersonal, organizational and Communication skills. – Know Safeguarding, Gender based violence, and Child Protection.	– Responsibility is to develop high-quality training material, curriculum, training coordination, training need assessment, training facilitation, and logistic support, etc. – S/he is responsible for training facilitation in CDI and outside Dhaka. – Regular update of training materials, methods, and application during training facilitation. – Assist in identifying contemporary training issues, develop training materials & modules. – Prepare training report and documentation of training files. – It is expected to spend approximately 50% of his/ her work time in the field. – Perform other duties as required. – **Salary**: Tk. 40,000/- (consolidated) per month during probationary period. For a truly deserving candidate, salary is negotiable. – **Job location**: The position is based at CDI, Dhaka, but will require frequent field visits.

The selected candidate will be appointed initially for a six-month probationary period. Upon successful completion of the probationary period, appointment may be confirmed according to the existing pay scale and service rules of the organization. After confirmation, long-term benefits such as a provident fund, gratuity, insurance, healthcare, and a compensation scheme will be admissible.

Eligible and interested candidates with requisite qualifications are invited to apply with a letter of intent (no more than one page) along with a complete CV with details of two referees and a cover letter, two passport size photographs and attested copies of all educational and experience certificates to the following address: **Director, Caritas Development Institute (CDI), 2, Outer Circular Road, Shantibagh Dhaka-1217** or e-mail: cdi@caritascdi.org by the **15th January 2026**. **Women candidates are especially encouraged to apply.** Only short-listed candidates will be invited for an interview. Incomplete applications will not be considered. Applicants without training experience need not apply. The organization reserves the right to reject any application or to cancel or postpone the recruitment process for any reason whatsoever. Personal contact will be treated as a disqualification for the post. The staff of Caritas Bangladesh, Trust offices, and Project offices may apply through the proper authority.

8/12/2025

গল্প

দুই হৃদয়ের আলো

রবীন ভাবুক

অনু'র ঠোঁটের কোণে কর্পোরেট হাসি! এক বছর পর পল্টন মোড়ে যখন অনুকে রণ দেখলো, তখন উড়ন্ত লাস্যময়ী অনুকে মেলাতে কষ্ট হচ্ছিলো ওর। অনু নিজেই রণ'র দিকে এগিয়ে এসেছিল। রণ অবশ্য আশা করেনি অনু ওকে দেখে এগিয়ে আসবে। অনু রণ'র সামনে এসে জানতে চাইলো-

- কেমন আছো? তুমি দেখি এখনো পাল্টাওনি।

- এই তো ভাল আছি। না, পারিনি নিজেকে পাল্টাতে। এই ইট পাথরের শহরে এখনো নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচে আছি।

- না, তোমার দ্বারা আর পাল্টানো সম্ভবও নয়। সেই একই পাগলাটে চেহারা, কথাবার্তায়ও কোনো পরিবর্তন নেই।

- হয়তো পারবো না পাল্টাতে, হয়তো পাল্টাতে চাই না। তোমাদের কর্পোরেট সমাজের ভাঁজে আমাদের মতো মানুষ খোঁজার মতো কোনো অপদার্থ থাকতে হয়।

- না, তোমার সেই ফিলোসোফিক্যাল কথা আর গেল না। তা এখন কি করো, সেই একই খবরের কাগজের অফিসেই পড়ে রয়েছ?

- সেই একই কাগজের গন্ধ, একই খবরের স্বাদ, শুধু স্থানটা পরিবর্তন হয়েছে। বলতে পারো, নতুন বোতলে পুরানো মদ। আর স্থান পরিবর্তন তো সেই কবেই তোমার ছায়ায় হয়েছিল।

- রণ এখনো সময় আছে, নিজেকে পরিবর্তন করো, সমাজের মানুষের সাথে মিশতে হবে তোমাকে। ওহ, আজকাল তোমার বেশ সুনাম শুনি অনেকের কাছে। যাক, ভাল। কিন্তু, কতদিন চলবে এভাবে? নিজেকে স্ট্যান্ডার্ড করো।

- তাই! (সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে রণ)। এরপর ধীর গলায় বললো, আচ্ছা অনু একটা কথা বলতো, তুমি কি সুখি?

- হোয়াই নট? (অনু বড় বড় চোখ করে রাগি চোখে তাকায় রণ'র দিকে) তুমি দেখ, আজ আমি স্ট্যান্ডার্ড মানুষের সাথে মিশি, গাড়িতে চলি, সবকিছু নিয়ে আমি তো মহা খুশি।

- হয়তো খুশি! কিন্তু মহাখুশি বলতে কি কিছু আছে? কিন্তু শুভকামনা করি, তোমার মুখে এই কর্পোরেট সুখের হাসি চিরকাল স্থায়ী হোক! (রণ সামনের রাস্তা ধরে চলতে থাকে)

অনু পেছন থেকে ডাক দিয়ে বললো-

- রণ, তুমি কি মনে করো এটা সুখ নয়?

- আমার মনে করা দিয়ে কি আসে যায়? তোমার ইচ্ছের সুখই তো বড় সুখ?

- তাহলে তুমি কি সুখি?

- নিশ্চয়ই! তোমাদের কর্পোরেট মানুষের কাছে আমরা বার বার ফিরে আসি তোমাদের সুখ চেনাতে!

ধীরে ধীরে রণ সামনের গলিতে হারিয়ে যায়। অনু দ্রুত গিয়ে গাড়িতে চড়ে বসে এবং এক বুক সুখের দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুধু মনে মনে বলে, বেচারা রণ! এই রণ'রা বেচারাই হয়ে থাকে সোসাইটির কোণে।

রণ, হাঁটতে হাঁটতে রমনা পার্কের এক বেঞ্চে বসে আরেকটা সিগারেট ধরায়। নিজেকে রণ আজকাল স্বাধীন উড়ন্ত মেঘ ভাবে। কোনো বাঁধন যে রণকে আটকে রাখতে পারে না। রণ'র চোখে আজকের অনু'র রং করা লাল চুলের মুখটা ভেসে ওঠে। কেমন অদ্ভুদ লাস্যময়ী লাগছিল ওকে। শর্ট টাইট কাপড়, চোখের সানগ্লাস মাথায়, তীব্র লিপস্টিক, মুখে কড়া মেকাপ, চোখের নাচন, দেহে মেদের প্রাচীর। কয়েক দিন আগের অনু আর আজকের অনু বিস্তর ফারাক।

স্নাতক শেষ করে একটা খবরের কাগজে চাকরি নিয়েছিল রণ। বেশ চলছিল সবকিছু মিলে। স্নাতকোত্তরে ভর্তি হয়ে পড়াশোনাটাও বেশ চালিয়ে যাচ্ছিল। চাকরির ক্ষেত্রেই পরিচয় অনু'র সাথে। অনু ডিজাইনের কাজ করতো। ছিমছাম গোছানো একটা মেয়ে। স্নাতকে পড়াশোনার পাশাপাশি এখানে ডিজাইনারের কাজ করে। প্রথম দিন রণ যখন অনুকে দেখে সেদিন অনু গোলাপী একটা শাড়ী পড়েছিল। ঠোঁটে হাল্কা লিপস্টিক। কেন যেন রণ বার বার অনুকে দেখতে লাগলো। পরিপাটি চাহনি, হাতে হাল্কা বড় নখ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো। চুলগুলো পিঠ বেয়ে হেলে পড়েছিল পড়ন্ত সন্ধ্যায়। খুব একটা কথা যে হতো অনু'র সাথে তাও না। কার্যক্ষেত্রে একমাত্র রণ'ই অনু'র সাথে কম কথা বলতো। এক অফিস পার্টিতে প্রথম অনু'র সাথে প্রথম কথা হয়। এলিফেন্ট রোড কমিউনিটি সেন্টার থেকে পার্টি শেষে রণ পায়ে হেঁটে ফার্মগেট বাসার উদ্দেশে রওনা দেয়। তখন রাত প্রায় দেড়টা। গ্রীণ রোড মোড়ে আসতেই রণ ভাই ডাক কানে আসে। ফিরে তাকাতে দেখে অনু রিক্সা থেকে নামছে। রিক্সা থেকে নেমে অনু বললো-

- যাক, ভালই হয়েছে আপনাকে পেয়ে গেলাম। আমি যে কি ভয়ে ছিলাম। দেখুন না এই রাতে একটা রিক্সা নিলাম, তা আবার পাংচার হয়ে গেল। হুট করে দেখি আপনি। আপনার বাসা তো ফার্মগেট? আমারও বাসা সেখানে। আমাকে একটু পৌঁছে দিবেন প্লিজ? এক নাগারে কথাগুলো বলে গেল অনু।

- পৌঁছে দিতে তো পারবো না, কিন্তু আপনার যাত্রা সঙ্গী হতে পারবো এই নক্ষত্রের রাতে।

অনু অবাক হয়ে থাকিয়ে বলে-

- এসব কি বলেন?

- না বললাম, আপনি তো আপনার নিজের পায়েই হেঁটে যাবেন, তাতে তো আমার পৌঁছে দেয়া হলো না। কিন্তু আপনার পাশে হেঁটে আমি যাত্রাসঙ্গীই হতে পারবো। আর দেখুন, আকাশ ভরা তারা।

দু'জনেই আকাশের দিকে তাকায়।

অনু বিড়বিড় করে বলে বললো-তাই তো! ঢাকার আকাশের তারা তো দেখাই হয়না। তাও যখন দেখি, তখন সবকিছু কেমন ফ্যাকাশে লাগে। কিন্তু আজকের রাতের আকাশের তারাগুলো জ্বলজ্বল করছে। অনু রণ'র পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বললো-

- অফিসে আপনাকে নিয়ে সবাই ঠিকই বলে। আপনি আসলেই অদ্ভুত।

- তাই নাকি, আমি অদ্ভুত? কিভাবে মনে হলো?

- না মানে, আপনি সব সময় সবকিছুর মাঝে অর্থ খুঁজে পান, সবকিছুতেই আনন্দ খুঁজে পান এইসব আর'কি!

- এই বিদর্ভ নগরে সবাই যদি দুঃখের অতলে ঘুড়িয়ে পড়ে, তখন তো আমার মতো বেহায়া সুখ পাখির প্রয়োজন অবলা এই শহরের!

- আপনি পারেনও বটে। এই যে, বাসার সামনে চলে এসেছি। ধন্যবাদ আপনাকে যাত্রাসঙ্গী হয়েছেন বলে। আসি, শুভ রাত্রি।

রণ পা বাড়াতেই অনু পেছন থেকে ডাক দেয়-

- রণ ভাই...

- হ্যাঁ বলুন!

- ধন্যবাদ এই বিদর্ভ নগরে আপনার জন্য একটি নক্ষত্রের রাত দেখতে পেলাম।

এরপর কতশত রাত ওরা একসাথে কাটিয়েছে কতভাবে! কখনো রাস্তায় হেঁটে,

কখনো দূরে গাঁয়ে গিয়ে খোল আকাশের নিচে, কখনো দূর পাহাড়ে, কখনো নদীর বাটে, কখনো সমুদ্র স্নানে। কতই আদুরে মাখা সময়গুলো কেটেছে ওদের!

রণ পা বাড়ায় বাসার পথে.....

শহুরে ধুলোবালির দিনের আলো নিভতে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে রাতের আঁধার নামতে শুরু করেছে, কিন্তু বাধ সাধছে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা নিয়ন আলোগুলো। সন্ধ্যার রংগুলো হঠাৎ করে সৌরচালিত নিয়ন বাতিগুলো জ্বলে ওঠে যেন নিজের মধ্যে টেনে নিয়ে কদাচার করে দিচ্ছে। ধীরে ধীরে রাতের আঁধার ভর করছে। অনু মেকাপ শেষ করে টিনের ছাপরা ঘরের দরজায় তালা মেরে পা বাড়ায় ব্যস্ত রাস্তার দিকে। চারিদিকে গাড়ির ঝাঁঝালো শব্দ! অনু বিশ্বরোডের ক্রসিং পার হয়ে রাস্তার একপাশে এসে দাঁড়ায়। প্রতিদিন রাতে এই জায়গায়টায় আসতে হয় অনুকে। কেমন বিশ্রি লাগে। তবুও আসতে হয় নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে। ধীরে ধীরে রাতের আঁধার শহরটাকে নিজের মধ্যে টেনে নিচ্ছে। রাত বাড়ছে, সেই সাথে কমে যাচ্ছে ব্যস্ত শহরের ক্লান্ত ভ্রমণ। একটা বাস এসে থামলো অনু'র সামনে। বাস থেকে রণ নামছে। তা দেখে অনু নিজেকে একটু আড়াল করে। রণ পাশের সিগারেটের দোকান থেকে একটা সিগারেট নিয়ে লম্বা টান দেয়। সিগারেট খেতে খেতে হঠাৎ চোখ পড়লো একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটার দিকে। রণ মনে হয় চিনতে পারছে মেয়েটাকে। কিন্তু, কিন্তু মেয়েটি বার বার রণ'র দিকে তাকায়, আবার একটু আঁড়ালে চলে যায়। রণ এবার পুরোপুরি বুঝতে পারলো মেয়েটা সত্যিই অনু। কিন্তু, অনু এভাবে নিজেকে আঁড়াল করতে চাইছে কেন ঠিক বুঝতে পারছে না। এরমধ্যে একজন লোক এসে অনুর সাথে কি যেন বলে আবার চলে গেল। রণ ধীরে ধীরে অনু'র সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। অনু মাথা নিচু করে থাকে রাস্তার দিকে কিছুক্ষণ। রণ বললো-

- কেমন আছো? তুমি এখানে যে?

- এই তো ভাল। তুমি এখানে কি করছো?

- অদেখা পথিকের কি দেখার শেষ থাকে বল? আমি এই ব্যস্ত শহরটাকে বারবার হারিয়ে ফেলে আবার খুঁজে বের করি।

অনু'র মুখের কোণে স্মিত হাসি। মনে মনে ভাবলো রণ সত্যিই এই ৭ বছর পরও পরিবর্তন হয়নি। কত নিখুঁত সৃষ্টি রণ। অনু'র মুখ এবং আনমনা মুখটা রণ খেয়াল করেছে। কিন্তু, রণ অবাক হলো যে, অনু'র ঠোঁটের কোণে আজ আর কর্পোরেট হাসি নেই। সেখানে এখন গভীর হতাশা আর অদ্ভুত অভিব্যক্তি। অনু বললো-

- তাহলে তুমি আগের মতোই আছ?

- হ্যাঁ, এইতো বেশ আছি। নিঞ্চুটি এই দেয়ালে আমার কবিতা আমিই বার বার পড়ি। যে কবিতার খাতা ছিঁড়ে গেছে একদিন, সেই খাতা তো আর জোরা লাগানো হয়নি।

অনু রণ'র এমন কথাগুলো প্রথম প্রথম খুব ভাল লাগতো, কিন্তু একটা সময় পর খুব বিরক্ত মনে হতো। কিন্তু, রণ'র এমন কথাগুলোর অর্থ অনু খুব ভাল করেই বুঝতো। আজ আর ওর কথাগুলো বিরক্ত লাগেনি। কেমন যেন সেই চিরচেনা মনে হলো। মনে হলো, আমি তো এমনই চেয়েছি, এমনই ছিলাম।

- কি হলো অনু, কিছু ভাবছো?

- হুম, না (কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উত্তর দিল)

- যাইহোক, এই রাতে এখানে কেন? তাও একা, গাড়িও দেখছি না।

- ভাগ্যের টানে।

- ভাগ্য! (অবাক স্বরে) তোমাদের কর্পোরেট সমাজের ভাগ্যের আবার জায়গা রয়েছে নাকি?

- আছে, কিন্তু আমরা মনে করি না।

রণ বুঝতে পারে অনু'র চেহারা, বেশভুষা এবং চাহনী দেখে সবকিছুই। রণ বললো-

- তবে এখানে এভাবে তোমাকে দেখতে পাবো, তা ভাবিনি।

হঠাৎ একটি গাড়ি এসে অনু'র সামনে দাঁড়ায়। একজন লোক উঁকি মেরে বললো-

- চলুন তাহলে।

অনু উত্তর দিল-

- আজ আর নয়।

- কেন? আজ বাড়িয়ে দিব, আপনাকে তো বলেছিলাম।

রণ এবার আগ বাড়িয়ে বললো-

- এই যে মহোদয়, বাড়ির ললনাকে ছলনায় ডুবিয়ে রেখে কতকাল চলবে? আপনাদের কর্পোরেট দেয়ালের বাহিরে কাউকে তো একটু নিঃশ্বাস নিতে দিন। আজ না হয়, আমি একে নেই। আপনার চেয়ে বেশি দিয়েছি। আজ আর আপনার জন্য হবে না, একে আজকের জন্য আমি কড়ি দিয়ে কিনে নিলাম।

লোকটি কালবিলম্ব না করে টান দিয়ে গাড়ি ছোটালো সামনের দিকে। অনু রণ'কে বললো-

- মানে কি? তুমি এ কথা বললে কেন?

- তুমি আজ এই খোলা আকাশের নিচে মুক্ত নিঃশ্বাস নিতে চাইছো। তাই আমি ছুটি দিলাম।

- কিন্তু...

- কিন্তুর প্রয়োজন নেই ম্যাডাম। চলুন, সামনে একটা টং ঘর আছে। দারুন চা করে খালায়। খেতে খেতে কথা বলি।

ওরা পা বাড়ায় সামনের দিকে। অনু'র বুক ফেটে কান্না আসছে। কত বছর পর রণ'র পাশে হাঁটছে। হাতটা বড্ড ধরতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু সাহস এবং অধিকার কিছুই নেই। কতকাল পর যেন নিজের বুকের মধ্যে পরিশুদ্ধ অক্সিজেন বয়ে চলেছে। হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে থাকে নিজের কর্পোরেট থিউরিগুলো-

রণ'র সাথে পত্রিকা অফিসে কাজটা ভালই চলছিল। এরপর প্রেম এবং স্বপ্নের মতো দিন চলা। একদিন পত্রিকার চেয়ারম্যানের ছেলে অফিসে এসেছিল। সেদিন মিটিং-এর ফাঁকে অনু'র সাথে বেশ কয়েকবার চোখাচোখি হয়। চেয়ারম্যানের বয়স হয়েছে, তাই বাবার ব্যবসার কিছু কিছু দায়িত্ব ছেলে নিতে যাচ্ছে। পত্রিকাটি তাদের ব্যবসার একটা অংশ। এখন থেকে চেয়ারম্যানের ছেলে পত্রিকার খোঁজ খবর রাখবে। এমনিতে তাদের এখানে আসা হয় না। কিন্তু চেয়ারম্যানের ছেলে নানা তালবাহানায় এখানে আসতো এবং অনু'র সাথে সখ্যতা গড়ার চেষ্টা করতো। এক সময় ওদের মধ্যে সখ্যতাও গড়ে ওঠে এবং রণ'র সাথে দূরত্ব তৈরি হয় অনু'র।

রণ খেয়াল করতো, প্রায়ই অনু অফিসে আসে না, মাঝে মাঝে অফিসের নিচে গিয়ে চেয়ারম্যানের ছেলের গাড়িতে উঠে চলে যায়। মাসখানেক পর অনু'কে রণ বললো-

- তাহলে আমাদের সম্পর্কের ইতি ঘটলো?

- সম্পর্ক! তোমার সাথে আমার ওটা সম্পর্ক ছিল মনে করো? ওটা নিছক একটা টাইম পাস। তুমি কি মনে করো তোমার এই ফিলোসফি মার্কা কথা দিয়ে তুমি সুখি হবে?

- কি বলছো অনু এসব?

- কি বলছি বুঝো না? বস, তুমি কর্পোরেট পথে আসো। তোমার এই নেকামী দিয়ে জীবন চলে না।

- তুমি আজ এই কথা বলছো?

- আরে! আজব তো! তুমি বুঝো না? বিদায় হও এখন এখান থেকে। আর শোনো তার চেয়ে ভাল হয়, এখানে আর থেকো না কাজে। অন্যত্র চলে যাও। জাস্ট বিরক্ত লাগে তোমাকে! আর না পারলে বল, আমি বিদায়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

- থাক অনু, আর দিতে হবে না ব্যবস্থা করে। আমি পারবো। এই বিস্তর দুনিয়ায় যাইবার অন্ত নাই, কিন্তু হাঁটিবার পথ রহিয়াছে! মুখে তাচ্ছিল্যেও হাসি দিয়ে কথাগুলো বলতে বলতে পথে মাঝেই হারিয়ে গিয়েছিল রণ!

ভালই চলছিল! কর্পোরেট পার্টি, ঘোরাঘুরি আর হইহুল্লোর করে সময় বয়ে যায়। চাকরিও করার প্রয়োজন হয় না। কর্পোরেট অর্থ এমনিতেই হাতে চলে আসে। কিন্তু এর দুই বছর পরই পাল্টে যায় অনু'র জীবনের মোড়। রণ'র সাথে সম্পর্কচ্ছেদের দেড় বছর পর পল্টন মোড়ে দেখা হয়েছিল অনু'র। এর ছয় মাস পর হুট করে অনু'র জীবনে নতুন বাঁকবদল শুরু হয়। চেয়ারম্যানের ছেলে বিয়ে করে অনুকে ছেড়ে দেয়। অনু অনেক কেঁদেকুটে পায়ে ধরেছিল বিয়ের জন্য। কিন্তু, চেয়ারম্যানের ছেলে উত্তর ছিল-

- দেখ তোমার সাথে আমি নিছক টাইম পাস করেছি। আর এরজন্য তো তুমিও অনেক কিছু পেয়েছ। তাই নিয়েই খুশি থাক। বেশি আশা করো না। তোমরা ছোটলোকের জাত আকাশের তারা ধরতে চাও সব সময়! এখন বিদায় হও।

এরপর অনেকেই পাশে এসে দাঁড়িয়েছে নির্দিষ্ট সুবিধা নিয়ে। কিন্তু, জীবনের খেই যে হারিয়ে ফেলেছে অনেক আগেই। এরপর অনেক কষ্টে একটা ছোট চাকরি যোগার করে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছিল। এরমধ্যে মা একদিন ফোন দিয়ে বাড়ি যেতে বলে। অনু গিয়ে জানতে পারলো, তার জন্য ছেলে দেখা হয়েছে। ছেলে আমেরিকা থাকে। পূর্বে বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু ডিভোর্স। বাড়ির পাশে এক ভাই এই বিয়ের ব্যবস্থা করেছে। পাত্র বলেছে বিয়ে করে আমেরিকা নিয়ে যাবে। অনু এই সুযোগ আর হাত ছাড়া করতে চাইলো না। বিয়ে করে সোজা বিশ্বের শক্তিধর দেশের নাগরিক, আয়েশী জীবন। কি আর চাই! অনু নিজেকে উচ্চবিলাসী সান্ত্বনা দেয়, আমার জীবনে সেরা সুযোগ আসবে তাই আমি জানিই। ডিভোর্স হয়েছে তো কি হয়েছে, আয়েশী জীবন তো পাব! পারিবারিকভাবেই বিয়ে হয়ে গেল। বেশ কাটছিল সময়গুলো। যেন স্বপ্নের মতো। অনু কাপলদ্বয় হয়ে যেন সুখের ঠিকানা পেয়ে গেল।

প্রতি মাসেই যেন হানিমুন লেগে রয়েছে। এরমধ্যে দুই-তিনটা দেশে মধুচন্দ্রিমা কাটানো হয়ে গেল। অনু যেন আকাশে উড়তে থাকে। স্বামী প্রথম প্রথম প্রতি মাসেই আমেরিকা থেকে দেশে আসে। এরপর তিন মাস, এরপর ছয় মাস, এরপর বছরে একবার। ধীরে ধীরে লাস্যময়ী অনু'র চেহারায় পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। কর্পোরেট মুখের প্রাচীর ভেদ করে জমেছে মেদের পাহাড়। বছর পেরিয়ে স্বামীর কাছেও নিজের সৌন্দর্য ধীরে ধীরে ম্লান হতে শুরু করেছে। অনুকে আজ নিবো, কাল নিবো বলেও আর আমেরিকাতে নেয়নি স্বামী। এখন স্বামী আসা তো দূরে, হুট করে যোগাযোগই বন্ধ করে দিয়েছে। কোনোভাবেই স্বামীর সাথে আর যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না। বিদেশী ডলারের মজুদও ধীরে ধীরে ফুরিয়ে আসছে। কি করবে অনু দিশেহারা হয়ে পড়ে। আগের মতো বন্ধুরাও আর তেমন যোগাযোগ করে না। আটশাট শর্ট কাপড়গুলোতেও এখন সেলাই পড়ছে। রঙ্গিণ চুলগুলো কৃত্রিম রং না পেয়ে কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। গলির মুখের যুবকরাও আর আরচোখে তাকায় না, ভাব জমানোর ছলে কেউ বলে না তুমি অদ্ভুত সুন্দর। শুধু আশেপাশের দু'একজন ভুড়িওয়ালা কর্পোরেট ধনীরা ইশারা দেয় ক্ষণিকের জন্য। অনেক কষ্টে অনু খবর পায়, ওর স্বামী আগের স্ত্রীকে নিয়ে দিব্যি আমেরিকাতে পুনরায় সংসার পেতেছে। কি করবে অনু, তা ভেবে পাচ্ছে না।

অনু দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে থাকে বন্ধুদের দ্বারে দ্বারে একটা ছোট চাকরির জন্য। কিন্তু সবাই একে একে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এখন আর কেউ আশ্রয় দিতে চায় না অনুকে। অনেক টানাপোড়নের পর অনু পা বাড়ায় এই পথে। কর্পোরেট সুখের আসায় আর নয়, শুধু দু'মুঠো ভাতের জন্য! এখন মনে হয় নিজেই একটা লাশ। কোনো আবেগ-অনুভূতি এখন আর কাজ করে না। আগে নিজেই ছিল রঙ্গিণ দুনিয়ায়, আর এখন নিজেই হয়ে উঠেছে একজন অদ্ভুত রঙ্গিণ মানুষ! রণ'কে মনে মনে অনেক খুঁজে, কিন্তু সাহস করে মনের বাইরে খুঁজতে পারেনি। ইতিমধ্যে অনু'র শরীরের নানা অংশে ব্যাথা আশ্রয় নিয়েছে, কিন্তু তারপরও চলতে হয় ক্লান্ত শরীর নিয়ে দু'মুঠো খাবারের জন্য।

রাত বাড়ছে, হালকা শীত পড়ছে বোধহয়। হাল্কা শীতল বাতাসের ভাজে এইসব ভাবতে ভাবতে রণ'র পাশে হাঁটতে থাকে অনু। শরীরে যেন শক্তি নেই অনু'র। শরীর টলছে! হঠাৎ রণ'র হাতে গরম জলের স্পর্শ পায়। রণ হাত উঠিয়ে দেখে নিয়নের আলোতে একফোঁটা জল জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। রণ মুখ তুলে তাকায় অনু'র দিকে। স্মিত স্বরে রণ বললো-

- একি অনু, তুমি কাঁদছো?

অনু কিছু বলতে পারে না। ঠোঁট দু'টো কাঁপছে। বুক চিরে কান্না আসছে, কিন্তু ভয়-সংকোচ-ঘৃণার জন্য তা বের করতে পারছে না। ট্রেনের হুইসেল বাজছে, রেলক্রসিং'র গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে পড়েছে। ট্রেন ছুটে আসছে ঝক্‌ঝক্‌ঝক্! অনু নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। দৌঁড়ে পা বাড়ায় রেল লাইনের দিক। কিন্তু এগুতে পারে না, রণ'র হাত ধরে রেখেছে। রণ বললো-

- কোথায় যাও? জীবনে গল্প লেখা তো এখনো শেষ হয়নি!

- আমি তো পারছি না, এখানেই থামাতে হবে জীবনে শেষ অধ্যায়! বিগত অধ্যায়গুলো তো ঘৃণার আর জড়তার।

- তোমাকে তো কখনোই ঘৃণা করিনি, শুধু তোমার চাওয়ার জন্যই সরে গিয়েছি। ঘৃণাগুলো না হয় ছেঁকে আলাদা করে রাখবো। আর শেষ অধ্যায় থাকে একটা শুদ্ধ সামাপ্তি, একটা সমাধান। হতে পারে ভাল বা খারাপ!

- আমি তো আর পারছি না রণ! তুমি ঠিকই বলেছিলে, এই কর্পোরেট সমাজে তোমার মতো মানুষ আসে মানুষ খোঁজার জন্য। তোমাকে আমার বড্ড হিংসে হয়, সেই একই তুমি একই রয়ে গেলে। আর আমি, এই আমি নিজেকে কতবার পাল্টিয়ে, কতভাবে পরিবর্তন করে সুখের নেশায় ছুটেছি।

অনু বলতে বলতে হু হু করে কেঁদে ফেলে স্বশব্দে। রণ মাথায় হাত বুলায়, অনু মুখ লুকায় রণ'র বুকে। রণ বললো-

- তোমার কথা তো জানা হলো না। চলো ওই যে সামনেই খালার চায়ের দোকান। চা খেতে খেতে কথা বলি আর মধ্য রাত্রির গল্প লিখি।

গাড়ির সাঁ-সাঁ শব্দের মাঝে পেছনে পড়ে থাকে শত ঘৃণা, যন্ত্রণা আর বয়ে বেড়ানো কষ্ট!

(৮৪ নং পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

স্মরণ করতে পেরেছি। উপলব্ধি এসেছে, সাধু সাধ্বীগণ তাদের প্রণোৎসর্গে যে অপূর্ব ভ্রাতৃ প্রেম দেখিয়েছেন, সেই প্রেমে আমিও যেন উদ্দীপিত হয়ে উঠতে পারি। খ্রিস্টমণ্ডলীর সেবায় যেন তৎপর থাকি। জীবনের ঘাত প্রতিঘাতেও প্রভুর প্রতি যেন অটল বিশ্বাস রাখতে পারি। অন্তরের সুরে, জীবনের ছন্দে নিরন্তর গাইতে পারি প্রভুর স্তুতিগান।

ফ্রান্সের লুদ্ নগরী মা মারীয়ার তীর্থস্থান, পর্তুগাল লিনবস ফাতেমা রাণী মা মারীয়ার তীর্থস্থানে গিয়েছি, তখন অন্তরে উপলব্ধি এসেছে মা মারীয়ার মতো মুখের বন্দনায় ও জীবনের পবিত্রতায় তাঁর পুত্র যিশুর প্রতি ভক্তি- বিশ্বাস প্রকাশ করতে পারি।

সাধু আম্ব্রোজের মন্দির, মিলান ক্যাথিড্রাল গির্জা, প্যারিসের নটরডেম ও যিশু হৃদয়ের গির্জার দিকে যখন তাকিয়েছি অন্তর মনটা ভরে গেল বিশ্বাসে-ভক্তিতে আর ঈশ্বরের শক্তিতে। আমার অন্তর যেন ঐশপ্রেমে প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। প্রার্থনা ছিল: আমার হতাশা-নিরাশার মাঝে তুমি হৃদয়ে আমার আশার প্রদীপ জ্বালো। Catecomb, underground graveyard, Catecombe Dei SS Marcellino & Pietro, at Casilna Rome. পরিদর্শন করার সময়ে এই চেতনা ভাবনা অন্তরে এসেছে যে, খ্রিস্টশহীদগণ খ্রিস্ট নামের জন্য আপন রক্ত দিয়েছেন, কোন শাসানির কাছে হয়নি নতশীর। খ্রিস্টশহীদগণ ধর্মবিশ্বাস রক্ষার জন্য আপন রক্ত বিসর্জন দিতে দ্বিধা করেননি, সেই একই বিশ্বাস আমার অন্তরেও যেন জাগ্রত হয়ে উঠে। কঠিন পরীক্ষার সামনে দাঁড়িয়েও যেন ধর্মপালনে অবিচল থাকতে পারি। সাধু সাধ্বীদের মত দয়াকর্ম সাধনে নিত্য আগ্রহী ও কর্তব্য সম্পাদনে নিষ্ঠাবান থাকাতে পারব। ধর্মীয় জীবন নবীকৃত করে তুলতে আগ্রহী থাকব।

জেলখানার মত

মিল্টন রোজারিও

অনেক বছর পর স্টিভ তার পরিবার পরিজন নিয়ে দেশে এসেছে। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা ঢাকার মনিপুরীপাড়া তার কাকাতো ভাই জনের বাসায় এসে উঠেছে তারা।

হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে নেমে তারা ভাবতেই পারেনি যে নিজ দেশ বাংলাদেশে এসেছে। স্টিভও মুগ্ধ হয় দেশের এই পরিবর্তন দেখে। তনিমা অবাক হয়ে বলে, দেখো কি সুন্দর হয়েছে আমাদের বাংলাদেশ এখন। এলিভেটর এক্সপ্রেসওয়েতে এসে রায়ান বলে, Wow.. its like an europe country papa. লিজা বলে, beautiful city. I like it.

স্টিভ তার ছেলেমেয়েকে কানাডা বসে দেশের অনেক গল্প বলেছে। বলেছে তার ছোট বেলাকার গ্রামের কথা। খেলাধুলা, মাছ ধরা ইত্যাদির কথা। মেয়ে লিজা বাবার কথাগুলি শুনে শুনে সব পেটের ভিতরে জমা করে রেখে দিয়েছে। বাবাকে গ্রামে গিয়ে সব দেখাতে বলবে বলে।

রাত্রের ঢাকা শহর দেখতে আসলেই খুব সুন্দর। হলিক্রস স্কুল এন্ড কলেজ পাড় হয়ে একটু সামনে আসতেই লিজা বলে ওঠে, রায়ান দা লুক, মেট্রোরেল যাচ্ছে। স্টিভ বলে, এটাই আমাদের চির পরিচিত চেনাজানা সেই ফার্মগেট। রায়ান বলে, it looks very busy city papa, and very craoud also. কিছুক্ষণের মধ্যেই স্টিভরা মনিপুরীপাড়া ১নং গেট দিয়ে ঢুকে শান্তি রাণী স্কুলের কাছে জনের বাসায় এসে পৌঁছে।

প্রায় ১৫/১৬ বছর পর তারা বাংলাদেশে এসেছে। রায়ানের বয়স তখন পাঁচ আর লিজার তিন বছর ছিল। দেশের কথা ওদের আর কারোই মনে নেই।

জনের ঘরে এসেই শুরু হয় হই হল্লা। বিরাট এক আনন্দের ধুম পরে যায় জনের ঘরে। স্টিভ রায়ান ও লিজাকে বলে, তোমরা আঙ্কেল আন্টির কাছে আশীর্বাদ চাও। জন বলে, না না ঠিক আছে। আমার কাছে আশীর্বাদ চাইতে হবে না। আমি সবাইকে আশীর্বাদ দিলাম। জন আর সুইটির দুই মেয়ে মিষ্টি এবং বৃষ্টি। দুই বোনই লিজার সমবয়সী। দু'জনই হলিক্রস স্কুলে পড়ে। বৃষ্টি বলে, মা এবারের বড়দিনটা আমাদের খুব আনন্দের হবে। গ্রামের বাড়িতে গিয়ে জমিয়ে বড়দিন করবো আমরা। জন বলে, হ্যাঁ। আমারও সেই ইচ্ছা। কিন্তু আমার মনে একটা শঙ্কা ছিল! স্টিভ বলে, তোর মনে আবার শঙ্কা কিসের? জন বলে, দাদা, আমার মনে শঙ্কা ছিল বৃষ্টির মাকে নিয়ে। স্টিভ বলে, মানে? মানে আর কি। থাক আর বলার দরকার নাই। আরে বল না শুনি। শোনো আস্তে বলি। সুইটি যেন না শোনে। সুইটি গ্রামে যেতে চায় না। স্টিভ বলে, ওহঃ এই কথা। ঠিক আছে আমি দেখবো সেটা। এমন সময় সুইটি এসে পরে। জন বলে, সবাই যখন গ্রামের বাড়িতে বড়দিন করতে যেতে চাচ্ছে, তবে তো লেঠা চুকে গেল। কোন শঙ্কা টঙ্কা রইলো না। এই কথা বলে জন স্টিভের দিকে তাকিয়ে চোখে টিপ মারে। স্টিভ বলে, তুই তো দেখি সেই আগের মতই রয়ে গেছিস। বৌয়ের পিছনে লেগে থাকিস। জন বলে, না দাদা একটু দুষ্টামি করলাম আর কি। তোমরা ফ্রেস হয়ে নাও। সুইটি খাবার দিচ্ছে। বৃষ্টি লিজাকে নিয়ে তার ঘরে যায়। মিষ্টি রায়ানের সাথে বসে গল্প করতে থাকে।

খাবারের টেবিলে বসে স্টিভ বলে, দেখো পাগলটা কত্ত খাবারের ব্যবস্থা করেছে। রাত্রে মানুষ এত্ত খাবার খায়? সুইটি বলে, ও কিছু নয় দাদা। এতো সামান্য। রুই মাছের ভাজাকারী, আমাদের জাতীয় ইলিশ মাছ ভাজা, মুরগির মশলাকারী এই তো। মিষ্টি বলে, জলপাই দিয়ে ডালের কথা বলো নাই মা। সুইটি বলে, হ্যাঁ। তাই তো। লিজা বলে আমি ডাল দিয়ে আগে খাবো। লিজার কথা শুনে বৃষ্টি হেসে দেয়। বলে, আগে ডাল খাবে তুমি? তনিমা বলে, লিজা আগে ইলিশ মাছ ভাজা দিয়ে খেতে হয়। দেখো সবাই ইলিশ মাছ ভাজা নিয়ে খাচ্ছে। না মা, ঐটাতে অলিভ আছে। আমি অলিভ দিয়ে ইলিশ খাবো। স্টিভ বলে, খাও তোমার যেটা ইচ্ছে। ঐদিকে মিষ্টি আর রায়ান খুব মজা করে ভাজাকারী আর ডাল দিয়ে ভাত খাচ্ছে। জন বলে, দাদা দেশের মচমচে মুড়ি আছে খাবে নাকি? স্টিভ বলে, না থাক। আজকে আর খাবো না। অন্যদিন খাবো। আর হ্যাঁ। শোন, কালকে সকালে ব্যাংকের কাজটা সেরে বিকেলের দিকে কিন্তু আমরা গ্রামে চলে যাবো। ঐদিকে বাবা মা বাড়িতে সবাই অপেক্ষা করছে। জন বলে, সবাই কারা? তুই তো জানিস পুষ্পও দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে বাবা-মায়ের সাথে আছে। পরদিন সকালে গেলে হয় না দাদা? নারে, এসেই তো তোর এখানে উঠলাম। কদিন পরে আবার আসবো। আগে বাবামাকে দেখে আসি। তুই কবে আসবি বাড়িতে? আমি ২৩ তারিখ বিকেলে আসবো দাদা। ঠিক আছে। এবার আমরা সবাই মিলে একসাথে বড়দিন করবো কিন্তু। অনেক আনন্দ করবো। অনেক বছর পর আবার একসাথে বড়দিন করবো সবাই।

জন একটি মাইক্রো করে রেখেছিল। পাঁচটার সময় মাইক্রো এসে হাজির। স্টিভ তার পরিবার নিয়ে গ্রামের বাড়িতে রওয়ানা হল। বাড়িতে পৌঁছতে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা বেজে গেল তাদের।

গাড়িতে বসে স্টিভ রায়ান আর লিজাকে পথের পাশের জায়গা, নদী দেখাতে দেখাতে আসে। বলে, দেখো এই জায়গাটির নাম সৈয়দপুর। আমরা আগে এখান থেকে বোটে করে সেই মরিচা ঘাটে গিয়ে নামতাম। সেখান থেকে বাসে চড়ে যেতাম বক্সনগর। বক্সনগর থেকে নৌকায়, কেউ হেঁটে যেতাম বান্দুরা। আগের দিনে আমরা কত কষ্ট করে ঢাকায় আসা যাওয়া করেছি। আর এখন আমরা গাড়ি করে আমাদের বাড়ির উঠানে গিয়ে নামতে পারি। রায়ান লিজা চুপচাপ বসে পাপার কথা শুনতে থাকে।

তুলসীখালী ব্রিজ পাড় হওয়ার সময় লিজা জিজ্ঞেস করে, এই ব্রিজের নাম কি পাপা?

স্টিভ বলে, এটার নাম তুলসীখালী ব্রিজ। সামনে মরিচা ব্রিজ। ঐ যে তখন বোটের কথা বললাম না। আগে আমরা বোটে করে যে মরিচা ঘাটে এসে নামতাম। সেই মরিচা এটা। এখন আর কেউ বোটে চড়ে মরিচা আসে না। লঞ্চ চলাচলের সব নদী এখন শুকিয়ে যাচ্ছে। এই নদীর নাম কি তোমরা জান? এই নদীর নাম হলো ইছামতি নদী। আমরা যখন ছোট ছিলাম, এই নদী দিয়ে তখন অনেক লঞ্চ ঢাকা যাতায়ত করতো। ছোট বড় অনেক লঞ্চ। লঞ্চগুলির নাম ছিল,

মঞ্জু, বনছায়া, মুন্নি আরো কত কি। জানো, লঞ্চে চড়ে ঢাকা আসতে তখন আমাদের ৫/৬ ঘন্টা সময় লাগতো। যাক, এই গল্প তোমাদের পরে একদিন শোনাবো।

দেখো কথা বলতে বলতে আমরা টিকিরপুর এসে পড়েছি। মাইক্রো ড্রাইভারের নাম রাসেল, জন বলে দিয়েছিলো। স্টিভ জিজ্ঞেস করে, আর কতক্ষণ লাগবে রাসেল? এই তো দাদা আর ঘন্টা খানেক। রাস্তায় জ্যাম না থাকলে চল্লিশ/পঞ্চাশ মিনিট। রাসেল এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই। শুধু তাদের কথা শুনেছে। এবার কথা বলার একটু যেন সুযোগ পেলো। জিজ্ঞেস করে, দাদা কতদিন পর বাংলাদেশে আসলেন? স্টিভ বলে, এই ১৫/১৬ বছর পর। ১৫/১৬ বছরে দেশের অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে দাদা। আগে আমরা গাড়ি চালাতে সাহস করতাম না। এত্ত খারাপ ছিল রাস্তাঘাট। আর এখন, কত গাড়ি রাস্তায়। হ্যাঁ। তাই তো দেখছি। তোমাদের গাড়ির চেয়ে, এই যে ছোট ছোট এগুলি কি গাড়ি? এগুলোই আমাদের রাস্তায় জ্যাম সৃষ্টি করে দাদা। এগুলির নাম ইজিবাইক। অটোরিক্সাও বলে অনেকে।

সন্ধ্যা নেমে গেছে। রাস্তার পাশে দোকানের বাতি, রাস্তার বাতিতে অন্ধকার চোখে ধরা পরে না। কিছুক্ষণ পর স্টিভ বলে, এইতো আমরা এসে পড়েছি। নমিতা সারা রাস্তা তো তুমি ঘুমিয়েই এলে। এই দেখো আমরা বান্দুরা এসে পড়েছি। নমিতা বলে, যে লম্বা জার্নি করেছি শরীরটা ক্লান্ত হয়ে গেছে। তাই একটু চোখ বুজে ছিলাম। তোমাদের বাপ মেয়ের কথা আমি সবই শুনেছি। স্টিভ বলে, মা দেখো এটা বান্দুরা হলিক্রস হাই স্কুল, সেমিনারী। আমি এই স্কুলে পড়েছি। লিজা বলে, পাপা দেখো এখানেও কত জ্যাম। রাসেল বলে, এখানে সব সময় জ্যাম থাকে সিস্টার। লিজা বলে, ওকে।

বাড়িতে পৌঁছতেই ঠাকুমা ঠাকুরদাদা এগিয়ে আসে। রায়ান আর লিজা গাড়ি থেকে নেমে দৌঁড়ে গিয়ে তাদের জড়িয়ে ধরে। ঠাকুরদা বলে, ওরে আমার দাদুভাই দিদিভাই কত্ত বড় হয়ে গেছে দেখেছো। স্টিভ বলে, রায়ান লিজা ঠাকুরদের পায়ে প্রণাম কর। স্টিভ নমিতা ও বাবা মায়ের পায়ে ধরে প্রণাম করে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে পিন্টু আর লতা ওদের দেখছিল। স্টিভ লিজাকে বলে, ঐ দেখো তোমাদের জন্য বারান্দায় কারা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। লিজা হাসতে হাসতে লতার কাছে যায়। জড়িয়ে ধরে বলে, তোমার নাম লতা তাই না? আর তুমি পিন্টু। তোমাদের ফটোতে দেখছি। দুই ভাইবোন একজন আরেক জনের দিকে তাকায়। হাসতে থাকে মিটি মিটি। লজ্জায় মাথা নিচু করে থাকে। মুখে কিছু বলে না। রায়ানও পিন্টুর কাছে যায়। হ্যাণ্ডশেক করার জন্য হাত বাড়ায়, পিন্টু রায়ানের সাথে হ্যাণ্ডশেক করে। এমন সময় ঘর থেকে দৌঁড়ে পুষ্প বেড়িয়ে এসে বলে, দাদাবৌদি তোমরা এসেছো। এই কথা বলে বৌদিকে জড়িয়ে ধরে সে। নমিতাও ননদিনীকে জড়িয়ে ধরে। বলে, কেমন আছিস পুষ্প? এই কথা বলে গালে চুমু খায়। কিরে তুই তো দেখি কেমন শুকিয়ে গেছিস! পুষ্প বলে, শুকাবো না। তোমাদের কথা চিন্তা করতে করতে শুকিয়ে গেছি। আমাদের কথা না সুধীরের কথা। হ্যাঁ। হয়েছে এখন চল, ঘরে চল। হ্যাঁ। চল।

রাত্রে গ্রামের শীতল পরিবেশে এবং দীর্ঘ জার্নির ক্লান্তিতে তাদের ভালোই ঘুম হল। সকালে উঠে স্টিভ উঠান দিয়ে হাঁটতে থাকে। খানিক পর তার বাবা কাশতে কাশতে একটি চাদর গায়ে ঘর থেকে বের হয়। পুষ্পকে বলে, আমাকে একটু কুসুম গরম জল দিস তো। পুষ্প বলে, হ্যাঁ বাবা দিচ্ছি। গেটের কাছে যেতেই স্টিভের সাথে দেখা। কিরে তুই এতো সকালে উঠেছিস কেন? একটু দেখছি বাবা বাড়ির চারপাশ। কি অবস্থা করেছে একেকজন। এতো বেড়া দেয়াল কেন বাবা? এতো খোয়ারের মত সবাই নিজেকে আটকে রেখেছে। লোকজন বাড়ি থেকে বের হয় কোন দিক দিয়ে? আয় ঘরে আয়। নাস্তা কর তারপর দেখিস গ্রাম ঘুরে। হ্যাঁ। তাই চল।

পুষ্প সেই সকালে উঠে সকলের জন্য নাস্তা বানাতে ব্যস্ত হয়ে পরে। নমিতা এসে বলে, কি করছো তুমি একা একা। দাও আমি কিছু করি। না বউদি তোমাকে কিছু করতে হবে না। তুমি এতো সকালে উঠেছো কেন? নমিতা বলে, সকালটা কত সুন্দর দেখেছো? চারদিকে কুয়াশায় ঢাকা। পুবে সূর্য উঠছে। পাখির কলকাকলি। এই রকম সকাল তো আমরা ওখানে পাই না। তুমি একটু উঠে বসতো। আমি দুটি চিতই পিঠা বানাই। দেখি ভুলে গেছি কি না। না না বৌদি, তুমি হাত পুড়ে ফেলবে। দাদা শেষে আমাকে বকবে। তারচেয়ে তুমি বাবা মায়ের সাথে বস গিয়ে। আমি আসছি। এই তো আর অল্প আছে। নমিতা খাবার ঘরে এসে দেখে টেবিলের উপরে গরম চিতোই পিঠা পাকন পিঠা, কাটাকুলি পিঠা, কেক দিয়ে সাজানো। একটু পর স্টিভ আসে। টেবিলের উপর এত্ত সব খাবার দেখে বলে, ওরে বাপ্ রে, এসব কবে করলো? স্টিভের মা বলে, আমার নাতি-নাতিনরা এতদিন পরে আসছে, তাদের জন্য সব করা হয়েছে। বস তোরা। নাস্তা কর। হ্যাঁ মা তোমার নাতি-নাতিনরা এখনও ঘুমুচ্ছে।

বাবা আমাদের বাড়ি ঘরের একি অবস্থা? আমি তো কিছু চিনতেই পারছি না। এই ১৫/১৬ বছরে দেশের এতো পরিবর্তন হয়ে গেছে! প্রতিটি বাড়ির চারদিকে প্রাচীর। কারো বাড়িতে বাঁশের বেড়া। এমন কেন বাবা? তুমি তো দেশে থাকো না, দেশের হালচাল জানো না। আগে কারো বাড়িতে কেউ উঠলে হাঁচি কাঁশি দিয়ে উঠতো। নাম ধরে ডেকে উঠতো। আর এখন জাত বিজাত সবাই বাড়ির উপরে দিয়ে যাতায়াত করে। স্টিভের মা বলে, ফেরিওয়ালা, টোকাইরা আসে। সামনে যা পায় সেটাই নিয়ে যায়। আমরা থাকি নানা কাজে ব্যস্ত। সব সময় কি বাড়ি পাহাড়া দিয়ে রাখা যায়, বল?

বাবা মায়ের সব কথা স্টিভ চুপচাপ শোনে, কিছু বলে না। এই সব সমস্যার কোন সমাধান নাই স্টিভের কাছে। নাস্তা খেয়ে স্টিভ নমিতাকে বলে, তুমি কি আমার সাথে ঘুরতে যাবে? কোথায়? এই সুধাদের বাড়িতে যাবো। চলো। নমিতা পুষ্পকে বলে, রায়ান লিজা উঠলে ওদেরকে বলিস আমরা এই পাশের বাড়িতে যাচ্ছি। পুষ্প বলে, ওদের জন্য তোমার ভাবতে হবে না বৌদি। আমি আছি না।

সুধাদের বাড়িতে যাবার পথে তপনের সাথে স্টিভের দেখা হয়। Good morning স্টিভ'দা। Very good morning, কেমন আছিস তপন? এই কথা বলে স্টিভ তপনের সাথে হাত মেলায়। কবে আসলে দাদা? গতকাল সন্ধ্যায়। কোথাও যাচ্ছ? হ্যাঁ। সুধাদের বাড়িতে যাবো। সুধাদের বাড়িতে তো তোমরা এই দিক দিয়ে যেতে পারবে না। কেন? জীবনদের বাড়ি ঘুরে যেতে হবে? স্টিভ তপনের কথা শুনে অবাক হয়। বলে, মানে? হ্যাঁ দাদা। জীবনদের বাড়ির পাশে টমুদের বাড়ি। টমুদের ঘরের পিছন দিয়ে একটি রাস্তা আছে, সেখান দিয়ে বিমলদের উঠানের পাশ দিয়ে একটু সামনে গেলে সুধাদের বাড়ি পাবে। এতো দেখি সাপ লুডু খেলার মত রে। না দাদা এটা তার চেয়েও আরো জটিল।

প্রতি বছরের মত ৩১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় গ্রামের প্রধান মাতব্বরের বাড়িতে সামাজিক বৈঠক বসেছে। গ্রামের সবাই সেখানে উপস্থিত। স্টিভ ও রায়ান, লিজা, লতা, পিন্টুকে নিয়ে এসেছে। স্টিভদের দেখে গ্রামের সবাই খুব খুশি হয়। সুবাস জিজ্ঞেস করে, স্টিভ'দা কতদিনের জন্য দেশে আসা? থাকবো ১৫/১৬ দিন। এর পর আবার ওদের সেশন শুরু হয়ে যাবে। এবার তো অনেক বছর পর গ্রামে এলে। হ্যাঁ। তাও ১৫/১৬ বছর হবে। গ্রামে ঘুরেছো? কেমন লাগছে এখন গ্রাম? খুব ভালো একটি কথা বলেছিস সুবাস। গ্রামে এসে আমি খুব বিব্রত হয়ে গেছি। স্টিভের কথা শুনে সবাই একটু নড়েচড়ে বসে। সুবাস জিজ্ঞেস করে, কেন? সকালে আমি সুধাদের বাড়িতে যাবো বলে তোর বৌদিকে নিয়ে বের হয়েছি। ভাগ্যিস তপনের সাথে আমার দেখা হয়েছিল। ওর কথা মত আমি

সুধাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম সত্য; কিন্তু প্রতিটি বাড়ি দেয়াল আর বাঁশের বেড়া দিয়ে এমন ভাবে আটকানো দেখে, প্রতিটি বাড়ি আমার কাছে জেলখানার মত মনে হল। এই সব বাড়িতে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে কেউ এদের রক্ষা করতে সহজে এগিয়ে আসতে পারবে না। গ্রাম প্রধান বলেন, হ্যাঁ স্টিভ তুমি ঠিকই বলেছো। কিন্তু, আমরা কি করবো বল! যার যার সুরক্ষা সে সেই ভাবেই রাখছে। স্টিভ বলে, আমার একটা প্রস্তাব দিতে চাই আজকের এই সামাজিক বৈঠকে। সুবাস বলে ওঠে, বল বল। প্রধান মাতব্বর এবং উপস্থিত সবাই সুবাসের কথায় সায় দেয়। স্টিভ বলে, দেখুন গ্রামের সবার অবস্থা সমান নয়। কারো বাড়ির চারদিকে দেয়াল দেয়ার সামর্থ আছে আবার কারো বাঁশের বেড়া। আমার প্রস্তাব হলো, যাদের আঁটি বাড়ি অর্থাৎ দুইতিনটি বাড়ি একসাথে, তারা যদি মিলেমিশে তাদের ঐ দুইতিনটি বাড়ি একসাথে ঘিরে দেয়াল বা বাঁশের বেড়া দেয় তাতে তারা কিন্তু আর জেলখানার মত থাকবে না। দুইতিনটি বাড়ীর মানুষ একসাথে থাকতে পারবে। একে অপরকে দেখতে পারবে। পারস্পরিক সম্পর্ক তাতে আরো মজবুত হবে। কারো কোন সমস্যা হলে সাথে সাথে এগিয়ে আসতে পারবে। স্টিভের এই কথা শুনে উপস্থিত সবাই খুব প্রশংসা করলো। অজিত মাতব্বর বললো, আসলে স্টিভ একটা ভালো বুদ্ধি দিয়েছে। আমরা দুইতিনটি বাড়ির সবাই মিলে যদি একটা বড় দেয়াল দেই তাহলে খুব ভালো হবে। আর ঐ যে পিটারের বাড়িতে যদি কোন কিছু হয় তাহলে, আমরা কিন্তু কেউ সহজে যেতে পারবো না তার বাড়িতে। কথাটা আমাদের ভেবে দেখা দরকার। কি বলো মাতব্বর সকল? সকলে মাথা নেড়ে অজিতের কথায় সম্মতি জানায়।

সামাজিক আরো আলাপ আলোচনা শেষে চা মিষ্টি কেক খেয়ে সবাই স্টিভের সাথে হাত মিলিয়ে যার যার বাড়িতে চলে যায়।

পরদিন স্টিভ ছেলেমেয়েদের নিয়ে ইছামতি নদীর পাড়ে যায়। নদীর পাড়ে গিয়ে ভাবতে থাকে সেই ছোটবেলার কথা। এই নদীতে বর্ষার সময় কত নৌকা, কত মাছ ছিল। কত মাছ তারা হাত দিয়ে, জাল দিয়ে, বড়শিতে ধরেছে। বলে, এই সেই ইছামতি নদী। যে নদীর কত গল্প করেছি আমি তোমাদের কাছে। এমন সময় লতা বলে ওঠে, দেখো লিজাদিদি, নদীর পানি এখন পচে গেছে, কচুরিপানায় ভরা। একটা নৌকাও চলে না। নদীতে কোন মাছও নাই। স্টিভ লতার মুখে এই সব কথা শুনে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। রায়ান বলে, পাপা চল ঐ মাঠের কাছে যাই। স্টিভ বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ। তাই চল। লিজা বলে, পাপা তুমি না আমাদের বাংলাদেশের কত গল্প শুনিয়েছিলে! আজ দেখো বাংলাদেশের গ্রামে কিছুই নাই। সব শেষ হয়ে গেছে। স্টিভের মনে লিজার এই কথাটি বেশ লাগে। ভাবতে থাকে অতীতের কথা। স্টিভের সেই ছোটবেলাকার কথা। সত্যিই তো কোথায় কেমন করে সব হারিয়ে গেলো। পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিদিন কত কিছুই তো হারিয়ে যাচ্ছে কিন্তু, লিজাকে আমি এখন এটা কি ভাবে বুঝাই!

পরদিন স্টিভ পরিবার নিয়ে রাসেলের মাইক্রোতে ঢাকা চলে আসে।

(৯২ নং পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

টেলিভিশন দেখতে চলে গেলাম।

দুপুরের দিকে ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরে আসি। দেখি সবকিছুই স্বাভাবিক নিয়মে চলছে। গোসল করে খেতে বসেছি। আর তখনই মা কথাটি বললেন, আজ রান্নাঘরে বিড়াল ঢুকেছিলো। মাচাংএর ওপর থেকে গুড়ের পাতিল ফেলে দিয়েছে। আমি ছাগলটা মাঠে বেঁধে দিয়ে এসে দেখি রান্নাঘর গুড়ে ভর্তি। আর একটি সাদা বিড়াল গুড় চেঁটে খাচ্ছে। লাঠি দিয়ে তাড়ানি দিতেই পালিয়ে গেল।

মায়ের কথা শুনে আমি বহু কষ্টে হাসি থামিয়ে রাখি। এখনো যখন একাকি ঘটনাটির কথা ভাবি, প্রচণ্ড হাসি পায়। তবে সে ঘটনার প্রায় সাতাশ বছর পর মাকে আসল ঘটনাটি বলেছিলাম। ততদিনে মা ঘটনাটির কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছে।

আমিও সাদাকালো টেলিভিশনের কথা একদম ভুলে গিয়েছিলাম। একবার বাড়িতে গিয়ে কৌতুহলবশত টেলিভিশনটি দেখতে গিয়েছি। আমি নিশ্চিত ছিলাম হয়তো ভাঙ্গারির দোকানে বিক্রি হয়ে গিয়েছে। টেলিভিশনের কথা পাড়তেই আমরা যাকে কাকা বলে ডাকি, তিনি বললেন, এখনো তাহলে টেলিভিশনটির কথা ভুলে যাওনি?

আমাকে ময়লার ভাগাড়ের ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। লম্বা বারান্দা পেরিয়ে ভেতরের দিকে যেতে হয়। দেখি ঘরের এককোণে মুখথুবড়ে পড়ে আছে আমাদের সেই স্বপ্নের সাদাকালো টেলিভিশন। আমাকে কেমন যেন নস্টালজিয়ায় পেয়ে বসলো। সম্বিৎ ফিরে পেতেই ময়লার ঘর থেকে বের হয়ে আসছি। দেখলাম নতুন ঘরের দেয়ালে বিরাটাকার দামি টেলিভিশন বসানো। পিছন ফিরে সাদাকালো টেলিভিশনটির দিকে আরেকবার তাকালাম। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এই ঘর থেকে।

মনে হলো যেন সাদাকালো টেলিভিশনটি ঘরের নতুন টেলিভিশনটিকে আফসোস করে প্রতিদিন বলে, আমাকে কতজন দেখতে আসতো; আমার কদর ছিলো আকাশচুম্বি আর তোমাকে কেউ দেখতেও আসে না।

আমি যখন লভেরেতে

সিস্টার অলি তজু এসসি

আমি যখন লভেরেতে কফির কাপে
চুমুক দিচ্ছি
আমি যেন সেই মেয়েটি
যে কবিতা লিখছে কোনো এক অদেখা
পুরুষের জন্য
দিনগুলো হতাশায় হাত ধরে হাঁটে
পালিয়ে যাওয়া প্রহর গুণে গুণে।
ভিনচেন্সাকে মনে পড়ে –
যে হেসেছিল একগাল হাসি নিখুঁত অভিনয়ে
স্থির থেকেছে বিস্ফোরক পথের সামনে
এগিয়েছে সাঁতরায়ে রক্তের নদী
অজস্র ক্ষত চিহ্ন নিয়ে
শেষ গন্তব্য পর্যন্ত।
কফিতে চুমুক সরিয়ে-
আমি হেঁটে যাই লভেরের রাস্তায়
এক মৌন মর্যাদায়
ছাঁয়া হয়ে হাঁটে স্পর্শ স্মৃতিরা
চাইলেই কোন নতুন স্পর্শ জন্মে না
ইসিও লেক বলে'না তার প্রবাহের আনন্দ
প্রতিটি ঢেউ স্বাগত জানায়'না-
আমার অবনত পদক্ষেপ।
আমি যেন সেই মেয়েটি –
দৌড়ে যাই ঐ পাহাড়ের দিকে
নতুন পথের প্রান্তে-
স্মৃতি আওরায়,
চোখ মেলে দেখি -
ওরা রেখে গেছে প্রার্থনা, প্রজ্ঞা
কবরের গভীরে বিলীন হওয়ার আগে।

বড়দিন

রক্সি গমেজ

ধন্য যিশু, ধন্য যিশু
আজকে এলো বড়দিন,
শোধ করিতে প্রভু এলেন
তোমার আমার ঋণ।
প্রভাতে উপাসনালয়
ঘণ্টার সুরে ডাকে,
জন্মতিথির প্রভা ছড়ায়,
পত্র ফাঁকে ফাঁকে।
গ্রহণ কর এ আরতি
হৃদয় যাহা দানে,
তব প্রশংসা ছড়িয়ে পড়ুক
সকল প্রাণে প্রাণে।

সাদাকালো টেলিভিশন

সাগর কোড়াইয়া

ছেলেবেলাটা আমার বেশ আনন্দে কেটেছে। যেমন ইচ্ছা তেমনই করতে পারতাম। কিন্তু পড়াশুনায় ছিলাম সিরিয়াস। চাকুরীর সুবাধে বাবা ঢাকাতে থাকতেন। মাসে একবার ছুটিতে এলে আমার মতো ভদ্র ছেলে আর কেউ ছিলো না। তখন খেলাধুলা বন্ধ; সবসময় বই নিয়ে বসে থাকতাম। বাবাকে প্রচণ্ড ভয় পেতাম। তবে বাবা কালেভদ্রে কয়েকবার মাত্র লাঠি দিয়ে উত্তম-মধ্যম দিয়েছেন। মনের মধ্যে বাবার প্রতি এই ভয়টা মা ঢুকিয়েছিলেন।

সারামাস দুষ্টামীর সর্বক্ষেত্রে বিচরণের কারণে মা কখনোই নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে বাবার কাছে নালিশ করবে বলে ভয় দেখাতেন। সে সময় মোবাইলের যুগ না হওয়ায় সারামাসের যত নালিশ মা জমিয়ে রাখতেন। আর ঠিকই; বাবা বাড়িতে এলে মা একে একে নালিশের ঝাঁপি খুলে বসতেন।

বাবা শুধু মনোযোগ দিয়ে শুনতেন।

মাসের শেষে বাবা বাড়িতে আসার এক সপ্তাহ আগে থেকে ভদ্র, শান্তশিষ্ট হয়ে যেতাম। দেখলে যে কেউ ভাববে, এই ধরণের ভালো ছেলে বুঝি দ্বিতীয়টি আর নেই।

বন্ধুরাও জানতো যে, বাবাকে বেশ ভয় পাই। তাই বন্ধুর দল সে সময় বাড়ির চারিদিকে ঘুরঘুর করতো। তবে বাড়িতে প্রবেশ করতে পারতো না। মুখ দিয়ে নানা ধরণের শব্দ তৈরি করে ডাকত। আর সে ডাকার ভাষাটা শুধু আমরাই বুঝতাম।

আমার ছোটবেলাটা আরেকটি কারণে ছিলো বেশ আনন্দের। সে সময় আমাদের এলাকায় কয়েকটি গ্রাম ঘুরেও টেলিভিশন চোখে পড়তো না। আমাদের গ্রামের একটি অংশ হিন্দুপাড়া। কয়েকটি পরিবার ছিলো বেশ অবস্থাশালী। স্থানীয় বাজারে ছিলো চাউল-কাপড়ের ব্যবসা।

এদের মধ্যে একটি পরিবারে ছিলো সাদাকালো টেলিভিশন। আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে লোকজন টেলিভিশন দেখতে আসতো। বাড়িটিতে একটা উৎসব পরিবেশ লেগেই থাকতো সব সময়।

পরিবারটির সাথে ছিলো আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা। এর ফলে আমার অবাধ যাতায়াত ছিলো।

জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই পরিবারটিতে টেলিভিশন দেখে আসছি। শুনেছি পরিবারটি ব্যবসার সুবাধে ভারত থেকে নিপ্পন নামক সাদাকালো টেলিভিশন লটারিতে জিতেছিলো। সেটা আমারও জন্মের প্রায় দশ বছর আগে।

পরবর্তীতে যতবারই টেলিভিশনটি দেখেছি; আমার কাছে নতুনই মনে হয়েছে। টেলিভিশনের সাথে আমাদের একটা আত্মার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল যেন।

সে সময় বিদ্যুৎ ছিলো না। তাই বড় আকারের ব্যাটারি দিয়ে টেলিভিশন চলতো। প্রত্যেক মাসে ব্যাটারি বাজারে নিয়ে যাওয়া হতো চার্জের জন্য। মনে পড়ে, ব্যাটারি চার্জের জন্য পাঁচ টাকা দোকানদারকে দেওয়া ছিলো বাধ্যতামূলক। আমাদের বন্ধুমহল কতবার চার্জের জন্য ব্যাটারি মাথায় নিয়ে

দোকানে দিয়ে এসেছি। একটাই উদ্দেশ্য, টেলিভিশনে সিনেমা প্রদর্শন শুরু হলে যাতে সামনে আসন পেতে পারি।

শুক্রবার আমাদের জন্য ছিলো সবচেয়ে আনন্দের। অনেকটা উৎসবের মতো। মিশনারী স্কুলের ছাত্র হওয়ায় আমাদের শুক্রবারেও হাফস্কুল করতে হতো। সকাল সাড়ে দশটায় টেলিভিশনে টারজান নামক ইংরেজি সিনেমা প্রদর্শিত হতো সে সময়। তাই দশটায় স্কুল শেষ হলে ভোঁ-দৌড়। কোন রকম বাড়িতে বইপত্র ফেলে রেখে চলে যেতাম হিন্দুপাড়া।

টেলিভিশনের সামনে মনোযোগী ছাত্রের মতো বসে টারজান দেখে বাড়ি ফিরতাম। নিজেকে তখন টারজান বলেই মনে হতো। বাড়িতে দুপুরের খাবার খেয়ে বিকাল তিনটায় আবার শুরু হতো পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা ছায়াছবি।

আশেপাশের গ্রামের লোকজন টেলিভিশনে সিনেমা দেখার জন্য এসে ভীড় জমাতো। দুপুরে কোন রকম খাবার খেয়ে সবার আগে স্থান দখল করে নিতাম। আমাদের বয়সীদের জায়গা ছিলো সবার সামনে। সিনেমা শুরু হলে নীরব যোগীর মতো পিনপতন নীরবতায় সিনেমা দেখতাম।

মাঝে মাঝে সিনেমা দেখার মাঝে বাধতো গণ্ডগোল। এমনিতেই জনসমাগম বেশি; তার ওপর আবার যদি গরম পড়তো তাহলে তো কথাই নেই। এরই ফাঁকে কে যেন দুর্গন্ধজনিত বায়ুত্যাগ করায় পরিবেশটাই নষ্ট হয়ে যেতো। আর সে সময় সকল দোষ গিয়ে পড়তো আমাদের মতো ছোটদের ঘাড়ে।

ফলে শাস্তি ছিলো অবধারিত। সিনেমার বিরতিতে টেলিভিশন বন্ধ রাখা হতো। আর তখন কান ধরে উঠবস নয়তো দাঁড়িয়ে থাকা। আরেকটি অভিনব শাস্তিও শিরোধার্য ছিলো; সবাইকে গান শুনানো।

বাড়িটিতে ইঁচড়ে পাকা একটি ছেলে ছিল। বয়সে আমাদের চেয়ে বেশ বড়। সিনেমা শুরু হলে লম্বাকার লাঠি নিয়ে বিছানায় বসে থাকতো। ছোটরা কেউ যদি কথা বলতো, তাহলে নির্ঘাত লাঠির আঘাত মাথায় এসে পড়তো। সিনেমা দেখার মায়ায় কতবার যে, লাঠির আঘাতও অমৃতের মতো লেগেছে।

একবার এক শুক্রবার দিন। স্কুল ছুটি হয়েছে। প্রায় দৌড়েই বাড়িতে এলাম। এসে দেখি বাড়িতে কেউ নেই। সকালবেলা না খেয়ে স্কুলে গিয়েছি। ক্ষুধায় পেট চো-চো করছিলো। একদিকে ক্ষুধা; আরেকদিকে টেলিভিশনে টারজান দেখার চিন্তা। রান্নাঘরের দরজা খুলে পাতিলে দেখি পান্তাভাত রয়েছে। মাচাং-এ মাটির হাঁড়িতে রয়েছে খেজুরের গুড়।

গুড় দিয়ে পান্তাভাত খেতে আমার ভালো লাগে। তবে সমস্যা হয়েছে গুড়ের পাতিল আমার নাগালের মধ্যে নেই। একটি পিঁড়ির ওপর আরেকটি পিঁড়ি দিয়ে তাতে উঠে দাঁড়ালাম। এবার গুড়ের পাতিল আমার হাতের নাগালে।

দু'হাত দিয়ে পাতালটি সাবধানে ধরলাম। পিঁড়ি থেকে সবেমাত্র নামতে যাব। আর তখনই ঘটলো বিপত্তি। পিঁড়ি থেকে পা ফসকে গেল। গুড়সহ মাটির পাতিল নিয়ে চিৎপটাং। পাতিল ভেঙ্গে রান্নাঘর গুড়ে ভরে গেল। আমি তো ভয়ে অস্থির। উপায়ান্তর না দেখে রান্নাঘরের দরজা ভিরিয়ে দিয়ে

(বাকি অংশ ৯১ নং পৃষ্ঠায় পড়ুন...)

ভালোবাসা কখনো পরাজিত হয় না

প্রদীপ মার্সেল রোজারিও

ডিসেম্বর মাস। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে সারাদেশে। গ্রাম এবং শহরে খ্রিস্টান অধ্যুষিত এলাকাগুলো আলোয় ঝলমল করছে। ঘর সাজানো হচ্ছে রঙিন বাতি আর ক্রিসমাস-ট্রি দিয়ে। বড়দিন আসছে। সবাই উৎসবের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। গির্জা থেকে খানিকটা দূরে ছোট্ট গ্রাম ছুটিপুর। হতদরিদ্র এ গ্রামটিতে বড়দিন মানে কেবল ঠাণ্ডা রাত, ক্ষুধা আর হতাশা।

ছুটিপুর গ্রামের এক কিশোরী স্নিগ্ধা। বয়স বারো কি তেরো। মুখে চিরন্তন হাসি, কিন্তু চোখে গভীর ক্লান্তি। বাবা-মা দু'জনেই দিনমজুর। বড়দিন মানে ও'দের কাছে বাড়তি রোজগার নয়, বরং বেশি ঠাণ্ডায় কম কাজ।

সকালে স্নিগ্ধা ঘুম থেকে উঠে দেখে মা মোটা লাল আটা দিয়ে রুটি বানাচ্ছে। পাশে ছোট ভাই স্পর্শ অনবরত কাশছে। মা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, যদি একটু গুড় থাকতো। স্নিগ্ধা চুপ করে রইলো। জানালার পাশে রাখা ছোট্ট পুরনো কাঠের ক্রুশটার দিকে তাকিয়ে সে মনে মনে প্রার্থনা করলো- হে যিশু, আজ বড়দিনের আগের দিন, সবাইকে একটু আনন্দ দাও।

বিকেলে গির্জার সাজসজ্জা শুরু হলো। ফাদার বললেন, "কাল বড়দিনের খ্রিস্টযাগে সবাইকে আসতে হবে। মনে রেখো, বড়দিন মানে শুধু উৎসব নয়, এটি ভালোবাসা এবং মানবতার আলো ছড়ানোর দিন।"

স্নিগ্ধা বাড়ি ফিরে ঠিক করলো, যেভাবেই হোক, ছোট ভাইয়ের জন্য একটি ছোট্ট উপহার যোগাড় করবে। ও'র পুরোনো কাঠের খেলনা গাড়িটা বেশ কিছুদিন হলো ভেঙ্গে গেছে।

বিকেলে সে গ্রাম থেকে এক মাইল দূরের বাজারে গেল। দোকানগুলোতে রঙ্গিন বাতি, খেলনা, কেক এবং অন্যান্য সাজসজ্জার সামগ্রী ঝলমল করছে। স্নিগ্ধার হাতে ছিলো মাত্র দশ টাকা। দোকানদার হেসে বললো, এই টাকায় খেলনা নয়, শুধু একটি মোমবাতি পাবে। স্নিগ্ধা মোমবাতিটাই কিনলো এবং মনে মনে বললো, আলোই তো বড়দিনের প্রতীক।

ফেরার পথে কুয়াশায় উঁচু-নীচু পথে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিলো। হঠাৎ সে শুনলো, কেউ যেন কাঁদছে। সে লক্ষ্য করলো ঝোপের পাশে একটি ছোট্ট ছেলে বসে আছে। শীতে কাঁপছে। ছেলেটির চোখে ভয়, হারিয়ে গেছে বোধ হয়। স্নিগ্ধা ছেলেটির কাছে গিয়ে বললো, ভয় পেও না, আমি তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবো। ছেলেটি মাথা নেড়ে বললো, আমি জানি না আমার বাড়ি কোথায়। স্নিগ্ধা ছেলেটির গায়ে নিজের পুরনো চাদরটা জড়িয়ে দিয়ে বললো, এসো, আজ রাতে

আমাদের বাড়িতে থাকবে।

ছেলেটিকে দেখে স্নিগ্ধার মা অবাক হয়ে বললেন, এ ছেলেটি কে?

ছেলেটি হারিয়ে গেছে, মা। একটু থাকতে দাও।

মা কিছু বললেন না, শুধু ওদের সামনে লাল মোটা আটার দু'টো রুটি রাখলেন। ওরা তিনজন ভাগ করে খেল।

রাত বাড়লো। বাইরে চার্চের ঘন্টাধ্বনি বাজছে- "ঈশ্বরের মহিমা সর্বোচ্চ স্থানে....।"

গভীর রাত, হঠাৎ স্নিগ্ধার ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে অদ্ভুত আলো। জানালা খুলে দেখে, আকাশ থেকে সোনালী আলো নামছে। আলোর ভেতর দাঁড়িয়ে আছে এক শান্ত মুখের মানুষ-দীর্ঘ পোশাক, কোমল হাসি।

শান্ত মুখের মানুষটি বললেন, "ভয় পেয়ো না, স্নিগ্ধা। আমি এসেছি সেই ভালোবাসার বার্তা নিয়ে, যা "বড়দিন"-এর আসল অর্থ। আমি সেই শিশুটি আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে এক গোয়াল ঘরে যার জন্ম হয়েছিলো। আমি যিশু।" তিনি আরও বললেন, "তুমি আজ এক হারিয়ে যাওয়া শিশুকে আশ্রয় দিয়েছো, নিজের খাবার ভাগ করে খেয়েছো। এটাই বড়দিনের আত্মা- ভালোবাসা ও ত্যাগ।" স্নিগ্ধা কাঁদতে কাঁদতে বললো, "কিন্তু আমি তো খুব দরিদ্র, আমার তো কিছুই নেই। যিশু মৃদু হেসে বললেন, "যে হৃদয়ে ভালোবাসা আছে, সে-ই সবচেয়ে ধনী।"

আলো নিভে গেল, সব শান্ত হয়ে গেল। সকালে যখন সূর্যের আলো জানালা দিয়ে ঢুকলো, স্নিগ্ধা জেগে দেখলো, সেই হারানো ছেলেটি নেই। কিন্তু যেখানে সে ঘুমিয়েছিলো, সেখানে রাখা একটি ছোট্ট কাঠের ক্রস, তাতে লেখা- "ভালোবাসা কখনো পরাজিত হয় না।"

স্নিগ্ধার মা আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, ঐটা আমাদের জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

সকালে চার্চে সকল খ্রিস্টভক্ত একত্রিত হয়েছে বড়দিনের খ্রিস্টযাগে। ফাদার বললেন, আজ আমাদের প্রভুর জন্মদিন। তিনি এসেছিলেন আমাদের শেখাতে- ভালোবাসাই হলো ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার। ধন নয়, পোশাক নয়, আলো ছড়াও হৃদয়ে, মানুষে মানুষে। প্রতিটি মানুষের মধ্যে ঈশ্বর আছেন।

স্নিগ্ধা সেই ছোট্ট ক্রসটা শক্ত করে ধরে বললো, আমি আজ বুঝেছি, বড়দিন মানে কেক খাওয়া বা উপহার পাওয়া নয়- বড়দিন মানে অন্যের জীবনে আলো জ্বালানো।

তারপর থেকে ছুটিপুর গ্রামে এক অদ্ভুত পরিবর্তন এলো। মানুষ একে অপরের পাশে দাঁড়াতে শুরু করলো। কেউ খাবার ভাগ করলো, কেউ পুরনো পোশাক দান করলো। চার্চের সামনে একটি কদম গাছ লাগানো হলো- গাছটির নাম রাখা হলো "আলোর গাছ"। প্রতি বড়দিনে সবাই সে গাছের নীচে মোমবাতি জ্বালিয়ে স্মরণ করে স্নিগ্ধাকে, যে এক হারানো শিশুর মাঝে খুঁজে পেয়েছিলো যিশুর আলো এবং ভালোবাসা।

আমার এ মন পাথরতো নয়!

ডেভিড স্বপন রোজারিও

ময়ূরীর সাথে আমার পরিচয় জেরুশালেমে তীর্থ ভ্রমণে এসে। সে সময়ে মোট ৫৪ জন তীর্থযাত্রী আমেরিকার বিভিন্ন শহর থেকে অংশগ্রহণ করেছিলো।

প্রথম দিন Tel আরা এর যে শহরটিতে আমরা এসে উপস্থিত হলাম তার নাম "Nayanya" খুবই সুন্দর একটি ছিমছাম শহর। দিনটি যার যার খুশিমত ঘুরে বেড়ানোর জন্য নির্ধারিত ছিলো। হোটেলের অদূরে, একরাশ নীল রঙ্গে রঞ্জিত বিশাল ভূমধ্যসাগরের একাংশ দেখা যাচ্ছিলো। আমাদের আর তর সইছিলো না। আমরা বেশ কয়েকজন হাঁটতে হাঁটতে সমুদ্র তটে নেমে এলাম।

চমৎকার আবহাওয়া। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই সমুদ্রের নির্মল হাওয়ায়, দেহ মন সিক্ত করছে। কেউ লম্বা কাঠের আরাম চেয়ারে শুয়ে, রোদ পোহাচ্ছে, কেওবা আবার সমুদ্রস্নানে ব্যস্ত।

আমার স্ত্রী মুক্তা অন্যান্য সঙ্গী-সাথীদের সাথে সমুদ্রের নোনা জলে হাঁটু পর্যন্ত পা ডুবিয়ে, ঢেউয়ের সাথে লুকোচুরি খেলছে। সূর্য, পশ্চিম দিগন্তে রক্তিম আলোকছটায় উদ্ভাসিত হয়ে ডুব দেবার অপেক্ষায়। কি মনোমুগ্ধকর একটি পরিবেশ চারিদিকে বিরাজ করছে। সেই দিকে মোহমুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখছি এবং আমার যা অভ্যাস আনন্দময় চিত্তে ঝিনুক কুড়াতে কুড়াতে, আমার প্রিয় কণ্ঠশিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের, অত্যন্ত জনপ্রিয় গানটি অনুচ্চ কণ্ঠে গাইতে লাগলাম:-

"ওগো মোর গীতিময়, ওগো মোর গীতিময়
মনে নাই, সেকি মনে নাই,
সেই সাগর বেলায়, ঝিনুক খোঁজার ছলে,
গান গেয়ে পরিচয় ওগো মোর গীতিময়..."

গান থামতেই, কে একজন পিছন থেকে বললো, ভালোইতো গাইছিলেন দাদা, থামলেন কেন?

পিছন ফিরে দেখি ময়ূরী, যার সাথে কিছুক্ষণ আগে মাত্র Hotel Lobby তে পরিচয় হয়েছে।

হাসতে হাসতে বললাম, কি যে গলার ছিরি, তাতে আবার গান গাওয়া।

আমরা দু'জন টুকটাক কথা বলতে বলতে বালুর পথে হাঁটছিলাম। হঠাৎ আলাপচারিতার এক পর্যায়ে, ময়ূরী বললো, দাদা, আপনি হয়ত জানেন না, আমি কিন্তু আপনার লেখার একজন ভক্ত। আচ্ছা দাদা, আমাকে নিয়ে একটা গল্প লিখতে পারেন না? আবদার শুনে আমি তার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকালাম। নির্বিকার ভাব দেখে মনে হলো, এক নিষ্পাপ বালিকা আমার কাছে, "আইসক্রিম" চাচ্ছে। কয়েক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, কিভাবে লিখবো? আপনার সাথে তীর্থে এসে পরিচয়, কতটুকুই বা আপনাকে চিনি বা জানি। তবে আপনি যদি আমার কাছে আপনার জীবন কাহিনী বলেন, তবে হয়ত চেষ্টা করে দেখতে পারি।

কিছুটা দূরে, একদল শিশু কিশোর, যুবক-যুবতী সমুদ্রস্নান করছিল, আর ঠিক তার পাশেই রোদ্র উপভোগ করার জন্য কয়েকটি আধা শোয়া চেয়ার খালি পড়েছিলো। আমরা সেখানে গিয়ে বসলাম– ময়ূরী, অকপটে তার জীবনের মধুর স্মৃতি, তিক্ত অভিজ্ঞতা, ভালোলাগা-না লাগার নানা দুঃখ বেদনার স্মৃতি তুলে ধরলো–

আমি সে'সব কথা গভীর মনোযোগ সহকারে একে একে হৃদয়ে গেঁথে রাখলাম।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। ইতিপূর্বে সবাই সমুদ্রে জলকেলি সেরে ফিরে এসেছে। আমরা হাঁটতে হাঁটতে হোটেলে ফিরে এলাম। এখন আমার সার্বক্ষণিক চিন্তা, কোথা থেকে কিভাবে শুরু করবো, কারণ তাকে আমি কথা দিয়েছি। ময়ূরী আনন্দচিত্তে যে ঘটনা আমাকে বলেছে, তাকেই ভিত্তি করে আমার গল্প এগিয়ে চললো। যে দশদিন একত্রে ছিলাম, সুযোগ পেলেই আবার কিছুটা ঝালিয়ে নিতাম। যাহোক গল্পে ফিরে আসি–

বর্তমানে ময়ূরীর বয়স প্রায় পয়ষট্টি বছর। এখনও দেহের সৌন্দর্য বিদ্যমান। পটলচেরা, হরিণীর মতো দুটি চোখ, গায়ের রং উজ্বল শ্যামবর্ণ। মাঝারি গড়ন, ফাঁপানো লম্বা কালো চুল, যা এক সময়ে তার গর্ব ছিলো, আজ বয়সের কারণে চুল অনেকটা ঝরে পড়েছে। বোঝা যায় যৌবনে সে যথেষ্ট রূপবতী ছিলো। আর এই চোখ দুটো ও স্নিগ্ধ হাসি দেখে আমি প্রথম দিন বলেছিলাম, "ঠিক যেন নাটোরের বনলতা সেন।"

সে মুচকি হাসি দিয়ে সলজ্জ কণ্ঠে বলেছিলো, কি যে বলেন, দাদা।

সম্ভবত: তার এই টানা চোখ দু'টো দেখেই ছোট কাকা তার নাম রেখেছিলেন "ময়ূরী"। সেই কাকা স্বাধীনতার আগে খুলনায় এক সাহেবের বাড়িতে বাবুর্চীর কাজ করতেন। সাহেবের খুব আদরের দু'টো ময়ূর ছিলো। নিয়মিত খাওয়া দাওয়া এবং যত্নাদি করার কারণে ময়ূর দু'টি তার খুব অনুরক্ত ছিলো।

যাহোক, ময়ূরী চার বোনের মধ্যে সেজো। গ্রামের স্কুলের প্রতিটি পরীক্ষায় সে প্রথম স্থান অধিকার করতো। বড় দু'বোন হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে নার্সিং পেশায় নিয়োজিত ছিলো। মূলত তাদের পরামর্শে, হলিক্রস স্কুলে ময়ূরীকে ক্লাশ সিক্সে ভর্তি করে দেয়া হয়। সে বড় বোনদের সাথে তেজকুনীপাড়ায় একটি ভাড়া বাসায় থাকে। তার এক পিসিমা সিস্টার, বয়স্ক এবং অত্যন্ত অভিজ্ঞ, প্রশাসনিক দক্ষতাসম্পন্ন। বলতে গেলে নিষ্ঠাবান এ সিস্টার পিসিমা'র তত্ত্বাবধানে, বোনেরা সবাই সুন্দর পরিচ্ছন্ন জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

লেখা-পড়ার ফাঁকে ফাঁকে, সে স্কুলের গানের শিক্ষিকার কাছে রবীন্দ্র সঙ্গীতের তালিম নিতে থাকে। অপূর্ব ভরাট গলার কারণে শিক্ষিকা তাকে যত্ন সহকারে গান শিখাতে থাকেন। গানের প্রতি তার আগ্রহের কারণে, তৃতীয় খ্রিস্টযাগে ময়ূরী নিয়মিতভাবে গানের দলে অংশ গ্রহণ করে। স্কুলে যে কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিল্পী হিসাবে তার উপস্থিতি অনিবার্য হয়ে ওঠে। সে ম্যাট্রিকে দু'টো লেটার সহ প্রথম বিভাগে পাশ করে। সামনে বিশাল সম্ভাবনাময় জীবন। সে হলিক্রস কলেজেই ভর্তি হয়।

আর ঠিক ঐ সময় তার জীবনে এক অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে, যা তার পরবর্তী জীবনকে উলোট-পালোট করে দেয়। ঘটনাটা নিম্নরূপ- গির্জায় প্রতি রোববার তৃতীয় মিসায় গানের দলে একটি ছেলে হারমোনিয়াম বাজায় এবং ভালই বাজায়। সে সবার প্রিয়পাত্র, নাম-শৈবাল রোজারিও, থাকে রাজাবাজার। প্রথমদিন থেকে ছেলেটির ময়ূরীকে মনে ধরে। সুযোগ পেলেই উপযাজক হয়ে নানা কথা বলতে চায়। ময়ূরীও স্বাভাবিকভাবে কথা বলে সহশিল্পী হিসাবে। প্রতি রোববার মিসা শেষে, বোন ও সহপাঠিদের সাথে দলবদ্ধভাবে বাসায় ফিরে আসে। শৈবাল কিন্তু নীরবে বেশ দূর থেকে তাকে অনুসরণ করে। অনেক সময় ময়ূরী কলেজ ছুটির পর শৈবালকে গেটের অনতিদূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। তখন সবার অলক্ষ্যে দু'চোখের মিলনে, মুচকি হাসির বিনিময়ে, নানা ভাবের আদান প্রদান হয়ে থাকে। এভাবে দিন গড়াতে থাকে।

আজকাল শৈবাল মিসা শুরুর আগে, নির্ধারিত গান না বাজিয়ে বিভিন্ন প্রেমের গানের সুর তোলে যেমন:-

"প্রেম যে চির মধুর, প্রেম যে চির উজ্জ্বল,
প্রেম যে মহিমাময়, প্রেম চির সবল।"

Orphanage এর একটি মেয়ে ভালো তবলা বাজায়, সে কিছু না বুঝে, বিস্ময়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

একদিন প্রেমে পাগল শৈবাল সব পারিপার্শ্বিকতা ভুলে মিসার আগে বাজাতে লাগলো হারানো সুরের ছায়াছবির গান-"

"তুমি যে আমার, ওগো তুমি যে আমার,
কানে কানে শুধু একবার বলো
তুমি যে আমার.....।

ভাগ্যিস ঐ সময়ে সিস্টারগণ এসে পৌঁছাননি, তাই রক্ষা, সবাই আড় চোখে দেখলো, ময়ূরী মাথা নীচু করে মুচকি মুচকি হাসছে। কারও বুঝতে বাকি রইলো না এর রহস্য কি? কিন্তু সিস্টার পিরিমা'র ভয়ে কেউ কিছু মন্তব্য করলো না। এখানে বলা প্রয়োজন শৈবাল তেজগাঁও কলেজে পড়ে এবং নম্র-ভদ্র ব্যবহারের জন্য সিস্টারগণও তাকে বেশ পছন্দ করেন।

এদিকে শৈবাল তার প্রেমিকাকে ভালোবাসার কথা জানাতে মরিয়া হয়ে উঠলো। কোনমতেই একান্তে দুটি মনের কথা বলার সুযোগ পাচ্ছে না। অতি নিকটে থেকেও সে যেন বেশ দূরে।

একদিন দীর্ঘ একটি প্রেমপত্র লিখে, সুযোগ মতো ময়ূরীর বইয়ে চালান করে দিলো। আর ঠিক এখানেই সে বড় ভুল করে ফেললো। ময়ূরী ঘুণাক্ষরেও টের পেলো না কিছুই। কথায় বলে না, পড়বিতো পর মালির ঘাড়ে। সিস্টার গানের বইগুলি একটি ব্যাগে ভরে নিয়ে যায় এবং আবার নিয়ে আসে এটা হয়তো শৈবাল জানেনা। সিস্টার যখন বইগুলো ব্যাগে ভরতে গেলো, চিঠিটা টপ করে নিচে পড়ে গেলো। ময়ূরীর নামের চিঠিটা পড়েতো সিস্টারের আক্কেল গুড়ুম। তিনি মহা দুঃশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন।

এরই মধ্যে ইন্টারমিডিয়েটের রেজাল্ট বের হয়েছে, ময়ূরী অত্যন্ত কৃতকার্যতার সাথে প্রথম বিভাগে পাশ করেছে। বোনেরা তাকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চায়, কিন্তু "সে গুড়ে বালি"। তখনকার দিনে রক্ষণশীল পরিবারের প্রেম-ভালোবাসা, অতীব নিন্দনীয় অপরাধ। সিস্টার তার ভাইকে জরুরী বার্তা পাঠালেন, ঢাকায় আসার জন্য। গোপনে বিস্তর আলোচনা হলো দুই ভাই-বোন মিলে। সকলকে হতবাক করে, একদিন সকালে বড়দিনের বেশ কিছুদিন বাকি থাকতেই, ময়ূরীকে সাথে নিয়ে বাবা রওনা হলেন গ্রামের বাড়ি। সময় দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে, ময়ূরীর মনটা শৈবালের জন্য আকুলি-বিকুলি করতে থাকে, কবে ফিরবে ঢাকায়, তার প্রিয়তমের কাছে। সে ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি তাকে নিয়ে, কি ভয়ংকর পরিকল্পনা তার পিতা-মাতা আত্মীয়স্বজনরা হাতে নিয়েছেন।

অনেক ধুমধাম করে বড়দিনের উৎসব শেষ হলো। এর মধ্যে ক্ষণিকের তরেও ময়ূরী শৈবালকে ভুলে থাকতে পারে নি। একদিন বিকেলে, উঠানে মাদুর বিছিয়ে ভাইপো-ভাইজিদের নিয়ে গানের আসর বসিয়েছে। এমন সময় দেখলো পাড়ার একদল নারী-পুরুষ বাড়িতে প্রবেশ করছে। ময়ূরীরা এমনিতেই একান্নবর্তী পরিবার, বাড়িশুদ্ধ লোক, তারপরও এদের আগমনে সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লো। ছোট কাকিমা, ময়ূরীকে ডেকে ঘরে নিয়ে গেলো এবং বললো, এরা পাশের গ্রামের মানুষ, তোমাকে দেখতে এসেছে, চলো, চটপট হাতমুখ ধুয়ে কাপড় বদলিয়ে নাও। ময়ূরী আচমকা এ কথা শুনে একদম হতভম্ব হয়ে পড়লো, কি করবে? কি বলবে? কিছুই ভেবে পেলো না। দম দেওয়া পুতুলের মতো কাপড় বদলিয়ে কাকিমার পিছু পিছু এক গাদা লোকের সামনে এসে মাথা নত করে দাঁড়ালো।

পাত্র-পাত্রী উভয়পক্ষের পছন্দ হলো, ফলে একদিন দিনক্ষণ দেখে বিবাহের পাট চুকে গেলো। এ যেন "ওঠ ছেরি তোর বিয়ে"। সে যুগে মেয়েদের মুখ ফুটে কিছু বলার অবকাশ ছিলো না। অভিভাবকদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এখানেও তাই হলো, ময়ূরীর পছন্দ-অপছন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন গুরুত্বই দেয়া হল না। তার মনের লালিত স্বপ্ন, উচ্চশিক্ষা লাভ করা, স্বপ্নই রয়ে গেলো। শত আনুষ্ঠিনিকতার মধ্যেও এক মুহূর্তের জন্য, তার প্রথম প্রেমিকের কথা ভুলে থাকতে পারলো না।

স্বামীর নাম অতুনু গমেজ, বেশ লম্বা, তবে কিছুটা হালকা গড়ন। মাথার চুল ঝরে গেছে, মধ্যখানে ছোট একটি টাক। গায়ের রং ফর্সা। সে খুব নম্র-ভদ্র এবং স্বল্পবাক। স্কুল ছুটির পর বাড়িতে ছাত্রদের প্রাইভেট পড়ায়। অংকে গুণী শিক্ষক হিসাবে এলাকায় তার যথেষ্ট নাম ডাক আছে। আশে পাশের গ্রামের ছাত্ররা প্রাইভেট পড়তে তার কাছে ছুটে আসে। প্রেম-পিরিত বা সংসার-ধর্ম নিয়ে তার আলোচনা করার ফুরসত নেই।

বেচারা ময়ূরী, একটুখানি স্নেহ ভালোবাসার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। শাশুড়ী মা বোধহয় ওর মনের ব্যথাটা বুঝতে পারলেন। একদিন উনি বললেন, বৌমা, তুমি তো গান জান, তবে বাড়ির ছেলে মেয়েদের গান শেখাচ্ছো না কেন? ময়ূরীতো যেন চাঁদ হাতে পেলো। সে বলল, কিন্তু মা, হারমোনিয়াম পাব কোথায়?

-আমি ব্যবস্থা করছি।

বড় ভাসুরের ঘরে একটি পুরানো হারমোনিয়াম ছিল। ভদ্রলোক এক সময়ে সাধু আন্তনীর পালা গান গাইতেন, কিন্তু অবসর নেওয়ার পর, কেউ আর এখন এই পুরনো যন্ত্রটি ব্যবহার করে না।

যাহোক, সেই হারমোনিয়াম এনে ময়ূরীকে দেয়া হল। ময়ূরী মহানন্দে যন্ত্রটি ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করে নিলো। সে বাড়ির ও গ্রামের অন্যান্য ছেলে মেয়েদের, বিকেলে গান শেখাতে লাগলো। মাঝে মাঝে সিস্টারদের অনুরোধে গির্জার গানের দলকেও গান শেখাতে লাগলো।

স্থানীয় যুব সংগঠন ও গির্জার নানা অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার জন্য সে নিয়মিতভাবে ডাক পায়। একদিন এমনি একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার জন্য অনুরোধ এলো, যে অনুষ্ঠানে ঢাকার একজন NGO প্রধান উপস্থিত থাকবেন, প্রধান অতিথি হিসাবে। ময়ূরী স্বভাব সুলভ সুরেলা কণ্ঠে অত্যন্ত দরদ দিয়ে, পরপর কয়েকটি জনপ্রিয় রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে লাগলো। সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনছে, সর্বশেষে যে গানটি সে গাইলো, তাতে তার হৃদয় মন এক হয়ে গেলো। ভাবে বিভোর হয়ে সে গাইলো-

"সখি ভাবনা কাহারে বলে,
সখি যাতনা কাহারে বলে,
তোমরা যে বল দিবস রজনী,
ভালোবাসা ভালোবাসা
সখি ভালোবাসা কারে কয়,
সেকি কেবলই যাতনাময়।"

বড় সাহেব এতো মুগ্ধ হলেন যে, তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীর মাধ্যমে, ময়ূরীকে খাবার টেবিলে ডেকে নিয়ে গানের ভূয়সী প্রশংসা করে, কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্ন করলেন। যেমন, তুমি কতটুকু পড়াশোনা করেছো? এখানে কি করো? স্বামী কি করে, ইত্যাদি।

ময়ূরী প্রতিটি প্রশ্ন অত্যন্ত স্পষ্ট করে ইংরেজিতে উত্তর দিলো। এতে সাহেব আরও খুশী হলেন, এবং তার হাতে একটি ভিজিটিং কার্ড দিয়ে বললেন, আগামী সপ্তাহে আমার সাথে ধানমন্ডি অফিসে আসো, আমি তোমাদের চাকরি দেবো।

এ মহান সুযোগ অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়ে, তারা তো মহাখুশি। বাড়ির লোক ও গ্রামের সবার উৎসাহে তাদের একমাত্র মেয়ে মহুয়াকে নিয়ে তেজকুনীপাড়া এসে, বড় বোনের বাসায় উঠলো। মেয়ে গ্রামে নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে, যেহেতু, ময়ূরী হলিক্রসের প্রাক্তন ছাত্রী, তাই মেয়েকে নবম শ্রেণিতেই ভর্তি করাতে কোন সমস্যা হলো না। নিজের নামের অদ্যাক্ষর অনুসারে, ময়ূরী তার মেয়ের নাম রেখেছে মহুয়া।

যথারীতি কার্ড হাতে ময়ূরী ও তার স্বামী অতুনু ধানমন্ডি অফিসে বড় সাহেবের সাথে দেখা করতে এলো। বস, তাদের দেখে খুশি

হলেন- অতুনুকে সহকারী হিসাব রক্ষক এবং ময়ূরীকে অফিস সহকারীর কাজ দিলেন। প্রথম প্রথম তারা রিক্সায় যাতায়াত করতো, কিন্তু বস জানার পর তাদের আসা যাওয়ার জন্য অফিসের গাড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন।

সুখময় জীবন দ্রুত গড়িয়ে যেতে লাগলো। মেয়ে তখন ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। আর ঠিক সে সময়, হাসনাবাদের একটি পরিবার এসে বললো- আপনাদের মেয়েকে আমাদের ভীষণ পছন্দ হয়েছে। আমাদের ছেলে আমেরিকার শিকাগো শহরে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে একটি ভালো কোম্পানিতে চাকরি করে। আশা করি আমাদের বিমুখ করবেন না।

বলা-বাহুল্য, মহুয়া দেখতে বেশ সুন্দর। দেহের গড়ন হালকা পাতলা, মার মতো মাথা ভর্তি লম্বা কালো চুল। ময়ূরী সর্বক্ষণ মেয়েকে আগলে রাখেন, কারণ যৌবনে যে ভুল সে করেছিলো, তার জন্য আজও জ্বলেপুড়ে মরছে। সে জন্য ময়ূরী, কোন মতেই রাজি হচ্ছিলো না, কারণ সে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারেনি, মেয়েকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে স্বপ্ন পূরণ করতে চায়। কিন্তু ছেলে পক্ষ নাছোড়বান্দা, তারা যে কোন শর্তে রাজি। মেয়ে যতদূর পড়তে চায় পড়াবে। ইতোমধ্যে ছেলে গৌরবও শিকাগো থেকে চলে এসেছে। নম্র-ভদ্র ছেলেটির সাথে কথা বলে এবং শেষ পর্যন্ত আত্মীয়স্বজনদের পরামর্শে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হলো, তবে মহুয়ার মতামত নিতে ভুল করলো না। মেয়ে রাজি হওয়াতে একদিন ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেলো।

ওরা চলে যাবার পর ময়ূরী ও তার স্বামী অতুনু একদম একা হয়ে গেলো। মহুয়ার অনুপস্থিতিতে বাড়িটি কেমন যেন খালি খালি মনে হয়, সবকিছু শূন্য ও বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে। একথা চিন্তা করেই বোধ হয়, মেয়ে মহুয়া প্রথম সুযোগে সকল প্রয়োজনীয় কাগজপত্র চেয়ে পাঠালো, মেয়ের চাহিদামত ময়ূরী সব যোগাড় করে পাঠিয়ে দিলো।

কয়েক বছর পর সুসংবাদ এলো, ঢাকাস্থ আমেরিকান এ্যাম্বেসী ইন্টারভিউ নিয়ে ভিসা দিয়ে দিলো। এবার যাবার প্রস্তুতি জোরে-সোরে শুরু হয়ে গেলো। যথাসময়ে টিকেট কাটা হয়ে গেলো, এখন উড়াল দেওয়ার সময়। অতুনু জমি সংক্রান্ত কাজে গ্রামের বাড়িতে গেছে। রোববার তৃতীয় মিসা শেষে, ময়ূরী গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো হঠাৎ গম্ভীর কণ্ঠে শুনলো, কেমন আছো ময়ূরী?

অতি পরিচিত কণ্ঠ শুনে ময়ূরী যেন স্তব্ধ হয়ে গেলো, মনে হলো সমস্ত শরীরটা যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে। কোন রকমে পিছন ফিরে দেখে, শৈবাল মাত্র হাত খানেক তফাতে দাঁড়িয়ে আছে। স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে দেখলো, শৈবালের মাথার চুলে পাক ধরেছে, চোখে পাওয়ারফুল মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। ক্ষণিকমাত্র, তারপর ময়ূরী বললো, ভালো আছি। আবেগঘন কণ্ঠে শুধালো, তুমি কেমন আছো? অনেকদিন পর দেখা। আমরা তো আগামী সপ্তাহে আমেরিকায় চলে যাবো। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কথা না বলে, চল, আমার বাসায় বসে তোমার সব কথা শুনবো।

ময়ূরীর বাসায় তখন বোনঝি'রা কোমড় বেঁধে জিনিসপত্র গুছানোর কাজে ব্যস্ত। কাকে কি দেয়া হবে এবং কি কি সাথে করে নেবে, সব ঠিক করাই ছিলো, শুধু বাঙে গুছিয়ে নেয়ার অপেক্ষায়।

শৈবাল ও ময়ূরী সামনা-সামনি দু'টো চেয়ারে বসলো। ময়ূরী নিজ হাতে চা বানিয়ে প্লেটে কিছু বিস্কুটসহ টি-টেবিলের উপর রাখলো। নিরবতা ভঙ্গ করে ময়ূরীই প্রথম প্রশ্ন করলো, এখন কি করছো? কতজন ছেলে-মেয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি।

শৈবাল একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, জীবনে যাকে প্রথম ভালোবেসে হৃদয় সিংহাসনে দেবীর আসনে বসিয়েছিলাম, তার স্থানে অন্য কাউকে কল্পনাও করতে পারিনি। তোমার হঠাৎ চলে যাওয়ার জন্য পাগলের মতো তোমাকে অনেক স্থানে খুঁজেছি। তোমাদের এলাকার যাকে পেয়েছি, লজ্জা-শরম ঝেড়ে ফেলে, মনের কথা বলেছি, তোমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছি। তাদেরই একজন খবর দিলো, ময়ূরীর বিয়ে হয়ে গেছে। আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। তোমাকে হারানোর কষ্ট কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলাম না। যেখানেই যাই, যা কিছুই করি না কেন, তোমার মুখটা ভেসে ওঠে মনের পর্দায়। শেষে ভাবলাম, তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যাবো, যদি তাতে তোমাকে ভুলে থাকা যায়! চরম হতাশা থেকে মুক্তি পেতে, একদিন চাকরি নিয়ে চলে যাই মধ্যপ্রাচ্যে। দীর্ঘদিন সেখানে কাজ করে, গতমাসে অবসর নিয়ে একেবারে দেশে ফিরে এলাম।

আরও অনেক সুখ-দুঃখের কথা হলো দু'জনের মধ্যে, বিদায় বেলায়, শৈবাল অবনত মস্তকে শুধু বললো, ভালো থেকো, এ জীবনে হয়তো আর দেখা হবে না, বলেই কোন উত্তরের অপেক্ষা না করেই, হন হন করে হেঁটে চলে গেলো। একবারের জন্যও পিছন ফিরে তাকালো না।

শিকাগোতে এসে তাদের নতুন জীবনে অভ্যস্ত হতে বেশ কিছু সময় লেগেছিলো। ২০১৮ তে স্বামী অতুনু মারা গেছে। ময়ূরী এখন সম্পূর্ণ একা। নাতি-পুতি নিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছে জীবন। আমি তার জীবন কাহিনী তন্ময় হয়ে শুনেছি। তার মনের গহীনে জমে থাকা অব্যক্ত কথাগুলো বলতে পেরে সে যেন ভারমুক্ত হলো। তার মনের সমস্ত দুঃখ কালিমা ধূয়ে-মুছে ছাফ করে দিলো।

তখন সূর্য অস্ত গেছে মাত্র, কিন্তু একটি উজ্জ্বল রঙিন, রক্তিম আভায় চারিদিক আলোকিত হয়ে আছে। কিছুক্ষণ আগে মাত্র তার গল্প শেষ করে নিশ্চুপ হয়ে গেছে ময়ূরী। হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে বললো, দাদা, আমি যাই, ওরা ডাকছে। আবেগে যে চোখের জলের ধারা নেমেছিলো, তা অলক্ষে রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে, বালুর মধ্য দিয়ে এলোমেলো পায়ে সমুদ্র তীরের দিকে ছুটে গেলো। তার হেঁটে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে থেকে, প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সারা জাগানো গানটি অজান্তে হৃদয় নিংড়ে বেরিয়ে এলো -

এই বালুকা বেলায় আমি লিখেছিনু
একটি সে নাম,
আজ সাগরের ঢেউ দিয়ে,
তারে যেন মুছিয়ে দিলাম।...
ভুলের এ বালুচরে, যে বাসর বাঁধা হলো
জানি তার নেই কোন দাম।।

জুবিলী

উইলিয়াম রনি গমেজ

আমরা তো সবাই আশার তীর্থযাত্রী
নব উদ্যমে নতুন প্রেরণায়
এগিয়ে যাবো সম্মুখে
যত-ই আসুক বাঁধা
সৃষ্টি হোক প্রতিবন্ধকতা
সব কিছু তুচ্ছ করে
দু'পায়ে মাড়িয়ে
এগিয়ে যাবো আগামীর জয়যাত্রায়
আমাদের রয়েছে বিশ্বাস
আস্থা ও নিরঙ্কুশ সমর্থন
একে অপরের সাথে সুদৃঢ় বন্ধন
এক-ই ভালবাসায় হৃদয় উজ্জীবিত
আমরা পেয়েছি অমিয় বাণী
প্রত্যাশার অর্ঘ্য সাজিয়ে
জ্যোর্তিময় অপার মহিমা নিয়ে
ত্রাণকর্তা এই জুবিলী বর্ষে
আবির্ভূত হবেন প্রতিটি
খ্রিস্ট ভক্তের অন্তরাত্মায়।

ফিরে পাওয়া সেই হারিয়ে যাওয়া.....

নব কস্তা

হালকা কুয়াশা-আচ্ছন্ন গোধূলি লগ্নে গ্রামের পাকা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে আদিত্য। রাস্তার পাশে হেমন্তের কাটা শূন্য ফসলী মাঠের দিকে তার দৃষ্টি। তবে তার দৃষ্টি শূন্য মাঠের দিকে হলেও তার মন ইতোমধ্যে পরে আছে সেই দুই-আড়াই বছর আগে। অন্তর সাথে সেই যে ঝগড়া হয়েছিল, এরপর আর যোগাযোগ হয়ে উঠেনি। তাদের বাবার দিয়ে যাওয়া জমিজমা নিয়ে তাদের এ বিচ্ছিন্নতা। অন্ত তার স্ত্রীকে নিয়ে শহরে থাকে। আগে অন্ত প্রত্যেক ছুটিতেই বাড়িতে আসত কিন্তু তাদের এই ঝগড়া বিবাদের পর আর আসে না। ফলে বাড়িটা কেমন শূন্য হয়ে থাকে। সূর্য তার রক্ত রাঙা আভা নিয়ে পশ্চিমাকাশে অস্ত যাচ্ছে। কুয়াশার একটা আবছা রেখা মাঠটাকে যেন ঢেকে ফেলছে। ফাঁকা মাঠটাতে ছোট ছোট গ্রাম্য ছেলেমেয়েরা খড়কুটো জ্বালিয়ে আগুন পোহানের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সব কিছু মিলিয়ে যেন এক মন খারাপ করার মত অবস্থা। "দাদা, বাড়িতে যাবি কখন?" অন্তরা পিছন থেকে এসে এই মন খারাপ করা নিরবতা ভাঙ্গে। আদিত্য অন্তরার কথায় বাস্তবে ফিরল। সে কিছুক্ষণ অন্তরার দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিন্তু কিছু বলল না। অন্তরা বলল,"বাড়িতে মা আর বৌদি তোর জন্য অপেক্ষা করছে।" তখন আদিত্য বলল,"হুম, চল্।" এই বলে তারা বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

আদিত্য বড়, অন্ত আদিত্যর থেকে প্রায় দেড় বছরের ছোট। আবার অন্তর থেকে অন্তরা চার বছরের ছোট। তাদের বাবা ছিলেন সরকারি স্কুলের একজন শিক্ষক। খুব নাম ডাক ছিল। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে গত আট বছর আগে তিনি পরপারে পাড়ি জমান। তিনি তাঁর রেখে যাওয়া জমিজমা সব আদিত্য ও তাদের মাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। গ্রামে তাদের আধাপাকা টিনশেডের বাড়ি আছে। একটি পুকুর আছে। সেখানে তারা মাছ চাষ করে। এছাড়া গোয়ালে চারটা গরুও আছে। বাড়ির পেছনের দিকটায় ফাঁকা জায়গায় প্রত্যেক মৌসুমে বিভিন্ন রকম সবজি চাষ করা হয়। ক্ষেতের নতুন ফসল, পুকুরের মাছ কিংবা বাগানের সবজি যখনই যা চাষ হত অন্তর জন্য শহরে পাঠিয়ে দেয়া হত নয়তো অন্ত যখন বাড়িতে আসত নিয়ে যেত।

অন্ত আদিত্যের সবচেয়ে আদরের ছোট ভাই। অন্ত গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে। আদিত্য চায় অন্ত যেন ভাল কলেজে পড়াশোনা করে। তাই অনেক চিন্তা-ভাবনা করে অন্তকে শহরের একটি ভাল কলেজে ভর্তি করিয়ে দেয়। অন্তও তার দাদাকে অনেক শ্রদ্ধা করে। তাদের মধ্যে ছিল বন্ধুসুলভ আচরণ। ছোটবেলায় যা কিছু করত, দুজনে বিভিন্ন শলা-পরামর্শ করে করত। ছোট থেকে তারা দু'জন ছিল খুব চঞ্চল। ভরদুপুরে সারা গ্রাম ঘুরে বেড়ানো ছিল তাদের প্রতিদিনকার নিয়ম। তবে আদিত্যর থেকে অন্ত একটু বেশি চঞ্চল ছিল। সবসময়ই তার মাথায় দুষ্টু বুদ্ধিতে ভরা থাকত। নিজেদের বাড়িতে আমগাছ থাকা সত্ত্বেও জ্যৈষ্ঠ মাসে অন্যের গাছে ঢিল মারা ছিল তাদের শৈশবের আনন্দ। তারা যখন ছোট ছিল তখন তাদের গ্রামের রাস্তা ছিল কাচা। বৃষ্টির দিনে যখন তারা স্কুল ছুটির পর বাড়িতে ফিরত, অন্ত ইচ্ছে করে কাদা পানিতে আছাড় খেতো আর হাসতো। সবকিছুর পরেও আদিত্য বা অন্ত কখনো স্কুলের পরীক্ষায় পিছিয়ে থাকত না। তাই তাদের হাজারো দুষ্টুমির পরেও তারা বড়দের খুব আদরের ছিল। গ্রামের এবং স্কুলের সবাই তাদের খুব পছন্দ করত। সময়ের সাথে সাথে তারাও বড় হয়ে যায়। দুষ্টুমিও কমতে থাকে। আদিত্য ইচ্ছে করেই গ্রামের একটি সরকারি কলেজে পড়াশোনা শেষ করে। সে তার বাড়ি ও গ্রাম ছেড়ে কখনোই শহরে থাকতে পারবে না। গ্রামের পরিবেশের প্রতি তার অগাধ মায়া। কিন্তু অন্তর কথা চিন্তা করে, ওর ভবিষ্যতের জন্য অন্তকে শহরের নামকড়া কলেজে ভর্তি করিয়ে দেয়। তাদের বাবা তখনও বেঁচে ছিলেন কিন্তু বয়সের কারণে তিনি শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অন্ত কলেজ থেকে ভালভাবে পাস করে এবং শহরেই একটি ভার্সিটিতে পড়ার জন্য সে মনোনিবেশ করে। যখন সে ভার্সিটিতে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে তখনই একটি মেয়ের সাথে পরিচয় এবং ধীরে ধীরে প্রেম হয়ে যায়। মেয়েটির নাম সুভা। শহরেই বড় হয়েছে। খুব স্মার্ট কিন্তু মনে সব সময়ই এক ধরনের সন্দেহ কাজ করত। এদিকে আদিত্য গ্রামেই তাদের মা-বাবার পছন্দ করা মেয়েকে বিয়ে করে। খুব ভালো আর শ্রদ্ধাশীল মেয়ে। সবসময় বড়দের সম্মান করে। অন্তরা তখন সবে মাত্র কলেজে উঠেছে। তার সাথে বড় বউদির সম্পর্ক খুব ভালো। সবকিছু মিলিয়ে ভালই চলছিল। অন্ত তার ভার্সিটি শেষ করে চাকরি শুরু করে। নিজেকে সাবলম্বি করে তোলে। তারপর তার পছন্দের মেয়ে সুভাকে পরিবারের সম্মতিক্রমে বিয়ে করে আর শহরেই থেকে যায়। প্রতি ছুটিতেই সুভাকে নিয়ে বাড়িতে আসে। অন্তরা তার কলেজ পড়া শেষ করে। বাড়িতে থেকে সে অন্যদেরকে নানাভাবে সাহায্য করে। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে তাদের গ্রামের কাচা রাস্তাটিও পাকা হয়ে যায়। নিচে নরম সাদা মাটির উপর কালো শক্ত পিচ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। সময়ের সাথে সাথে তাদের বাবাও চলে যান না ফেরার দেশে।

সুভা শহরের স্মার্ট মেয়ে হলেও তার মন ছিল ছোট। সবসময়ই সবকিছু পেয়ে এসেছে। তাই কখনো কাউকে কিছু দেওয়াতে যে আনন্দ হয় তা তার জানা ছিল না। একদিন সময় বুঝে সে অন্তকে বলল, "তোমদের বাড়িতে জমিজমা কতটুকু আছে?" অন্ত বলল, "যথেষ্ট। তুমি সারা জীবনেও শেষ করতে পারবে না।" সুভা বলল, "সেগুলো নিশ্চয় দাদা দেখাশুনা করেন। তুমি এক কাজ কর, সময় থাকতেই তুমি তোমার ভাগের টুকু বুঝে নাও।" অন্ত বলল, "হঠাৎ এই কথা! দাদা তো আছেই কোনো সমস্যা হবে না।" কিন্তু সুভা বলল, "দেখো, তুমি আর আমি শহরে থাকি। গ্রামে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেটা আমরা তো আর জানিনা। সবশেষে দেখা যাবে যে, তোমার দাদা তোমাকে না জানিয়ে তোমার ভাগের জায়গা-জমিটুকু বিক্রি করে দিলেন। তখন কি করবে?" অন্ত বলল, "কখনো না। দাদা কখনো এমন করবে না। কিছু করলে অবশ্যই আমাকে জানাবে। সুভা বলল, "সেটা না'হয় জানাবে, কিন্তু ধর তোমাকে না জানিয়ে বিক্রি করে দিলেন, তখন কি করবে?" অন্তু কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, "দেখি কি করা যায়।"

ডিসেম্বর মাস। বড়দিনের ছুটিতে অন্ত ও সুভা বাড়িতে এসেছে। তাদের বড়দিন ভালভাবেই চলছিল। কিন্তু বড়দিনের দু-একদিন পর অন্ত তার মাকে গিয়ে বলল যে সে তার ভাগের জায়গা জমি বুঝে নিতে চায়। তখন মা আদিত্যকে ডেকে বিষয়টা জানাল। আদিত্য বলল, "অন্ত তার ভাগের জায়গা বুঝে নিতে চায় সেটা তো ভাল কথা; কিন্তু এখন কেন?" মা বলল, " আমি কি জানি! তুই অন্তকে জিজ্ঞেস কর্।" তখন আদিত্য অন্তকে জিজ্ঞাস করতেই অন্ত বলল, "হ্যাঁ দাদা, আমি চাচ্ছি আমার ভাগেরটুকু বুঝে নিতে। আমি চিন্তা করছি, আমার জন্য আলাদা বাড়ি করব।" আদিত্য বলল, "ঠিক আছে, তাহলে দু'দিনের মধ্যে সব কাগজপত্র রেডি করি। তারপর তুই তোর টুকু বুঝে নিস।"

দু'দিন পরে, সকালে আদিত্য গ্রামের কিছু অভিজ্ঞ বয়স্ক ব্যক্তিদের সাথে বসে তাদের বাবার রেখে যাওয়া জমিজমা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিল। সবকিছুই ঠিক ছিল কিন্তু মাঝখানে সমস্যা বাধায় সুভা। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় সুভা অন্তকে বলল, "আমার মনে হয় এই জমিজমা নিয়ে কোন সমস্যা আছে।" অন্ত বলল, "মানে!"

সুভা বলল, "মানে আবার কি!" এইবার সুভা একটু জোর দিয়ে বলল, "আচ্ছা তুমি এত অবুঝ কেন বল'তো আমাকে? তোমাদের এই যে জমিজমা ভাগাভাগি হল, আমার তো মনে হচ্ছে তোমার দাদা তোমাকে ঠকিয়েছে। শুধু মনে হচ্ছে বললে ভুল, আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি।" অন্তু বলল, "তুমি কিভাবে নিশ্চিত হয়ে বলছ?" সুভা বলল, "দেখো, আমরা দুজন শহরে থাকি, তাই আমাদের জমিজমা বিষয় নিয়ে ধারণা কম থাকতে পারে। কিন্তু তোমার দাদা তো গ্রামেই থাকেন। উনার এই বিষয়ে ধারণা অনেক বেশি। তিনি হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে, আমরা এই বিষয়ে কম জানি। তাই তিনি তোমার যতটুকু প্রাপ্য তার সবটুকু দেননি। আমাদের যে ধারণা নেই তাই বলে আমরা তো অবুঝ নই।" অন্তু কিছু বলল না, কিন্তু এই কথা শোনার পর তার আদিত্য উপর থেকে কেমন যেন শ্রদ্ধা-ভক্তি উঠে গেল।

সকালে ঘুম থেকে উঠে অন্তু সুভাকে বলল, "তৈরি হয়ে নাও আর এই বাড়িতে থাকবো না। কোন প্রয়োজন নেই এই ঠকবাজ মানুষদের সাথে থাকার। সুভা কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু অন্তু বাধা দিয়ে বলল, "কোন কথা নয় আগে বাসায় যাবো তারপর। এখন যা বলছি তাড়াতাড়ি কর। অন্তু ও সুভা যখন ব্যাগ গুছিয়ে তৈরি হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল তখন তার মা দেখে বলল, "কিরে কোথায় যাচ্ছিস তোরা?" অন্তু অভিমানের সুরে বলল, "চলে যাচ্ছি মা, আর আসব না। তোমরা ভাল থেকো।" তখন মা বলল, "সেকি, তুই না আরও এক সপ্তাহ থাকবি! এখন কেন চলে যাচ্ছিস!" অন্তু বলল, "থাকতেই তো চেয়েছিলাম কিন্তু অনেকেই চায় না আমি যেন এই বাড়িতে থাকি।" মা তখন আদিত্যকে ডেকে পাঠালো। আদিত্য এসে বলল, "কিরে কোথায় যাচ্ছিস এই সাত সকালে?" অন্তু আদিত্যের দিকে না তাকিয়ে বলল, "তা তোমার না জানলেও চলবে।" আদিত্য বুঝতে পারল কিছু একটা হয়েছে কিন্তু সেটা কি ধরতে পারল না। তাই অন্তুর সামনে গিয়ে জিজ্ঞাস করল, "কি হয়েছে আমাকে বল্। না বলে এভাবে কেউ চলে যায় নাকি!" অন্তু বলল, "তুমিই তো চাওনা আমি যেন এই বাড়িতে থাকি। আদিত্য বলল, "মানে কী!" অন্তু বলল, "মানে কিছু না। আমি ঠিক করেছি, আমি আর এই বাড়িতে থাকব না। তুমি আর তোমার জায়গাজমি নিয়ে থাক।" এবার আদিত্য মোটামুটি আঁচ পেয়েছে সমস্যাটা কোথায়। সে বলল, "আমি আমার জায়গাজমি নিয়ে থাকব মানে! আমি কি তোকে সবকিছু বুঝিয়ে দিইনি! তাহলে তুই এমন করছিস কেন?" অন্তু বলল, "বুঝিয়ে দিয়েছো কিন্তু সবটুকু না। তুমি কি মনে করেছ, আমি কিছু বুঝিনা! আমি তোমার থেকে ছোট আর শহরে থাকি বলে আমি বোকা! তুমি আমাকে ঠকিয়েছ। আমার যতটুকু জমি পাওনা তার সবটুকু তুমি আমাকে দাওনি। কোন সমস্যা নেই। আমি যতটুকু জমি পেয়েছি তা দিয়েই আমার হবে। তুমি থাক আমি যাই।" এবার আদিত্য সত্যিই খুব রেগে যায়। সে রাগের মাথায় বলল, "বেশ করেছি তোকে ঠকিয়েছি। তোকে আর এই বাড়িতে থাকতে হবে না। এই বাড়িতে তোকে যেন আর না দেখি। এখনই তুই চলে যা।" অন্তু কিছু বলল না। হন হন করে সুভাকে নিয়ে চলে গেল। যখন আদিত্যর হুস হল, দেখল মা শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে কান্না করছে। অন্তরা তার বৌদির সাথে দাঁড়িয়ে আছে ঘরের বারান্দাতে।

এভাবেই কেটে গেল আড়াই বছর। গত দুই বছর সবাই অন্তুর জন্য অপেক্ষা করেছে যে অন্তু বড়দিনের ছুটিতে বাড়িতে আসবে। বড়দিনের সময় মা অন্তুর জন্য নানা রকম পিঠাপুলি তৈরি রাখত কিন্তু অন্তু আসেনি। আদিত্যও রাগারাগির পর কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেছে। সে মনে মনে নিজেকেই দোষারোপ করতে লাগল। তার মনে হত, শুধু শুধু অন্তুর উপর রাগ দেখালো। রাগ না দেখিয়ে বুঝালেই পারত। যখনই অন্তু বাড়িতে আসত, বাড়িটা ভরা ভরা লাগত। কিন্তু এখন যেন এক শূন্যতা ভর হয়ে আছে পুরো বাড়িটাতে। সবসময় যেন এক স্তব্ধতা লেগেই আছে।

"কিরে! কি চিন্তা করলি?" মা আদিত্যকে জিজ্ঞাস করল। আদিত্য বলল, "চিন্তা করছি অন্তুকে ফোন করব। বাড়িতে আসতে বলব।" মা বলল, "যার জন্য এত কিছু করলি, সেই কিনা তোকে ঠকবাজ বলল।" আদিত্য বলল, "থাক না মা। অন্তু ছোট তাই বুঝতে পারেনি। এটা কোন ব্যাপার না। দেখি ফোন করে কি বলে। অবশ্য যদি ফোন ধরে। না ধরলে তো কিছুই বলতে পারব না।"

অন্যসব বছর বড়দিনে তাদের খুব ভালো প্রস্তুতি নেওয়া হতো। কিন্তু গত দু'বছর তেমন কোন প্রস্তুতি নেওয়া হয়নি। আদিত্য বড়দিনে গির্জায় যেতো কিন্তু মনোযোগ দিতে পারত না। তাই কিছুদিন আগেই আদিত্য গির্জার ফাদারের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে। ফাদারই তাকে পরামর্শ দেন, যেন সে অন্তুকে ফোন করে। যখন গির্জা থেকে বাড়ি ফিরছিল আদিত্যর বারবার মনে হচ্ছিল অন্তু অবশ্যই ফোন ধরবে এবং বড়দিনে বাড়িতেও আসবে। আর যখন আসবে তখন সে ভালভাবে প্রস্তুতি নেবে বড়দিনের জন্য।

অন্তু সবসময় মনমরা হয়ে থাকে। নিজের ভাই-বোন ও মায়ের সাথে গত আড়াই বছরে কোন যোগাযোগ হয়নি। সবসময় মনে হত, এই বুঝি বাড়ি থেকে ফোন আসবে। কিন্তু কেউ আর ফোন করে নি। চেয়েছিল যদি দাদা ফোন করে তাহলে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে। জীবনে সবচেয়ে বড় ভুল করেছে সে, তার দাদাকে ভুল বুঝে। তাদের যে জমিজমা ভাগাভাগি হয়েছিল সেখানে আসলেই গরমিল ছিল আর গরমিলটা হচ্ছে আদিত্য তার ভাগের বেশকিছু জায়গাজমি অন্তুকে দিয়ে দিয়েছে। অন্তু যখন শহরে ফিরে আসে তখন তার কাগজপত্র গুলোতে চোখ বুলায়, ঐ সময় সে বিষয়টা খেয়াল করেছিল। তখন সে কি করবে বুঝতে পারছিল না। শুধু মনে হচ্ছিল সামান্য কিছু জমিজমার জন্য অনেক বড় কিছু হারিয়ে ফেলেছে সে। এরপর আর বাড়িতে যাওয়ার মতো সাহস তার হয়নি। ভয়, যদি তাকে আর বাড়িতে গ্রহণ না করে। সুভাকে সে খুব বকা-ঝকা করেছিল তার ভুলের জন্য। সুভাও তার জীবনে সবচেয়ে বড় শিক্ষাটা পেয়েছে। তাই সে ঠিক করে যে সে আর কখনো কারো কোন ব্যাপারে মনের ভেতর সন্দেহ পোষণ করবে না। সব সময় ভাল কিছু করার চেষ্টা করবে। তার মনের ভেতর অনুশোচনা হয়েছিল।

ডিসেম্বরের ১৯ তারিখ। বড়দিনের আরো ছয়দিন বাকি। আদিত্য ঠিক করল আজ যেভাবে হোক অন্তুকে সে ফোন করবে। যেই কথা সেই কাজ। সরাসরি সে ফোন করল। প্রথমে দুবার রিং হল কিন্তু কোন সাড়া মিলল না। আদিত্য মনে করল এবার রিং না হয়ে ফোন বন্ধ বলবে। কিন্তু না, অন্তু এবার ফোন ধরল। দুপাশেই নিরবতা। এ নিরবতা ভঙ্গ করে অন্তু যেই হ্যালো বলল অমনি আদিত্যর চোখে জল এসে গেল। "কেমন আছিস অন্তু?" অন্তু বলল, "ভাল না দাদা। কবে থেকে তোমাদের দেখি না। খুব বাড়িতে আসতে মন চায়। কিন্তু উপায় তো নেই। তুমি কি এখনও আমার উপর রেগে আছ?" এই বলে অন্তু থামল। আদিত্য বলল, "দূর কি যে বলিস, আমি কি কখনো তোর সাথে রাগ করে থাকতে পারি। আর তোর বাড়িতে আসতে মন চায় তো আসিস না কেন? তুই না থাকলে বাড়িটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে।" অন্তু বলল, "ভয় হয়। আমাকে যদি আর গ্রহণ না কর! আগে বল, আমাকে ক্ষমা করেছ কিনা।" আদিত্য বলল, "দূর বোকা, তুই ছোট তাই ভুল করতেই পারিস। এটা কোন ব্যাপার না। তুই এক কাজ কর, তুই কাল পরশুর মধ্যে সুভাকে নিয়ে বাড়ি চলে আয়। আমরা আবার এক সাথে বড়দিন করব। অন্তু বলল, "আমি অবশ্যই আসছি দাদা।" অন্তুর খুশি যেন উপচে পড়ছে। "এখন রাখি'রে, পরে আবার কথা বলব।" এই বলে আদিত্য ফোন কেটে দিল। মুহূর্তের মধ্যে আজকের এই ঘন কুয়াশার সকালটা আদিত্যর জন্য বদলে গেল। কষ্টদায়ক মনটা হঠাৎ-ই আনন্দে ফুরফুরে হয়ে গেল। আদিত্য সাথে সাথে সবাইকে জানালো যে অন্তু বাড়িতে

(বাকি অংশ ৯৯ নং পৃষ্ঠায় পড়ুন...)

দীর্ঘশ্বাস

সুমন কোড়াইয়া

খবরটা শুনে ভীষণ মন খারপ হয়ে গেল দীপের। সুহেলী আর নেই। নেই মানে পরলোকগমন করেছে। আর কখনো দেখা হবে না বাল্যবন্ধুকে, যাকে এক সময় তিনি পছন্দ করতেন।

অফিস শেষে বাসে করে পুরান ঢাকা যাচ্ছিলে দীপ। এমন সময় তার মা সেলফোনে খবরটা দেন তাকে। সাথে অনুরোধ করলেন, "বাবা তুই ভুল করেও এই সময় বাড়িতে আসিস না। সুহেলীর অপমৃত্যুতে পুলিশ এসেছে। পুলিশ এখনো আছে। নানাজনকে নানা প্রশ্ন করছে।" গলায় দড়ি দিয়ে সুহেলীর আত্মহত্যার বিষয়টা মেনে নিতে কষ্ট হয় দীপের। বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। বাস গুলিস্তান নগর ভবনের সামনে গেলে, সে নেমে যায়। বাসায় ফিরতে হবে। তার ইচ্ছে করে এখনই অনলাইনে খুলনার বাসের টিকেট কেটে রওনা দেয় বাড়িতে। একই গ্রামে সুহেলী বিয়ে হয়েছে সুহেলের সাথে। সুহেল-সুহেলী নামের সাথে নাম ও হৃদয় মিলে বিয়ে করে সংসার পেতেছিল ওরা। বিয়ের দাওয়াতও খেয়েছে দীপ। উপহার দিয়েছে। অভিনন্দন জানিয়েছে। তখনও তার বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠেছিল। বুকে পাথর চাপা দিয়ে রেখেছিল।

শৈশবে সুহেলী, দীপ ও সুহেল বাল্যবন্ধু ছিল। তারা এক সাথে গ্রামের মেঠো পথ ধরে স্কুলে যেতো। দ্বাদশ শ্রেণিতে উঠে সুহেলীকে পছন্দ করার বিষয়টি দীপ জানিয়েছিল কিন্তু সুহেলী সোজা জানিয়ে দিয়েছিল, সে পছন্দ করে সুহেলকে। পাঁচ বছর পর তারা বিয়ে করে সংসার পাতে।

এই পর্যন্ত তিন বাল্যবন্ধুর সম্পর্ক ভালোই ছিল। সমস্যা বাঁধে সুহেল-সুহেলীর বিয়ের ছয় মাস পর থেকে। সুহেলীর মনে হতে থাকে, সে যে প্রত্যাশা নিয়ে সুহেলের সাথে বিয়ে হয়েছিল, বিয়ের পর সেই প্রত্যাশা পূরণ হচ্ছে না। এছাড়া সুহেল স্ত্রীকে নিয়েও সন্দেহ শুরু করেছে। তাদের দাম্পত্যের মিষ্টি সম্পর্ক তেতো হওয়া শুরু করলো। সুহেল সুহেলীর গায়ে হাত তোলা পর্যন্ত শুরু করল। এই নিয়ে গ্রামে একদিন সালিশও হয়। গ্রামের মাতব্বররা সুহেলকে সাবধান করে দেন। দীপ সেই সালিশে উপস্থিত ছিল নীরব দর্শক হিসেবে। সে অনেক কিছু বলতে চেয়েও কিছুই বলেনি কি এক অজানা আশংকায়।

একদিন সন্ধ্যাবেলা দীপ বাড়িতে ছিল। সেই সময় সুহেলী তাদের বাড়িতে এলো। সে দীপের হাত চেপে ধরে আক্ষেপ করে বলল, "দীপ, আমি অনেক বড় ভুল করে ফেলেছি। আবেগের বশে ভুল মানুষকে বিয়ে করেছি। সুহেল আমাকে বুঝে না বরং ভুল বুঝে। সুহেল সন্দেহ করে বলে, তোর সাথে নাকি আমার সম্পর্ক রয়েছে।" ঠিক সেই সময়ই দীপের মা ঘরে প্রবেশ করেন। দীপ মাকে সব খুলে বলে। দীপের মা ও দীপ সুহেলীকে অনুরোধ করে, সে যেন আর এই বাড়িতে না আসে। সমাজের মানুষ খারাপ বলবে। তখন পর্যন্ত দীপ তার বাল্যবন্ধু সুহেলীর প্রতি এতটা দুর্বল হয়নি। শুধু সহমর্মী হয়েছে সুহেলীর প্রতি। আর রাগ হয়েছে সুহেলের ওপর।

স্কুল শিক্ষক দীপ ঠিক করল শহরে চলে যাবে। একদিন সুহেল দীপের সাথে দেখা করতে আসে। এসে বন্ধুকে চোখ রাঙ্গিয়ে শাসিয়ে বলে, "তোর কারণে আমার সংসারে শান্তি নাই। তুই সুহেলীকে জীবনে পাসনি ঠিকই, কিন্তু সুহেলী মনে মনে ঠিকই তোকে ভালোবাসে। আর আমাকে এদিকে ঠকাচ্ছে।"

বাল্যবন্ধুর কথাগুলো শুনে মাথায় রক্ত উঠে গিয়েছিল ভদ্র শান্ত স্বভাবের দীপের। সেদিন শার্টের কলার ধরে টান দিয়ে মুখের কাছে সুহেলের মুখটা এনে দীপ বলেছিল, "বাজে কথা বলিস না সুহেল। এতদিন চুপ ছিলাম। কিছু বলিনি। তোদের সাতেও নাই, পাঁচেও নাই আমি। একসময় সুহেলীকে শুধু পছন্দ করতাম কিন্তু সে তো মন দেয় তোকে। আর আমি সেটা মেনে নিয়েছিলাম। তোদের দাম্পত্য অশান্তির মাঝে আমাকে জড়াস না, প্লিজ।" আবেগে দুজনই কেঁদে ফেলেছিলেন সেদিন।

এরপর ছয় বছর হলো দীপ রাজধানীতে। থাকে রাজাবাজার। যশোরের ঝিকরগাছার শিমুলিয়া গ্রামের বাড়িতে বড়দিন ও ইস্টার সানডে'র সময় যায়। সেসময় হয়ত কয়েকবার রাস্তা ঘাটে সুহেল-সুহেলীর সাথে দেখা হয়েছে। সৌজন্যতা রক্ষা করতে দীপ তাদের সাথে কেমন আছিস; জিজ্ঞেস করেছে। সুহেলীর কথাটা সে ভুলতেই বসেছিল একটি জাতীয় পত্রিকায় ক্রাইম রির্পোটার দীপ। পত্রিকায় কাজ সেরে কোনদিন রাত আট-নয়টার আগে বাসায় ফিরতে পারে না দীপ। সেদিন সে একটু আগে অফিস থেকে বের হয়েছিল। তার বিধবা মা তাকে বলেছিলেন, পুরান ঢাকা থেকে ভালো দেখে স্বর্ণের দুইটা আংটি কেনার জন্য। ছেলের জন্য তিনি মেয়ে দেখেছেন। বিয়ের আগে আংটি বদল করাতে চান তিনি।

দীপ মায়ের কথা ঠিকই রেখেছে। এক সপ্তাহ পরে দুইটি আংটিসহ তার বাড়িতে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সে বাড়িতে গেল আরও তিন মাস পর। বাস থেকে নেমে রিক্সা দিয়ে গ্রামে কাঁচা রাস্তা দিয়ে বাড়িতে পৌঁছাতে হয়। রিক্সায় বসে দেখতে পেল রাস্তার পাশে সুহেলীর কবরে বসে কাঁদছে তার বাল্যবন্ধু সুহেল। দীপ বাড়ি না গিয়ে সুহেলের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বাল্যবন্ধুকে জড়িয়ে ধরল সুহেল। দীপের বুক থেকে বের হয়ে আসে দীর্ঘশ্বাস। এই দীর্ঘশাসের অর্থ অনেক। দীপ ভাবে, সুহেল শুধু শুধু বৌ'কে সন্দেহ করে অকালে ওর সংসারটা নষ্ট করেছে। ওর জন্য বড়ো মায়া হয় তার। ৯৯

(৯৮ নং পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

আসবে। সেদিনের মত আবার পাকা রাস্তার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো কিন্তু আজকের প্রকৃতি আর ঐদিনের মত মনমরা নেই। ঘন কুয়াশার ফাঁকে সূর্য যেন হাসছে।

আদিত্য দুপুর থেকে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অন্তরা তার বৌদিকে নিয়ে বাড়িঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শুরু করে দিয়েছে। তাদের মা উঠে পড়ে লেগে যায় পিঠা তৈরিতে। এদিকে অন্তু বিকেলবেলা সুভাকে নিয়ে শপিং করতে গেল। অন্তু বাড়ির সবার জন্য নতুন জামা কাপড় কিনল। সুভাও সবার জন্য বিভিন্ন ধরনের উপহার কিনল। এখন অন্তুর শুধু চিন্তা কখন বাড়ি যাবে। সময় যেন যেতেই চাচ্ছে না।

অন্তু আর সুভা ২১ তারিখে গ্রামে পৌঁছে। সাথে করে অনেক ব্যাগ-লাগেজ। আদিত্য আগে থেকেই পাকা রাস্তায় অপেক্ষা করছিল। দূর থেকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি অন্তুর কাছে ছুটে যায়। ভাইকে জড়িয়ে ধরে। সমস্ত খুশি যেন উপচে পড়ছিল তখন। অন্তু বাড়িতে উঠে সবার সাথে দেখা করে ও আশীর্বাদ নেয়। সে পুরো বাড়িঘর, পুকুরঘাট ঘুরে ফিরে দেখতে থাকে। তাদের মা খুব খুশি।

২৩ তারিখে অন্তরা ও সুভা মিলে গোশালা ঘর সাজায়। ফুল, রঙিন বাতি দিয়ে সম্পূর্ণ বাড়িঘর সাজিয়ে ফেলে। যেন অনেক বছর পর আবার বড়দিন ফিরে এসেছে তাদের বাড়িতে।

২৫ তারিখ। বড়দিনের দিন সবাই একসাথে গির্জায় যায়। যিশুকে হৃদয়ে বরণ করে নেয়। মিশার শেষে অন্তু ও আদিত্য ফাদারের কাছ থেকে ও অন্যান্য বয়স্কদের কাছ থেকে আশীর্বাদ নেয়। গ্রামের কীর্তন দলে যোগ দেয়। এভাবেই খুঁজে পায় তারা সেই দুই বছর আগের হারিয়ে যাওয়া বড়দিন। ৯৯

আত্মোপলব্ধি

ফাল্গুনী ডি' কস্তা

শহুরে কোলাহল মুখরিত বিকেলগুলোতে রানা প্রতিদিন বাড়ির পিছনের মাঠে দৌড়ে যেত। তার বন্ধুরা সেখানে জড়ো হতো ও হাসি-ঠাট্টা, দৌড়ঝাঁপ–সব মিলিয়ে সেই মাঠই ছিল রানার আনন্দের রাজ্য। কিন্তু ধীরে ধীরে সে একটি বিষয় বুঝতে শুরু করল। তার কিছু বন্ধু খেলতে খেলতে এমন সব নোংরা, অশ্লীল, কথা বলতো যা রানার একদম পছন্দ হতো না। রানার কানে কাঁটার মতো বিঁধত এসব শব্দ। সে অনেকবার চেষ্টা করেছিল উপেক্ষা করতে, কিন্তু মনের ভেতরটা তবু বারবার অস্বস্তিতে ভরে উঠত।

একদিন খেলা থেকে ফিরে সে চুপচাপ বসে রইল। মা জিজ্ঞেস করলেন,

–"কিরে রানা, আজ এত চুপচাপ কেন?"

রানা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মা'কে সব কথা বলল। মা গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনার পর বললেন,

–"বাবা, সব বন্ধুই ভালো হয় না। মাঝে মাঝে খেলবি, আর বাকিটা সময় ভালো কিছু শিখিস।"

মায়ের কথায় রানা যেন নতুন আলো দেখল। কয়েকদিন পর মা তার জমানো টাকা দিয়ে রানার জন্য একটি কম্পিউটার কিনে আনলেন। কম্পিউটার পেয়ে রানা তো ভীষণ খুশি।

সে তখন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ে–কম্পিউটার চালাতে তার কোনো সমস্যাই ছিল না। কিন্তু সমস্যা হলো অন্য জায়গায়–নতুন কম্পিউটারটা তার মাথায় গেম খেলার নেশা ধরিয়ে দিল। যতক্ষণ সময় পায়, সে গেম খেলত।

কিন্তু একদিন রাতের অন্ধকারে হঠাৎ তার ভেতরে প্রশ্ন জাগল–

"আমি কি এভাবেই জীবন কাটাব? শুধু গেম খেলে?"

এই টেকনোলজির যুগে আমি কি এই সুযোগকে অন্যভাবে কাজে লাগাতে পারিনা?

তার মনে হঠাৎ তীব্র অনুশোচনা জন্মালো। সেই রাতেই সে সিদ্ধান্ত নিল–নিজেকে বদলাবে। পরদিন থেকে রানা গেম খেলা কমিয়ে দিল। সে নতুন কিছুর সন্ধানে পথ খুঁজতে লাগল। আর তখনই তার মনে জন্ম নিল এক অদ্ভুত আকর্ষণ–জাপানিজ ভাষার প্রতি। কারণ সে অনেক জাপানি মুভি দেখেছে। সে প্রতিদিন অল্প অল্প করে পড়তে লাগল–জাপানিজ অক্ষর, শব্দ, উচ্চারণ...

একটি ছেলের নীরব যুদ্ধ, নিজের সঙ্গে নিজের লড়াই, শেখার লড়াই। স্কুলের পড়া তার অতটা ভালো লাগত না, কিন্তু কম্পিউটারের প্রতি তার ভিন্নরকম প্রেম ছিল। নতুন সফ্‌টওয়্যার, নতুন স্কিল–প্রোগ্রামিং, গ্রাফিক্স, ভিডিও এডিটিং–সবই সে একাই শিখে ফেলল।

পরীক্ষার ফল খুব ভালো হলো না, কিন্তু "এ" লেভেল পাস করল। মা তা নিয়েই ভীষণ খুশি। মা জানতেন–তার ছেলে অন্য পথে হাঁটছে, সেই পথই তাকে একদিন বড় করে তুলবে।

একদিন ব্যক্তিগত কাজের প্রয়োজনে রানা একটি জাপানিজ অফিসে গেল। অফিসের ভেতরে ঢুকতেই অদ্ভুত এক শৃঙ্খলার গন্ধ তাকে ছুঁয়ে গেল।

ভেতরে একজন জাপানিজ ভদ্রলোক বসেছিলেন। রানা তাকে জাপানিজ ভাষায় অভিবাদন জানাল। ভদ্রলোক খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রানার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বিস্ময়ে বললেন–

–"তুমি জাপানিজ ভাষা এত ভালো বলতে পারো!"

সে মাথা নাড়ল–

–"জি, একটু একটু জানি।"

ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞেস করলেন,

–"আমাদের স্কুলে শিক্ষক হতে চাও? আমরা কাউকে খুঁজছিলাম।"

রানা চোখ বড় করে বলল–

–"আমি? কিন্তু আমি তো টিচার নই!"

ভদ্রলোক হেসে বললেন–

–"ভাষা জানো মানে শেখাতে পারবে। চেষ্টা করলে পারবে। আমরাও সাহায্য করব।"

এরপরেই তিনি যে প্রস্তাব দিলেন, তাতে রানা অবাক হয়ে গেল–

সকাল ৮টা থেকে ৫টা পর্যন্ত কাজ, আর বেতন–পঞ্চাশ হাজার টাকা।

রানা যেন বাকরুদ্ধ হয়ে গেল। সে কখনো ভাবেনি তার জীবন এভাবে বদলে যাবে।

বাড়ি ফিরে সে মাকে সব কিছু বলল। মা তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন–

–"দেখেছিস বাবা? পরিশ্রম কখনোই ব্যর্থ যায় না।"

রানার চোখে পানি এসে গেল, তবে সেটা খুশির।

এরপর রানা তার কাছে মনোনিবেশ করল। জাপানিজ ভাষা শেখানোতে সবাই তাকে খুব পছন্দ করত।

আর অফিস শেষে! সে তখন ফিরে যেত তার আরেক বিশ্বে; ভিডিও এডিটিং, গ্রাফিক্স, কোডিং...। দিনের শেষে তার টেবিলের আলো নিভলেও তার স্বপ্নের আলো নিভত না। নিজের মতো করে গড়ে উঠছিল তার ভবিষ্যৎ। রানা আর আগের সেই ছেলে নেই। সে এখন এক নতুন মানুষ; নিজেকে বদলানোর সুযোগকে গ্রহণ করার শক্তি অর্জন করা একজন সফল মানুষ।

এবং এভাবেই, একটি সাধারণ ছেলে নিজের আগ্রহ, পরিশ্রম আর সাহস দিয়ে সাফল্যের উচ্চ শিখরে পৌঁছতে পারে।

(১০১ নং পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

তিতাস দাঁড়িয়ে লাবনীর হাত ধরে বললো, তুমি কি পাগল হলে লাবনী, মাথা ঠান্ডা করে সোফায় বস, আমার কথাটা শোন প্লিজ।

লাবনী হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, তোমার সঙ্গে আমার আর কোন কথা নেই, তুমি থাক তোমার সমিতি নিয়ে।

হঠাৎ দুলে উঠলো সব। কাঁপতে লাগলো ফ্ল্যাটের দরজা, জানালা, টেবিল, চেয়ার, সোফা সবকিছু। জানালার গ্রীল আর রান্নাঘরে ঝনঝন শব্দ হতে লাগলো। ডাইনিং টেবিল থেকে দুটো গ্লাস পড়ে ভেঙ্গে গেলো। লাবনীর দাঁড় করানো সুটকেসটা পড়ে গেলো। চতুর্দিক থেকে ভেসে আসতে লাগলো মানুষের আর্তি। তিতাস চিৎকার করে উঠলো, ভূমিকম্প! ভূমিকম্প! টেবিলের নিচে এসো তোমরা। পুরনো আমলের ভারি কাঠের ডাইনিং টেবিল। লাবনী অনেক বলার পরও এটি বদলায়নি তিতাস। এ টেবিলটার উপর এক ধরনের মায়া পড়ে গেছে ওর। টেবিলের নিচে ওরা তিনজন। প্রিয়ানা ওর দুহাত দিয়ে বাবা-মা দুজনকে আকড়ে ধরে আছে। তিতাস ওর দুহাত দিয়ে দুজনকে বেষ্টন করে আছে। কম্পন থেমে যাবার পরও বেশ কিছুক্ষণ টেবিলের নিচে ত্রিভুজাকৃতি হয়ে বসে থাকলো ওরা। প্রথম প্রিয়ানাকে নিয়ে বের হল তিতাস, তারপর লাবনী। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো তিনজন। কথা শুরু করলো প্রিয়ানা-ই, মামনি তুমি যেয়ো না, আমার খুব ভয় করে। তিতাস লাবনীর দিকে তাকিয়ে বললো, লাবনী, আই এম সরি। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এবার আমি সমিতির ইলেকশন করবো না। লাবনী আনতমুখে বললো, তোমার ইচ্ছে। তারপর ওড়না দিয়ে চোখ মুছে সুটকেস নিয়ে বেডরুমে ঢুকলো।

গার্ড ইন্টারকমে বললো, স্যার, আমাদের বিল্ডিং-এ ফাটল ধরেছে। তিতাস বললো, আমি একটু পরে আসছি, তুমি সব ফ্ল্যাট মালিকদের জানাও। মনে মনে বললো, আমাদের সংসারের ফাটলটা তো জোড়া লাগলো!

ফাটল

খোকন কোড়ায়া

ফেরানো গেলো না লাবনীকে, কিছুতেই ও আর তিতাসের সঙ্গে সংসার করবে না। তিতাসের বারবার অনুরোধ, স্যরি বলা, বারো বছরের একমাত্র মেয়ে প্রিয়ানার কান্না কোন কিছুই লাবনীর সিদ্ধান্ত পাল্টাতে পারলো না। চলে যাবার জন্য শুক্রবার দিনটিকেই বেছে নিলো লাবনী। সকালে ব্রেকফাস্টের পর ড্রইংরুমে বসে প্রিয়ানা টিভি দেখছে, তিতাস মোবাইল টিপসে, লাবনী ওর সুটকেস নিয়ে ওদের সামনে দাঁড়িয়ে বললো, আমি চলে যাচ্ছি।

তেইশ বছরের দাম্পত্য জীবন ওদের। প্রেমের বিয়ে। পরিচয় কর্মক্ষেত্রেই। একই এনজিওতে চাকরি করতো দুজনেই। তিতাস ছিলো লাবনীর ইমিডিয়েট বস। ভালো লাগা থেকে ভালোবাসা, তারপর বিয়ে। তবে দুজনেই পরিণত বয়সের, তাই বিয়ের সিদ্ধান্ত ওরা ভেবেচিন্তেই নিয়েছিলো। বেশ ভালোই কাটছিলো ওদের দাম্পত্য জীবন। সুখী ছিলো ওরা। দুজনের আলোচনার মাধ্যমেই বিয়ের এক বছর পর এনজিওর চাকরি ছেড়ে দিয়ে একটি স্কুলে চাকরি নিয়েছিলো লাবনী। কারণ স্বামী-স্ত্রী একই অফিসে চাকরি করবে এটা যেমন অফিসের কলিগরা মেনে নিতে পারেনি, তেমনি ওদের নিজেদেরও ভালো লাগছিলো না বিষয়টি। ওরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো পাঁচ বছর পর সন্তান নেবে। কিন্তু কিছুতেই গর্ভধারণ হচ্ছিলো না লাবনীর। এরপর অনেক চিকিৎসা, অনেক সাধনা। বিয়ের এগার বছর পর প্রিয়ানা আসে ওদের কোলজুড়ে। পূর্ণতা আসে ওদের দাম্পত্য জীবনে। প্রিয়ানাকে ঘিরে ওদের জীবন হয়ে ওঠে আরও সক্রিয়, আরও আনন্দময়। প্রিয়ানাকে কে কত আদর করতে পারে, তার যেন একটি প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেলো দুজনের মধ্যে। কতো আদিখ্যেতা যে করতো দুজন মেয়েটাকে নিয়ে! প্রিয়ানাকে ঘিরে এভাবেই কাটছিলো ওদের সুন্দর দিনগুলি।

আজ থেকে ছ'বছর আগে তিতাসের এক বন্ধু সায়ন্ত এলো ওদের বাসায়। চা-নাস্তা খাওয়ার পর সায়ন্ত বললো, বন্ধু, একটি প্রস্তাব নিয়ে তোর কাছে এসেছি। তিতাস বললো, কি প্রস্তাব?

- "ঠিকানা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:"-এ আমি প্রেসিডেন্ট পদে ইলেকশন করছি। আমি চাই তুইও আমাদের সঙ্গে থাক। তোর মতো যোগ্য, সৎ মানুষের খুব দরকার আমাদের, জানিসতো বর্তমান বোর্ড অনিয়ম আর দুর্নীতি করে সমিতির বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে।

- কিন্তু আমার তো সময় নেইরে বন্ধু, অফিস থেকে ফিরি সন্ধ্যায়, তারপর পরিবারকে তো একটু সময় দিতে হয়।

- পরিবারকে সময় দিবি, তাতে সমস্যা কি, তুইতো হবি বোর্ড মেম্বার, মাসে একদিন শুধু মিটিং-এ গেলেই চলবে। তোরা যদি এগিয়ে না আসিস, তবে সমিতিগুলো তো খারাপ লোকদের দখলে চলে যাবে।

- ঠিক আছে, ভেবে দেখি, তারপর জানাবো।

সেদিন রাতে বিষয়টি নিয়ে লাবনীর সঙ্গে আলাপ করেছিলো তিতাস। লাবনী বলেছিলো, সায়ন্তদা যতই বলুক মাসে একদিন গেলেই চলবে, দেখো মাঝে মাঝেই যেতে হবে তোমার। আমার কাকাকে তো দেখেছি, সন্ধ্যার পর সমিতির অফিসেই পড়ে থাকতেন। দেখ, তুমি যা ভালো বোঝ।

পরদিন আবার ফোন করেছিলো সায়ন্ত। তিতাস অপারগতা প্রকাশ করায় বলেছিলো, তোর কথা আমাদের প্যানেলের সবাইকে বলেছি, সবাই খুব খুশি। এখন তুই না করলে আমি বেইজ্জতী হয়ে যাবো দোস্ত। ইলেকশনটা হোক, আগে সবাই পাশ করে আসি, তারপর তোর ভালো না লাগলে রিজাইন করিস।

সায়ন্ত'র পিড়াপিড়িতে এক সময় রাজি হয়ে যায় তিতাস। লাবনীর কথাই ঠিক, মাসে একদিন নয়, প্রতি সপ্তাহে একদিন/দুদিন যেতে হতো সমিতির অফিসে। এভাবেই কেটে গেলো তিনটি বছর। আবার ইলেকশন। লাবনী বললো, তিন বছর তো সমিতিতে সেবা দিলে, এবার ক্ষ্যান্ত দাও। তিতাস বললো, দেখ লাবনী এতদিন তো ছোট একটি পদে ছিলাম, আমি তো সেক্রেটারি বা প্রেসিডেন্ট পদটা ডিজার্ভ করি। এবার সেক্রেটারি পদের জন্য ইলেকশন করবো। কথা দিচ্ছি, এই টার্মই শেষ। সেক্রেটারি হওয়ার পর তিতাস অফিস ছুটির পর সোজা চলে যায় সমিতির অফিসে, ফেরে রাত নয়টা/দশটায়। প্রথম প্রথম প্রিয়ানা জিজ্ঞেস করতো, বাবা কখন আসবে, এখন আর জিজ্ঞেস করে না, ঘুমিয়ে পড়ে। বাবার সঙ্গে ওর দেখা হয় শুধু সকালে অল্প সময়ের জন্য। রাতে এসে খেয়েদেয়ে ঘুমাতে চলে যায় তিতাস, পরদিন সকালে অফিস। কত কথা জমা হয়ে থাকে লাবনীর, বলা হয় না।

তিন বছরের শেষ দিন। লাবনী মনে করিয়ে দেয়, তিতাস মনে আছে তো; তুমি বলেছিলে সমিতিতে এই টার্মই তোমার শেষ। তিতাস বলে, হ্যাঁ বলেছিলাম, তবে কি জান, সমিতিতে ছয় বছর সেবা দিলাম, সেক্রেটারি হলাম। আমার ইচ্ছা প্রেসিডেন্ট হয়ে তারপরই আমি বিদায় নেবো এ সমিতি থেকে। সে যোগ্যতা আমার আছে। আর সদস্য-সদস্যারাও আমাকে আগামীতে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেখতে চায়। লাবনী বলে, সদস্য-সদস্যারা চায় কিনা জানি না, তবে তোমার তাবেদাররা খুব চায় কারণ তুমি প্রেসিডেন্ট হলে তোমাকে ভাঙ্গিয়ে ওরা বেশ চলতে পারবে।

তিতাস রেগে যায়, এসব কি বলছো তুমি লাবনী?

লাবনীও মেজাজ হারায়, ঠিকই বলছি। আমিও তো কিছু খবর রাখি! আর শোন, তুমি প্রেসিডেন্ট পদের যোগ্য সেটা আমি অস্বীকার করছি না, তবে আরও যোগ্য লোক আছে সমাজে, তুমি তো ছয় বছর থাকলে, এবার তাদের সুযোগ দাও সমাজের জন্য কাজ করার। তারপর যদি প্রয়োজন মনে কর, সদস্য-সদস্যারা যদি তোমাকে চায় তিন বছর পর আবার দায়িত্ব নিও। তাছাড়া তুমি প্রেসিডেন্ট হও তা কে চায়, আর কে না চায় সেটা জানার কোন আগ্রহ নেই আমার। তবে আমিও চাই না, আর তোমার মেয়েও চায় না। আমরা চাই তুমি আমাদের সময় দাও। এতে যদি তুমি আমাদের স্বার্থপর ভাবো, করার কিছুই নেই। এখন তোমার সিদ্ধান্ত তুমি কাদের গুরুত্ব দেবে।

তিতাস বলে, তুমি বুঝতে পারছো না লাবনী, এটা আমার সম্মানের ব্যাপার। তাছাড়া আমি একটা দল নিয়ে চলি, দলের সবাইকে নিয়ে এতদূর এগিয়ে আমি এখন পিছু হটতে পারবো না ।

- তার মানে, তুমি ইলেকশন করবেই? তাই না?

তিতাস নিরুত্তর।

- তোমার কাছে আমাদের চেয়ে তোমার দলই বড় হল! ঠিক আছে, তুমি থাক তোমার দল নিয়ে।

লাবনী সেদিনই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে যে, ও আর তিতাসের সঙ্গে থাকবে না। আপাতত ওর কোন বান্ধবীর বাসায় গিয়ে উঠবে, তারপর একটা ছোট বাসা ঠিক করে প্রিয়ানাকে ওর কাছে নিয়ে যাবে। স্কুলের চাকরিটা এখনো আছে, ওদের দুজনের বেশ চলে যাবে।

প্রিয়ানা দৌড়ে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো, আমাকে ফেলে চলে যেও না মামনি।

লাবনী মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বললো, কয়েকটা দিন এখানে থাক মা, আমি এসে তোমাকে নিয়ে যাবো।

(বাকি অংশ ১০০ নং পৃষ্ঠায় পড়ুন...)

আগমন

জেসিকা লরেটো ডি' রোজারিও

"পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর অনুভূতি হলো, মা হওয়া। সন্তানের হাতের প্রথম কোমল স্পর্শ, তার গায়ের গন্ধ একজন মায়ের কাছে এই পৃথিবীর বুকে এক টুকরো স্বর্গসম। ঈশ্বরের এক পরম আশীর্বাদ, একজন মায়ের জীবনে পরিপূর্ণতার উপলব্ধি।"

একটা ছোট্ট মেয়ে, বয়স তিন কি চার হবে, অনেকক্ষণ ধরেই বল নিয়ে তার মা এবং বাবার সাথে খেলায় মত্ত। তার আধো আধো বুলি, হাস্যোজ্জ্বল মুখ, খেলতে খেলতে হঠাৎ পড়ে যাওয়া, আবার দৌড়ে এসে তার মাকে জড়িয়ে ধরার এই অপূর্ব দৃশ্যগুলো মুগ্ধ হয়ে প্রাণভরে দেখছিলো বর্ষা। আজকাল প্রায়ই বিষণ্ন থাকে সে। মনে মনে ভাবে, কেন ঈশ্বর তাকে এই পরম আনন্দ হতে বঞ্চিত করলো? পরমুহূর্তেই মনে পড়ে, হ্যাঁ এটা তারই, তাদেরই পাপের ফল। যার প্রায়শ্চিত্ত সে করে চলেছে এক যুগেরও বেশি সময় ধরে ... কিন্তু আর কতো? তার প্রায়শ্চিত্ত কি আর কখনো শেষ হবেনা? নিজের অজান্তেই চোখ হতে গড়িয়ে পড়া জল মুছে নিলো সে। সকাল থেকেই এই পার্কের বেঞ্চিতে বসে আছে সে। যখনই তার মন খারাপ হয় , শ্বাস ভারি হয়ে আসে ঠিক তখনই সে চলে আসে এই পার্কে। নিজেকে কিছুটা সময় দিতে , আশা দিতে। একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে, ঈশ্বর নিশ্চয়ই তাকে ক্ষমা করবেন, তার প্রার্থনা শুনবেন। এভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে গেছে ঠিকই কিন্তু তার শাস্তি বোধ হয় আজও শেষ হয়নি। মনে মনে ভাবে বর্ষা, আর কতো যুগ পার হলে তার এই শাস্তির অবসান হবে ...

বছর তেরো আগের কথা। ভালোবেসে পরিবারের অমতে বিয়ে করেছিলো শুভকে। শুভ ছিলো তখন উঠতি অভিনেতা আর বর্ষা ছিলো স্কুল শিক্ষিকা। অনেক কষ্ট করে চলছিলো তাদের সংসার। ছোট এই সংসার টানতেই তারা হিমশিম খাচ্ছিলো। সংসার জীবনের ছয় মাস না পেরুতেই, তাদের জীবনে সুখবর নিয়ে আসে নতুন সদস্য। কিন্তু অর্থের অভাব, এই জীবন যুদ্ধের দিন রাত্রিতে খুশি হতে পারেনি শুভ। অনেক মিনতি করলেও, শুভর একরোখা জেদ, বাস্তবতা সব মিলিয়ে মেনে নিতে হয় তার সিদ্ধান্তকে। বাধ্য হয়ে গর্ভপাত করায় বর্ষা। সেদিনের পর এক অদ্ভুত শীতলতা চলে আসে তাদের সম্পর্কে। শোক কাটিয়ে, ধীরে ধীরে তারা ফিরে আসে তাদের স্বাভাবিক জীবনে। বছর কয়েক বাদে, শুভ পেয়ে যায় বড় একটা নাটকের সুযোগ। রাতারাতি হিট হয়ে যায় সেই নাটক। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি, একের পর এক সাফল্য। নাটক থেকে অভিষেক হয় বড় পর্দায়। আর্থিক অনটনের অবসান হয়। নিজেদের ফ্ল্যাট কেনে তারা। খুব যত্ন নিয়ে ঘরের প্রতিটা কোণা সাজায় বর্ষা। দামী আসবাবপত্রে ঠাসা সেই ফ্ল্যাট জুড়ে কোনো কিছুরই কমতি নেই তবুও শুধু শূন্যতা আর শূন্যতা। এক নবজাতকের অভাব অনুভূত হয় প্রতিটি মুহূর্তে। বছর সাতেক পর থেকে শুভ আর বর্ষা প্রস্তুতি নেয় তাদের পরিবার পরিকল্পনার কিন্তু বিপত্তি ঘটে তখনই। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তারা জানতে পারে, পূর্বের সেই গর্ভপাতের কারণে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে বর্ষার শরীরে। প্রাকৃতিকভাবে মাতৃত্বের স্বাদ গ্রহণ করা তার জন্য এতটাও সহজ হবেনা। কান্নায় ভেঙে পড়ে বর্ষা, শুভও নিজেকে দোষারোপ করতে শুরু করে। কিন্তু হাল ছাড়েনি তারা, শুরু হয় আধুনিক চিকিৎসা, দেশে-বিদেশে নানান চিকিৎসা, ওষুধপত্র নিয়েও এর সমাধান হয়নি। বারংবার তারা ব্যর্থ হয়। এভাবে কেটে গেছে বেশ কয়েকটি বছর। ক্যারিয়ারে সাফল্য, আর্থিক স্বচ্ছলতার কোনো কমতি নেই তাদের জীবনে কিন্তু অদ্ভুত এক শূন্যতা, শীতলতা তাদের জীবন জুড়ে। শত ব্যস্ততার পরেও রোজ রবিবার নিয়ম করে তারা গির্জায় যেতো, প্রায়শ্চিত্ত করতো, অনুতপ্ত হতো। কিন্তু সেই শাস্তি ভোগ করতে করতে পার হয়ে যায় এক যুগ। এসব ভাবতে ভাবতেই উঠে দাঁড়ায় বর্ষা , বাসায় ফিরতে হবে। হাঁটতে হাঁটতে কিছুটা সামনে এগিয়ে গেলে দেখে কিছু পথশিশু খুব কষ্ট পাচ্ছে ক্ষুধায়, কিছু খাবার কিনে দেয় তাদের বর্ষা। বাসায় ফিরে এই নিয়ে শুভর সাথে আলোচনা করে। তখন তারা সিদ্ধান্ত নেয়, যেহেতু সামনে বড়দিন তাই ঢাকার ভেতরে এবং বাইরে বেশ কয়েকটি এতিমখানায় তারা যাবে। সেখানে বাচ্চাদের জন্য কাপড়, খেলনা, খাবার এবং টাকা দিবে। যেই ভাবা সেই কাজ। পরের শুক্রবার সময় করে তারা 'মাদার মেরী অরফান হোম' নামক একটি এতিমখানায় যায়। সেখানে অনেকটা সময় তারা বাচ্চাদের সাথে কাটায়। বর্ষা এবং শুভর ভেতরে এক অদ্ভুত পরিপূর্ণতার ছোঁয়া আসে। সেখানে একজন সিস্টার তাদের বলেন, "তোমরা একজন বাচ্চাকে দত্তক নিতে পারো, হয়তো তাতে ঈশ্বর তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন এবং তোমাদের আত্মগ্লানিও ঘুচবে কিছুটা।"

বিষয়টা ভাবায় তাদের। রাতে বাড়ি ফিরে তারা সিদ্ধান্ত নেয় একটি বাচ্চাকে দত্তক নিবে। পরদিন তারা আবারও সেই হোমে যায় এবং বাচ্চা দত্তক নেওয়ার ব্যাপারে সিস্টারকে আবেদন জানায়। সিস্টার তাদের বিষয়টা বিবেচনা করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজ দিতে বলেন এবং সময় চেয়ে নেন। বড়দিনের আরমাত্র দিন চারেক বাকি! অদ্ভুত এক উত্তেজনায় তারা অপেক্ষার প্রহর গুনছে। বড়দিনের ঠিক আগের দিন সিস্টার তাদের ফোন করে তার সাথে দেখা করতে বললেন।

পরদিন সকালে, বর্ষা আর শুভ চট্‌জলদি তৈরি হয়ে চলে আসে হোমে। সিস্টার তাদের বলেন, "তোমাদের বিষয়টা বিবেচনা করে, আমাদের এই হোম থেকে আমরা তোমাদেরকে বাচ্চা দত্তক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

আনন্দে কেঁদে ফেললো তারা দুজনেই। এরপর নবজাতকদের কক্ষে তাদের নিয়ে গেলে, তারা একটি দুই দিনের নবজাতককে কোলে তুলে নেয়। সিস্টার জানায়, গত পরশুদিন রাতে কেউ একজন এই শিশুটিকে তাদের দরজার সামনে রেখে গেছে। সিস্টার আরও বলেন, "তোমরা ওকে নিতে পারো কিন্তু আজ নয়, আমরা আজকে শিশুটির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবো এবং তার সুস্থতার বিষয় নিশ্চিত করবো। তোমরা কালকে সকালে এসে তাকে নিয়ে যেতে পারবে।

যাওয়ার আগে, বর্ষা নিজের কোলে নিয়ে অনেক চুমু খায় শিশুটিকে, চোখের জল মুছতে মুছতে তারা বেড়িয়ে যায় হোম থেকে। বাড়ি ফেরার পথে, তারা শিশুটির জন্য অনেক কাপড়, খেলনা, খাবার দুধ, দোলনা এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে নেয়। বাড়ি ফিরে তারা পরম আনন্দে শিশুটির জন্য আলাদা কামরা প্রস্তুত করে এবং তা নিজ হাতে সাজায়।

পরদিন সকালে, বড়দিনের আনন্দ নিয়ে তারা গির্জায় যায়। গির্জা থেকে বেড়িয়ে তারা সোজা চলে আসে হোমে। অন্যান্য বাচ্চাদের জন্য বড়দিনের উপহার এবং কেক দেয় তারা। অবশেষে, সিস্টার এসে বাচ্চাটিকে তুলে দেয় বর্ষার কোলে, মাতৃত্বের এক পরম আনন্দ নিয়ে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরে সেই নবজাতককে। সিস্টার জানতে চান, "শিশুটির জন্য তারা কি নাম ঠিক করেছে?" বর্ষা এবং শুভ একে অপরের দিকে তাকিয়ে একসাথে উত্তর দেয়, "ইম্মানুয়েল" (যার অর্থ, ঈশ্বর আমাদের সাথে আছেন)। সিস্টার এক গাল হেসে চুমু খায় ইম্মানুয়েলের কপালে এবং আশীর্বাদ করেন বর্ষা ও শুভকে। আরও বলেন, "ঈশ্বর নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে আছেন। ইম্মানুয়েলের মধ্যে দিয়ে তোমরা আশীর্বাদিত হলে, মাতৃত্ব এবং পিতৃত্বের সুখ তোমরা লাভ করো, ইম্মানুয়েলকে মানুষের মতো মানুষ করো এই প্রার্থনাই করি।

বড়দিনের দিন তাদের জীবনে ঘটলো ইম্মানুয়েলের আগমন। পরম এক প্রাপ্তি নিয়ে, তাকে ঘিরে শুরু হলো বর্ষা এবং শুভর নতুন জীবন।

ফিরে আসা

ষ্টিফেন কোড়াইয়া

শীতের রাত। ডিসেম্বরের চব্বিশ তারিখ। মেঘহীন আকাশে যেন তারার মেলা বসেছে। থেকে থেকে উত্তরের হাওয়া এসে শীতের তীব্রতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। তাই ঢাকা শহরের অলিতে গলিতে আশ্রয় নেওয়া রাতজাগা নেড়ী কুকুরগুলো ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভুত শব্দ করে কেঁকিয়ে ওঠছে। ছেঁড়া কাঁথা বা একটি জীর্ণ চাদর গায়ে জড়িয়ে রাস্তার ফুটপাতে শুয়ে থাকা অসহায় মানুষগুলো হাত-পা গুটিয়ে তীব্র শীতের প্রকোপ থেকে নিজেদের বাঁচাতে ব্যর্থ চেষ্টা করছে। ঘন কুয়াশার চাদরে মোড়া ঢাকা শহরের রাজপথের দু'পাশের নিয়ন বাতিগুলোর আবছা আলো পিচ ঢালা রাস্তার উপর বিচ্ছুরিত হয়ে যেন এক ভৌতিক আবহ সৃষ্টি করছে। রাস্তার আশেপাশে খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের বাড়িগুলোর ছাদের উপর স্থাপিত লম্বা বাঁশে ঝুলছে রং-বেরঙ্গের বৈদ্যুতিক আলো ভরা ছোট বড় তারা, ইংরেজীতে 'ক্রিসমাস স্টার' যা প্রভু যিশুর জন্ম স্থাননির্দেশনার প্রতীক বলে সবাই বিশ্বাস করে। এতরাতেও কোন কোন বাড়ি থেকে ভেসে আসছে বড়দিনের আনন্দ উদ্‌যাপনের ধূম নৃত্যের তালে তালে হিন্দি বা ইংরেজী গানের মূর্ছনা।

লাউড স্পীকারে তেজগাঁ গির্জার দিক থেকে ভেসে আসে বড়দিনের গানের সুমধুর স্তবগান। আনন্দ ও আশীর্বাদের এ রাত যেন আদি পাপে কলঙ্কিত মানব জাতির সেই কলঙ্ক মোচনের এক মহেন্দ্রক্ষণ হিসাবে আবির্ভূত হয়ে মুক্তির বাণী শোনাচ্ছে মানবজাতিকে।

রাতের এ নির্জনতায় পথ চলছে একটি লোক। অতিরিক্ত মদ্যপানে পা টলছে তার। নিদ্রাহীন দুটো চোখ রক্তজবার মত লাল। উস্কোখুস্কো চুল। বড়দিনের এ উচ্ছ্বাস-আনন্দ, গান বাজনা, আলোকসজ্জা কিছুই যেন দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না তার। বন্ধু বান্ধবের সাথে আড্ডা, মদ গাঁজাসহ নানারকম নেশা দ্রব্য সেবনেই যেন তার আনন্দ, জীবনের লক্ষ্য। এই শীতেও রীতিমত ঘামছে লোকটি। রাতের অন্ধকার চিরে তীব্র হর্ণ বাজিয়ে মাঝে মাঝে দু-একটি মোটর গাড়ি তাকে পাশ কাটিয়ে হুস করে চলে যাচ্ছে। রাত দুপুরে রাস্তার মাঝখান দিয়ে হেলেদুলে হেঁটে চলা লোকটির চলার ভঙ্গি দেখেই হয়তো চালকরা বুঝে যাচ্ছে একজন নেশাগ্রস্ত আত্মভোলা মাতাল পথে নেমেছে। তাই সাবধানে পাশ কাটিয়ে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করছে।

মাইকেল-এক সময়ের প্রতিষ্ঠিত ছাত্র। অবস্থাপন্ন পরিবারের একমাত্র সন্তান হিসাবে কোন অভাব অভিযোগ তাকে স্পর্শ করেনি কোনদিন। মা বাবার কাছে যখন যা চেয়েছে, তা যেন না চাইতেই পেয়ে গেছে সে। সুন্দর ও সুঠাম বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, যেমন কথা বলার ভঙ্গি তেমনি সুন্দর আচরণ, মুখে অনন্য হাসির রেখা যেন মাইকেলকে করে তুলেছে মহান সৃষ্টিকর্তার এক অপূর্ব সৃষ্টি।

বয়স ছয় হতেই মা বাবা তাকে স্থানীয় মিশন স্কুলে ভর্তি করে দেন। সুন্দর আচার-আচরণ, ব্যবহার ও লেখাপড়ায় ভাল হওয়ায় স্কুলে ভর্তি হওয়ার পরই শিক্ষক-শিক্ষিকা'দের সুনজরে পড়ে মাইকেল। একজন ভাল এবং বুদ্ধিমান ছাত্রকে পেয়ে তারা খুশি হন। এ ছেলে ভালো লেখাপড়া শিখে একদিন অনেক বড় হবে, উচ্চ পদের একজন সম্মানিত ব্যক্তি হয়ে স্কুলের নাম রাখবে। প্রধান শিক্ষক তাকে নিয়ে স্বপ্নের জাল বুনেন।

মা-বাবার অত্যাধিক আদর-স্নেহ, স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকা'দের প্রশংসা কেমন যেন অহংকারী করে তোলে মাইকেলকে। স্কুলের সেরা ছাত্র বলে পরিচয় দিতে নিজের মনে নিজেই পুলক অনুভব করে সে। তার চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী সহপাঠীদের ক্রমেই এড়িয়ে চলতে শুরু করে মাইকেল। যোগ দেয় কিছু অবস্থাপন্ন ও মেধাবীসহপাঠীদের দলে। তাদের সাথে আনন্দ ভ্রমণের নাম করে মাঝে মাঝেই এদিক সেদিক ঘুরতে যায়। মদ্যপান করে। এতদিনের সকালে ও রাতে নিয়মিত পড়ার অভ্যাসটি বদলে গিয়ে দেরি করে ঘুম থেকে উঠা শুরু করে। কারণ জিজ্ঞেস করলে রাত জেগে পড়াশুনার দোহাই দিয়ে দেরিতে ঘুম ভাঙ্গার কারণ ব্যখ্যা করে। এক অজানা কারণে লেখাপড়ায় মনোযোগ কমতে থাকে মাইকেলের। ক্লাশের সেই রোল নং ১ ছাত্রটির রোল নং পিছুতে পিছুতে ১০-এ নেমে আসে। সহপাঠীরা যারা সব সময় মাইকেলের মেধার কাছে হার মানতো, তার এ অধঃপতন দেখে তারা মুচকি হাসে। স্কুলের শিক্ষকগণ তাদের এক সময়ের এ মেধাবী ছাত্রটির এ অধঃপতন দেখে প্রমাদ গুনে। তার বাবা মাকে ডেকে অতি দুঃখের সাথে ছেলের এ অধঃপতনের কথা জানান।

মাইকেলের এ পরিবর্তন এতদিনে মা-বাবার চোখকেও ফাঁকি দিতে পারেনি। নানাভাবে বুঝিয়েও যখন তাকে ফেরাতে পারেননি, তখন দুঃখে-যন্ত্রণায় তার গায়ে হাত তুলতেও বাধ্য হন তারা। মা-বাবার ও স্কুলের শিক্ষকগণের উপদেশ ও কড়া শাসনে মাইকেল পড়াশুনার প্রতি একটু মনোযোগী হলেও এতদিনের খারাপ অভ্যাসটি যেন তাকে চারদিক থেকে জড়িয়ে ধরে। ফল হিসেবে এসএসসি পরীক্ষায় কোনরকম পাশ করে ঢাকার একটি কলেজে ভর্তি হয় মাইকেল। কলেজে পা দিয়েই এতদিনের মা-বাবা ও শিক্ষকগণের উপদেশও শাসন থেকে মুক্তির এক অবারিত দরজা যেন তার সামনে খুলে যায়। কিছু উচ্ছৃঙ্খল বন্ধু-বান্ধবীও জুটে যায় কয়েকদিনের মধ্যেই। তাদের সাথে আড্ডাবাজি, মদ্যপান, জুয়ার মত নিষিদ্ধ এক অন্ধকার জগৎ যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। তার অশালীন আচরণ, ব্যবহার ও কথাবার্তায় এতদিন যে ক'জন সুহৃদ তার পাশে ছিল, তারাও তাকে ত্যাগ করে। বাবা মায়ের কাছেও তার এ অধঃপতনের সংবাদ চাপা থাকেনা। হতাশা আর ব্যর্থতার এক গভীর আত্মদহনে নিমজ্জিত হয় তারা।

একমাত্র ছেলের এ বিপর্যয় সহ্য করতে না পেরে অসুস্থ হয়ে পড়েন মাইকেলের মা দীপান্বিতা। -"বাবা মাইকেল, আর কতদিন আমাদের কষ্ট দিবি বাবা? যে অন্ধকার জগতে পা দিয়েছিস, সেখান থেকে ফিরে আয়, ফিরে আয় বাবা। তোর উপর যে আমাদের অনেক আশা-ভরসা, অনেক স্বপ্ন।" মোবাইল ফোনে ভেসে আসা মায়ের কান্নাজড়িত আকুতিমাখা কণ্ঠ শুনে বিরক্তিতে নাক কুচ্কায় মাইকেল। বিকৃত কণ্ঠে মুখ থেকে বেরিয়ে আসে একটি অশ্রাব্য গালি। -"তুই আমাকে এভাবে গালি দিতে পারলি খোকা?" ভুলে গেছিস যে আমি তোর জন্মধাত্রী মা। আজ থেকে মনে করবো আমার কোন সন্তান নেই। মা বলে আর ডাকবি না আমাকে।" সেই থেকে বেশ কয়েক মাস হয়ে গেলো, মায়ের সাথে আর কোন কথা হয়নি। মায়ের কথা শুনে বাবাও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন তার দিক থেকে। পাড়া প্রতিবেশি ভাইবোন, বন্ধুবান্ধব যারা তাকে এতদিন মাথায় তুলে রাখতো, খবরাখবর নিতো, তার এই অধঃপতনের কথা শুনে তারা সবাই মাইকেলের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। স্কুলের সহপাঠিদের মধ্যে যারা তার সাথে ঢাকা শহরে এসে কলেজে ভর্তি হয়েছে, তারাও আজকাল তার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। রাস্তাঘাটে দেখা হয়ে গেলে পাশ কাটিয়ে চলে যায়, যেন তার স্পর্শ লাগলে তাদের অমঙ্গল হয়ে যাবে।

দেখতে দেখতে বছর শেষ হয়ে এলো। মা বাবার সাথে কোন যোগাযোগই নেই মাইকেলের। ঢাকায় থাকা খাওয়ার জন্য বাবা যে কয়টি টাকা তাকে দিয়েছিলেন, তা শেষ হয়ে গেছে। সে টাকার বেশিরভাগই খরচ হয়েছে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আমোদ-

ফুর্তিতে। তারপর জীবন বাঁচাতে ধার-দেনা করে চলছে কোনরকম। তার এই দুর্দিনে নিজ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবরা তাকে এড়িয়ে চললেও যারা তার এ অধঃপতনের সঙ্গী তারা কিন্তু তার খবর নিতে ভুলেনি। প্রতিদিন এসে খবর নিয়ে যায়, বাবা তার মাসিক খরচের টাকা পাঠিয়েছে কিনা। পাঠায়নি শুনে মুখ ভার করে চলে যায় তারা। সোনার ডিম পাড়া হাঁসটির বাড়ি থেকে মাসিক খরচের টাকা না পাওয়া যে তাদের মদ-জোয়ার আড্ডায় দুর্ভিক্ষ নেমে আসারই মত।

বড়দিন এগিয়ে আসছে। বাবা মা নিশ্চয় এতোদিনে তার প্রতি তাদের রাগ অভিমান ভুলে গেছেন। নিজের মনকে নিজেই প্রবোধ দেয় মাইকেল। সন্তান হিসেবে বাবা-মাকে এতবড় কথাটি বলা তার কোনভাবেই উচিত হয়নি। সেও তো একদিন বাবা হবে, তখন যদি তার নিজের সন্তান তাকে এভাবে গালি দেয়? তার নিজের চোখের সামনে যদি তার নিজ সন্তান তার মত অবক্ষয়ের অন্ধকারে তলিয়ে যায়? তার মন তখন কেমন হবে? অনুতাপের তীব্র দহনে পুড়তে পুড়তে বাবা-মায়ের প্রতি সহানুভূতিতে চোখে জল আসে মাইকেলের। নিজের অজান্তেই পাশে থাকা মোবাইল ফোনটি হাতে তুলে নিয়ে বাবার নাম্বারে কল দেয় মাইকেল। -"বাবা; আমি মাইকেল, কেমন আছো বাবা? মা ভালো আছে তো?" ওপাশ থেকে বাবা যোসেফের কান্নাভেজা কণ্ঠ ভেসে আসে, "আমরা ভাল আছি বাবা, তুমি ভালো তো? উত্তর দেয় তার বাবা।" না বাবা আমি ভাল নেই। হাতে কোন টাকা পয়সা নেই। যে টাকা পাঠিয়েছিলে, তা শেষ গেছে অনেক দিন। আর একটি কথা বাবা, আমাকে বলে ছিলেনা ভালো হয়ে যেতে, আমি সত্যি ভালো হয়ে যাবো বাবা, তোমাদের আর কষ্ট দেবো না। আমার যে বেশ কিছু টাকার প্রয়োজন বাবা। সামনে বড়দিন আসছে। একদিনের বেশি ছুটি পাবো না বলে বাড়ি আসতে পারছিনা।" এক নাগাড়ে এতগুলো কথা বলে থামতেই মা-বাবার প্রতি এতক্ষণের সহানুভতিশীল মনটাতে আবার শয়তানীর কালো রেখা ঝিলিক দেয়। বাবার মন গলাতে পেরেছে ভেবে খুশি হয় মাইকেল। সুদিনের বন্ধু-বান্ধবরা এসে এবার আর ফিরে যাবেনা। রাতভর আড্ডা চলবে। বড়দিন উপলক্ষ্যে আসবে বোতল বোতল মদ। চলবে জুয়া। বাবা-মা'কে ঠকানো খুবই সহজ কাজ, চোখের জল ফেলে একটু মন ভোলানো কথা, তারপরই কাজ হাসিল- ভেবে নিজের মনে নিজেই নিষ্ঠুর হাসি হাসে মাইকেল।

আজ ২৪ ডিসেম্বর। আগামীকাল বড়দিন। বাড়িতে সবাই আনন্দ করবে আর ছেলেটি ঢাকা শহরে একাকী কাটাবে। মা'বাবাকে ছেড়ে শহরে নিশ্চয় ছেলের খুব কষ্ট হচ্ছে ভেবে আর দেরি না করে ছেলের বিকাশ নম্বরে টাকা পাঠিয়ে ফোন করে বড়দিনের অগ্রীম শুভেচ্ছাসহ টাকা পাঠানোর কথা জানিয়ে দেন মাইকেলের বাবা।

টাকা পেয়ে সারা মাসের চলা ও বাসা ভাড়ার কিছু টাকা রেখে বাকি টাকাগুলো নিয়ে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে বেরিয়ে পড়ে মাইকেল। আগামীকাল ২৫ ডিসেম্বর। বড়দিন উৎসব। এবার ইচ্ছে করেই মা-বাবাকে কলেজ থেকে ছুটি না পাওয়ার মিথ্যে কথা বলে ঢাকায় থেকে গেছে মাইকেল। এবারের বড়দিনটি বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়ে কাটাবে। মদ্যপান একদমই পছন্দ করেননা তার বাবা। মাঝে মাঝে বাবাকে প্রভু যিশুর পালক পিতা যোসেফের সাথে তুলনা করে মাইকেল। তার বাবার মত এত সহজ-সরল মানুষ যে এ যুগে আছে, তার বাবা যোসেফকে না দেখলে বুঝা যাবে না। কিছুতেই এ যুগে চলার যোগ্য নয় সে। পুরানো অচল পয়সার মত। তাই তো একটি মিথ্যে কথা বলে টাকা চাইতেই কোন প্রশ্ন না করেই পাঠিয়ে দিলেন এতগুলো টাকা। এ বড়দিনে নিজের ও মায়ের জন্য হয়তো কিছুই কিনবেননা। ছেলে কি খাচ্ছে না খাচ্ছে ভেবে দু-একদিন উপোসও করতে পারেন তারা।

আজ ২৪ ডিসেম্বর বলে কথা। প্রাক-বড়দিন উৎসব পালন করেছে মাইকেল। বাবার পাঠানো টাকার পূর্ণ ব্যবহার করেছে সে আজ। বন্ধু-বান্ধবীদেরকে সাথে নিয়ে জমিয়ে আড্ডা দিয়েছে। বোতলের পর বোতল বিদেশি মদ এসেছে। খেয়ে সবাই মিলে হৈ-হল্লা করেছে। টাকা দিয়েছে মাইকেল।

বন্ধু-বান্ধবীরা চলে যাবার পর বাসায় ফেরার উদ্দেশে রাস্তায় নেমে এলেও অতিরিক্ত মদ্যপানে নেশার ঘোরে বাসায় ফেরার রাস্তা ভুলে যায় মাইকেল। একরাত বাসায় না গিয়ে শহরের রাজপথে ঘুরে বেড়ালে কেমন হয় ভেবে বাসায় ফেরার গলি পথটা খোঁজার কোন চেষ্টা না করেই মেইন রোডের মাঝখান দিয়ে এমনভাবে হাঁটতে শুরু করে মাইকেল, যেন কোন মহারাজা এক রাজ্য জয় করে আর এক রাজ্য জয়ের অভিলাসে স্বদর্পে এগিয়ে চলছে।

হঠাৎ রাতের নিস্তব্দতা ভেঙ্গে প্রচণ্ড গতির কোন যানবাহন ব্রেক করার শব্দ মাইকেলের কানে এসে বাজে। চকিতে তার স্বপ্নময় পথ চলা থেমে যায়। একটি গরম আগুনের হলকা এসে তার শরীরে লাগে। সামনের দিকে তাকিয়েই দেখতে পায়, একটি যাত্রীসহ মোটর গাড়ি প্রচণ্ড বেগে ছুটে এসে রাস্তার পাশের একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে আছড়ে পড়েছে। কাঁচের ঝনঝন ও ধাতুর বিকট আওয়াজে প্রথমটায় কেমন স্থবির হয়ে যায় মাইকেল, তারপরই মানবিক কর্তব্যবোধের এক প্রচণ্ড ধাক্কায় তার নেশাগ্রস্ত মনটা বাস্তবতায় ফিরে আসে। এক মুহূর্ত দেরি না করে নিজের দুর্বল ও অর্ধচেতন দেহটা নিয়ে টলতে টলতে দৌড় দেয় দুর্ঘটনা স্থলের দিকে। গাড়ির ভাঙ্গা কাচের ফাঁকা দিয়ে প্রচণ্ড আঘাতে দুঁমড়ে মুচঁড়ে যাওয়া বিধ্বস্ত গাড়ীটির ভেতরে দৃষ্টি পড়তেই দেখতে পায় রক্তাক্ত অবস্থায় একটি বাচ্চা ছেলে কাঁদছে, পাশে তার রক্তাক্ত মা। চালকের আসনে বসা লোকটি নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে আসনের উপর। শরীরটা যেন গাড়িটির মতই দুমড়ে-মুচড়ে গেছে তার। হয়তো'বা ছেলেটির বাবা। টাটকা রক্তে ভিজে গেছে তার সারা শরীর। মাথাটা ষ্টিয়ারিং হুইলের উপর হেলে পড়েছে। দ্বিক-বিদিক জ্ঞান হারিয়ে কাঁপা হাতে সর্বশক্তি দিয়ে খুলতে চেষ্টা করে দুর্ঘটনা কবলিত গাড়িটির আটকে থাকা দরজা। নেশাগ্রস্ত দুর্বল শরীরে হঠাৎ যেন অসুরের শক্তি ফিরে পায় মাইকেল। হেচকা টানে গাড়ির দরজা খুলে অতি কষ্টে বাচ্চা ছেলেটিকে বাইরে বের করে নিয়ে আসে। এতক্ষণে গাড়ির ইঞ্জিনে আগুন ধরে গেছে। আগুনের আঁচ থেকে বাঁচাতে পাজাকোলে করে ছেলেটিকে একটু দূরে নিয়ে শুয়ে দিয়ে তড়িৎ গতিতে আবার গাড়ির কাছে ফিরে এসে শিশুটির মাকে টেনে বের করে আনে। প্রচণ্ড ধাক্কায় অজ্ঞান হয়ে গেলেও তিনি শ্বাস নিচ্ছেন দেখে আশ্বস্ত হয় মাইকেল। এবার চালকের আসনে বসা ছেলেটির বাবাকে বের করার চেষ্টা করে মাইকেল কিন্তু বিধি বাম, তার কাছে যাওয়ার আগেই দাউ দাউ করে চালকের আসনে আগুন জ্বলে ওঠে। আগুনের লেলিহান শিখা অগ্রাহ্য করে ছেলেটির বাবাকে বের করার শেষ চেষ্টা করেও জলন্ত আগুনের আঁচে পিছিয়ে আসে মাইকেল। বাচ্চা ছেলেটি কেমন আছে দেখতে দৌড়ে তার কাছে যেতেই ছেলেটি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মাইকেলের হাত দুটো আকঁড়ে ধরে ফিস ফিসিয়ে বলে উঠে, "আংকেল, আমার বাবাকে বাঁচান প্লিজ, যিশু আপনাকে সাহায্য করবেন।" ছেলেটির ফিসফিসিয়ে বলা অস্পষ্ট কথাগুলো যেন আগুনের শিখার মতই মাইকেলের কানে এসে আছড়ে পড়ে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই টহল পুলিশ আসে। মাইকেলের উদ্ধার তৎপড়তার জন্য তাকে ধন্যবাদ দিয়ে জরুরী এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসে ফোন দিতেই তড়িৎ গতিতে এ্যাম্বুলেন্স চলে আসে। রক্তাক্ত বাচ্চা ছেলেটি তখনও ব্যথায় থেকে থেকে ককিয়ে উঠছে। মা বাবার অবস্থা জানার তীব্র আগ্রহ ও মনের জোড় যেন তাকে এখনও সজ্ঞান রেখেছে। দ্রুত গতিতে আহত মা ও ছেলেকে এ্যাম্বুল্যান্সে উঠাবার সময় মুহূর্তের জন্য ছেলেটির উপর মাইকেলের চোখ পড়ে। এতক্ষণের অসম্ভব ক্লান্তি ও ভয় মিশ্রিত দুটো চোখ মেলে কাকে যেন খুঁজছে সে। রক্তমাখা হাত ও অশ্রুভেজা চোখে ঘন কুয়াশায় নিজেকে আড়াল করে এ্যাম্বুলেন্সের একপাশে

এসে দাঁড়ায় মাইকেল। বুকে অনুভব করে এক অব্যক্ত যন্ত্রণা। হঠাৎ কানে আসে আগের মতই একটু আগে শোনা ছেলেটির অস্ফুট কণ্ঠ, "ধন্যবাদ আঙ্কেল।" তড়িৎ গতিতে ছেলেটির দিকে তাকায় মাইকেল। অশ্রু ভেজা চোখ দুটোতে কৃতজ্ঞতাবোধের স্পষ্ট চিহ্ন।

মাইকেল রক্তভেজা ইলেকট্রনিক হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখে রাত ১২টা বেজে গেছে। ডিজিটাল তারিখের ঘরে ২৫ ডিসেম্বর তরিখটি জ্বলজ্বল করছে। মাইকেলের খেয়াল হয় আজ বড়দিন। মুহূর্তের জন্য শৈশবের দিনগুলোতে ফিরে যায় মাইকেল; যখন বড়দিনের এ'রাতে সেও মা-বাবার হাত ধরে মধ্যরাতের খ্রিস্টযাগে যোগ দিতে গির্জায় যেতো। সবাই মিলে প্রার্থনা করতো তারপর বাবা-মা ও গুরুজনদের সাথে সেলাম বিনিময় করে তাদের আশীর্বাদ গ্রহণ করতো। আর আজ? আজ সে একজন নেশাসক্ত, অপয়া ও সমাজের মানুষ নামের এক মূল্যহীন কীট। অথচ আজকের রাতে তাকেই কিনা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা বেছে নিয়েছেন কতগুলো অসহায় মানুষের জীবন বাঁচাতে, তাদের উদ্ধারকর্তারূপে।

জরুরী সাইরেন বাজিয়ে আহতদের নিয়ে এ্যাম্বুলেন্সটি ঢাকা মেডিকেলের উদ্দেশে চলে যেতেই ছেলেটির বলা দুটো কথা যেন মাইকেলের অপরাধী মনটা প্রশান্তিতে ভরিয়ে দেয়। নিজের মনে নিজেকেই সান্ত্বনা দেয় মাইকেল, এখনও শেষ হয়ে যায়নি সে। নিজের ও মানুষের জন্য এখনও তার কিছু করার আছে। ঈশ্বর বুঝি তার কাছে তাই চান।

আহতদের নিয়ে এ্যাম্বুল্যান্স চলে যাওয়ার পর পুলিশ দুর্ঘটনা কবলিত ভাঙ্গা গাড়িটি থেকে ছেলেটির বাবার অগ্নিদগ্ধ লাশটি বের করে পোষ্ট মর্টেমের জন্য পাঠিয়ে দিয়ে ট্রেকার ডেকে গাড়িটি টেনে নিয়ে স্থানীয় থানার উদ্দেশে চলে যাওয়ার পরও স্থবিরের মত কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে মাইকেল, তারপর কি মনে করে দ্রুত তেজগাঁ রেল-স্টেশনের দিকে হাঁটা শুরু করে।

এতক্ষণে ভোর হয়ে এসেছে। শীতের আকাশের রাশি রাশি তারকরাজি কখন অদৃশ্য হয়ে মাত্র একটি ধ্রুব তারা আকাশের এক কোণে জ্বলজ্বল করছে।

কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে চট্টগ্রামের উদ্দেশে ছেড়ে আসা প্রথম ট্রেনটি তেজগাঁ রেল স্টেশনে এসে থামতেই যেন কোন যাদুকরের যাদুবলে দৌড়ে এসে উঠে পড়ে মাইকেল। আর ঢাকা শহরে নয়। বড়দিন উৎসবের এই পবিত্র দিনটি মা-বাবার সাথে উদ্‌যাপনের এক প্রচণ্ড ইচ্ছা তাকে বাড়ির দিকে ঠেলতে থাকে।

একমাত্র ছেলের অধঃপতনের খবর শুনতে শুনতে মাইকেলের বাবা যোসেফ ও মা দীপান্বিতা সত্যিই অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন। বড়দিন উপলক্ষ্যে পাড়া-পরশীদের ঘরে ঘরে আনন্দের বন্যা বয়ে গেলেও মাইকেলের বাড়িতে কোন আনন্দ নেই, নেই কোন আয়োজন। ২৪ ডিসেম্বরের এই পবিত্র রাতে ছেলের চিন্তায় নির্ঘুম রাত কেটেছে বুড়ো মা-বাবার। প্রভু যিশুর এ জন্ম-তিথিতে মাটির প্রদীপ জ্বেলে দু'জনে মিলে সন্ধ্যা প্রার্থনায় ছেলের মন পরিবর্তনের জন্য বিশেষ প্রার্থনা করেন তারা, তারপর বড়দিনের পিঠা বানাতে বসে যান মা। যদি ছেলে আসে তবে তো খেতে দিতে হবে, তাই রাত জেগে প্রহরের পর প্রহর গুনে তারা, কিন্তু রাত পেরিয়ে গেলেও ছেলের দেখা না পেয়ে নির্ঘুম রাতের বিষন্নতা যেন আরো বেড়ে যায়।

রেল স্টেশন থেকে বের হয়ে পাগলের মত হাঁটতে থাকে মাইকেল। এখনও রাস্তায় লোক চলাচল শুরু হয়নি। বাড়ির পথেই পাকা রাস্তার পাশে থাকা গির্জার গতরাতের আলোক সজ্জার রঙ্গীন বাতিগুলো এখনও জ্বলছে। ঢং ঢং করে গির্জার ঘন্টাটি বড়দিনের প্রথম উপাসনা আরম্ভ হওয়ার ঘোষণা দিচ্ছে। একটু পরেই প্রথম খ্রিস্টযাগ শুরু হবে। আরো জোরে পা চালায় মাইকেল। একটি অশরীরী শক্তি যেন মা-বাবার কাছে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে তাকে।

যখন বাড়ি এসে পৌঁছে মাইকেল, তখন দিনের আলো ফোঁটতে শুরু করেছে। নির্ঘুম রাত কাটিয়ে ভোরের দিকে তার মা বাবার চোখে মাত্র একটু তন্দ্রার মত এসেছে। হঠাৎ ঘরের দরজায় নক করার শব্দে তন্দ্রা ছুটে যায় তাদের। হুড়মুড় করে উঠে ঘুম ঘুম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, "এত সকালে কে ডাকছো গো?" প্রথমটায় কোন উত্তর দিতে পারে না মাইকেল। এক অব্যক্ত কান্নায় তার কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে। তারপর অস্ফুট কণ্ঠে উত্তর দেয় "মা আমি মাইকেল, আমি ফিরে এসেছি মা, আমি ফিরে এসেছি।" ছেলের কণ্ঠ শুনেও প্রথমটায় বিশ্বাস হতে চায় না। তাড়াতাড়ি দরজা খোলে ছেলেকে দেখে অবাক হন মা। আলু-থালু বেশে পাগলের মত চেহারা। কান্নাভেজা লাল চোখ দু'টো যেন ঠিকরে বেড়িয়ে আসতে চাচ্ছে। স্বপ্ন দেখছেন না তো তিনি? তবে কি ঈশ্বর তাদের প্রার্থনা শুনেছেন? "ওগো ওঠো, দেখ কে এসেছে! আমাদের মাইকেল ফিরে এসেছে।" চিৎকার করে ডাক দেন স্বামীকে। মাইকেলের বাবাও এতক্ষণে বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছেন। এবার আর নেশার বোতল আর মিথ্যে কথা নয়- হাঁটু গেড়ে প্রথমে মা তারপর বাবার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে, তারপর অব্যক্ত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে মাইকেল। কাঁপা কাঁপা হাতে ছেলের মাথায় হাত রাখেন মা-বাবা। তারপর দু'হাতে টেনে তুলে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরেন তারা। চোখে তাদের আনন্দ অশ্রু। অনেক দিন পর মাইকেল অনুভব করে এক অনাবিল শান্তি- যা কোন নেশা তাকে দিতে পারেনি এতদিন।

বাতাসে ভেসে আসে গির্জার বড়দিনের প্রথম খ্রিস্টযাগের ঘন্টাধ্বনি। আর দেরি না করে মা-বাবা ছেলেকে গোসল ও পরিপাটি করে নিয়ে গির্জায় যাবার প্রস্তুতি নেয়। অনেকদিন পর মা-বাবার হাত ধরে গির্জায় প্রবেশ করে মাইকেল। খ্রিস্টযাগে মাইকেলকে মা-বাবার একান্ত সানিধ্যে দেখে প্রতিবেশিরা সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকায় তার দিকে, এ সেই মাইকেল নয়তো, যে নেশা করে ঢাকা শহরের রাস্তায় রাস্তায় পাগলের মত ঘোরে বেড়ায়। খ্রিস্টযাগের পর মা-বাবা মাইকেলকে নিয়ে গির্জার প্রধান পুরোহিত ফাদার যোসেফের সাথে দেখা করেন। সবকিছু শুনে ফাদার যোসেফ মাইকেলকে বুকে জড়িয়ে ধরে বড়দিনের শুভেচ্ছাসহ আন্তরিক অভিনন্দন জানান। তারপর তার কপালে ক্রুশের চিহ্ন একে আশীর্বাদ করেন। মাইকেলও আনত মস্তকে হাত জোড় করে উপরের দিকে হাত প্রসারিত করে চোখ বুঝে প্রার্থনা করে- "হে প্রভু যিশু, আমাকে জীবনে ফেরার সুযোগ দেওয়ার জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।"

সেদিন দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে এক পিতার, রক্ত ঝড়েছে মা ও ছেলের, কিন্তু এক পথভ্রষ্ট পাপী মানুষ ফিরে পেয়েছে নতুন জীবন। বিবেকের জ্বলন্ত আগুনে দগ্ধ হয়ে ছাই হয়েছে মাইকেলের পুরানো অভিশপ্ত জীবনটা, ফিরে পেয়েছে আর একটি নতুন জীবন।

পরের দিন থেকে মাইকেল বেছে নেয় সত্য ও সততার পথ। ত্যাগ করে নেশা ও জুয়ার মতো যত কুঅভ্যাস। মানুষের সাথে ব্যবহারে আনে পরিবর্তন। পুনর্বাসন কেন্দ্রে ভর্তি হয়। সেখান থেকে ফিরে এসে গ্রামে থেকেই বাবার কাজে সাহায্য করতে শুরু করে। বাড়ি থেকে আসা যাওয়া করে আবার পড়াশুনা শুরু করে। উচ্চ শিক্ষার পাশাপাশি বেছে নেয় নামমাত্র পারিশ্রমিকের বিনিময়ে গরীব অসহায় ছেলে মেয়েদের টিউশনির কাজ। মাইকেল যে কোনোদিন ভাল হতে পারবে, সেকথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও একটি দুর্ঘটনা, তার দৃঢ় মনোবল, একাগ্রতা তাকে সেপথ থেকে ফিরিয়ে আনে।

সময় এগিয়ে চলে। প্রতি বড়দিনে গির্জার বেদীতে একটি মোমবাতি জ্বেলে নীরবে প্রার্থনা করে মাইকেল- "ধন্যবাদ প্রভু যিশু, তোমার এ শুভ জন্মতিথীতে আমার পাপময় জীবন থেকে ফিরতে আমাকে সাহায্য করা জন্য।"

এক গিটার বাদকের বড়দিন উদ্‌যাপন

রবিন সি. গমেজ

পৃথিবীতে কিছু মানুষের মুখাকৃতি এমন হয়, যেন কত পরিচিত, কিংবা চেনা জানা। অথচ জীবনে কোনো দিনই তার সাথে হয়তো সাক্ষাৎ ঘটেনি। এমন কোনো মানুষের সাথে সাক্ষাৎ হলে এক গভীর অনুভূতি ও আন্তরিকতায় মন পুলকিত হয়ে উঠে। তখন যেচে গিয়ে তার সাথে একটু আলাপ করতে মন চায়, কিংবা একটু সখ্যতা গড়ে তুলতে সাধ জাগে। সেদিন এমন ভাবটি জেগে উঠেছিল রায়ানের প্রতি সেই গিটার বাদকের অন্তরে। যিনি ইউনিয়ন স্টেশনের একটি বেঞ্চে বসে মনোরম মনমুগ্ধকর সঙ্গীত পরিবেশন করছিলেন। রায়ান অনতিদূরে একটি বেঞ্চে বসে অর্থাৎ ঠিক গিটার বাদকের সম্মুখের বেঞ্চে বসে গভীর ধ্যান দিয়ে তার ডায়েরীর পাতায় কিছু লিখছিল। কিছুক্ষণ হলো সে কাজ শেষ করে স্টেশনের ঐ বেঞ্চটিতে এসে বসেছে। রায়ানের কর্মস্থল স্টেশন থেকে পাঁচ মিনিট হেঁটে যাওয়ার মধ্যে পড়ে। অবশ্য রায়ান প্রায়ই কর্ম শেষে ওখানে বসে একটু বিশ্রাম নিয়ে বাড়ি ফেরে।

সেদিন গিটার শুনতে শুনতে রায়ান মুগ্ধ ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। নিমিষের মধ্যে সে খেই হারিয়ে ফেলে এবং এক ভাবনার সাগরে নিমজ্জিত হয়ে যায়। জীবনের ফেলে আসা দিনগুলো তার স্মৃতিচারণ হয়। ছেলেবেলা থেকেই তার অনেক সাধ আহ্লাদ ছিল সঙ্গীত শেখার, কিন্তু বাস্তবে কিছুই হয়নি। তবে অনেক কষ্টে এক জোড়া তবলার বন্দোবস্ত সে করতে পেরেছিল। তাই একটু টুঙ্গ-টাঙ্গ বাজাতে পারে। তবে আহামরি তেমন কিছুই নয়। রায়ানের মনে সাধ জাগে, আহা! সে যদি ঐ গিটার বাদকের মত অমন সুন্দর গিটার বাজাতে পারতো, তাহলে কতই না মজা হতো।

ক্ষণকাল পরে রায়ানের দৃষ্টিগোচর হয় ঐ গিটার বাদক যেন ওকে ইশারায় ডাকছে এবং পাশে এসে বসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে। রায়ান একটু চমকে উঠে এবং ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও লোকটির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

"হাই! কেমন আছো? আমার নাম জ্যাক। বেশিরভাগ মানুষ আমাকে জ্যাকি বলে ডাকে। তোমাকে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে পেরে আমি খুব খুশি। তোমার নাম কি জানতে পারি?" এই বলে জ্যাকি হ্যান্ড-শেকের জন্য রায়ানের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। ভদ্রতা রক্ষার্থে রায়ানও হ্যান্ড-শেকের জন্য হাত বাড়িয়ে দেয় এবং বলে, "আমি রায়ান। তোমার সাথে দেখা করে খুব ভালো লাগলো।"

-"কি লিখছো ভাই?"

-"কিছু না, শুধু গল্প।"

জ্যাকি তার পাশে রাখা ব্যাগ থেকে প্রায় অর্ধেক একটি হুইস্কির বোতল থেকে দ্রুত কয়েক ঢোক হুইস্কি গলায় ঢেলে নিল। রায়ান ভাবলো, লোকটি হয়তো একটু নেশা-খোর হতে পারে। তাই সে দ্রুত কেটে পড়ার

উদ্যোগ নিচ্ছিল। কিন্তু জ্যাকি নাছোরবান্দা তার পাশে বসার জন্য পুনরায় অনুরোধ জানালো। শেষ পর্যন্ত রায়ানকে গিটার বাদকের পাশে বসতেই হলো।

জ্যাকি কি যেন ভাবছিল, তারপর বললো, "বাদ দাও, এটা কোন ব্যাপার না, আমি আশা করি তুমি একজন সাংবাদিক। তুমি যা দেখেছো, দয়া করে তোমার লেখায় তা লিখো না।"

কথাগুলো বলে জ্যাকি প্রাণ খুলে হাসতে থাকে। রায়ানের ধারণা হচ্ছে, জ্যাকির জীবনে হয়তো কোন অব্যক্ত যন্ত্রণা কিংবা কোন চাপা আর্তনাদ লুকিয়ে আছে যা সে প্রকাশ করতে পারছে না। তাই প্রাণ খুলে হেসে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে।

হাসিটা থামিয়ে বললো, "ভাই তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে এবং তোমার চেহারাটি খুব পরিচিত মনে হচ্ছে, মনে হয় তোমাকে কোথাও দেখেছি।"

"হতে পারে এই স্টেশনেই দেখেছো। মাঝে মাঝে বাড়ি ফেরার আগে ঐ বেঞ্চটিতে বসে একটু বিশ্রাম নিই।"

"তা হবে হয়তো, এজন্য তোমাকে কাছে ডেকেছি। তুমি কি কিছু মনে করেছো?"

"তা হবে কেন? মোটেই না।"

জ্যাকি তার গিটার হাতে নিয়ে বাজাতে থাকে এবং বলে, "আমি তোমার জন্য এক অপূর্ব সুর সৃষ্টি করবো। দেখবে তোমার মনে যদি কোন দুঃখ থাকে সব কিছু ভুলে যাবে এবং নিমিষের মধ্যে আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠবে তোমার মন প্রাণ।"

"বেশ তো তাহলে শুরু করে দাও, আর দেরি নয়।"

জ্যাকি তার মন প্রাণ দিয়ে এক অপূর্ব সুর সৃষ্টি করে। মিউজিক শেষে রায়ান করতালি দিয়ে বলে উঠে, "সত্যিই এটা দারুন ছিল। ধন্যবাদ তোমাকে।"

জ্যাকি রায়ানকে খুশি করতে পেরেছে তাই এক তৃপ্ত আনন্দে ওর অধরে এক অপূর্ব হাসির রেখা ফুটে উঠলো। সেদিন মিউজিক শোনার পর রায়ান পুনরায় জ্যাকিকে ধন্যবাদ দিয়ে সাবওয়ে ট্রেন ধরে বাড়ি ফিরে যায়। জ্যাকি আবারও সুর তোলে তার গিটারে এবং ট্রেনে উঠার আগ পর্যন্ত রায়ান সে সুর শুনতে পায়।

প্রায় দু'সপ্তাহ পরের ঘটনা রায়ান কর্ম শেষে বাড়ি ফিরছিলো। ইউনিয়ন স্টেশনের সেই বেঞ্চটিতে জ্যাকি গিটার হাতে চুপ চাপ বসে আছে। হয়তো গিটারের Tuning কাজে ব্যস্ত। ওকে দেখে রায়ান এগিয়ে যায়। কিন্তু আজ ওর চেহারাটি অমন মলিন দেখাচ্ছে কেন? রায়ান বুঝতে পারছে না। বিমর্ষ ও বিষণ্নতায় আচ্ছন্ন।

ওর পাশে দাঁড়িয়ে রায়ান জিজ্ঞাসা করে,

-"কেমন আছো ভাই? আমাকে চিনতে পেরেছো?"

-"ওহ! রায়ান, আমি ঠিক আছি, ধন্যবাদ। তোমার খবর কি?"

-"ধন্যবাদ, আমিও ঠিক আছি, সকালের শিফট শেষ করে বাড়ি ফিরছি।"

জ্যাকি কিছু না বলে চুপ-চাপ বসে রইলো।

রায়ান জিজ্ঞাসা করে,

-"কি হয়েছে ভাই? তোমাকে খুব মন খারাপ দেখাচ্ছে, যদি তুমি আমাকে তোমার বন্ধুদের একজন মনে করো, তাহলে দ্বিধা ছাড়াই তুমি আমাকে ঘটনাটা বলতে পারো।"

জ্যাকি উত্তর দিলো,

-"আমি খুব একা বোধ করছি, আমি এখন একা।"

রায়ান জিজ্ঞাসা করে, "তোমার ছেলে-মেয়ে কেউ নেই?"

জ্যাকি বললো, "এক সময় ওরা আমার সাথেই ছিল। এখন ওরা বড় হয়েছে, তাই আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। Toronto University থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে তারা তাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত। এখন নিজেদের পছন্দের Boy-friend, Girl-friend নিয়ে অন্যত্র থাকে। ওরা আজকাল খুব ব্যস্ত, কেউ আমার খোঁজ-খবর রাখে না। কিন্তু তাতে আমার কোন দুঃখ নেই। তবে ওদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পেরেছি এটাই আমার গর্বের বিষয়। যদিও আমাকে এর পিছনে অনেক আত্মহুতি দিতে হয়েছে, তবুও আমি সুখী যে ওদেরকে ঠিকমত মানুষ করে গড়ে তোলেছি এবং এটাই আমার সন্তুষ্টি। ওদের সাধ-আহ্লাদ আমি কখনো অপূরণীয় রাখিনি। শুরু থেকেই Government Job করেছি। এখন আমি Retired. আমার যথেষ্ট আছে। শুধু দুঃখ এটাই আমি নিঃসঙ্গ।

জ্যাকির কথাগুলো রায়ান মনযোগ দিয়ে শুনছিল।

"ছেলে-মেয়েরা বড় হলে কেউ অভিভাবকদের সাথে থাকে না। এটাই স্বাভাবিক। তুমি যদি কিছু মনে না কর, তাহলে কি একটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে পারি?" রায়ান জিজ্ঞাসা করে। জ্যাকি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

"তোমার স্ত্রী কি এখন তোমার সাথে থাকে না?"

জ্যাকি প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যেতে চাচ্ছে, থাক না সে কথা, এখন তোমার কথা বল। প্রায় দু'সপ্তাহ আগে ঠিক এখানেই তোমার সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল। তাই না?

"তা বটে। কিন্তু মনে কর আমি তোমার একজন ভাল বন্ধু। তুমি সবকিছু আমাকে খুলে বলতে পার। যদিও তোমার সাথে আমার অল্প সময়ের পরিচয়, কিন্তু তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো।" রায়ান বললো।

জ্যাকি কিছুক্ষণ কোন কথা বললো না। গভীর ধ্যানে কি যেন ভাবতে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে বলতে লাগলো, "আমার স্ত্রী আমাকে মিছে ভুল বুঝে রাগে ও অভিমানে আমার কাছ থেকে দূরে চলে গেছে। তবে আমি মনে করি এতে সেও সুখী নয়। একদিন তার ভুল বুঝতে পেরে ফিরে আসবে। আমি শুধু ঐ দিনের প্রতীক্ষায় রয়েছি এবং এটাই আমার বিশ্বাস"।

"নিশ্চয়ই! সেও তোমাকে অনেক ভালবাসে। সবকিছুই একদিন ঠিক হয়ে যাবে। তুমি অত ভেবো না। আচ্ছা সে এখন কোথায় আছে?"

"এ শহর থেকে একটু দূরে, সেন্ট ক্যাথ রিন, তার এক ঘনিষ্ট বান্ধবীর বাড়িতে। কয়েক বছর হলো সেই বান্ধবীর স্বামী দেহান্ত হয়েছে। আমার ধারণা ওর ঐ প্রিয় বান্ধবীই সকল অনিষ্টের মূলে। প্রায়ই লক্ষ্য করতাম সেই বান্ধবীর সাথে দীর্ঘ সময় ব্যাপী ফোনালাপ হতো। আমি ওকেই সন্দেহ করছি, হয়তো সে ওকে উস্কানিমূলক কথা বলেছে, যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে আমাদের মাঝে দূরত্ব"। জ্যাকি কথাগুলো বলে এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো।

"তুমি অমন করে ভাবছো কেন? তা তো সঠিক নাও হতে পারে। তবে তুমি কি এর মাঝে তার সাথে কখনো দেখা করেছ?"

"বিগত দু'বছর যাবত আমিই যাচ্ছি ওর সাথে দেখা করতে। বিশেষ করে বড়দিনের সময় এলে ওর জন্য ক্রিসমাস গিফট্ নিয়ে যেতাম। তবে ভাবছি এ বছর যাব না"।

"না! এ ভুলটি করো না! তুমি এবারো নিশ্চয়ই যাবে। কেননা ঐ বিশেষ সময়টিতে তোমার সাথে দেখা করা একান্ত প্রয়োজন"।

" মনে রাখবে, ভালোবাসা একটি অসাধারণ শক্তি, ভালোবাসা এবং ক্ষমা দ্বারা সমগ্র বিশ্ব জয় করা সম্ভব।" জ্যাকির মুখটি যেন এক অবর্ণনীয় আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবং বললো, "তুমি যখন বলছো তখন নিশ্চয়ই যাবো। দেখি এবার কি হয়?"

রায়ান হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে প্রায় সন্ধ্যা সাতটা বেজে গেছে, তাই জ্যাকির কাছ থেকে বিদায় নেবার প্রাক্কালে হ্যান্ডসেকের জন্য হাতটি বাড়িয়ে দিয়ে বলে, "ব্রাদার তোমার সাথে কিছুক্ষণ সময় দ্রুত কেটে গেল। অনেক মজার আলাপ হলো, তোমার দুঃখের কাহিনীও শোনা হলো, মনে বিশ্বাস ও আনন্দ রেখো, দেখবে সবকিছুই স্বাভাবিক হয়ে যাবে।"

জ্যাকি জিজ্ঞাসা করে, "তুমি কোন দিকে যাচ্ছো?"

"আমি Go Train নেবো এবং Danforth পর্যন্ত যাবো।"

"তা হলে চল একসাথে যাই। আমিও ওদিকে থাকি। Scarborough Go Station সংলগ্ন আমার বাড়ি। বেড়াতে এসো।"

জ্যাকি পকেট থেকে ঠিকানা ও ফোন নম্বর সমেত একটি কার্ড বের করে রায়ানকে দিয়ে বলে, "ব্রাদার আমি আশা করি তুমি আসবে। আমরা বেশ মজা করবো। তোমার সাথে বেশ চুটিয়ে গল্প করা যাবে।"

"অবশ্যই, ধন্যবাদ আমাকে তোমার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য।"

ওরা দু'জন Go Transit এর দিকে হাঁটতে থাকে। Danforth পৌঁছলে রায়ান জ্যাকির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ট্রেন থেকে নেমে যায়।

দু'মাস পরের ঘটনা। ইতিমধ্যে বড়দিন অতিবাহিত হয়েছে। রায়ান কর্ম শেষে বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে ইউনিয়ন স্টেশনে পৌঁছে Go Transit এর দিকে হাঁটছিল। হঠাৎ সে শুনতে পায় গিটারের সুর ও ছন্দে স্থানটি যেন মুখরিত হয়ে উঠেছে। মিউজিকটি তার অতি পরিচিত মনে হচ্ছিল। রায়ান ভাবলো ওটা নিশ্চয়ই জ্যাকির মিউজিক হবে। বেশ জমিয়েছে এবং অনেক লোকজনের গ্যাদারিং হয়ে গেছে। কৌতূহলবশত সে এগিয়ে যায় এবং ভীড় ঠেলে জ্যাকির সামনে এসে দাঁড়ায়। রায়ানকে দেখে জ্যাকি আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে এবং চিৎকার করে বলে উঠল, "ভাই, আমি সবকিছু ফিরে পেয়েছি। এই বড়দিনে আমরা অনেক আনন্দ এবং আনন্দের সাথে একসাথে উদ্‌যাপন করছি, আমার স্ত্রী বাড়ি ফিরে এসেছে। আমাদের মেয়ে এবং ছেলেও অনেক দিন পর আমাদের সাথে যোগ দিয়েছে। ধন্যবাদ ভাই, সবকিছু ঠিকঠাক হয়েছে। এই সবকিছুর পিছনে রয়েছে তোমার পরামর্শ।"

ত্রাণকর্তা শিশু যিশু

নোয়েল গমেজ

শিশুটিকে উপহার দেওয়ার জন্য,
তিন পণ্ডিতের আগমন
এবং অসংখ্য দেবদূত।
সেই সঙ্গে হাজার হাজার স্বর্গদূত,
সবার মাঝে ঐক্যতানে গেয়ে চলেছে,
শান্তির গান।
শ্রী যিশুর জন্মদিন,
সকলের বড়দিন।
স্বর্গদূতের সুমিষ্ট গান,
পাখিদের কলকাকলি,
ভ্রমরের ও মৌমাছির গুনজন।
স্থানটিকে অপূর্ব
স্বর্গীয় মহিমায় মণ্ডিত,
করে তুলেছিল।
কনকনে শীতে এক গোশালয়,
পশুদের সেই মাঝখানে,
জন্মগ্রহণ করেন,
আমাদের প্রিয় ত্রাণকর্তা শিশু যিশু ॥

সুতোয় বাঁধা ঘুড়ি

রাখি রিটা রোজারিও

চোখে চশমাটা দিতে দিতে আমি ভাবলাম- সন্ধ্যার প্রার্থনা সেরে নেই। রাতের রান্না রয়েছে, আবার লেসন প্ল্যান গুলো করতে হবে। ওটা আগামীকাল কলেজে জমা দিতে হবে। সুতরাং দু'টো মেয়েকে প্রার্থনার জন্য ডাকতেই, ওরা বলল- আসছি মা।

আগামীকাল দু'জনেরই পরীক্ষা, তাই ওরা বলল- প্রার্থনা ছোট করে করতে। 'ওমা সে কি কথা - রোজ তো মধ্যরাত পর্যন্ত মোবাইল টেপো, তখন সময় নষ্ট হয় না বুঝি? শুধু প্রার্থনা করতে বললেই..... যত্তসব'। আমার জীবনের সব আশা ভরসাগুলো একটা ক্ষীণ কুপিবাতির মত হয়ে গেল। দু'হাত উপরে তুলে, দু'চোখে নোনা জল ভরিয়ে, শুধু স্রষ্টার প্রতি অটুট থেকেই এই প্রার্থনাতে বেঁচে রয়েছি। মাঝে মাঝে এই অকূল পাথারে জীবন নৌকাটা চালাতে ভীষণ ভড়কে উঠি। পারবো তো - কুলের নাগাল পেতে!

বাজারে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, নিত্য নৈমিত্তিক কিছু টাকা খরচের উদার দরজা, ঘর ভাড়া, লোনের চাপ সবমিলিয়ে একেবারে নাভিশ্বাস হওয়ার উপক্রম। এরকম সময় একটা অদৃশ্য সুতো যেন আমাকে প্রতিনিয়ত টেনে রাখে, সাহস দেয় সেটা হল প্রার্থনা। ওটা বোধ করি ঠিকমত কড়া বিপদে না পড়লে মানুষ নামক জীবটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না।

খুব সকালে না উঠলে সময় নামক ঘড়িটার সাথে টাল সামলাতে বেশ বেগ পেতে হয়। রাতেও আবার ১টা বা ১:৩০ এর আগে বিছানায় শুতে যেতে পারি না। অগত্যা ডাইরীতে দিনের কাজগুলো লিখে একটা ফর্দ করার চেষ্টা করছি। এদিকে মাসের শেষ, তারপর হাত টান তখনই ঘরের আইপিএস এর ব্যাটারি নষ্ট হয়ে গেল। অগত্যা ব্যাটারি বাবদ অনেকগুলো টাকা তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল। টাকাগুলো রাখা হয়েছিল ঘরের চাল আনার জন্য। তাই বুদ্ধি করে চালের পরিমাণ কমিয়ে আনলাম। বুঝলাম, জীবনে হিসেব করে চললেও অতর্কিত কিছু সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। আমরা না চাইলেও জীবন আমাদের তা দেয়।

কলেজের টিচার্স রুমে টিফিন টাইমে একদিন বসেছিলাম। একজন কলিগ দৌড়ে এসে জানালো- "জানেন, ফার্মগেট মেট্রোরেলের ৫০ কেজি বেয়ারিং প্যাড মাথায় পড়ে একজন লোক মারা গেছে।" মনের ভিতর বলে উঠল - "আহারে, লোকটা বাসা থেকে বেরিয়ে ছিল কাজের উদ্দেশে। অথচ আজ তার কি পরিণতি!" পরে অবশ্য পুরো খবরটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ভদ্রলোক জীবন দশায় যথেষ্ট ভালো, কর্মঠ ও সংসারী ছিলেন। দু'টো ছোট ছোট অবুঝ শিশু, স্ত্রী সবাইকে এভাবে রেখে চলে যাওয়া। আমার কাছে তখন মনে হল- স্রষ্টার এ কেমন বিচার?

দিন কতক পরের ঘটনা। একজন দৃষ্টিহীন ছাত্রীর অপরিমেয় সাফল্যের খবর। মানবিক বিভাগ থেকে GPA-5 পেয়ে এ বছর এইচএসসিতে পাস করেছে। ওর বাবা-মা আর ওর ওই দৃষ্টিহীন চোখে আজ ভগবানের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতার বারিধারা। কিছু না থাকলেও অনেক কিছু পাওয়া যায়। নিজেই মনে মনে ভাবতে লাগলাম - এ তোমার কেমন লীলা? মস্তিষ্কের নিউরনগুলোতে মজবুত গাঁথুনির ঠোকর আর চোখের অপটিক নার্ভগুলোতে অন্ধকারের পাহাড়। বোধকরি, এটাই স্রষ্টার সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা।

আমার পরিচিত অনেকেই আজ বার্ধক্যের জালে জর্জরিত। অগণিত রোগ, ক্যান্সার নামক ব্যাধির ভয়াবহতায় আক্রান্ত। কেউ কেউ এই রোগের চিকিৎসা করাতে গিয়ে আজ নিঃস্ব। এমন অনেকেই আছে যারা বিছানায় শয্যাশায়ী অনেক বছর ধরে, শরীরের পিছনে দগদগে ঘা, পুঁজ, দুর্গন্ধ নিয়ে বেঁচে আছে। যে মানুষগুলো প্রতিটা ক্ষণ বেঁচে থাকার চেয়ে মরার জন্য প্রার্থনা করে বেশি। কারণ এই মানুষগুলো জানে- তাকে সেবা করতে গিয়ে অন্য মানুষগুলো আজ ক্লান্ত- আজ তারা নিঃস্ব। কেউ কেউ তো লাইফ সাপোর্টে থাকে দীর্ঘদিন, পরিচিতদের মধ্যে আশার আলো কখনো জ্বলে ওঠে, কখনো দপ করে নিভে যায়।

আমার এ জীবনে এত অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনাগুলো কয়েকদিন ধরে ঘটছে, তা নিজের কাছে বড্ড অসহায় করে তুলছে। দুপুরে বাসার দরজার কাছে এক বৃদ্ধ মাসি কেঁদে কেঁদে টাকা তুলছে তার ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত মেয়ের জন্য। দয়া পরশ হয়ে কিছু টাকা দিলাম। পরে শুনলাম উনি প্রায়ই বিভিন্ন কারণ নিয়ে এভাবে টাকা তোলেন। কেউ কেউ বিরক্ত হলো, এই হেন কাণ্ডে। আমি ভাবলাম- বয়স্ক মানুষ, টাকার প্রয়োজন তারও আছে। এমনি হাত পাতলে টাকা বা ভিক্ষা পাবে না। অগত্যা এই উপায়ে .....।

এদিকে আমার বিল্ডিংয়ের দু'পাশে অনেক বিল্ডিং। ডানে, বামে, সামনে। একদিন ঘ্রাণেন্দ্রিয় মহাশয় বেশ জেগে উঠলেন। বোধ করি, পাশের বিল্ডিংয়ে কারো জন্মদিনের উৎসব চলছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অনেক মেহমানের আনাগোনা। এরপর খাওয়া-দাওয়া তারপর মিউজিক, চিৎকার রাতভর.....। বড় বিচিত্র্য এই পরিমণ্ডল। সন্ধ্যা থেকে রাতভর হৈ-হল্লা, চিৎকার চেঁচামেচি, মিষ্টি পানীয় (সভ্য জগতের এই আর কি?)। তখন মনে হল, এরা ভেবেছিলেন এই পৃথিবীর একমাত্র তারাই জীব, অন্যরা অজীব।

আমারই জীবনে এত ঘটনা দেখেছি, এত ঘটনা অনুভব করেছি, তাই মাঝে মাঝে খেই হারিয়ে ফেললাম। যাকে আজ দেখলাম সুস্থ, পরের দিন সে নেই। যিনি আছেন - শরীর স্বাস্থ্য ভালো নন, তাই আজও আছেন। ভগবানের লীলা বোঝা বড় ভার। তাইতো রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "শুধু দাঁড়িয়ে জলের দিকে তাকিয়ে থাকলে সমুদ্র পাড়ি দেয়া যায় না।"

তাই তাকিয়ে প্রার্থনা হয় না। প্রার্থনা হতে হয় ভিতর থেকে আর তাতে থাকতে হয় চেষ্টা, পরিশ্রম, আর বিশ্বাস। আমাদের জীবনে আগামীকাল যাই ঘটুক না কেন- তা মানিয়ে নেয়া, মেনে নিয়ে পথ চলায় উত্তম। নইলে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা-ভীষণ বোকামির। তাই হয়তো আমার বাসায় দুপুরে আসা বৃদ্ধ মহিলাটি সম্মানসূচক পন্থাই বেছে নিয়েছেন। কারণ ভিক্ষে চাইলে আমি হয়তো ১০০ টাকা দিতাম না বরং 'মাফ কর' এই বলে দরজা লাগিয়ে দিতাম।

এখানে সবাই ব্যস্ত; নিজের জীবন নিয়ে। কেউ আপনার কষ্ট নিয়ে এতটা ভাবেনা যতটা আপনি ভাবেন। তাই আগামীতে যেই সত্যের মুখোমুখি আমি হচ্ছি, তা কঠিন হতে পারে; রূঢ় হতে পারে। তাতেই কি? আমি সেই কঠিনেরে ভালোবাসিলাম। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় প্রার্থনাকে বেছে নিলাম। বিপদ থেকে রক্ষা করো, সেটার চেয়ে বরং বিপদকে মোকাবিলা করার শক্তি চাইছি। আমার ঘুড়ি যেখানেই থাকুক, সেটা যেন স্রষ্টার সুতোয় বাঁধা থাকে আজীবন।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

স্বাস্থ্য কথা

শীতের আমেজ ও স্বাস্থ্যঝুঁকি

গ্রন্থনায়: জেভিয়ার রোজারিও

কুয়াশাঘেরা ভোর, খেজুরের রস আর পিঠা-পুলির উৎসব নিয়ে আমাদের দেশে শীত আসে। এটি নিঃসন্দেহে বছরের অন্যতম আরামদায়ক ঋতু। তবে ঋতু পরিবর্তনের এই সন্ধিক্ষণে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় শরীর খারাপ হওয়াটাও বেশ স্বাভাবিক ঘটনা। তাপমাত্রার পতন এবং বাতাসে আর্দ্রতা কমে যাওয়ার ফলে জীবাণুর সক্রিয়তা বেড়ে যায়। বিশেষ করে পরিবারের শিশু ও বয়স্ক সদস্যদের জন্য এই সময়টা কিছুটা বাড়তি সতর্কতার দাবি রাখে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শীতকালে সচরাচর যেসব রোগবালাই 'বিনা দাওয়াতে' ঘরে হানা দেয়, চলুন সেগুলো সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।

সর্দি-কাশি ও সিজনাল ফ্লু: শীতের সবচাইতে পরিচিত ও সাধারণ সমস্যা হলো সর্দি-কাশি। মূলত ভাইরাসজনিত কারণে এটি হয়ে থাকে, যাকে আমরা 'সিজনাল ফ্লু' বলে থাকি। আবহাওয়ার সামান্য পরিবর্তনে অনেকেরই নাক দিয়ে পানি পড়ে, হাঁচি-কাশি, শরীর ব্যথা এবং হালকা জ্বর দেখা দেয়। এটি সাধারণত এক সপ্তাহেই সেরে যায়, তবে অবহেলা করলে ভোগান্তি বাড়তে পারে।

শ্বাসকষ্ট বা হাঁপানির প্রকোপ: শীতকালে বাতাসে ধুলোবালি ও ধোঁয়ার পরিমাণ বেড়ে যায় এবং বাতাসের আর্দ্রতা কমে যায়। এই শুষ্ক ও ধূলিময় পরিবেশ অ্যাজমা বা হাঁপানি রোগীদের জন্য বেশ কষ্টদায়ক। এ সময় শ্বাসকষ্টের সমস্যা অনেক বেড়ে যায়। এছাড়া বয়স্কদের মধ্যে 'ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ' (COPD)-এর সমস্যাও এই সময়ে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

নিউমোনিয়ার ঝুঁকি: শীতের অন্যতম আতঙ্কের নাম নিউমোনিয়া। এটি ফুসফুসের একটি মারাত্মক সংক্রমণজনিত রোগ। অত্যাধিক ঠান্ডায় বিশেষ করে শিশু এবং বয়স্কদের মধ্যে নিউমোনিয়া হওয়ার প্রবণতা খুব বেশি দেখা যায়। অতিরিক্ত শ্বাসকষ্ট, উচ্চ জ্বর এবং শ্বাস নেওয়ার সময় বুকের খাঁচা দেবে যাওয়ার প্রধান লক্ষণ। সঠিক সময়ে চিকিৎসা না নিলে এটি প্রাণঘাতী হতে পারে।

টনসিলাইটিস বা গলা ব্যথা: হিমশীতল বাতাস বা অসাবধানতাবশতঃ ঠান্ডা পানি পানের কারণে গলায় প্রদাহ বা টনসিল ফুলে যাওয়ার সমস্যা দেখা দেয়। এতে ঢোক গিলতে প্রচণ্ড ব্যথা হয়, কথা বলতে কষ্ট হয় এবং অনেক সময় জ্বরও চলে আসে। শিশুদের মধ্যে এই সমস্যাটি বেশ প্রবল।

শিশুদের শীতকালীন ডায়রিয়া: অনেকের ধারণা ডায়রিয়া শুধু গরমে হয়, কিন্তু শীতেও শিশুদের ডায়রিয়া হতে পারে। একে বলা হয় 'উইনটার ডায়রিয়া', যা মূলত রোটাভাইরাসের (Rotavirus) কারণে হয়। দূষিত পানি, খাবার এবং অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ থেকে এই ভাইরাস ছড়ায়। তাই শীতেও শিশুদের খাবার ও পানির ব্যাপারে সতর্ক থাকা জরুরি।

বাত বা জয়েন্টে ব্যথা: যাদের আগে থেকেই বাতের সমস্যা বা আর্থ্রাইটিস আছে, শীতকাল তাদের জন্য বেশ কষ্টের। ঠান্ডা আবহাওয়ায় শরীরের রক্ত সঞ্চালন কিছুটা ধীর হয়ে যায়, ফলে হাড়ের জয়েন্টে ব্যথা তীব্র হয়। বয়স্করা এই সমস্যায় বেশি ভুগে থাকেন।

সাইনাসাইটিসের হানা: যাদের সাইনাসের সমস্যা আছে, কুয়াশা ও ঠান্ডার কারণে তাদের মাথাব্যথা ও কপালে যন্ত্রণা বাড়তে পারে। নাক বন্ধ হয়ে থাকা এবং দীর্ঘস্থায়ী মাথাব্যথা এ সময় রোগীদের কাবু করে ফেলে।

ত্বকের রুক্ষতা ও চর্মরোগ: শীতের শুষ্ক বাতাস আমাদের ত্বক থেকে আর্দ্রতা শুষে নেয়। ফলে ত্বক ফেটে যাওয়া, ঠোঁট ফাটা, পায়ের গোড়ালি ফাটা এবং ত্বক খসখসে হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দেয়। এছাড়া অনেকের একজিমা, খোসপাঁচড়া বা চর্মরোগ এই সময়ে বেড়ে যায়। পাশাপাশি মাথায় খুশকির উপদ্রবও এ সময় লক্ষ করা যায়।

শীতকালে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি যে স্বাস্থ্য সমস্যাটি ঘরে ঘরে দেখা যায়, তা হলো "সর্দি-কাশি ও সিজনাল ফ্লু"। আবহাওয়া পরিবর্তনের এই সময়ে ছোট শিশু থেকে শুরু করে বয়স্ক–কেউই এর আক্রমণ থেকে রেহাই পান না। যদিও এটি খুব সাধারণ একটি রোগ, তবুও অবহেলা করলে এটি ভোগান্তির বড় কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। শীতের আগমনে প্রকৃতির রূপ বদলানোর পাশাপাশি আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাতেও পরিবর্তন আসে। এসময় তাপমাত্রা কমে যাওয়া এবং বাতাসে আর্দ্রতার অভাবে ভাইরাসের প্রকোপ বেড়ে যায়, যা আমাদের শ্বাসনালিকে আক্রমণ করে।

আসুন আমরা জেনে নেই "সর্দি-কাশি ও সিজনাল ফ্লু" রোগের কারণ, লক্ষণ, প্রতিকার ও করণীয় সম্পর্কে।

"সর্দি-কাশি ও সিজনাল ফ্লু"

কারণসমূহ:

কেন হয় এই রোগ? সর্দি-কাশি বা ফ্লু মূলত ভাইরাসজনিত সংক্রমণ। রাইনোভাইরাস (Rhinovirus) এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের আক্রমণে এটি হয়ে থাকে। তবে শীতে এই রোগ ছড়িয়ে পড়ার প্রধান কারণগুলো হলো:

ভাইরাসের সক্রিয়তা - শুষ্ক ও ঠান্ডা আবহাওয়ায় ফ্লু ভাইরাস দীর্ঘসময় বাতাসে ভেসে বেড়াতে পারে এবং দ্রুত বংশবিস্তার করে।

প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস - শীতে আমাদের নাকের ভেতরের মিউকাস মেমব্রেন শুকিয়ে যায়। ফলে ভাইরাস সহজেই শরীরে প্রবেশ করতে পারে। এছাড়া ঠান্ডা আবহাওয়ায় শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে।

সংস্পর্শ - এটি অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ। আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি-কাশির ড্রপলেট বা ব্যবহৃত জিনিসপত্র (যেমন- গ্লাস, তোয়ালে) ব্যবহারের মাধ্যমে এটি সুস্থ মানুষের শরীরে ছড়িয়ে পড়ে।

লক্ষণসমূহ:

সাধারণ সর্দি-কাশি ও ফ্লুয়ের লক্ষণগুলো বেশ স্পষ্ট। ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ১-৩ দিনের মধ্যে সাধারণত লক্ষণ প্রকাশ পায়- যেমন:

- ✓ নাক দিয়ে অনবরত পানি পড়া বা নাক বন্ধ হয়ে থাকা।
- ✓ গলা খুসখুস করা এবং ব্যথা হওয়া।
- ✓ ঘন ঘন হাঁচি ও শুষ্ক কাশি।
- ✓ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের জ্বর।
- ✓ শরীর ম্যাজম্যাজ করা বা প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হওয়া।
- ✓ মাথা ব্যথা এবং দুর্বলতা।
- ✓ কখনও কখনও চোখের কোণ লাল হয়ে যাওয়া বা চোখ দিয়ে পানি পড়া।

ঘরোয়া প্রতিকার ও চিকিৎসা: সর্দি-কাশি সাধারণত কোনো ওষুধ ছাড়াই ৫-৭ দিনের মধ্যে সেরে যায়। তবে উপসর্গগুলো উপশম করতে এবং দ্রুত সুস্থ হতে কিছু ঘরোয়া পদ্ধতি বেশ কার্যকর, যেমন-

পর্যাপ্ত বিশ্রাম - ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়তে শরীরের শক্তির প্রয়োজন। তাই এ সময় পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও ঘুম অত্যন্ত জরুরি।

প্রচুর তরল পান - শরীরকে আর্দ্র রাখতে হবে। কুসুম গরম পানি, আদা চা, লেবু চা বা গরম স্যুপ পান করলে গলার আরাম হয় এবং কফ পাতলা হয়ে বেরিয়ে আসে।

লবণ-পানির গার্গল - গলা ব্যথা ও খুসখুসে ভাব কমাতে কুসুম গরম পানিতে এক চিমটি লবণ মিশিয়ে দিনে ৩-৪ বার গার্গল করা সবচেয়ে কার্যকর টোটকা।

ভাপ বা স্টিম নেওয়া - নাক বন্ধ থাকলে গরম পানির ভাপ নিলে শ্বাসনালি পরিষ্কার হয়। গরম পানিতে মেন্থল দিয়ে ভাপ নিলে আরও ভালো ফল পাওয়া যায়।

মধু ও তুলসী পাতা - হাজার বছর ধরে সর্দি-কাশির ওষুধ হিসেবে মধু ও তুলসী পাতার রস ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এটি কাশি কমাতে জাদুর মতো কাজ করে।

ওষুধ - জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল এবং সর্দির জন্য অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় ওষুধ সেবন করা যেতে পারে। তবে মনে রাখবেন, এটি ভাইরাসজনিত রোগ, তাই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কখনোই অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করবেন না।

প্রতিরোধে করণীয়:

প্রবাদ আছে, "প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ শ্রেয়।" সর্দি-কাশি থেকে দূরে থাকতে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি:

- বাইরে বের হলে মাস্ক ব্যবহার করুন।
- ঘন ঘন সাবান দিয়ে হাত ধোঁয়ার অভ্যাস করুন।
- ভিটামিন-সি যুক্ত খাবার (কমলা, আমলকী, পেয়ারা) বেশি করে খান।
- ঠান্ডা বাতাস থেকে বাঁচতে কান ও গলা ঢেকে গরম কাপড় পরিধান করুন।

পরিশেষে, সর্দি-কাশি সাধারণ রোগ হলেও শ্বাসকষ্ট বা উচ্চ মাত্রার জ্বর (১০২ ডিগ্রির বেশি) ৩ দিনের বেশি স্থায়ী হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। সুতরাং, শীতের এই রোগবালাই থেকে নিজেকে এবং আপনার পরিবারকে সুরক্ষিত রাখতে কিছু সাধারণ নিয়ম মেনে চলা অবশ্যই প্রয়োজন।

নীরব ঘাতক নিউমোনিয়া

শীতের আগমনের সাথে সাথে বাংলাদেশে যেসব রোগের প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে উদ্বেগজনক হারে বাড়ে, তার মধ্যে 'নিউমোনিয়া' অন্যতম। এটি ফুসফুসের একটি মারাত্মক সংক্রমণ, যা সঠিক সময়ে চিকিৎসা না করালে প্রাণঘাতী হতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, বাংলাদেশে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ এই নিউমোনিয়া। তবে শুধু শিশু নয়, বয়স্করাও এই রোগে সমান ঝুঁকিতে থাকেন। নিচে নিউমোনিয়া হওয়ার কারণ, লক্ষণ এবং এর প্রতিকার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার

কারণসমূহ: নিউমোনিয়া বিভিন্ন জীবাণুর আক্রমণে হতে পারে। এর প্রধান কারণগুলো হলো:

o ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস: নিউমোনিয়ার প্রধান কারণ হলো ব্যাকটেরিয়া (যেমন- Streptococcus pneumoniae)। এছাড়া ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস বা রেসপিরেটরি সিনসিশিয়াল ভাইরাস (RSV)-এর সংক্রমণের ফলেও নিউমোনিয়া হতে পারে।

o দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা: শীতকালে ঠান্ডা আবহাওয়ায় শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কিছুটা কমে যায়। শিশু ও বয়স্কদের ইমিউন সিস্টেম দুর্বল থাকায় তারা সহজেই আক্রান্ত হয়।

o পরিবেশগত কারণ: অতিরিক্ত ধুলোবালি, ধোঁয়া এবং দূষিত বাতাস ফুসফুসের ক্ষতি করে সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ায়।

o অন্যান্য অসুখ: সাধারণ সর্দি-কাশি বা হামের পরবর্তী জটিলতা হিসেবেও নিউমোনিয়া দেখা দিতে পারে।

লক্ষণসমূহ: নিউমোনিয়ার লক্ষণগুলো সাধারণ সর্দি-কাশির চেয়ে অনেক বেশি তীব্র হয়। প্রধান লক্ষণগুলো হলো:

- ***উচ্চ মাত্রার জ্বর:*** শরীর কাঁপিয়ে জ্বর আসা এবং প্রচুর ঘাম হওয়া।
- ***কাশি ও কফ:*** অনবরত খুসখুসে কাশি অথবা কাশির সাথে হলুদ, সবুজ রঙের কফ বের হওয়া।
- ***শ্বাসকষ্ট:*** শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বেড়ে যাওয়া।
- ***বুক ও পেটে ব্যথা:*** শ্বাস নেওয়ার সময় বা কাশ দিলে বুকে তীব্র ব্যথা অনুভূত হওয়া।
- ***শিশুদের ক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষণ:*** শিশুদের ক্ষেত্রে শ্বাস নেওয়ার সময় বুকের খাঁচা বা পাঁজর দেবে যাওয়া, খেতে না চাওয়া, নিস্তেজ হয়ে পড়া এবং ঠোঁট বা আঙুল নীল হয়ে যাওয়া।

চিকিৎসা ও করণীয়: নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দিলে কালক্ষেপণ না করে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

❖ **চিকিৎসকের পরামর্শ:** এটি ব্যাকটেরিয়াজনিত হলে চিকিৎসক অ্যান্টিবায়োটিক দেন। ভাইরাসজনিত হলে লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা দেওয়া হয়। পূর্ণ কোর্স ওষুধ সেবন করা জরুরি।

❖ ***বিশ্রাম ও তরল খাবার:*** রোগীকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে রাখতে হবে। প্রচুর পরিমাণে পানি, ফলের রস এবং গরম স্যুপ খাওয়াতে হবে যাতে কফ পাতলা হয়ে বেরিয়ে আসে।

❖ ***অক্সিজেন ও নেবুলাইজার:*** শ্বাসকষ্ট তীব্র হলে বা রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা কমে গেলে হাসপাতালে ভর্তি করে অক্সিজেন বা নেবুলাইজার দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

প্রতিরোধ ও সতর্কতা: নিউমোনিয়া প্রতিরোধে সচেতনতাই সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।

➢ **টিকাদান:** শিশুদের জন্য ইপিআই (EPI) শিডিউলের টিকা এবং নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন (PCV) সময়মতো নিশ্চিত করতে হবে। বয়স্করাও চিকিৎসকের পরামর্শে ইনফ্লুয়েঞ্জা ও নিউমোনিয়ার টিকা নিতে পারেন।

➢ **ঠান্ডা থেকে সুরক্ষা:** শীতকালে পর্যাপ্ত গরম কাপড় পরিধান করতে হবে। বিশেষ করে কান ও গলা ঢেকে রাখতে হবে।

➢ **স্বাস্থ্যবিধি:** বাইরে থেকে এসে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে। হাঁচি-কাশির সময় মুখ ঢেকে রাখতে হবে।

➢ **ধূমপান বর্জন:** পরোক্ষ ধূমপান (Passive Smoking) শিশুদের ফুসফুসকে দুর্বল করে দেয়, তাই শিশুদের সামনে ধূমপান করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

➢ **পুষ্টিকর খাবার:** রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে টাটকা শাকসবজি ও ভিটামিন-সি যুক্ত খাবার খেতে হবে। শিশুদের ক্ষেত্রে মায়ের বুকের দুধ নিউমোনিয়া প্রতিরোধে শক্তিশালী ভূমিকা রাখে।

শীতের এই সময়ে সামান্য সর্দি-কাশিকেও অবহেলা করা উচিত নয়। লক্ষণগুলো চিনতে পারলে এবং সময়মতো ব্যবস্থা নিলে নিউমোনিয়া থেকে সহজেই সুস্থ হওয়া সম্ভব।

টনসিলাইটিস বা গলা ব্যথা

শীতকালে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ ঢোক গিলতে গিয়ে গলায় তীব্র ব্যথা অনুভব করা–এই অভিজ্ঞতা আমাদের অনেকেরই আছে। শীতে যে কয়েকটি স্বাস্থ্য সমস্যা আমাদের দৈনন্দিন কাজে ব্যাঘাত ঘটায়, তার মধ্যে টনসিলাইটিস বা গলা ব্যথা অন্যতম। টনসিল আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার একটি অংশ হলেও, ঠান্ডায় এটি নিজেই আক্রান্ত হয়ে বিপত্তি ঘটায়। তাহলে প্রথমেই আমরা জেনে নেই টনসিলাইটিস কী?

আমাদের গলার ভেতরে জিভের গোড়ার দুই পাশে মাংসপিণ্ডের মতো দুটি গ্রন্থি থাকে, যাকে বলা হয় 'টনসিল'। এগুলো শরীরের প্রহরী হিসেবে কাজ করে এবং মুখ দিয়ে প্রবেশ করা জীবাণুকে প্রতিরোধ করে। কিন্তু যখন ভাইরাসে বা ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এই টনসিলে প্রদাহ বা ইনফেকশন হয়, তখন তাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় 'টনসিলাইটিস' বলা হয়।

কারণসমূহ:

✓**ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া:** টনসিলাইটিসের প্রধান কারণ হলো ভাইরাস (যেমন-

অ্যাডেনোভাইরাস, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস)। তবে ১৫-৩০% ক্ষেত্রে এটি ব্যাকটেরিয়ার (মূলত Streptococcus) সংক্রমণে হয়ে থাকে।

✓**ঠান্ডা বাতাস ও খাবার:** শীতে ঠান্ডা বাতাস সরাসরি গলায় লাগলে বা ফ্রিজের ঠান্ডা পানি ও আইসক্রিম খেলে টনসিলে প্রদাহ হতে পারে।

✓ **রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা:** শিশুদের এবং বয়স্কদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকায় তারা এতে দ্রুত আক্রান্ত হয়।

✓**হাইজেন বা পরিচ্ছন্নতা:** মুখ ও দাঁত নিয়মিত পরিষ্কার না রাখলে বা অন্যের ব্যবহৃত গ্লাস ও চামচ ব্যবহার করলে জীবাণু ছড়িয়ে টনসিলে সংক্রমণ ঘটাতে পারে।

লক্ষণসমূহ:

➢ **তীব্র গলা ব্যথা:** ঢোক গেলার সময় বা খাবার খাওয়ার সময় গলায় প্রচণ্ড ব্যথা হওয়া। মনে হয় গলায় কাঁটা বিঁধে আছে।

➢ **টনসিল ফুলে যাওয়া:** আয়নায় দেখলে গলার দুই পাশের টনসিল লাল হয়ে ফুলে থাকতে দেখা যায়। অনেক সময় এর ওপর সাদা বা হলুদ আস্তরণ পড়ে।

➢ **জ্বর ও কাঁপুনি:** সংক্রমণের ফলে শরীরে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসতে পারে (১০১-১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত)।

➢ **গ্ল্যান্ড ফুলে যাওয়া:** গলার বাইরের দিকে চোয়ালের নিচে লিম্ফ নোড বা গ্ল্যান্ড ফুলে যেতে পারে এবং ব্যথা হতে পারে।

➢ **অন্যান্য:** কানে ব্যথা, মাথা ব্যথা, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ এবং গলার স্বর পরিবর্তন বা বসে যাওয়া।

ঘরোয়া প্রতিকার ও চিকিৎসা:

❖ **লবণ-পানির গার্গল:** এটি টনসিলাইটিসের সবচেয়ে পরীক্ষিত ও কার্যকর ওষুধ। এক গ্লাস কুসুম গরম পানিতে আধা চা-চামচ লবণ মিশিয়ে দিনে ৩-৪ বার গার্গল করলে গলার প্রদাহ কমে এবং জীবাণু দূর হয়।

❖ **আদা ও মধু চা:** আদা ও মধুর অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গুণ রয়েছে। আদা কুচি দিয়ে ফোটানো পানিতে লেবুর রস ও মধু মিশিয়ে পান করলে গলায় আরাম পাওয়া যায়।

❖ **গরম ভাপ:** গরম পানির ভাপ নিলে গলার শুষ্কভাব কমে এবং ব্যথা উপশম হয়।

❖ **খাবার গ্রহণে সতর্কতা:** শক্ত বা ভাজা-পোড়া খাবার এড়িয়ে চলতে হবে। নরম খাবার, স্যুপ বা জাউ ভাত খেতে হবে যা গিলতে সহজ। প্রচুর পরিমাণে পানি পান করতে হবে যাতে গলা শুকিয়ে না যায়।

❖ **ওষুধ ও চিকিৎসা:** ব্যথা ও জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল খাওয়া যেতে পারে। তবে যদি এটি ব্যাকটেরিয়াজনিত হয় (চিকিৎসক পরীক্ষা করে বুঝবেন), তবে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন হতে পারে। মনে রাখবেন, চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করবেন না।

প্রতিরোধে করণীয়:

❖ শীতে কান ও গলা মাফলার দিয়ে ঢেকে রাখুন।

❖ ফ্রিজের ঠান্ডা পানি বা খাবার পুরোপুরি বর্জন করুন।

❖ বাইরে থেকে এসে হাত-মুখ ভালো করে সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

❖ কারো সর্দি-কাশি হলে তার থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।

টনসিলাইটিস সাধারণ সমস্যা মনে হলেও, যদি বছরে ৫-৭ বারের বেশি হয় অথবা শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, তবে নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে প্রয়োজনে টনসিল অপারেশনের কথা ভাবতে হতে পারে। শীতে একটু সচেতন থাকলেই গলার এই অস্বস্তি থেকে দূরে থাকা সম্ভব।

তথ্যসূত্র: *ইন্টারনেট,*
WHO, CDC, NHS, UK,
icddr.b, DGHS, NIDCH

'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'-র সকল পাঠক/পাঠিকাবৃন্দকে শুভ বড়দিন উপলক্ষে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট বিশ্বাস করে

মানুষের সার্বিক উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নারী পুরুষের সমতাভিত্তিক ক্ষমতায়ন একটি সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থার পূর্বশর্ত।

আমরা সম্পূর্ণ আবাসিক ও সর্বাধুনিক ভেন্যুতে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করে থাকি। আমাদের সঙ্গে আছেন দেশি-বিদেশি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একদল অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক, যারা সার্বক্ষণিক কারিতাস ও সমমনা প্রতিষ্ঠান সমূহের সক্ষমতা অর্জনে দীর্ঘ সময় ধরে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে আসছে। আমাদের মেধাবী গবেষকদল অব্যাহতভাবে দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের বেইজ লাইন সার্ভে, প্রকল্প মূল্যায়ন, প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি, এ্যাকশন রিসার্চ, ইমপ্যাক্ট স্টাডিসহ যে কোনো সামাজিক গবেষণাসমূহ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করে আস্থা অর্জন করেছে।

পরিচালক ও কর্মীবৃন্দ
কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট
২ আউটার সার্কুলার রোড, শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭
ফোন: ০২২২২২২৯৬২৫, ইমেইল- cdi@caritascdi.org
www.caritascdi.org

কলাম

কালের সাক্ষ্য : পর্ব ৩৫

ফাদার দিলীপ এস. কস্তা

প্রেরিতগণের শ্রদ্ধামন্ত্র ও প্রসঙ্গ কথা

০১. প্রেক্ষাপট: ধর্মের ভিত্তি গড়ে উঠে বিশ্বাসের কতগুলো মূল সত্যের উপর। বিশ্বের প্রধান প্রধান প্রতিটি ধর্মের মূল সত্যগুলোর লিখিত রূপ রয়েছে। খ্রিস্টবিশ্বাসের অন্যতম ভিত্তি হলো প্রেরিতগণের শ্রদ্ধামন্ত্র প্রার্থনাটি। প্রেরিতগণের শ্রদ্ধামন্ত্র প্রার্থনাটি (Apostles Creed) বিশ্বাসের মন্ত্র হিসেবে পরিচিত। ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে নিসিয়া মহাসভা প্রার্থনাটি গ্রন্থনা করা হয় বলে নিসিয়া বিশ্বাস মন্ত্র বা শ্রদ্ধামন্ত্র (Nicene Creed) নামে পরিচিত। নিসিয়া মহাসভার প্রধান ব্যক্তি সাধু আথানাসিউস (জন্ম আলেকজান্দ্রিয়া, মৃত্যু: ৩৭৩) এটি গ্রন্থনা করেন বলে এটিকে আথানাসিয়াস বিশ্বাসমন্ত্র (Athanasian Creed) বলা হয়। নিসিয়া বিশ্বাসমন্ত্রটির উৎস হলো নিসিয়া মহাধর্মসভা ২২৫ ও কনস্টানোপলে মহাধর্মসভা ৩৮১। ল্যাটিন শব্দ ক্রেদো Credo থেকে Creed শব্দটির উৎপত্তি। ক্রেদো শব্দের অর্থ হলো 'আমি বিশ্বাস করি।' প্রেরিত শিষ্যগণের বিশ্বাসের ভিত্তিতে ক্রেদো বা বিশ্বাসমন্ত্র বা শ্রদ্ধামন্ত্র রচনা করা হয়। আরিয়ুসের ভ্রান্ত মত থেকে সঠিক শিক্ষা প্রদানের জন্য ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম নিসিয়া মহাসভা প্রেরিতগণের শ্রদ্ধামন্ত্র প্রার্থনাটি সঠিক ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং এই প্রার্থনা পূর্ণতা লাভ করে ১ম কন্সস্টানিপোলো মহাসভায় পবিত্র আত্মার ব্যাখ্যা দানের মাধ্যমে। এই বছর (২০২৫) নিসিয় বিশ্বাসমন্ত্রের ১৭শ তম পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে রোমসহ বিশ্বের বিভিন্ন সেমিনারী ও গঠনগৃহে সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে, অর্থাৎ বিশ্বাসের মূল সত্যগুলো নিয়ে অভিজ্ঞতা ও মূল্যায়ন করা হচ্ছে।

২. নিসিয়া ধর্ম মহাসভা প্রসঙ্গ কথা

আরিয়ুস (মৃত্যু ৩৩৬) ছিলেন একজন কট্টরপন্থী সন্ন্যাসী। তিনি তার ব্যক্তিগত চিন্তার আলোকে মণ্ডলীর শিক্ষার বিরুদ্ধে মতবাদ প্রচার করতেন। তিনি বলতেন, "যিশু খ্রিস্ট হলেন ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যবর্তী একজন শ্রেষ্ঠ মানব মাত্র। ঈশ্বরের মত তিনি অনাদি অনন্ত নন। তবে তিনি নানা দিব্য সদ্‌গুণে ভূষিত। তিনি সকলের শ্রদ্ধেয়। তবে তিনি স্বয়ং ঈশ্বর নন। তিনি শাশ্বত পিতা ঈশ্বরের এক সৃষ্ট প্রাণ মাত্র; অর্থাৎ যিশু খ্রিস্ট প্রকৃত ঈশ্বর নন। আরিয়ুস যিশু খ্রিস্টের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করতেন" (খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাস)। বিশ্বাসী ভক্তদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি ও দ্বন্দ্বের অবসানের লক্ষ্যে পোপ সাধু সিলভেস্টার (মৃত্যু ৩৩৭) একটি ধর্ম মহসভার আয়োজন করেন। মহান সম্রাট কন্সটানস্টাইন এর সহায়তায় পোপের দু'জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ৩১৮ জন বিশপ নিয়ে ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠিত হয়। আলেকজান্দ্রিয়ার মহাধর্মপাল সাধু আথানাসিউস এই মহাসভার প্রধান ব্যক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখেন। বহু আলোচনা ও যুক্তি তর্কের শেষে 'নিসিয় বিশ্বাসমন্ত্র' প্রার্থনাটি রচনা করা এবং আরিয়ুসকে মণ্ডলীচ্যুত করা হয়।

৩. বিশ্বাস প্রসঙ্গ কথা: 'কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা' গ্রন্থে ১৮১৪ ধারায় বলা হয়েছে "বিশ্বাস হ'ল সেই ঐশতাত্ত্বিক গুণ, যার দ্বারা আমরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি এবং তিনি যা কিছু বলেছেন ও আমাদের নিকট যা প্রকাশ করেছেন এবং পবিত্র মণ্ডলীর ধর্ম বিশ্বাসের জন্য যা কিছু প্রদান করেছেন- তাও আমরা বিশ্বাস করি, কারণ তিনি নিজেই যে সত্য। বিশ্বাসের দ্বারা মানুষ স্বাধীন ভাবে নিজের সম্পূর্ণ সত্তাকে ঈশ্বরের কাছে অর্পণ করে। এই কারণে বিশ্বাসী ভক্তগণ ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে ও তা মেনে চলতে সাধনা করে। বিশ্বাসগুণে যে ধার্মিক, সে বাঁচবে। জীবন্ত বিশ্বাস ভালোবাসা দ্বারা কার্যকর।" ১৮১৫ ধারায় আরো বলা হয়েছে "বিশ্বাসের দান তার মধ্যেই অবস্থান করে, যে এর বিরুদ্ধে কোন পাপ করেনি। কিন্তু, 'কর্মহীন বিশ্বাস মৃত': বিশ্বাস যখন আশা ও ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত, তখন ভক্তবিশ্বাসীকে খ্রিস্টের সাথে পূর্ণ ভাবে যুক্ত করে না এবং তাকে তাঁর দেহের জীবন্ত অঙ্গ করে তোলে না।" কয়েকজন ঐশতত্ত্ববিদের বিশ্বাস বিষয়ক মতামত উল্লেখ করা হলো:

➢ সাধু সিপ্রিয়ান (জন্ম কার্তেজ, মৃত্যু: ২৫৮) বলেন," বিশ্বাস করা" একটি মাণ্ডলিক ক্রিয়া। আমাদের ধর্মবিশ্বাস খ্রিস্টমণ্ডলীর ধর্মবিশ্বাস থেকে আগত, সঞ্জাত, প্রতিপালিত ও পরিপুষ্ট। খ্রিস্টমণ্ডলীর সকল বিশ্বাসীর জননী। খ্রিস্টমণ্ডলীর বিশ্বাসীই আমাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের জন্ম দেয়, তাকে পালন করে ও তার পুষ্টিসাধন করে। " খ্রিস্টমণ্ডলীকে জননী হিসেবে স্বীকার না করলে, ঈশ্বরকে কেউ পিতা বলে স্বীকার করতে পারে না"

➢ "শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিভিন্ন যুগের প্রয়োজনে সাড়া দেয়ার জন্য বহু বিশ্বাসোক্তি বা ধর্মবিশ্বাসমন্ত্র প্রকাশ পেয়েছে: বিভিন্ন প্রৈরিতিক ও প্রাচীন মণ্ডলীর বিশ্বাসোক্তি গড়ে উঠেছে; উদাহরণস্বরূপ, (Quicumque) যাকে আথানাসীয় বিশ্বাসোক্তি বলা হয়; কতিপয় মহাসভার খ্রিস্টবিশ্বাসের স্বীকারোক্তি, যেমন তলেদো, লাতেরান, লিয়োঁ, ট্রেন্ট মহাসভা; অথবা কতিপয় পোপের দ্বারা প্রদত্ত ধর্মবিশ্বাসের স্বীকারোক্তিসমূহ উদাহরণস্বরূপ (Fides Damasi) অথবা পোপ ৬ষ্ঠ পলের রচিত ঈশ্বরের জনগণের বিশ্বাসোক্তি নামক দলিল (Credo of the People of God)" (কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, পৃষ্ঠা ৫৮)।

০৪. বিশ্বাসমন্ত্রটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: খ্রিস্টধর্মীয় শব্দার্থ, কোষ বইয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, "খ্রিস্ট ধর্ম বিশ্বাসের মূলমন্ত্র বা মূল কথাগুলো ১২টি অনুচ্ছেদে সারসংক্ষেপ হিসাবে প্রকাশিত। প্রেরিতগণের শ্রদ্ধামন্ত্র বা বিশ্বাসের মূলমন্ত্র কথাটি এই লোক বিশ্বাস হতে জাত যে ইহা যিশুর বারজন শিষ্য কর্তৃক বাস্তবেই রচিত; এর সারমর্ম স্পষ্টতঃ নবসন্ধি হতেই এসেছে। যা হোক। ঐতিহাসিক লেখকগণ এর মূল রচনার তারিখ দেখিয়েছেন ১৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৪০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। তাতে এটাই প্রমাণিত যে, গোড়া হতেই পাশ্চাত্য মণ্ডলীভুক্ত নতুন সদস্যদের বা দীক্ষাপ্রার্থীদের উক্ত প্রেরিতদের শ্রদ্ধামন্ত্র মুখস্থ করতে হত। আজও তা খ্রিস্ট ধর্মবিশ্বাসের সর্বাঙ্গীন সুন্দর সারসংক্ষেপ হিসেবে পরিগণিত"।

প্রেরিতগণের শ্রদ্ধামন্ত্র প্রার্থনাটি

"স্বর্গ-মর্তের স্রষ্টা সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরের এবং তাঁহার অদ্বিতীয় পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিস্টে আমি বিশ্বাস করি। যিনি পবিত্র আত্মার প্রভাবে গর্ভস্থ হইয়া কুমারী মারীয়া হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন, পোন্তিয় পিলাতের শাসনকালে যাতনা-ভোগ করিলেন, ক্রুশবিদ্ধ, গতপ্রাণ ও সমাহিত হইলেন, পাতালে অবরোহণ করিলেন, তৃতীয় দিবসে মৃতদের মধ্যে হইতে পুনরুত্থান করিলেন; স্বর্গারোহণ করিলেন, সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন; সেই স্থান হইতে জীবিত ও মৃতের বিচারার্থে আগমন করিবেন। আমি পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি, পুণ্যময়ী কাথলিক মণ্ডলী, সিদ্ধগণের সমবায়, পাপের ক্ষমা, শরীরের পুনরুত্থান ও অনন্ত জীবনে বিশ্বাস করি" *(খ্রীষ্টধর্মীয় শব্দার্থ, পৃষ্ঠা ১৬৩)*

০৫. প্রেরিতগণের প্রার্থনাটির দু'টি রূপ

"বিশ্বাস সত্যের সারমর্ম যা নিসিয়ার মহাধর্মসভা (৩২৫) এবং কনস্টান্টিনোপলের মহাধর্মসভা থেকে এসেছে। প্রেরিতগণের শ্রদ্ধামন্ত্রের চেয়ে এই বিশ্বাসমন্ত্রে কাথলিক

বিশ্বাস আরো পূর্ণতা প্রকাশ পেয়েছে বিশেষ করে পবিত্র ত্রিত্বের উপর। নিসিয়ার বিশ্বাসমন্ত্র (কাথলিক মণ্ডলীতে) রবিবারে উপদেশের উপর বিশ্বাসের স্বীকৃতিস্বরূপ উচ্চারণ করে থাকি। কিন্তু সাধারণত বাংলাদেশে প্রেরিতগণের শ্রদ্ধামন্ত্র উচ্চারণ করা হয় (দ্রষ্টব্য প্রেরিতগণের শ্রদ্ধামন্ত্র)।

• প্রেরিতদূতগণের বিশ্বাসমন্ত্র

"স্বর্গমর্তের স্রষ্টা সর্বশক্তিমান পিতা পরমেশ্বরে আমি বিশ্বাস করি। তাঁর একমাত্র পুত্র আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্ট আমি বিশ্বাস করি। তিনি পবিত্র আত্মার প্রভাবে গর্ভস্থ হয়ে কুমারী মারীয়া হতে জন্মগ্রহণ করলেন। পোন্তিয় পিলাতের শাসনকালে যাতনাভোগ করলেন, ক্রুশবিদ্ধ হলেন, মৃত্যুবরণ করলেন এবং সমাধিস্থ হলেন। তিনি অধোলোকে অবরোহণ করলেন। তৃতীয় দিবসে তিনি পুনরুত্থান করলেন। তিনি স্বর্গারোহণ করলেন, তিনি পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন। সে স্থান হতে তিনি জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে পুনরায় আগমন করবেন। আমি পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি, পুণ্যময়ী কাথলিক মণ্ডলী, সিদ্ধগণের মিলন সংযোগে পাপের ক্ষমা, শরীরের পুনরুত্থান এবং অনন্ত জীবনে বিশ্বাস করি" (কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, পৃষ্ঠা ৫৪)।

• নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র

"এক পরমেশ্বর, সর্বশক্তিমান পিতা, স্বর্গমর্তের দৃশ্য-অদৃশ্য সমস্তের সৃষ্টিকর্তায় আমি বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি এক প্রভু যিশু খ্রিস্টে, পরমেশ্বরের একমাত্র-জাত পুত্র, এবং সর্বযুগের পূর্বে পিতা হতে জাত। পরমেশ্বর হতে পরমেশ্বর, জ্যোতি থেকে জ্যোতি, সত্যেশ্বর হতে সত্যেশ্বর। তিনি জাত, সৃষ্ট নন, পিতার সঙ্গে অভিন্ন-স্বরূপ, তাঁর দ্বারা সমস্তই হল সৃষ্ট। মানবজাতির আমাদের জন্য এবং আমাদের নিস্তারের উদ্দেশে স্বর্গ থেকে অবরোহণ করলেন, এবং পবিত্র আত্মার প্রভাবে কুমারী মারীয়ার গর্ভে দেহধারণ করে জন্মালেন এবং মানুষ হলেন। তিনি পোন্তীয় পিলাতের শাসনকালে আমাদের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হলেন, যাতনাভোগ করলেন এবং সমাধিস্থ হলেন। শাস্ত্র-অনুসারে তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থান করলেন; এবং স্বর্গে আরোহণ করলেন ও পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন। পুনরাগমন করবেন-তাঁর রাজত্বের শেষ হবে না। আমি বিশ্বাস করি প্রভু ও জীবনদায়ী পবিত্র আত্মায়। তিনি পিতা ও পুত্র হতে সম্ভূত, পিতা ও পুত্রের সাথে সমতুল্যভাবে গৌরবান্বিত ও আরাধিত; তিনি প্রবক্তাদের মধ্য দিয়ে কথা বলেছেন। আমি বিশ্বাস করি এক পবিত্র সার্বজনীন ও প্রৈরিতিক খ্রিস্টমণ্ডলীতে, আমি স্বীকার করি পাপমোচনার্থে এক দীক্ষাস্নান; আমি মৃতদের পুনরুত্থান ও শাশ্বত জীবনের প্রত্যাশা করি" (কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, পৃষ্ঠা ৫৪)।

০৬. প্রেরিতগণের প্রার্থনাটির ভিন্ন ভিন্ন মন্তব্য

• ১২টি পদে বিভক্ত ঐতিহাসিকদের মতামত (১৫০-৪০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত)

• সাধু এমব্রোজ বলেন, "এই ধর্মবিশ্বাসমন্ত্র হচ্ছে আধ্যাত্মিক মুদ্রাঙ্কন আমাদের হৃদয়সিক্ত ধ্যান এবং সার্বক্ষণিক রক্ষক। এটি নিঃসন্দেহে আমাদের আত্মার ঐশ্বর্য।

• সাধু ইরেনিয়াস বলেন,"খ্রিস্টমণ্ডলীর নিকট হতে আমরা যে ধর্মবিশ্বাস লাভ করেছি তা আমরা সর্বোত্তম পাত্রে রক্ষিত মহামূলবান সম্পদের ন্যায়, এই ধর্মবিশ্বাস প্রতিনিয়ত নবীকৃত হচ্ছে এবং যে পাত্রে তাকে ধারণ করেছেন তাকেই নবীকৃত করে তুলেছে।

• পরিত্রাণের জন্য বিশ্বাস অপরিহার্য। প্রভু নিজেই দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন, "যে বিশ্বাস করবে ও দীক্ষাস্নাত হবে, সে পরিত্রাণ পাবে; যে বিশ্বাস করবে না, তাকে বিচারধীন করা হবে" *(মথি ১৬: ১৬)*।

• সাধু টমাস আকুইনাস (১২২৫-১২৭৪) বলেন, "ধর্মবিশ্বাস হচ্ছে সেই জ্ঞানের পূর্বাস্বাদ যা ভাবীযুগে আমাদের পরম সুখ দান করে"।

"শুরু থেকেই প্রৈরিতিক খ্রিস্টমণ্ডলীর সবার জন্য বিধিসম্মত সংক্ষিপ্ত মন্ত্রাকারে তার বিশ্বাস প্রকাশ ও সম্পাদন করে আসছে। কিন্তু প্রাচীনকাল থেকেই খ্রিস্টমণ্ডলীর তার ধর্মবিশ্বাসের মৌলিক উপাদানগুলো সুবিন্যস্ত ও সুস্পষ্ট সারসংক্ষেপ রচনা করতে চেয়েছিল। বিশেষভাবে দীক্ষাস্নান প্রার্থীদের কথা বিবেচনা করে একাজ করা হয়েছিল" *(কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, পৃষ্ঠা ৫৭)*।

"ধর্মবিশ্বাসের স্বীকারোক্তি" প্রথমবার করা হয় দীক্ষাস্নানের সময়। ধর্মবিশ্বাসমন্ত্র হল প্রধানতঃ দীক্ষাস্নানে উচ্চারিত বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি। যেহেতু "পিতা, ও পুত্র, ও পবিত্র আত্মা নামের উদ্দেশে" দীক্ষাস্নান সংস্কার প্রদান করা হয়, যেহেতু দীক্ষাস্নানের সময় ধর্মবিশ্বাসের যে সত্যাবলী ঘোষণা করা হয়, সেগুলো পবিত্র ত্রিত্বের তিন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেই উচ্চারিত হয়ে থাকে" (উৎস: কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, পৃষ্ঠা ৫৭)।

"প্রেরিতদূতগণের বিশ্বাসমন্ত্র-এই নাম দেয়া হয়েছে কেননা ন্যায়সঙ্গতভাবেই এটিকে প্রেরিতদূতদের বিশ্বাসের একটি যথার্থ সারাংশ হিসাবে গণ্য করা হয়। এটি রোমের খ্রিস্টমণ্ডলীর অতি প্রাচীন দীক্ষাস্নানে উচ্চারিত বিশ্বাসোক্তি। এটির গুরুত্ব সর্বাধিক কেননা এটি রোমীয় খ্রিস্টমণ্ডলীরই বিশ্বাসোক্তি, যেখানে খ্রিস্টমণ্ডলী প্রেরিতদূতদের প্রথম সেই পিতরের ধর্মাসন, এবং যেখানে তিনি এক অভিন্ন খ্রিস্টবিশ্বাস আনয়ন করেছিলেন" *(কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, পৃষ্ঠা ৫৯)*।

"নিসীয়-কনস্তান্তিনোপলীয় অথবা নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্রের গুরুত্ব আছে এই কারণে যে, এটির সূচনা হয়েছিল প্রথম দুইটি বিশ্বজনীন মহাসভা থেকে (৩২৫ ও ৩৮১ খ্রিস্টাব্দ)। আজ পর্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চত্যের সকল বৃহৎ খ্রিস্টমণ্ডলীতেই এটি একইভাবে সমাদৃত" *(কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, পৃষ্ঠা ৫৯)*।

০৭. খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের মূলমন্ত্র হলো প্রেরিতগণের শ্রদ্ধামন্ত্র: "যুগ যুগ ধরে খ্রিস্টমণ্ডলী বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি, জনগণ ও জাতির মধ্যে একই প্রভুর কাছ থেকে পাওয়া, এবং দীক্ষাস্নানের দ্বারা হস্তান্তরিত, একই বিশ্বাস প্রতিনিয়ত স্বীকার করে আসছেন। এই বিশ্বাসের ভিত্তি এমন দৃঢ়প্রত্যয় প্রকাশ করে যে, সকল মানুষের ঈশ্বর ও পিতা এক ও অভিন্ন। এই বিশ্বাসের একজন জ্বলন্ত সাক্ষী লিয়োঁর সাধু ইরেনিয়াস বলেছেন" *(উৎস: কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, পৃষ্ঠা ৫২)*

"খ্রিস্টমণ্ডলী যদিও গোটা বিশ্বে, এমন কি পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃতি, তথাপি প্রেরিতদূতগণ ও তাদের শিষ্যদের কাছ থেকে যে ধর্মবিশ্বাস সে লাভ করেছে এই বাণীপ্রচার ও বিশ্বাস-সম্পাদকে একই গৃহে বসবাসকারীর ন্যায় সে সযত্নে তা রক্ষা করে। অনুরূপভাবে খ্রিস্টমণ্ডলীর সকলেই যেন একমন, একপ্রাণ হয়েই সেই বিশ্বাস স্বীকার করে এবং যেন একটি মাত্র মুখ দিয়েই সমস্বরে এই বিশ্বাস প্রচার, শিক্ষাদান ও হস্তান্তর করে" *(কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, পৃষ্ঠা ৫২)*।

উপসংহার: বিশ্বাসমন্ত্রের শেষ কথা হলো "অনন্ত জীবনে বিশ্বাস করি" পার্থিব জীবনে অবস্থানকালে আমরা দীক্ষিত ভক্তবিশ্বাসী হিসেবে বিশ্বাসমন্ত্রের গুণেই ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করি। বিশ্বাসমন্ত্র প্রার্থনাটি খ্রিস্টীয় জীবনের মূল ভিত্তি ও শিক্ষা। কাথলিক মণ্ডলীর নিগূঢ় ও রহস্যময় সত্যগুলো প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বাসমন্ত্রের মাধ্যমে। রবিবারসহ মহাপর্বে প্রেরিতগণের শ্রদ্ধামন্ত্র প্রার্থনাটি ভক্তি ভরে আবৃতি করার নির্দেশ দেয় মাতামণ্ডলী। প্রেরিতগণের শ্রদ্ধামন্ত্র প্রার্থনাটি মুখস্থ রাখার মধ্য দিয়ে আবৃত্তি করতে আহূত। কেননা মাতামণ্ডলীর শিক্ষা ও নির্দেশনা পালন করার মাধ্যমে আমাদের জীবন বিশ্বাসে পূর্ণতা লাভ করে।

সহায়ক গ্রন্থ:

• কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলিনী, ঢাকা, ২০০০।

• ফাদার দানিয়েল লৌয়ারী, খ্রীষ্টধর্মীয় শব্দার্থ, (সম্পাদনায়: ফাদার সিলভানো গারেল্লো) জাতীয় ধর্মীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর, ১৯৯৬।

• রোজারিও, যোহন উত্তম, খ্রিস্টিয় বিশ্বাসের মূল ভিত্তি হিসেবে বিশ্বাসমন্ত্রের তাৎপর্য, দীপ্তসাক্ষ্য, বড়দিন সংখ্যা, ২০১২, ঢাকা।

ত্যাগ, দান ও আলোর উপহার

জাসিন্তা আরেং

শীতের এক শান্ত রাত। আকাশ জুড়ে অসংখ্য তারা ঝিকমিক করছে। তারাদের ভীড়ে একটি তারা অন্যগুলোর চেয়ে বেশি উজ্জ্বল যেন সে কিছু বলতে চায়। ছোট্ট গ্রাম বেথলেহেম তখন বড়দিনের আনন্দে আলোয় ভরে উঠেছে। ঘরের জানালায় আলো, গির্জায় ঘণ্টার ধ্বনি, আর মানুষের মুখে হাসি।

এই গ্রামেই থাকতো ছোট্ট মেয়ে মারীয়া। তার বয়স মাত্র আট বছর। সে খুব গরিব পরিবারের সন্তান। তাদের ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে দামি সাজসজ্জা ছিলো না, ছিলো না বড় কোনো ভোজের আয়োজন। তবুও মারীয়ার চোখে ছিলো অপার আনন্দ, কারণ তার মা বলতেন,"বড়দিন মানে শুধু পাওয়া নয়, বড়দিন মানে ভালোবাসা অন্যকে দেওয়া।"

মারিয়া জানালার পাশে বসে আকাশের দিকে তাকালো। উজ্জ্বল তারাটির দিকে তাকিয়ে সে ভাবলো, "এই তারাটাই কি সেই তারা, যে তারাটি যিশুর জন্মের সময় পথ দেখিয়েছিল?" তার মা তখন তাকে কাছে টেনে নিলেন এবং মিষ্টি কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন যিশুর জন্মের গল্প। অনেক-অনেক বছর আগে, এই পৃথিবী যখন দুঃখ, হিংসা আর অন্ধকারে ভরে ছিলো, তখন ঈশ্বর মানুষকে আশার আলো দিতে তাঁর একমাত্র পুত্র যিশুকে পৃথিবীতে পাঠালেন। যিশু কোনো রাজপ্রাসাদে জন্ম নেননি। তিনি জন্ম নিয়েছিলেন এক সাধারণ গোয়ালঘরে। কারণ ঈশ্বর চেয়েছিলেন মানুষ বুঝুক, ভালোবাসা ধন-সম্পদে নয়, হৃদয়ে বাস করে। যিশুর মা মারীয়া ও বাবা যোসেফ ছিলেন খুবই সাধারণ মানুষ। থাকার জায়গাটুকু ছিলো না তাঁদের, খাবার ছিলো অল্প। তবুও তাঁরা ভয় পাননি। কারণ তাঁরা জানতেন এই শিশুটি শুধু তাঁদের নয়, পুরো মানব জাতির জন্য আশার বার্তা নিয়ে এসেছে। নিজেদের সব কষ্ট ভুলে তাঁরা যিশুকে আগলে রেখেছিলেন নিঃস্বার্থ ভালোবাসা দিয়ে। এটাই ছিলো তাঁদের ত্যাগ। মারীয়া মন দিয়ে গল্প শুনছিল। তার ছোট্ট হৃদয়ে এক অদ্ভুত আলো জ্বলে উঠলো। সে ভাবলো, "যদি যিশু আমাদের জন্য এতো ত্যাগ করতে পারেন, তবে, আমিও পারি একটু ত্যাগ করতে।" পরদিন সকালে বড়দিন এলো। গির্জায় সবাই নতুন পোশাক পরে গেল। কেউ কেক এনেছে, কেউ খেলনা, কেউ উপহার। গির্জার পরিবেশ আনন্দে মুখরিত ছিলো। মারীয়ার হাতে ছিলো একটি ছোট কাঠের পুতুল। এটি তার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস। তার বাবা একদিন নিজের হাতে বানিয়ে দিয়েছিলেন। বাবাকে সে আর কোনোদিন দেখেনি, তাই পুতুলটি তার বাবার স্নেহ-ভালোবাসা ও তার অনুপস্থিতি তাকে উপলব্ধি করতে দেয় না, সে যে নেই। পুতুলটিই ছিলো বাবার একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন। গির্জার দরজার পাশে মারীয়া দেখলো, একটি ছোট ছেলে চুপচাপ বসে আছে। তার চোখে জল, গায়ে জড়ানো পুরোনো ছেড়া জামা। সবার হাতে উপহার, কিন্তু তার হাতে কিছুই নেই।

মারীয়ার বুক কেঁপে উঠলো। সে পুতুলটির দিকে তাকালো, আবার ছেলেটির দিকে তাকালো। মনে-মনে সে দ্বিধায় পড়ে গেল। "এটা তো আমার একমাত্র খেলনা যা বাবার স্মৃতিচিহ্ন! আমি কি সত্যিই এটা দিয়ে দেব?" এই নিয়ে মারীয়ার কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়লো।

ঠিক তখনই গির্জার ভেতর থেকে যাজকের কণ্ঠে সে শুনতে পেলো- "যিশু আমাদের শিখিয়েছেন, ত্যাগই হলো ভালোবাসার সবচেয়ে বড় প্রকাশ।" মারীয়াও পরক্ষণেই উপলব্ধি করলো এবং তার চোখ জলে ভরে গেল। সেও আর দেরি করলো না। ধীরে-ধীরে ছেলেটির কাছে এগিয়ে গেল। "এই নাও", সে মৃদু হেসে বললো, "এটা তোমার জন্য।" ছেলেটি অবাক হয়ে তাকালো। তার চোখে আনন্দের আলো জ্বলে উঠলো। সে পুতুলটি বুকে জড়িয়ে ধরলো। "ধন্যবাদ", সে কাঁপা কণ্ঠে বললো। মারীয়ার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। কিন্তু সেই জল দুঃখের নয়, বরং সেই জল ছিলো খাঁটি আনন্দের। সেদিন রাতে মারীয়া যখন ঘরে ফিরলো, তার মা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "আজ তুমি যিশুর পথেই হেঁটেছ।" মারীয়া আবার জানালার কাছে গিয়ে আকাশের দিকে তাকালো। উজ্জ্বল তারাটি যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে হাসছে। সে মনে-মনে বললো, "যিশু, তুমি তোমার জীবন দিয়ে আমাদের ভালোবাসা শিখিয়েছ। আজ আমি সেই ভালোবাসার একটু আলো ছড়াতে পেরেছি।" সেই রাতেই মারীয়া বুঝেছিল, আশা কখনো ছোট হয় না, উপহার শুধু জিনিস নয়, অনুভূতি, ও ত্যাগই হলো বড়দিনের আসল আনন্দ। সেই থেকে মারীয়ার কাছে বড়দিন মানে শুধু উৎসব নয়, দান, ত্যাগ ও আশার আলো জ্বালিয়ে দিয়ে তার মত শিশুদের পাশে দাঁড়ানো। সেদিন থেকে সে ঠিক করলো, প্রতি বছর সে কোন না কোনভাবে গরিব, দুঃখী ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াবে। তার যা আছে, তাই সহভাগিতা করবে। মারীয়া তার মা'কে অসহায় শিশু ও মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কথা বললো। মেয়ের কথা শুনে তার মা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন এবং মারীয়াকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমার ছোট মনে এতো ভালোবাসা কোথা থেকে এলো? সে উত্তর দিলো, গির্জায় গিয়ে যাজকের কণ্ঠে আমি শুনতে পেয়েছি যে, ত্যাগের মধ্য দিয়ে যিশু আশার সঞ্চার করেছিলো অসহায় ও পাপীদের মনে। নিঃস্বার্থ ভালোবাসা দিয়ে তিনি জয় করেছিলেন মানুষের হৃদয়। তাই, আমিও আজ থেকে মানুষের জীবনে আশার আলো নিয়ে যাবো। মারীয়ার মা তার কথা শুনে ভীষণ খুশী হলেন এবং তাকে বললেন, তুমি যিশুর দেখানো আলোর পথ অনুসরণ করলে ঈশ্বর ও অসহায় মানুষেরা তোমাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করবে। মায়ের কথা শুনে, মারীয়াও ভীষণ আনন্দিত হলো। তার মা তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললো, বড়দিন হলো ভালোবাসা বিলিয়ে দেওয়ার এক পবিত্র দিন। শীতলতার গণ্ডি পেরিয়ে উষ্ণ হৃদয় নিয়ে বড়দিনের আনন্দ ও ভালোবাসা সকলের মাঝে ভাগ করে নেয়া। তাই আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করবো বড়দিনে আমাদের মত গরিব, আশাহত ও অসহায় মানুষের জীবনে ত্যাগ, দান ও আশার আলো ছড়াতে। তবেই, বড়দিনের আনন্দ ও ভালোবাসা দ্বিগুণ হবে॥

বড়দিন: শিশু যিশুর জন্মদিন

প্লাবন স্কট গ্রেগরী

শীতের নরম রোদ যখন ধীরে ধীরে পৃথিবীর কোল জুড়ে গা ছড়িয়ে বসে, তখনই খ্রিস্টান জগৎ আনন্দে, আলোয় ও ভালোবাসায় প্রস্তুত হতে থাকে এক বিশেষ দিনের জন্য–বড়দিন। ২৫ ডিসেম্বর কেবল একটি তারিখ নয়; এটি খ্রিস্টানদের বিশ্বাস, ইতিহাস ও আশার এক মহামহিম উৎসব। আর এই উৎসবের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন এক নবজাতক–শিশু, যাঁর জন্মের মাধ্যমে মানবতার ইতিহাসে আলো ছড়িয়ে পড়েছিল নতুনভাবে।

শিশু যিশুর জন্ম; অন্ধকারের মাঝে আলোর আগমন: খ্রিস্টান ঐতিহ্য অনুযায়ী, বেথলেহেমের এক সাধারণ গোয়ালঘরে জন্মেছিলেন যিশু। চারদিকে ছিল নিরবতা, ঝলমলে তারাভরা আকাশ আর এক অদ্ভুত শান্তিময় পরিবেশ। কোনো রাজপ্রাসাদের বিলাস নয়; বরং সাধারণ-ই সেই জন্মযাত্রা। যেন মানবজাতিকে শেখানো হয়েছিল–ঈশ্বরের ভালোবাসা আসে বিনয়ের আড়ালে, সরলতার আবরণে। যিশুর জন্মকে তাই বলা হয় আশার প্রতীক, মানবতার পুনর্জন্ম, এবং শান্তির বার্তা। বড়দিনের মূল সুরও তাই–সব মানুষের মধ্যে ভালোবাসা, ক্ষমা আর সম্প্রীতির আলো ছড়িয়ে দেওয়া।

বড়দিনের বার্তা; মানুষের প্রতি ঈশ্বরের উপহার: শিশু যিশুর জন্ম আসলে এক বিশেষ প্রতিশ্রুতি–ঈশ্বর মানুষের কাছাকাছি আসছেন, মানবজীবনের সুখ-দুঃখে অংশ নিচ্ছেন, আর তাদের জন্য আলোর পথ দেখাচ্ছেন। খ্রিস্টান ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী, যিশুর জন্ম ছিল ঈশ্বরের পক্ষ থেকে মানবতার উদ্দেশ্যে এক অনন্য উপহার। যে কারণে বড়দিনে উপহার দেওয়ার রীতি পৃথিবীর সর্বত্র জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, গরিব-দুঃখী–সবাইকে কিছু না কিছু দিয়ে ভাগাভাগি করা হয় এই উৎসবের আনন্দ।

বাংলাদেশে বড়দিন; রঙ, আলো আর সংস্কৃতির মিলনমেলা: বাংলাদেশে বড়দিন মানেই পুরনো চার্চগুলোতে ঘণ্টাধ্বনি, মোমবাতির আলোয় প্রার্থনা, কীর্তন গান আর ঘরে ঘরে কেক বানানো। খ্রিস্টান পরিবারগুলো এই দিনটিকে শিশু যিশুর জন্মদিন হিসেবে গভীর শ্রদ্ধা ও আনন্দের সাথে পালন করেন। চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ির পাহাড়ি অঞ্চলে বড়দিন আরও রঙিন–আদিবাসী সংস্কৃতির নাচ-গান, উৎসব শোভাযাত্রা আর ঐতিহ্যবাহী খাবারের মাধ্যমে দিনটি হয়ে ওঠে মিলনমেলা। অনেক অখ্রিস্টান পরিবারও বন্ধুবান্ধবের নিমন্ত্রণে বড়দিনের আনন্দে শরিক হন–যা আমাদের সমাজে ধর্মীয় সম্প্রীতির এক সুন্দর নিদর্শন।

বড়দিনের প্রতীকসমূহ: গল্পে ও ঐতিহ্যে

ক্রিসমাস ট্রি: জীবনের অনন্ততার প্রতীক, সবুজ গাছকে সাজানো হয় রঙিন আলো আর অলংকারে।

তারকা: বেথলেহেমের সেই অলৌকিক তারার স্মৃতি, যা পথ দেখিয়েছিল জ্ঞানীদের।

সান্তা ক্লজ: শিশুদের আনন্দের উৎস, দানশীলতা ও উদারতার প্রতীক।

কীর্তন গান: শান্তি, ভালোবাসা আর যিশুর জন্মগাঁথা বর্ণনা করে।

শিশুদের জন্য বড়দিন: খুশির আর শেখার দিন: শিশু যিশুর জন্মদিন হওয়ায় বড়দিন শিশুদের কাছে বিশেষ প্রিয়। তারা গল্প শোনে যিশুর জীবন, তাঁর ভালোবাসা, ক্ষমা আর মানবতার শিক্ষা। স্কুলে ছোট ছোট নাটক, গান আর সাজসজ্জা–সব মিলে উৎসবটিতে যুক্ত হয় মিষ্টি রঙিন আনন্দ।

আজকের পৃথিবীতে বড়দিনের অর্থ: যিশুর জন্মের হাজার হাজার বছর পরেও বড়দিনের বার্তা একই অন্যকে ভালোবাসো, শান্তি ছড়াও, ক্ষমা করো, এবং আলো দিয়ে অন্ধকার দূর করো। আজকের অশান্ত পৃথিবীতে এই বার্তাটি আরও বেশি দরকার। বড়দিন আমাদের মনে করিয়ে দেয়–আশা কখনো নিভে যায় না, অন্ধকার যত গভীরই হোক, আলো তার পথ খুঁজে নেয়।

বড়দিন হলো ভালোবাসার দীপশিখা: বড়দিন কেবল খ্রিস্টান ধর্মের উৎসব নয়; এটি মানুষের হৃদয়ের উৎসব। শিশু যিশুর জন্মদিন আমাদের মনে করিয়ে দেয় সত্যিকারের মানবিকতার কথা–দরিদ্রের পাশে দাঁড়ানো, ক্ষুধার্তকে খাওয়ানো, দুঃখীর সান্ত্বনা হওয়া, আর সব মানুষের প্রতি ভালোবাসা ছড়িয়ে দেওয়া। এই বড়দিনে আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে জ্বলে ওঠুক সেই আলো–শিশু যিশুর জন্মের আলো, ভালোবাসার আলো, মানবতার আলো।

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

সারিকা ফুলকুমারী রোজারিও,
২য় শ্রেণী
ফাদার উইস স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়

অরিন রোজারিও
রায়ের দিয়া উচ্চ বিদ্যালয়

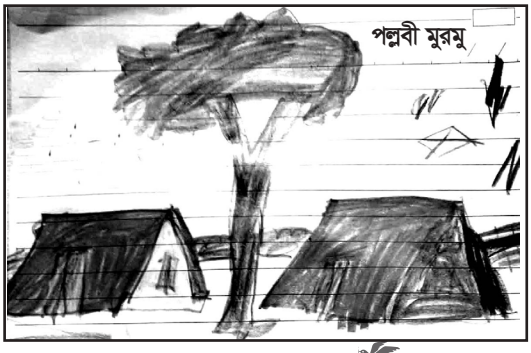

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

২০২৫ খ্রিস্টাব্দ: ভাটিকানের এক সন্ধিক্ষণ

খ্রিস্ট জন্ম জয়ন্তী, পোপ ফ্রান্সিসের অধ্যায়ের সমাপ্তি ও পোপ লিও'র নতুন যাত্রা

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

২০২৫ খ্রিস্টাব্দ কাথলিকদের জন্য বিভিন্ন কারণেই একটি বিশেষ বছর। এ বছর পালিত হচ্ছে খ্রিস্ট জন্ম জয়ন্তী (Jubilee Year) –যা কাথলিক মণ্ডলীতে আত্মশুদ্ধি, ক্ষমা, তীর্থযাত্রা ও নতুন আশার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত। আবার এই পুণ্যবর্ষেই ভাটিকানে নেতৃত্বের পরিবর্তন হয়েছে, তবে তা শুধু ধর্মীয় নয়, বরং ঐতিহাসিক ও বৈশ্বিক তাৎপর্য বহনকারী ঘটনা।

কাথলিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, নিঃসন্দেহে এ বছরের সবচেয়ে বড় ঘটনা ছিল এপ্রিল মাসে পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যু এবং পরবর্তীতে নতুন পোপ হিসেবে পোপ চর্তুদশ লিও'র নির্বাচন ও অধিষ্ঠান–যিনি মণ্ডলীর ইতিহাসে প্রথম আমেরিকান পোপ। তবে আমাদের খ্রিস্ট বিশ্বাসের দিক থেকে দেখলে, 'আশার জুবিলী বর্ষ' হয়তো আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ।

বিশ্বের ১.৪ বিলিয়ন কাথলিক ছাড়াও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের কাছেও পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যু এবং পোপ চতুর্দশ লিও'র নির্বাচনের ঘটনাটি অন্যতম আলোচনার বিষয় ছিল ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে।

২ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে 'উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশন' "Deaths in 2025" (২০২৫ সালের মৃত্যুসমূহ)– নিয়ে যে এন্ট্রি তা প্রকাশ করে; যার মধ্যে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের নামও রয়েছে। এই বছরে তাদের দ্বিতীয় সর্বাধিক পঠিত এন্ট্রি এটি। আর ইংরেজি উইকিপিডিয়ার ৭.১ মিলিয়ন নিবন্ধের মধ্যে পোপ লিওর জীবনী ছিল পঞ্চম সর্বাধিক পঠিত প্রবন্ধ।

ফাউন্ডেশন জানায়, "জনগণ যখন পোপ চর্তুদশ লিও সম্পর্কে জানতে অনলাইনে প্রবেশ করে, তখন সব উইকিমিডিয়া প্রকল্পে ট্র্যাফিক প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৮ লাখ ভিউতে পৌঁছায়–যা স্বাভাবিক ট্র্যাফিকের তুলনায় ছয় গুণেরও বেশি এবং আমাদের জন্য একেবারে সর্বকালের নতুন রেকর্ড।" তারা আরও জানান যে, "অনেক মানুষ পোপ ফ্রান্সিসের জীবন সম্পর্কেও জানতে তাদের অনলাইন প্লাটফর্মে প্রবেশ করে। তাঁর ইংরেজি উইকিপিডিয়া নিবন্ধটি ছিল বছরের একাদশ সর্বাধিক পঠিত পৃষ্ঠা।

১ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে ঈশ্বর জননী কুমারী মারীয়ার মহাপর্বের খ্রিস্টযাগ উৎসর্গের মধ্য দিয়ে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বছরটি শুরু করেছিলেন। সে সময়ই তাঁর কণ্ঠ দুর্বল এবং মুখ কিছুটা ফোলা ছিল। যা ইতোমধ্যেই এটি ইঙ্গিত দিচ্ছিল যে তাঁর চিকিৎসকেরা তাঁর দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসজনিত রোগ–ব্রংকিয়েকটেসিস ও অ্যাজমাটিক ব্রঙ্কাইটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হিমশিম খাচ্ছিলেন। এসব রোগ সর্দি লাগলেই আরও খারাপ হয়ে যেত। পরবর্তীতে ১৪ ফেব্রুয়ারি তাঁকে জ্বর ও শ্বাসনালির সংক্রমণের কারণে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, যা পরে ডাবল নিউমোনিয়ায় রূপ নেয়।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস অসুস্থাবস্থায় হাসপাতালে থাকাকালীন সময়ে, কার্ডিনাল ও ভাটিকানের অন্যান্য কর্মকর্তারা পালাক্রমে ভাটিকানে সাধু পিতরের চত্বরে হাজারো মানুষের সহযোগে রোজারিমালা পরিচালনা করতেন। কার্ডিনালদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের কার্ডিনাল রবার্ট এফ, প্রেভোষ্টও ছিলেন। রাত্রিকালীন এই প্রার্থনা চলতে থাকে ২৩ মার্চ পর্যন্ত যখন পোপ ফ্রান্সিস রোমের জেমেল্লি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান।

পোপ ফ্রান্সিস তাঁর ৮৮তম জন্মদিনের ঠিক পরেই, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর, জুবিলী বর্ষের সূচনা করেছিলেন। তবে পরে শারীরিক দুর্বলতার কারণে জুবিলীর অনেক উপাসনা পরিচালনার দায়িত্ব কার্ডিনালদের কাছে অর্পণ করতে বাধ্য হন। ইস্টারের দিনে, "উরবি এট অরবি" (নগরী ও বিশ্বের প্রতি) আশীর্বাদ প্রদান করার পর তিনি হাত প্রায় তুলতেও পারছিলেন না। তারপরও তিনি পোপমোবাইলে চড়ে জনতার মাঝে প্রায় ১৫ মিনিট সময় কাটান। জনগণের সাথে এটিই ছিল তাঁর শেষ যাত্রা। পরদিন সকালে, ২১ এপ্রিল, সকাল ৭টা ৩৫ মিনিটে পোপ ফ্রান্সিস মৃত্যুবরণ করেন।

শোক এবং প্রার্থনার পাশাপাশি, পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যু ভাটিকানের কার্ডিনালদের কলেজের সভাগুলোর সূচনা করেছিল, যেখানে মণ্ডলীর অবস্থা ও প্রয়োজন, বিশ্বের প্রয়োজন এবং পরবর্তী পোপের গুণাবলীর বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়।

৭ মে ১৩৩ জন কার্ডিনালের সিস্টিন চ্যাপেলে প্রবেশের মধ্য দিয়ে পোপ নির্বাচন সংক্রান্ত কনক্লেভ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। পরের দিন, চতুর্থ ভোটে, কার্ডিনাল প্রেভোস্ট নির্বাচিত হন এবং পোপ লিও চতুর্দশ নাম গ্রহণ করেন।

জনসমাগমে পোপ চর্তুদশ লিও'র প্রথম কথাগুলো হলো: "আপনাদের মধ্যে শান্তি থাকুক"। যেকোন দলের সাথে মিটিং করার সময়েও তিনি একই কথা প্রায়শই ব্যবহার করেন। উষ্ণ ও সংযমী ব্যক্তিত্বের অধিকারী প্রথম আমেরিকান পোপ তাঁর সেবাদায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁর পূর্বসূরীদের মতোই সুসমাচার প্রচার করা, শান্তির জন্য কাজ করা, চার্চের

মধ্যে এবং মানব পরিবারে ঐক্য প্রচার করা, এবং এগুলোকে একত্রিত করে দরিদ্রদের সেবা করা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলা বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে।

পুণ্যপিতা চর্তুদশ লিও তাঁর প্রথম প্রৈরিতিক প্রেরণাপত্র "Dilexi Te" ("আমি তোমাদের ভালোবেসেছি")-এ সকল খ্রিস্টানদেরকে দরিদ্রদের ভালোবাসতে উৎসাহ দিয়ে আন্তঃসম্পর্কযুক্ত বার্তা দান করেন। পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় বলেন, দারিদ্রের যে কোনো রূপই হোক না কেন; দরিদ্রদের প্রতি ভালোবাসা হলো সেই সুসমাচারিক স্বাক্ষর যা ঈশ্বরের হৃদয়ের প্রতি বিশ্বস্ত মণ্ডলীর পরিচায়ক। আমি বিশ্বাস করি যে দরিদ্রদের প্রতি প্রাধান্যভিত্তিক মনোভাব মণ্ডলী এবং সমাজ উভয়ের জন্যই পুনর্নবীকরণের অসাধারণ উৎস, যদি আমরা আমাদের আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত হতে পারি এবং দরিদ্রদের আহাজারিতে আমাদের কান খুলে দিতে পারি।"

এই ভালোবাসা বিষয়ে প্রৈরিতিক প্রেরণাপত্রে এবং অন্যান্য জায়গায় বারবার উল্লেখ করেছেন, যা অভিবাসী ও শরণার্থীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মণ্ডলী সবসময়ই অভিবাসীদের মধ্যে প্রভুর জীবন্ত উপস্থিতিকে স্বীকৃতি দিয়েছে, যিনি শেষবিচারে তাঁর ডান দিকে থাকা মানুষদের বলবেন: 'আমি একজন অপরিচিত ব্যক্তি ছিলাম, আর তোমরা আমাকে স্বাগত জানিয়েছিলে।

পুণ্যপিতা পোপ লিওকে বারবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসী ও শরণার্থী নীতির এবং প্রশাসনের গণবিতাড়নের ঘোষিত লক্ষ্য সম্পর্কে। পোপ মহোদয় বারংবার মণ্ডলীর শিক্ষাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, যা একটি দেশের সীমানা নিয়ন্ত্রণ করার অধিকারকে মান্য করে, তবে যারা নিরাপত্তা ও ভালো জীবন খুঁজছেন, তাদের সম্মানের সঙ্গে আচরণ করতে হবে বলে জোর দেন।

তার পূর্বসূরী পোপ ফ্রান্সিসের তুলনায় পোপ লিও কাস্তেল গান্দোলফোতে বেশি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। পোপীয় সম্পত্তির কাস্তেল গান্দোলফোতে রয়েছে ভিলা, একটি খামার, বাগান এবং একটি শিক্ষাকেন্দ্র যা মানুষকে পরিবেশ সম্বন্ধে শিক্ষা দান করে। পোপ ফ্রান্সিস সেখানে শুধু কয়েকবার গিয়েছিলেন এবং পরে প্রধান পোপীয় আবাসস্থলকে একটি জাদুঘরে রূপান্তর করেছিলেন। অন্যদিকে, পোপ লিও গ্রীষ্মকালে সেখানে সপ্তাহ ধরে থাকেন এবং প্রায় প্রতিটি সোমবার সন্ধ্যায় ফিরে যান ভিলায় ২৪ ঘণ্টা কাটাতে–পড়াশোনা, বিশ্রাম, টেনিস খেলা এবং ইনডোর সুইমিং পুলে সাঁতার কাটার জন্য।

পুণ্যবর্ষে নির্বাচিত হওয়ায়, পোপ লিও একটি পূর্ণতালিকাভুক্ত কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন যেখানে বেশিরভাগ সপ্তাহান্তে বিশেষ জুবিলী উদ্‌যাপন পরিকল্পিত ছিল। তিনি সেটিকে আপন করে নিয়েছিলেন। বিশেষ করে জুলাই মাসের শেষের দিকে যুব জুবিলী-র সময়, যা রোমে এক মিলিয়নের বেশি যুবক-কিশোরকে একত্রিত করেছিল।

পোপ লিও জনগণের সঙ্গে বিশেষ এবং তাৎক্ষণিক সংযোগ তৈরি করেছিলেন, বড় অংশে কারণ তিনি যুবকদের সঙ্গে সরাসরি

ইংরেজি ও স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলেন। এছাড়াও ভাটিকানের আনুষ্ঠানিক কাজের ভাষা ইতালিয়ানও তিনি বেশ ভালো ব্যবহার করেন।

যুব জুবিলীতে পোপ মহোদয় যখন বৈশ্বিক ভাষা ইংরেজি ব্যবহার করেন তখন তাতে ব্যাপক সাড়া দিয়ে যুবকেরা তাদের আনন্দ প্রকাশ করেছিল। কেননা তারা অনুবাদ ছাড়াই বুঝতে পারছিলেন। পোপ চতুর্দশ লিও দারুণভাবে যুবদের সম্ভাবনা, আশা এবং স্বপ্নকে ছুঁয়ে দেখিয়েছিলেন এবং তাদেরকে তার সাথে প্রার্থনায় ও উদ্‌যাপনে নিয়ে এসেছিলেন। ৩ আগস্টেও খ্রিস্টযাগে পুণ্যপিতা যুবকদেরকে বলেন, তুমি যেখানেই থাকো সেখানেই মহান জিনিস ও পবিত্রতা আকাঙ্ক্ষা করো। অল্পতে সন্তুষ্ট হয়ো না। তখন তুমি প্রতিদিন সুসমাচারের আলো নিজের মধ্যে ও চারপাশে বৃদ্ধি পেতে দেখবে।

পুণ্যপিতার সংযোগের ক্ষমতা এবং মিশন, ঐক্য ও শান্তিতে ফোকাস দান বিশেষভাবে দৃশ্যমান হয় ২৭ নভেম্বর-২ ডিসেম্বর, যখন তিনি পোপ হিসেবে তাঁর প্রথম বিদেশ সফর করেন তুরস্ক ও লেবানন পরিদর্শনে।

এই সফরটি পরিকল্পনা করা হয়েছিল সর্বমণ্ডলীর নিসিয়া মহাসভার ১৭০০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে। তবে তিনি সেই ছোট সংখ্যালঘু কাথলিক সম্প্রদায়গুলিকেও উৎসাহিত করেছিলেন, যারা উভয় দেশে বড় ধরনের অবদান রাখে, এবং প্রধান মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা দেখানোর জন্য বহু ঘণ্টা ব্যয় করেছিলেন ।

২ ডিসেম্বর রোম ফেরার পথে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বলেন,

"সম্ভবপর যত বেশি সত্যিকারের ঐক্য এবং বোঝাপড়া, সম্মান এবং মানবিক বন্ধুত্ব ও সংলাপ আমরা প্রচার করতে পারবো, পৃথিবীতে তত বেশি সম্ভাবনা থাকবে যুদ্ধের অস্ত্র দূরে সরিয়ে রাখার; অবিশ্বাস, ঘৃণা, শত্রুতার যে দেয়াল তৈরি হয়েছে তা দূরে রাখার, এবং আমরা একত্রিত হয়ে সত্যিকারের শান্তি ও ন্যায় প্রচারের উপায় খুঁজে পেতে পারব।"

https://www.catholicsun.org/2025/12/15/vaticans-2025-year-brings-new-pope-renewed-focus-on-unity-peace/

- তথ্যসূত্র : news.va

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র পরিবার থেকে সকলকে

MERRY
Christmas
And
Happy New Year

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু
পরিচালক ও সম্পাদক

হিসাব বিভাগ

ডগলাস ডি, রোজারিও
প্রধান হিসাব রক্ষক

অমিত রোজারিও
সহকারী হিসাব রক্ষক

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বিশাল এভারিশ পেরেরা
সম্পাদনা সহযোগী

নব কস্তা
সম্পাদনা সহযোগী

জেভিয়ার রোজারিও
সম্পাদনা সহযোগী

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
সার্কুলেশন ইনচার্জ

প্রান্ত গমেজ
সার্কুলেশন সহযোগী

প্রতিবেশী প্রকাশনী

পরেশ রোজারিও
সেলস্ ইনচার্জ

বিনয় কস্তা
সেলস্ এসিস্ট্যান্ট

টমাস কোড়াইয়া
সেলস্ এসিস্ট্যান্ট

জ্যোতি কম্যুনিকেশন

সুনীল পেরেরা
সহযোগী,
পরিচালক ও সম্পাদক

বাণীদীপ্তি

ফাদার নিখিল গমেজ
কো-অর্ডিনেটর, আরভিএ

সিস্টার লাইলী আরএনডিএম
কো-অর্ডিনেটর বাণীদিপ্তী

রিপন আব্রাহাম টলেন্টিনু
প্রোগ্রাম প্রযোজক,আরভিএ

এন্থনী তপন গমেজ
প্রধান শব্দগ্রাহক

জেমস্ গনছালভেস্
প্রোগ্রাম সহযোগী

জেরী প্রিন্টিং

অজয় পিউস কস্তা
ব্যবস্থাপক

দীপক সাংমা
গ্রাফিক্স ডিজাইনার

পিতর হেম্ব্রম
কম্পিউটার অপারেটর

সাম্য টলেন্টিনু
কম্পিউটার অপারেটর ও গ্রাফিক্স

লিটন
সহযোগী, জেরী প্রিন্টিং

মো: হেমায়েত উদ্দীন
মেশিনম্যান

ফারুক মিয়া
মেশিনম্যান

মানিক রোজারিও
মেশিনম্যান

সেন্টু রোজারিও
মেশিনম্যান

আব্দুল খালেক
বাইন্ডার

সুশীল মারাক
বাবুর্চি

পরিমল টুডু
সিকিউরিটি গার্ড

পলিনুস কেরকেটা
সিকিউরিটি গার্ড

তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী

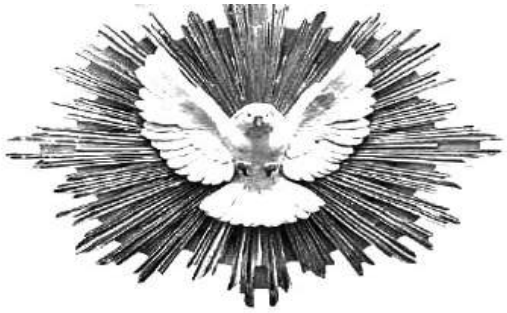

প্রয়াত ওয়াল্টার রোজারিও

পিতা: প্রয়াত রোডল্ফ রোজারিও
মাতা: প্রয়াত আগ্নেস রোজারিও
জন্ম: ২৯ জুলাই, ১৯৪২ (কলকাতা)
মৃত্যু: ০৩ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
(সিলভার স্প্রিং, মেরিল্যান্ড, আমেরিকা)
গ্রাম: নাগরী (জোয়া মিস্ত্রী বাড়ী)
নাগরী ধর্মপল্লী, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

"আজিকে হয়েছে শান্তি,
জীবনের ভুলভ্রান্তি
সব গেছে চুকে।
রাত্রিদিন ধুক্‌ধুক্‌
তরঙ্গিত দুঃখসুখ
থামিয়াছে বুকে।
যত কিছু ভালোমন্দ
যত কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব
কিছু আর নাই।
বলো শান্তি, বলো শান্তি,
দেহ-সাথে সব ক্লান্তি
হয়ে যাক ছাই।"

তুমি নেই, দুই বছর চলে গেল, তুমি নেই। নেই তোমার হাসিমাখা কথা, নাতি-নাতনিদের সাথে খুনসুটি। খাবারের টেবিলে নেই তোমার সরব উপস্থিতি। তুমি হীনা ছোট্ট নিবাসে আজ শূন্যতার বসবাস। এখন দেয়ালের তোমার প্রতিটি ছবি স্মৃতি হয়ে গেছে। গাড়ির চাকা গেছে থেমে। দেয়াল ঘড়ির টিকটিক শব্দ শুনি প্রতিক্ষণ শুধু স্তব্ধ হয়ে গেছে তোমার জীবন ঘড়ি। অবুঝ নাতি-নাতনির চোখে তোমাকে না দেখার শূন্যতা দেয়ালের ছবিতে আটকে থাকে। বড় অসময়ে তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেলে পিতার কোলে।

জীবনে তোমার পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, প্রার্থনা, নিয়মানুবর্তিতা ও আদর্শ ছিল আমাদের দিক নির্দেশনা। সদা হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখেছি সব সময়। দীর্ঘ প্রবাস জীবনে একাকিত্বের মাঝেও তুমি নিজের সুখ বিসর্জন দিয়ে আমাদের রেখেছিলে সুখী করে। তোমার জীবনের সকল কষ্ট আমাদের দিয়েছে সফলতার সোনালী সূর্য।

আমাদের বিশ্বাস আজ তুমি আছো ঈশ্বরের বাগানের ফুল হয়ে। ঈশ্বর তোমাকে ভালোবাসেন বলেই তোমাকে বেছে নিয়েছেন তোমার চরণে ঠাঁই দেবার তরে। তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর আমরা যেন তোমার আদর্শ প্রতি পালন করতে পারি। প্রার্থনা করি তোমার সকল পাপ যেন ঈশ্বর ক্ষমা করেন।

ওপারে তুমি অনেক অনেক ভালো থেকো।

শোকার্ত তোমার প্রিয়জন-

রেবেকা রোজারিও (স্ত্রী)
সিজার রোজারিও (ছেলে)
ডিনা রোজারিও (ছেলে বৌ)
উমা রোজারিও (মেয়ে)
গ্রেগরী শীতল পেরেরা (মেয়ে জামাই)
শার্লি, স্টেফি, ক্লেয়ার ও কার্ল (আদরের নাতনি ও নাতি)
সিলভার স্প্রিং, মেরিল্যান্ড, ইউএসএ

বটমলী হোম অর্ফানেজ টেকনিক্যাল স্কুল

১ হলিক্রশ কলেজ রোড, ৩ তেজকুনী পাড়া, ফার্মগেইট,
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫, মোবাইল ঃ ০১৭৩২৪৬৬৬৩৩

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বটমলী হোম অর্ফানেজ টেকনিক্যাল স্কুলে আগামী ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ ভর্তি কার্যক্রম অতিসত্ত্বর শুরু হতে যাচ্ছে।

ভর্তি ফরম এর মুল্য = ৫০/-

ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও কাগজ পত্রঃ

১। ৮ম শ্রেণি পাশ করার পর পরবর্তী শ্রেণি গুলোতে অধ্যয়নরত দশম শ্রেণি পর্যন্ত।
২। খ্রিস্টান শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বাপ্তিস্মের সার্টিফিকেট (আবশ্যক), পাল-পুরোহিতের নিকট থেকে চিঠি আবশ্যক এবং বিদ্যালয়ের ছাড়পত্র।
৩। জন্ম নিবন্ধন পত্র আবশ্যক এবং জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি (যদি থাকে)।
৪। সম্প্রতি তোলা তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি।
৫। বয়সঃ **১৪ থেকে ১৮ বছর হতে হবে।**
৬। প্রশিক্ষণের মেয়াদ (২) দুই বছর ।

পরীক্ষা পদ্ধতিঃ
ভর্তি পরীক্ষায় : প্রথমে মৌখিক এবং পরে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
ভর্তি পরীক্ষার তারিখঃ ১০/০১/২০২৬, জানুয়ারি

যারা হোস্টেলে থাকবে তাদের জন্য ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ভর্তি ফি, জানুয়ারি মাসের বেতনসহ হোস্টেল ফি বাবদ প্রয়োজন ১,৭০০.০০ (এক হাজার সাতশত) টাকা মাত্র, দ্বিতীয় বছরে ভর্তির জন্য ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা এবং হোস্টেলে অবস্থান ছাত্রদের থাকা-খাওয়া বাবদ প্রতি মাসে ২০০/- (দুইশত) টাকা করে দিতে হবে। ভর্তির সময় অবশ্যই উপযুক্ত অভিভাবক (বাবা/মা) সাথে নিয়ে আসতে হবে। ক্লাসের সময় সকাল ৮:০০ ঘটিকা থেকে দুপুর ১২:০০ ঘটিকা পর্যন্ত এবং বিকাল ১:৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৪:০০ ঘটিকা পর্যন্ত। এ সময়ে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কোন কাজের জন্য ছুটি দেয়া হবে না। তাছাড়া প্রশিক্ষণার্থীদের এখানে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কাজেও অংশ নিতে হয়, বিধায় পরিশ্রম করার মানসিকতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদেরকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

১ম বছর ভর্তি বাবদ= ১,৭০০/- (এক হাজার সাতশত টাকা)।
২য় বছর ভর্তি বাবদ= ১,০০০/- (এক হাজার টাকা)।
প্রতি মাসে = ২০০/- (দুইশত টাকা)।
ট্রেনিং ও বই, খাতা-পত্র বাবদ = ১,০০০/-(এক হাজার টাকা) দুই বছরে।

বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য যোগাযোগ করার মোবাইল নম্বরঃ

বটমলী হোম অর্ফানেজ টেকনিক্যাল স্কুল।
সময় : সোমবার থেকে শনিবার : সকাল ৮: ০০ - ১২: ০০ মিনিট, দুপুর ১: ০০ - ৪: ০০ মিনিট।
ফোন নম্বর : +৮৮-০২-৫৮১৫৫৭৪৮
মোবাইল : ০১৭৩২৪৬৬৬৩৩

ব্রাদার যোগেশ জন কর্মকার, সিএসসি
অধ্যক্ষ
বটমলী হোম অর্ফানেজ টেকনিক্যাল স্কুল

"শান্তি, মহাশান্তির মাঝে তুমি আছ
সুন্দর ঐ রম্যদেশে তুমি আছ।"

স্নেহময়ী মা

মা তুমি ওই নীল আকাশে মিশে আছ, যেখানে বাবা আমাদের সূর্য হয়ে আর মা তুমি চাঁদ হয়ে আছ। তোমরা রেখে গেলে তোমাদের সপ্তর্ষি কন্যা, প্রভাত তারা আর শুকতারা - তোমাদের দুই পুত্র, জামাতা, পুত্রবধু, আরো অসংখ্য তারকারাজি তোমাদের নাতি-নাতনি, পুতি-পুতিন ও বহু প্রিয়জনদের। মা তোমার স্নেহ ভালবাসায়, আদর যত্নে স্বর্গীয় আশীর্বাদে প্রতিক্ষণে তোমাদের নবরত্ন ও তাদের পরিবার ও সকলকে নিলাকাশের নিলাচলে ঘিরে রেখো।

তুমি আমাদের রত্নগর্ভা মা, প্রার্থনাময়ী, ত্যাগী, পরিশ্রমী, যত্নশীল ও এক নারী নেত্রী। বাবার পাশে থেকে তোমার পরিবার ও ৭১ এর যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন দলের জন্য রাতে রান্না করা ও গভীর রাতে তাদের খাবার দেওয়া, যুদ্ধবিধ্বস্ত গ্রাম বাংলার উন্নয়নে গ্রামের মহিলাদের জন্য মুরগীর ফার্ম ও নিয়মিত ঔষধ দেওয়া, বিশুদ্ধ পানির জন্য চাপকল (টিউব ওয়েল) বিতরণ করা। গ্রামের গরীব মহিলাদের পাটের হস্তজাত শিল্পকর্ম ঢাকার জাগরণী বিক্রয় কেন্দ্রে নিতে এবং এই দরিদ্র নারীদের টাকা পয়সা সঠিকভাবে বুঝিয়ে দিতে তুমি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে। সমবায় সমিতি ও সামাজিক উন্নয়ন কাজে তোমার ছিল অদম্য উৎসাহ। বাবার একেবারে পরিপূর্ণাঙ্গ জুড়ি ছিলে তুমি।

ফিলোমিনা নির্মলা ডি'কস্তা
১ জুলাই, ১৯৩৪ – ২১ অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
নর্থ ক্যারোলিনা, ইউএসএ

বাংলাদেশে থাকাকালীন সময়ে সংসারের কাজকর্ম সামলিয়ে তুমি নাগরী মিশনে মা মারীয়ার সেনাসংঘের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারীর দায়িত্ব বিভিন্ন সময় নিষ্ঠার সাথে পালন করেছ। আমেরিকাতেও তুমি সেনাসংঘের প্রার্থনায় বিভিন্ন স্টেইটে তোমার সন্তানদের ও খ্রিস্টভক্তদের সাথে রোজারি মালা প্রার্থনা, বাইবেল পাঠ ও জীবন সহভাগিতায় যুক্ত থেকেছ। মৃত্যু মুহূর্ত পর্যন্ত মা মারীয়ার শৃঙ্খল প্রার্থনা, প্রভুর প্রার্থনা, শিশু মারীয়ার নভেনা আবৃতি করেছ। দুই দিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুইবার রোগী লেপন ও পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করে আত্মিক প্রশান্তি নিয়ে মায়ের মাসে স্বর্গধামে চলে গেলে। ঈশ্বরের মহান আশীর্বাদে তোমার নয় সন্তান, পুত্র-বধূ, জামাতা, ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনী, পুতি-পুতিন সকলেই তোমার এই মহাযাত্রায় গান ও প্রার্থনার মাধ্যমে শয্যাপাশে উপস্থিত ছিল। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে খ্রিস্টপ্রসাদের মত বিস্কুট ভেঙ্গে দু'হাত তুলে প্রার্থনা করে তোমার সন্তানদের খাইয়ে দিয়েছ, হাতে জল নিয়ে সকলের উপর ছিটিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করেছ। এ সবই তোমার প্রার্থনাময়তা, পবিত্রতা, সরলতার নিদর্শন। স্বামীভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বস্ততা ও ভালবাসা ছিল তোমার জীবনাদর্শ। সত্যি মা তুমি আদর্শ স্ত্রী, স্নেহময়ী মা, নিঃস্বার্থ লালনপালনকারী ঠাকুমা ও দিদিমা, এবং গর্বিত বড়মা।

বাংলাদেশে তোমার ভাই ও ভাই বৌ, ভাইস্তা ভাইস্তি, নাতি-নাতনী, আত্মীয়স্বজনদের কুশলাদি নিয়মিত ফোনালাপে জেনেছ। তোমার সদালাপ ও প্রার্থনা সকলের মনে আনন্দ ও সাহস এনে দিত। মা তুমি সকলকে তোমার ভালবাসার ডানার নীচে আগলে রাখতে। তোমার অমায়িক ব্যবহার ও ভালবাসা দিয়ে তুমি সবাইকে এক মিলন বন্ধনে বেঁধে রেখেছ। তোমার জীবদশায় তোমার দুই ছেলে, বৌমা, পাঁচ মেয়ে ও প্রত্যেক জামাতা, দুই সিস্টার মেয়ে তোমাকে দিয়েছে গভীর শ্রদ্ধা, আন্তরিক সেবা-যত্ন ও ভালবাসা। নাতি-নাতনীরা তোমাকে তাদের জীবনের গভীর থেকে ভালবেসেছে। পুতি-পুতিনরা তোমাকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হত। তোমার মুখের মিষ্টি হাসি সকলের মনকে উদ্ভাসিত করেছে। ডাক্তার, নার্স, সেবিকা সকলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। মাকে হারানোর কঠিন ব্যথায় বিশেষ করে যারা প্রার্থনা ও সমবেদনা জানিয়েছেন, সান্ত্বনা দিয়েছেন তাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

মা তুমি শুধু মূল্যবান স্মৃতিই রেখে যাও নি, কিন্তু দিয়ে গেছ এক উত্তরাধিকার যা আমাদের পথ দেখায়, "ঐক্যবদ্ধ থাকো, একে অপরকে সম্মান করো, এবং নিঃশর্ত ভালবাসো।" আমরা জানি ও বিশ্বাস করি বাবা ও তুমি স্বর্গধামে ঈশ্বরের আরাধনায় সর্বদা রত আছ। মা তোমাকে ও বাবাকে প্রণাম জানাই। **শুভ বড়দিন ও নববর্ষের আশীর্বাদ চাই।**

তোমাদের আদরের সন্তান : উষা - নিকোলাস (পরলোকগত), রীনা - সুশীল,
রেবা, আর.এন.ডি.এম, আভা, এস.এম.আর.এ
লরেন্স - প্রভাতি, শুভ্রা - জেমস, শিখা - সুজিত, পঙ্কজ, সিম্মি - ডেনিস,

নাতি -নাতনী : রুজভেল্ট - লিরা, ভিক্টর - রিমি, সুমন - প্রিয়াংকা, ব্লেইজ - মুমু, সুজন - সুইটি,
প্রিন্স - পূজা, জেরি-ক্রিণা, ক্যালভিন, জেসি - জিনা, ক্রিস্টফার, এলি - অকসর,
ম্যাথিউ, ইভা, এমা, মারিসা, জেইডা, জেইক

পুতি -পুতিন : হৃদি, ক্লেইন, রাহী, নিক্সন, এইডেন, অদ্রি, লিয়া,
এলাইনা, ব্রুকলিন, এলা, নায়া, জিজি, কালিন।

হৃদয়ে তোমরা অমর হয়ে আছো

মারীয়া মিনতি বটলেরু
জন্ম : ১৯ জুন, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৪ জুন, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

টমাস বটলেরু
জন্ম: ২৪ এপ্রিল, ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৫ অক্টোবর, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ

এলিজাবেথ বটলেরু
জন্ম: ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৪ অক্টোবর, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ

মাইকেল প্রদীপ বটলেরু
জন্ম: ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৬ নভেম্বর, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

তোমরা আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে গেছ না ফেরার দেশে তা-ও আজ অনেক দিন হলো। কিন্তু আজও তোমাদের স্মৃতি আমাদের মাঝে চির অম্লান। তোমাদেরকে হারানোর বেদনায় আজও কাঁদে অন্তর, ভিজে আঁখি। চোখ মুছতেই তোমাদের সবার মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠে একে একে তোমাদের স্মৃতি। তোমাদের রেখে যাওয়া শত-সহস্র সুখ স্মৃতি ও সুআদর্শ আমাদেরকে পথ চলতে সাহস জোগায়। তোমরা নেই কিন্তু তোমাদের স্পর্শ আমরা অনুভব করি অনুক্ষণে।

স্বর্গ থেকে তোমরা তোমাদের রেখে যাওয়া পরিবারকে আশীর্বাদ করো যাতে করে তোমাদের সকল সন্তান, নাতী-নাতনী, পরিবারের সকল আত্মীয়-স্বজনও যেন তোমাদের মত ন্যায়বান, ধর্মভীরু ও প্রার্থনাশীল হয়ে আদর্শ খ্রিস্টীয় জীবন-যাপন করে যেতে পারে। তোমরা আমাদের শক্তি, আমাদের সাহস।

পরম পিতার সান্নিধ্যে তোমরা পরম শান্তিতে থাকো আর স্বর্গ থেকে আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করো।

পরিবারবর্গ

এম.বি.বি.এস. ডিগ্রী অর্জন

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অপার করুণা ও আশীর্বাদে আমাদের বড় মেয়ে **জয়েস ফ্লোরেন্স গমেজ, এম.বি.বি.এস. চূড়ান্ত পেশাগত পরীক্ষায় সফলতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে চিকিৎসক হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।** এ সাফল্য আমাদের পরিবারের জন্য এক গর্বের ও আনন্দঘন মুহূর্ত।

সে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে হলি ক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে জি.পি.এ. ৫ পেয়ে এস.এস.সি. এবং ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে হলি ক্রস কলেজ থেকে জি.পি.এ. ৫ সহ ট্যালেন্টপুল বৃত্তি অর্জন করে এইচ.এস.সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। পরবর্তীতে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে মুগদা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয় এবং সাফল্যের সঙ্গে এম.বি.বি.এস. ডিগ্রি সম্পন্ন করে। বর্তমানে সে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-এ ইন্টার্নশিপ করছে।

তার এই কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের জন্য আমরা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পাশাপাশি তার শিক্ষা জীবনের প্রতিটি ধাপে সংশ্লিষ্ট স্কুল, কলেজ ও মেডিকেল কলেজের সম্মানিত সকল শিক্ষক, আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীর প্রতি জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

আমাদের প্রার্থনা–সে যেন ভবিষ্যৎ জীবনে মানবিকতা, দায়িত্ববোধ ও নিষ্ঠার সঙ্গে একজন আদর্শ, দক্ষ ও হৃদয়বান চিকিৎসক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

বাবা-মা : ফেবিয়ান সেবিষ্টিন গমেজ ও ঝুমা পালমা
ছোট বোন : ফ্লোরিন জোভানা গমেজ
দাদু-ঠাকুমা : প্রয়াত জন ফটিক গমেজ ও প্রয়াত ক্লারা গমেজ
নানু-দিদা : প্রয়াত জর্জ সুব্রত পালমা ও রেণু পালমা

ঠিকানা: জন-ক্লারা হাউজ, ষড়নিকেতন, রমনা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীকে বিভিন্ন প্রকার সহযোগীতা করে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন যাঁরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাই ।

সম্পাদকীয় বোর্ডের সদস্যবৃন্দ

ফাদার কমল কোড়াইয়া

মালিন ক্লারা বাড়ৈ

থিওফিল নিশারন নকরেক

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিদেশ প্রতিনিধিগণ

জেমস্ গমেজ (আদি)
আমেরিকা

ডেভিড স্বপন রোজারিও
আমেরিকা

বিপুল এলিট গনছালভেস
আমেরিকা

হিউবার্ট ডি'ক্রুজ
আমেরিকা

সুবীর কাস্মির পেরেরা
আমেরিকা

মিন্টু রোজারিও
অস্ট্রেলিয়া

শংকর ভাস্কর পালমা
ইতালি, ইউরোপ

সুমন জন গমেজ
কানাডা

বাংলাদেশে সকল ধর্মপল্লীর পুরোহিতগণ, ব্রতধারী/ব্রতধারিণী, বিভিন্ন ধর্মপল্লীর স্বেচ্ছাসেবীবৃন্দ সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র উন্নয়নে সহায়তা করে চলেছেন। তাদের প্রতিও আন্তরিক ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা।

বাবা: সিরিল ডি রোজারিও
জন্ম : ৩ মার্চ, ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: ধনুন, নাগরী মিশন
মৃত্যু : ১০ এপ্রিল, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
নিউইয়র্ক, আমেরিকা

মা: মারীয়া রোজারিও
জন্ম : ৭ আগস্ট, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : তিরিয়া, নাগরী মিশন
মৃত্যু : ১ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
নিউইয়র্ক, আমেরিকা

তোমরা আমাদের মাঝে নেই এ কথা বিশ্বাস হয় না। আমাদের খুবই কষ্ট হয়, তোমাদের চলে যাওয়া দিন সেই স্মৃতি আজও আমাদের কাঁদায়। তোমরা চলে গেছো না ফেরার দেশে। তোমরা ছিলে ধর্মপ্রাণ, স্নেহশীল, কর্তব্যনিষ্ঠা। তোমরা ছিলে সেনা সংঘের সদস্য এবং সব সময় তোমরা মানুষের কল্যাণ ও সাহায্য-সহযোগিতা করার চেষ্টা করতে।

বাবা ও মা তোমরা আমাদের চোখের সামনেই আছো অনুভূতিতে এবং থাকবে যতদিন আমরা বেঁচে থাকবো। তোমাদের রেখে যাওয়া পরিবারের সবাইকে আশীর্বাদ করো যেন তোমাদের আদর্শে আমরা খ্রিস্টের পথ চলতে পারি। প্রার্থনা করি পরম পিতার কাছে তোমরা শান্তিতে বিশ্রাম করো।

সবাইকে শুভ বড়দিনের ও নববর্ষের শুভেচ্ছা-২০২৬

আশীর্বাদ প্রত্যাশী তোমাদের সন্তানগণ
সমর, স্বপন, সুবাস, সুধীর ও চিত্রা ও
নাতী-নাতনী এবং সকল আত্মীয়-স্বজন।

Blessed are they that mourn for they shall be comforted
St. Matthew 5;4

In loving Memory Of

Callistus D'Rozario
27th Oct. 1926 - 5th Oct. 2010

Euphrasia D'Rozario
18th June 1934 - 11th Sept. 2024

Our hearts still hold onto our loving parents who are missing this Christmas. As we all gather for this joyous Holy Occasion, we cherish their presence in spirit and fondly recall with gratitude every moment they have spent with us.

As we pray for the Christmas angels to bring them sweet eternal rest, we wish **A Merry Christmas and a Happy New Year** to all members of the Christian faith.

Callistus (Notun Tuital-Master Bari) and Euphrasia (Boro Golla-Polton Bari) are forever remembered by their children and their spouses.

Liberatus & Ruth, Tarcisius & Shefali, Ignasius & Jhoan, Cornelius & Lynette, Scholastica & Christopher, Laticia & Osbaldo, Florence & Robert, Jenny and Michael

and their grandchildren:
Russel, Leah, Cornelius, Jonathan, Nicholas, Charles, Matthew, Jason, Adrian, Janice & Jovan.

অনন্তধামে যাত্রার তৃতীয় বছর

মুছে যাওয়া দিনগুলি আমায় যে পিছু ডাকে
স্মৃতি যেন আমারই হৃদয়ে বেদনা রং বেরংয়ের ছবি আঁকে

প্রয়াত গাব্রিয়েল পেরেরা
জন্ম: ২২ ডিসেম্বর, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৭ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বাবা দেখতে দেখতে তিনটি বছর পার হয়ে গেল তুমি আমাদের মাঝে নেই। কিভাবে যে তিনটি বছর পার হয়ে গেল বুঝতেই পারিনি। বাবা তোমার অভাব এখন ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করছি।

বাবা, তোমার অভাব পূরণীয় নয়। তোমার অসীম ভালোবাসা কেবলই তোমার কথা মনে করিয়ে দেয় বার বার। তুমি ছিলে আমার কাছে বট বৃক্ষের মতো, যে বৃক্ষের ছায়া ছিল আমার মাথার উপর। বাবা আমি বিশ্বাস করি তুমি স্বর্গধামে ঈশ্বরের কাছে ভালো আছ। স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের জন্য প্রার্থনা করো এবং আশীর্বাদ করো।

পরিবারবর্গ –

স্ত্রী	:	হাসি দেশাই
ছেলে	:	পলাশ পেরেরা
নাতি	:	আকাশ গাব্রিয়েল পেরেরা
		অনিত্য মাইকেল পেরেরা
ছেলের বউ	:	জেনেভি দেশাই

গ্রাম: বাগবাড়ী
মঠবাড়ী মিশন
গাজীপুর।

অনন্তধামে যাত্রার চতুর্থ বছর

প্রয়াত সিলভেস্টার দেশাই
জন্ম: ২৫ নভেম্বর ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
রাঙ্গামাটিয়া, কালীগঞ্জ, গাজীপুর

"শান্তি মহাশান্তি মাঝে তুমি আছো,
সুন্দর ঐ রম্যদেশে তুমি আছো"

প্রিয় দাদা
- কার্মেল পেরেরা

আমি তোমার ছোট বোন মেরী
তোমার কাছে দু'টি কথা লিখতে কেন হয়ে গেল দেরী?
কেন তুমি না ফেরার দেশে চলে গেলে?
আমায় একা ফেলে?
দিন রাত সামনে ভেসে উঠে তোমার মুখ খানি
আর চোখের জলে ভেসে যায় বুক খানি।
বাড়ীতে আসলে কর নাই দেরী
ছুটে আসতে আমায় দেখতে আমার শ্বশুর বাড়ী।
তুমি নেই এই কথা হয় না বিশ্বাস
কে দেবে আমাকে আশ্বাস?
দাদা, তোমার কাছে বলেছি মনের দুঃখের কথা,
সান্ত্বনা দিয়ে দূর করে নিয়েছ মনের ব্যথা।
তোমার মত দাদাকে আর পাব না কোথাও, তুমি কেন
হয়ে গেলে আমাদের কাছ থেকে উধাও? তোমাকে
দেখিবারে খুঁজি বার বার, দেখা দাও না দাদা একবার?
দাদা তুমি ছিলে একজন সহজ সরল, তোমার মধ্যে ছিল না
কোন গরল। জানি আর কোনদিন পাব না তোমাকে।
শুধু তোমার স্মৃতিগুলো গেঁথে রাখার অন্তরে ততদিন।
১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে তোমার নাতী আকাশের
বিয়ে হয়ে গেছে, স্বর্গ থেকে
আশীর্বাদ কর দু'হাত বাড়িয়ে। তুমি আজ স্বর্গে আছ
এই আমাদের বড় সান্ত্বনা, এর চেয়ে বেশী কি
আছে আর পাওনা? আমরা যেন ভাল থাকি
করিও আমাদের জন্য প্রার্থনা।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
মেয়ে: জেনেভি দেশাই (শিপ্রা)
মেয়ে-জামাই: পলাশ পেরেরা
নাতি: আকাশ গাব্রিয়েল পেরেরা ও
অনিত্য মাইকেল পেরেরা

S.F.X. GREENHERALD
INTERNATIONAL SCHOOL

Cambridge International Centre BD600 Since 1954

Congratulations!

OUTSTANDING CAMBRIDGE
LEARNER AWARDS 2025

AWARD CATEGORY

TOP IN WORLD

O LEVEL
QUALIFICATION

Ahmad Zarif Ferdous
Subject 1 : Additional Mathematics
Subject 2 : Computer Science

Amlan Halder
Subject : Additional Mathematics

Arithra Roy
Subject : Additional Mathematics

Md Shikhor Joarder
Subject : Mathematics Syllabus D

Shreeja Saha
Subject : Mathematics Syllabus D

Zarif Mustafiz
Subject : Mathematics Syllabus D

The RNDM Sisters, Teachers, Students, Officers & Staff of SFX Greenherald International School wish you all a Merry Christmas & A Happy New Year.

Merry Christmas

HAPPY NEW YEAR 2026

24, Asad Avenue, Mohammadpur Dhaka - 1207 + 88-02-410 224 68 info@sfxghis.school www.sfxghis.school

William Carey International School

(An Exclusive English Medium School) Govt. Reg. No.23/English (EIIN: 903421)

CAMBRIDGE International Education
Cambridge International School

Our Facilities

- Spacious Playground
- Reliable Standby Power Supply
- Air-Conditioned Classrooms
- Innovative Teaching Methods
- Modern Teaching Methodologies
- Health and Wellness Programs
- Dedicated Areas For Creative Learning
- Extra-Curricular Activities to Foster Skills
- Clubs (Science, Debating, Environmental, Cultural)

Session July 2025 to June 2026

ADMISSION OPEN

Playgroup to O' Level

Advanced Computer & Multimedia Resources

Using advanced technology in the curriculum equips students with essential digital skills, enhances interactive learning, and prepares them for future academic and career challenges.

CCTV Secured Premises

Our campus is fully secured with CCTV Surveillance, ensuring a safe learning environment for students and peace of mind for parents.

INDIVIDUAL DEVELOPMENT

This approach ensures each student gets personalized attention through modern educational technologies, boosting engagement and academic success.

REGISTER NOW
www.wcischool.org

Bangladesh Baptist Church, 70-D/1, Indira Road,
(West Razabazar) Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka-1207
Phone: +88 02-4102-6113, Mob: 01989283257

DHAKA CAMPUS

ADMISSION OPEN

Session July 2025 to June 2026

Playgroup to STD-X

WHY CHOOSE US?

- Innovative teaching methods
- Dedicated Educators
- Extracurricular opportunities
- Inclusive Community
- CCTV Secured Premises

- **OUR FACILITIES**
- Digital Class Room
- Spacious Playground
- Dedicated Areas for Creative Learning
- Reliable Standby power supply
- Air-Conditioned Classrooms
- Transportation
- Health & Wellness program
- Clubs (Science, Debating, Environmental, Cultural)

ABOUT SCHOOL

Join our Cambridge-registered, English medium school for a balanced education that excels in academics and character building. With top-notch facilities and dedicated educators, we ensure every child thrives. Enroll now for a brighter future!

REGISTER NOW
www.wcischool.org

YMCA International Building, B-2 Jaleswar,
Radio Colony Bus Stand, Savar, Dhaka-1343
Mobile: 01709091205, 01709127850

SAVAR CAMPUS

"Train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart from it."- Proverbs 22:6

Wishing everyone a Christmas filled with peace, joy, and the warmth of togetherness. May the season bring bright moments, kind hearts, and memories that last long into the new year. We are very grateful to God for the achievements of **Dr. Marlin Sushmita Gomes,** who graduated from St. John's University in New York with a Doctor of Pharmacy, and **Anthony Ryan Gomes,** who graduated from Valley Stream North High School with an AP Scholar Award. Everyone please keep them in your prayers and bless them for their future endeavors.

MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR TO YOU ALL

Grandfather: Desmond Gomes
Grandmother: Jacinta Gomes
105/A Green Road Farmgate, Dhaka, Bangladesh

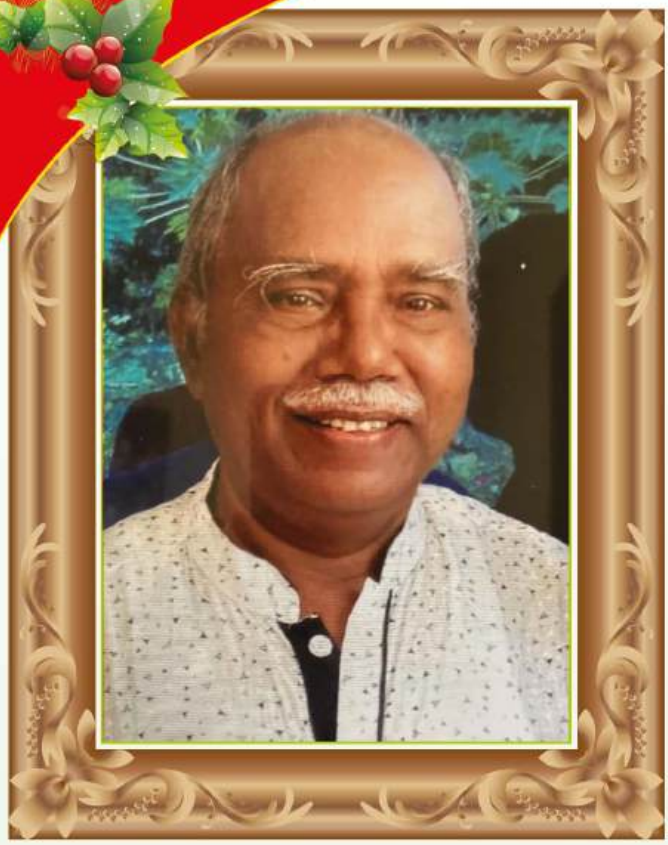

বাবা/দাদু
আমরা তোমায়
অনেক অনেক ভালোবাসি

প্রয়াত আলফন্স রোজারিও

জন্ম : ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ৬ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

(ইউনাইটেড হাসপাতাল, ঢাকা)

গ্রাম: কুচিলাবাড়ি

মঠবাড়ি মিশন, কালিগঞ্জ, গাজীপুর।

দেখতে-দেখতে পাঁচ বছর চলে গেল, ফিরে এলো শুভ বড়দিন ও আরেকটি নতুন বছর। এতো তাড়াতাড়ি তুমি আমাদেরকে ছেড়ে এভাবে চলে যাবে, তা কোনদিন ভাবতেও পারিনি। তেমন কোন অসুস্থতার লক্ষণও তোমার মধ্যে আগে থেকে পরিলক্ষিত হয়নি। তারপরেও কঠিন নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে- সব মিলিয়ে প্রায় এক মাসের মধ্যেই একজন জলজ্যান্ত মানুষ থেকে শুধুই ছবি হয়ে গেলে সবার কাছে। অনন্তের অসীম নীলিমায় হারিয়ে গেলে তুমি, আর কোনদিন ফিরে আসবে না, এই নশ্বর পৃথিবীতে। তোমাকে ছাড়া আমাদের কোন কিছুই আর পরিপূর্ণতা পায় না। কোন পার্বণ বা কোন পারিবারিক অনুষ্ঠান, কোন কিছুতেই না। একটা অপূরণীয় শূন্যতায় নিমগ্ন থাকে সবাই। খেতে গেলে ও সন্ধ্যা প্রার্থনার সময় তোমার চেয়ারখানা আজও খালি পড়ে থাকে। রাতে ঘরে ফিরতে দেরী হলে – আর তোমার কল বেজে ওঠে না। কেউ আর আদরমাখা গলায় বলে না "দেরী করতেছো কেন? তাড়াতাড়ি বাড়ি এসে খেয়ে বিশ্রাম করো।" আবার বাড়ি ফিরলে তোমার স্নেহমাখা স্নিগ্ধ হাসি দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যেতো – সব কালিমা দূর হয়ে যেতো। এখন সেইসব কিছুই একটা ছবিতে আবদ্ধ হয়ে আছে। হাসপাতালে থাকা অবস্থায় শত কষ্টের মধ্যেও কোনদিন বলো নাই- কষ্টের কথা। "কেমন আছো" - জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিতে "আমি তো ভালই আছি।" শৈশবে মাকে হারিয়ে তুমি বেড়ে উঠেছিলে সীমাহীন অনাদরে, মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে। জীবনযুদ্ধে তুমি কখনও পিছু পা হওনি - ছোটবেলা হতে অধ্যবসায়ের দ্বারা কিভাবে বড় হওয়া যায় ও জীবনে উন্নতি করা যায়, তা তুমি আমাদেরকে শিখিয়েছ। অলসতা তুমি মোটেও পছন্দ করতে না। তুমি ছিলে কঠোরভাবে নিয়মানুবর্তী। সময়ের কাজ সময়ে ও নিজের কাজ নিজে করতে তুমি উৎসাহিত করতে সবাইকে। মা মারীয়ার প্রতি তোমার অসীম ভক্তি ছিলো। রোজই রোজারীমালা হাতে করে হাঁটতে বেরোতে এবং সন্ধ্যায় পরিবারের সবাইকে নিয়ে নিয়মিত রোজারীমালা প্রার্থনা করতে নিয়মিত গির্জায় যেতে খ্রিস্টযাগ শুনতে।

তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো আমরা যেন তোমার আদর্শে জীবন পথে চলতে পারি এবং ঈশ্বরের পথ থেকে যেন বিচ্যুত না হই।

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাদের বাবা / দাদু-কে স্বর্গে অনন্ত শান্তি দান করুন।

সবার প্রতি রইলো শুভ বড়দিন ও নববর্ষের অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

তোমার সহধর্মিনী
সিসিলিয়া রোজারিও

তোমার স্নেহধন্য –
পুত্র ও পুত্রবধূগণ এবং একমাত্র কন্যা ও জামাতা

তোমার অনেক আদরের নাতি-নাতনিরা ও নাতিন জামাই –
ঐশী ও ইভান্স, যাকোব, অর্থী, অস্তী, অহনা, প্রাপ্তি, কৃপা, অথৈ, অবনী, রাফেল, মার্সিয়া ও স্যাম।

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100 Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100 Phone : 47113885, E-Mail : wklypratibeshi@gmail.com, Web: www.wklypratibeshi.org, Face Book: Weekly Pratibeshi